শিকাগোতে স্বামী বিবেকানন্দ, ১৮৯৩

"সর্বজীবে সমতা, এটিই হলো মুক্তের লক্ষণ।"

পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ

মেরি লুইজ বার্ক

প্রকাশ ভবন
১৫ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট ॥ কলিকাতা-৭৩

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন ১৩৪৭ (সেপ্টেম্বর ১৯৪০)
দ্বিতীয় সংস্করণ
আশ্বিন ১৩৬৭ (সেপ্টেম্বর ১৯৬০)
তৃতীয় মুদ্রণ
বৈশাখ ১৩৮৭ (মে ১৯৮০)
চতুর্থ মুদ্রণ
মাঘ, ১৪০৮ (জানুয়ারী ২০০২)

প্রকাশক
শ্রীসুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রকাশ ভবন
১৫ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ-শিল্পী
শ্রীকানাই পাল

মুদ্রাকর
চয়নিকা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৬০ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

কম্পুটাব কম্পোজ
ই-মেজ
৩৬/১ ফিডার রোড, জলকল
বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬

চিত্র-মুদ্রক
প্রিন্ট এক্সেল
৮৮বি/১এ আনন্দ পালিত রোড
কলকাতা-১৪

সূচীপত্র

নবম অধ্যায়

পূর্বাঞ্চল ভ্রমণ — প্রথম পর্ব

॥ ১ ॥

১১ মার্চ তারিখের বক্তৃতায় তিনি গোঁড়া খ্রীস্টানদের দ্বারা ভারতের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারের সরাসরি উত্তর দিয়েছিলেন। সেই তেজোদ্দীপ্ত ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণের পর ডেট্রয়েট থেকে তিনি হেল ভগিনীদ্বয়কে লিখলেন—"বক্তৃতা প্রভৃতি বাজে কাজে একেবারে বিরক্ত হয়ে উঠেছি। শত বিচিত্র রকমের মনুষ্যনামধারী কতকগুলি জীবের সহিত মিশে মিশে উত্যক্ত হয়ে পড়েছি। আমার বিশেষ পছন্দের বস্তুটি যে কি, তা বলছি ঃ আমি লিখতেও পারি না, বক্তৃতা করতেও পারি না, কিন্তু আমি গভীরভাবে চিন্তা করতে পারি, আর তার ফলে যখন উদ্দীপ্ত হই, তখন বক্তৃতায় অগ্নিবর্ষণ করতে পারি, কিন্তু তা অল্প অতি অল্পসংখ্যক বাছাই করা লোকের মধ্যেই হওয়া উচিত। তাদের যদি ইচ্ছা হয় তো আমার ভাবগুলি জগতে প্রচার করুক—আমি কিছু করব না। কাজের এ একটা যুক্তিবিভাগ মাত্র।"[১*]
কিন্তু স্বামীজীর ক্লান্তি এবং বক্তৃতা সহায়ে ভারতের জন্য অর্থোপার্জনের আশা ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও স্পষ্টত ঈশ্বরের এরূপ অভিপ্রায়ই ছিল যে, তিনিই তাঁর ভাবধারাগুলি বহন করে নিয়ে চলবেন এবং আরও বিস্তীর্ণ এলাকায় দীর্ঘকাল ধরে সেগুলি ছড়িয়ে দেবেন। সেজন্য তাঁর বিশ্রাম ঈশ্বরের অভিপ্রেত ছিল না। বস্তুত যে শ্রমবিভাগ স্বামীজী এখানে আকাঙ্ক্ষা করেছেন তা তাঁর জীবৎকালে সম্পূর্ণরূপে রূপায়ণের কোন সম্ভাবনা ছিল না।

এ একটা প্রচলিত কথা যে, ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষগণ খুঁটি-নাটি বিশদ পরিকল্পনা করে থাকেন না। কিন্তু তাঁদের জীবনের দিকে ফিরে তাকালে তার মধ্যে একটি বৃহৎ পরিকল্পনার অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায়। স্বামীজী যখন ডেট্রয়েটে তখনই তাঁর আমেরিকার মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলে কাজের তুঙ্গে অবস্থান ঘটে। ডেট্রয়েটে এই তুঙ্গে অবস্থানের সপ্তাহগুলিসহ মধ্যাঞ্চলে

* ১৫ মার্চ, ১৮৯৪ তারিখে লিখিত পত্র (বাণী ও রচনা, ৭ম সংস্করণ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩১৭)

কাজ সাঙ্গ হতে না হতেই আবার আমেরিকার পূর্বাঞ্চল থেকে তিনি আমন্ত্রণ পেতে লাগলেন। এসময়ে তিনি স্লেটন লাইসিয়াম বক্তৃতা ব্যবস্থাপক গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন এবং যেখানেই আমন্ত্রণ পাবেন সেখানেই যাবার অধিকাব অর্জন করেছেন। এমন কি তখন তিনি ভারতেও ফিরে আসতে পাবতেন—সেকথা তিনি ভেবেও ছিলেন। কিন্তু জনসভায় একনাগাড়ে বক্তৃতা দেওয়ায় বিরক্তি এসে পড়লেও আমেরিকায় অন্ততপক্ষে আরও কয়েকমাস থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্তই তিনি নিলেন।

এ-কথা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হতে এ সম্পর্কে তিনি কোন প্রত্যক্ষ নির্দেশ পেয়েছিলেন কিনা—না, নিজের প্রজ্ঞা বা ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। কিন্তু এটি সুনিশ্চিত যে, এ ব্যাপারে নির্দেশ কোন দিব্য উৎস থেকেই এসেছিল। এ-বিষয়ে তাঁর নিজের মনে সর্বদা একটি দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে একটি চিঠিতে তিনি এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—"প্রভুর ইচ্ছায় এখনও নামযশের ইচ্ছা আমাব হৃদযে আসেনি এবং বোধহয় আসবেও না। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী।... এদেশে সহস্র সহস্র নরনারী আমাকে অতিশয় স্নেহ-প্রীতি ও ভক্তি করে। 'মূকং কবোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।' আমি তাঁর কৃপায় আশ্চর্য! যে শহরেই যাই তোলপাড় হয়। এরা আমার নাম দিয়েছে 'Cyclonic Hindu'। মনে রেখো এ তাঁর ইচ্ছা—I am a voice without a form, আমি অমূর্ত বাণী।"[২*] পরে আরও লিখলেন—"এখন পূর্বদিকে যাচ্ছি। কোথায় যে বেড়া পাযে লাগবে (তরী পাড়ে ভিড়বে) তিনিই জানেন।"[৩*] এইভাবে তিনি ঈশ্বর কর্তৃক যেদিকে চালিত হয়েছেন, সেদিকেই চলতে শুরু করে, মার্চের শেষে ডেট্রয়েট ছেড়ে নিউ-ইযর্কের অভিমুখে যাত্রা কবলেন।

পূর্বাঞ্চলে যাপিত তাঁর যে জীবন কাহিনী আজ আমাদের নিকট সুপরিচিত, তা বর্ণনা করার আগে তাঁর মধ্যাঞ্চল ভ্রমণ কাহিনীর একটি শূন্য স্থান পূরণের উদ্দেশ্যে মুহূর্তের জন্য সেদিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। প্রথম খণ্ডের শেষ অধ্যাযে একথা সংক্ষেপে উল্লেখিত হয়েছে যে, ডেট্রয়েটে ছ-সপ্তাহ অবস্থানকালে তিনি দুবাব এ অঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র যান—একবার ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে ওহিয়োর অন্তর্গত আডাতে (Ada), আর একবার ২০ ও ২১ মার্চ তারিখদ্বয়ে বে সিটি ও মিচিগানের অন্তর্গত স্যাগিনতে। এই আডায়

* বাণী ও বচনা, ১ম সং, ৭ম খণ্ড, পত্রসংখ্যা ১৪১, পৃঃ ২৪ ও ২৮

যাবার সময়ও স্বামীজী বক্তৃতা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। এই ছোট্ট শহরটিকে তারা তাঁর বক্তৃতার পক্ষে উপযুক্ত ক্ষেত্র বলে নির্বাচিত করেছিল নিশ্চয়ই এই কারণে যে, এখানে ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে মেথডিস্ট সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ওহিয়ো উত্তরাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়টির দ্বারা প্রচুর শ্রোতৃ-সমাবেশ ঘটাবার সম্ভাবনা। সত্যই তা সম্ভব হয়েছিল। আডা রেকর্ড নামে ওখানে যে সাপ্তাহিক পত্রিকাটি ছিল ওই শহরের সমসাময়িককালে একমাত্র সংবাদপত্র, তাতে স্বামীজীর ভাষণের একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও বক্তার প্রতি প্রতিবেদকদের দৃষ্টি যথেষ্ট তীক্ষ্ণ ছিল না, তবুও তাদের প্রতিবেদনের মাধ্যমেই সুস্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় এক আগ্রহী, সচেতন এবং কিছুটা বিস্ময়াবিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীকে, যাবা স্বামীজীর প্রতি বোমা বর্ষণের মতো সবরকম প্রশ্ন নিক্ষেপ কবছিল, যার মধ্যে অনেকগুলি হিন্দুধর্মের প্রতি তাদের আগ্রহশীলতার পরিচায়ক।

২১ এবং ২৮ ফেব্রুয়ারির আডা রেকর্ডে যথাক্রমে নিম্নলিখিত ঘোষণাটি ও প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ঃ

হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ

যিনি তাঁর দেশে আমাদের দেশের জোসেফ কুকের মতো, তিনি ২৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় অপেরা হাউসে 'মানুষের দেবত্ব' সম্বন্ধে ভাষণ দেবেন।

ভাষণ

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় অপেরা কক্ষটি হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের 'মানুষের দেবত্ব' সম্বন্ধে ভাষণকালে পূর্ণ ছিল।

৮-৩০-এর পূর্বে বক্তা মঞ্চে আসেন-নি। ব্যক্তিগত আকৃতিতে তিনি সুগঠিত দেহের অধিকারি, মধ্যবয়স্ক এবং পরিচ্ছন্ন মুখচ্ছবি-বিশিষ্ট। তাঁর চোয়াল প্রশস্ত, চোখ দুটি ছোট উজ্জ্বল ও ঘন-সন্নিবিষ্ট। তাঁর গায়ের রঙ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। তাঁর শব্দ চয়ন প্রমাণ করল তিনি একজন শিক্ষিত মানুষ এবং আমরা শুনেছি যে, তিনি আমেরিকার কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক।

*তিনি তাঁর ভাষণে যা বলেন তা এরূপ**—"সকল ধর্মের মূল ভিত্তি*

* বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৭০-৭১

হলো মানুষের প্রকৃত স্বরূপ আত্মাতে বিশ্বাস—যে আত্মা জড় পদার্থ ও মন দুয়েরই অতিরিক্ত কিছু। জড়বস্তুর অস্তিত্ব অপর কোন বস্তুর ওপর নির্ভর করে। মনও পরিবর্তশীল বলে অনিত্য। মৃত্যু তো একটি পরিবর্তন মাত্র।

"আত্মা মনকে যন্ত্রস্বরূপ করে চালিত করে। মানবাত্মা যাতে শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়, সেই চেষ্টা করা কর্তব্য। মানুষের স্বরূপ হলো নির্মল ও পবিত্র, কিন্তু অজ্ঞান এসে মেঘের মতো ওকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ভারতীয় ধর্মের দৃষ্টিতে প্রত্যেক আত্মাই তার প্রকৃত শুদ্ধ স্বরূপ ফিরে পেতে চেষ্টা করছে, ভারতবাসী আত্মার স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। আমাদের ধর্মই একমাত্র সত্য। এটা আমাদের প্রচার করা নিষিদ্ধ।

"আমি হলাম চৈতন্যস্বরূপ, জড় নই। প্রতীচ্যের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী মানুষ মৃত্যুর পরও আবার স্থূল শরীরে বাস করার আশা পোষণ করে। আমাদের ধর্ম শিক্ষা দেয় যে, এরূপ কোন অবস্থা থাকতে পারে না। আমরা 'পরিত্রাণে'র বদলে আত্মার মুক্তির কথা বলি।"

মূল বক্তৃতাটিতে মাত্র ৩০ মিনিট লেগেছিল; তবে বক্তৃতার ব্যবস্থাপক সমিতির অধ্যক্ষ ঘোষণা করেন, বক্তৃতার শেষে কেউ প্রশ্ন করলে বক্তা তার উত্তর দিতে প্রস্তুত আছেন। এই সুযোগ অনেকেই গ্রহণ করেছিলেন। যাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে যেমন ছিলেন ধর্মযাজক, অধ্যাপক, ডাক্তার ও দার্শনিক, তেমনি ছিলেন সাধারণ নাগরিক, ছাত্র, সৎলোক আবার দুষ্ট লোক। অনেকে লিখে তাঁদের প্রশ্ন উপস্থাপিত করেন। অনেকে আবার তাঁদের আসন থেকে উঠে বক্তাকে সোজাসুজি প্রশ্ন করেন। বক্তা সকলকেই সৌজন্যের সঙ্গে উত্তর দেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশ্নকর্তাকে বেশ হাসিয়ে তোলেন। একঘণ্টা এরূপ চলার পর বক্তা আলোচনা সমাপ্তির অনুরোধ জানান। তখনও বহু লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাকি। বক্তা অনেকগুলির জবাব কৌশলে এড়িয়ে যান। যাই হোক তাঁর আলোচনা থেকে হিন্দুধর্মের বিশ্বাস ও শিক্ষাসমূহ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আরও কয়েকটি কথা আমরা লিপিবদ্ধ করলাম ঃ*

হিন্দুরা মানুষের পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। তাদের ভগবান কৃষ্ণ উত্তর ভারতে পাঁচ হাজার বছর আগে এক শুদ্ধভাবা নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণের কাহিনী বাইবেলে কথিত খ্রীস্টের জীবনেতিহাসের অনুরূপ। তবে কৃষ্ণ নিহত হন এক আকস্মিক দুর্ঘটনায়। হিন্দুরা মানবাত্মার প্রগতি এবং

*দেহান্তর প্রাপ্তি স্বীকার করেন। আমাদের আত্মা পূর্বে পাখি, মাছ বা অপর কোন ইতর প্রাণীর দেহে আশ্রিত ছিল। মরণের পর আবার অন্য কোন প্রাণী হয়ে জন্মাবে। একজন জিজ্ঞাসা করেন, এই পৃথিবীতে আসার আগে এসব আত্মা কোথায় ছিল? বক্তা বলেন, 'অন্যান্য লোকে। আত্মাসকল অস্তিত্বের অপরিবর্তনীয় আধার। এমন কোন কাল নাই যখন ঈশ্বর ছিলেন না এবং সেইজন্য এমন কোন কাল নাই যখন সৃষ্টি ছিল না। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা ব্যক্তি ভগবানকে স্বীকার করেন না।' বক্তা বলেন—"তিনি বৌদ্ধ নন। খ্রীস্টকে যেভাবে পূজা করা হয়, মহম্মদকে সেইভাবে করা হয় না। মহম্মদ খ্রীস্টকে মানতেন, তবে খ্রীস্ট যে ঈশ্বর—তা অস্বীকার করতেন। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ক্রমবিকাশের ফলে ঘটেছে, বিশেষ কোন নির্বাচন বা সৃজনের মাধ্যমে নয়। ঈশ্বর হলেন স্রষ্টা, আর বিশ্বপ্রকৃতি হলো তাঁর সৃষ্টি। শিশুদের জন্য ছাড়া হিন্দুধর্মে প্রার্থনার রীতি নেই। আর তাও শুধু মনের উন্নতির উদ্দেশ্যে। পাপের শাস্তি অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি ঘটে থাকে। আমরা যে-সব কাজ করি, তা আত্মার নয়, অতএব কাজের ভেতর মলিনতা ঢুকতে পারে। আত্মা পূর্ণস্বরূপ, শুদ্ধস্বরূপ। তার কোন বিশ্রাম-স্থানের প্রয়োজন হয় না। জড়পদার্থের কোনও ধর্ম আত্মাতে নেই। মানুষ যখন নিজেকে চৈতন্যস্বরূপ বলে জানিতে পারে, তখনই সে পূর্ণাবস্থা লাভ করে। ধর্ম হলো আত্মস্বরূপের অভিব্যক্তি। যে যত আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত, সে তত সাধু। ভগবানের শুদ্ধসত্তার অনুভবের নামই উপাসনা। হিন্দুধর্ম বহিঃপ্রচারে বিশ্বাস করে না। তার শিক্ষা এই যে—মানুষ যেন ভগবানকে ভালবাসার জন্য ভালবাসে এবং প্রতিবেশীর প্রতি সদয় আচরণের সময় নিজেকে যেন সম্পূর্ণ ভুলে যায়। পাশ্চাত্যের লোক অতিরিক্ত কর্মপ্রবণ। বিশ্রামও সভ্যতার একটি অঙ্গ। হিন্দুরা নিজেদের দোষ-ত্রুটি ঈশ্বরের উপর চাপায় না। বিভিন্ন ধর্মগুলির মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রবণতা এখন দেখা যাচ্ছে।"**

স্পষ্টত, সেন্ট লুইতে যে রটেছিল স্বামীজী "আমেরিকার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক" (চতুর্থ অধ্যায় ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য), তা এই মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এ-সংবাদ আডার মেথডিস্ট সম্প্রদায়ের বিশ্ববিদ্যালয়টির নিকট স্বস্তি বহন করে এনেছিল। আডা রেকর্ড তার পুনরাবৃত্তি করেছে কোন অভিসন্ধি নিয়ে নয়। যদিও মূলে রটনাটি ছিল বিদ্বেষমূলক।

* বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ৭০-৭২

জোসেফ কুকের সঙ্গে স্বামীজীকে তুলনা করার ব্যাপারেও কোন মন্দ অভিপ্রায় ছিল না। জোসেফ কুক আমেরিকার একজন অগ্নিবর্ষী বক্তা, যিনি ধর্মমহাসভায় 'সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্বের' আদর্শের প্রতি সমর্থন জানান নি। তুলনাটি এক অর্থে প্রশংসাসূচকই, কারণ নিঃসন্দেহে এটি করা হয়েছিল রেভারেন্ড কুকের খ্যাতি ও প্রভাবের দিকে দৃষ্টি রেখে, তাঁর প্রচারবেদি হতে অন্যকে আঘাত করবার প্রবণতার দিকে দৃষ্টি রেখে নয়।

বে সিটিতে এবং মিচিগানের অন্তর্গত স্যাগিন শহরে মার্চ মাসের শেষভাগে স্বামীজীর কাজের ও আডা শহরে তাঁর কাজের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য ছিল, কারণ সেখানে ব্যবস্থাপনায় বক্তৃতা-সংস্থা ছিল না, সম্ভবত ব্যবস্থাপনায় ছিলেন শ্রীযুক্ত হোল্ডেনের উত্তরাধিকারী। সে যাই হোক না কেন, ১৬ মার্চের আগেই সেগুলির ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল, কেন না ১৭ মার্চ ডেট্রয়েট ট্রিবিউনে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল ঃ

বে সিটিতে কানন্দ

বে সিটি, মিচ., বিশেষ সংবাদ, মার্চ ১৬ হিন্দু সন্ন্যাসী কানন্দ পরের মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এখানে একটি বক্তৃতা দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। স্থানীয় কোন গির্জাতে তিনি যোগাযোগ করতে পারেন নি, তাঁর বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হবে ওয়াশিংটন অ্যাভিনিউস্থ পুরান স্কেটিং ক্রীড়াক্ষেত্রে।

মনে হতে পারে যে, বে সিটির ধর্মযাজক সম্প্রদায় স্বামীজীকে উপযুক্ত স্থান দিতে অস্বীকার করেছিলেন এবং 'পুরান স্কেটিং ক্রীড়াক্ষেত্র'—কথাগুলি হতে মনে হতে পারে যে, তিনি যেন বাধ্য হয়েছিলেন ভগ্নদশা, পরিত্যক্ত গোলাবাড়ির চেহারার একটি স্থানে ভাষণ দিতে এবং বে সিটির সাংবাদিকও যেন তাঁর প্রতিবেদনে এ-কথাটিই বোঝাতে চেয়েছেন। বাস্তবে কিন্তু ঠিক তা নয়, কারণ পুরান স্কেটিং ক্রীড়াক্ষেত্রটিই ঐ সময়ে বে সিটির রঙ্গমঞ্চে পরিণত হয়েছিল, যেখানে যে-কোন অনুষ্ঠান—এমন কি নৃত্যগীতাদিও অনুষ্ঠিত হতো। সুতরাং এই পুরান ক্রীড়াক্ষেত্রটিতে দোষের কিছু ছিল না।

সম্ভবত বে সিটির ধর্মযাজকেরা স্বামীজীর প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলেন এবং তাঁদের অনুগামীদের সাবধান করে একই কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু জনসাধারণের অপর অংশ সানন্দে তাদের খ্যাতনামা অভ্যাগতকে স্বাগত জানিয়েছিল। সংবাদপত্রগুলি তাঁর আগমন ঘোষণা করে লিখেছিল—"আজকের

সন্ধ্যায় অপেরা হাউসে হিন্দুধর্ম বিষয়ে সবকিছু বলা হবে" এবং "বে সিটির জনসাধারণ খ্রীস্ট, ইহুদী ও ইসলাম ব্যতিরিক্ত একটি অন্যধর্মের মুখপাত্রের ভাষণ শোনবার দুর্লভ সুযোগ পাবেন মঙ্গলবার ২০ মার্চ তারিখে ওয়াশিংটন অ্যাভিনিউস্থ ক্রীড়াক্ষেত্রটিতে।" পরবর্তী দুটি দীর্ঘ প্রতিবেদন বে সিটির দুটি সংবাদপত্র হতে গৃহীত ঃ

আগামীকাল (২০ মার্চ, মঙ্গলবার) অপেরা হাউসে বিবে কানন্দের ভাষণের জন্য সংরক্ষিত আসনের টিকিট বিক্রয়। কোন অতিরিক্ত অর্থ দেয় নয়।

এই হিন্দু সন্ন্যাসীটি ডেট্রয়েট শহরে আর. জি. ইঙ্গারসোলের চেয়েও অধিক শ্রোতা আকর্ষণ করেছেন। তাঁর চমৎকার ভাষণ-দক্ষতা, বিশুদ্ধ ইংরেজী ও চিন্তার গভীরতা এ-দেশের সর্বত্র শিক্ষিত মানুষদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। তিনি শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর দেশবাসীর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।[৪]

ধর্মমহাসভায় এক বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন এই সুপণ্ডিত হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবে কানন্দ। তিনিই আজ সন্ধ্যায় অপেরা হাউসে ভাষণ দেবেন এবং লক্ষণসমূহ দেখে মনে হচ্ছে যে, তিনি বিপুল পরিমাণ শ্রোতা পাবেন এবং তাদের মধ্যে পাবেন বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গকেও।[৫]

একজন হিন্দু সন্ন্যাসী

গত সন্ধ্যায় তিনি অপেরা হাউসে এক চিত্তাকর্ষক ভাষণ দিয়েছেন। তিনি যে ধরনের ভাষণ গতকাল সন্ধ্যায় এখানে দিয়েছেন, সেরকমটি শোনবার সুযোগ বে সিটির অধিবাসিগণ কদাচিৎ পেয়ে থাকেন। ভদ্রলোকটি ভারতের অধিবাসী, প্রায় তিরিশ বছর আগে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেছেন। যখন ডঃ সি. টি. নিউকার্ক বক্তাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন তখন অপেরা হাউসটির নিচের তলা অর্ধেক পূর্ণ হয়েছে। তাঁর ভাষণে প্রসঙ্গত তিনি এ-দেশের মানুষদের সর্বশক্তিমান ডলার-উপাসনার প্রবৃত্তির জন্য সমালোচনা করেন। এ-কথা সত্য যে, ভারতে জাতিবিভাগ আছে। কিন্তু ওখানে একজন খুনী কখনও সমাজের শীর্ষদেশে আরোহণ করতে পারে না। এ-দেশে সে যদি লক্ষ লক্ষ ডলার উপার্জন করতে পারে, তাহলেই সে অন্য সকলের মতো ভাল। কিন্তু ভারতে একজন অপরাধী সর্বাবস্থায়

একজন অধঃপতিত বলে বিবেচিত হবে। হিন্দুধর্মের একটি শ্রেষ্ঠ দিক হলো, তার অন্য ধর্মমত সম্বন্ধে সহিষ্ণুতা। খ্রীস্টধর্ম প্রচারকেরা অন্যান্য প্রাচ্যদেশীয় ধর্মগুলির তুলনায় ভারতীয় ধর্মসমূহ সম্বন্ধে অধিক কঠোর মনোভাবসম্পন্ন, তার কারণ হিন্দুরা তাদের সে মনোভাব পোষণ করতে দেয় এবং এভাবেই তারা তাদের অন্যতম মূল বিশ্বাস সহনশীলতা পালন করে থাকে। কানন্দ উচ্চশিক্ষিত এবং মার্জিত রুচিসম্পন্ন ভদ্রলোক। শোনা যায় ডেট্রয়েটে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, হিন্দুরা তাদের শিশুসন্তানদের নদীতে বিসর্জন দেয় কিনা। উত্তরে তিনি বলেন—না, তারা তা করে না, তাঁরা খুঁটিতে বেঁধে ডাইনীও পোড়ায় না। বক্তা আজ স্যাগিনতে ভাষণ দেবেন।[৬]

গতকাল বে সিটিতে খ্যাতনামা হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবে কানন্দ
অপেরা হাউসে তাঁর দেশের ধর্ম-বিষয়ে ভাষণ—
আমেরিকা সম্বন্ধে তাঁর মতামত ঃ

গতকাল বে সিটি বহু আলোচিত হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবে কানন্দের মধ্যে একজন বিশিষ্ট অভ্যাগতকে পেয়েছিল। তিনি গতকাল মধ্যাহ্নে ডেট্রয়েট থেকে এসে পৌঁছান, ডেট্রয়েটে তিনি সেনেট-সদস্য পামারের অতিথি ছিলেন। এখানে এসেই তিনি ফ্রেজার হাউসে চলে যান। সেখানে 'দ্য ট্রিবিউন' পত্রিকার সাংবাদিক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কানন্দের আকৃতি দৃষ্টি-আকর্ষক। তাঁর দৈর্ঘ্য প্রায় ছ ফুট, ওজন একশ আশি পাউন্ডের মতো এবং গড়ন অত্যন্ত সুঠাম। তাঁর গায়ের রঙ জলপাইয়ের মতো। চুল ও চোখ অতি সুন্দর কালো রঙের, পরিষ্কার ক্ষৌরিত মুখমণ্ডল। কণ্ঠস্বর কোমল ও সুরেলা, আর তিনি অত্যন্ত লক্ষণীয়ভাবে ভাল ইংরেজী বলেন, অন্তত্পক্ষে অধিকাংশ আমেরিকাবাসীদের অপেক্ষা ভাল বলেন। তাঁর সৌজন্য বিশেষভাবে লক্ষ্যে পড়বার মতো উচ্চ স্তরের।

কানন্দ তাঁর নিজ দেশ এবং এদেশ সম্পর্কে তাঁর যে ধারণা হয়েছে সে সম্পর্কে চিত্তবিনোদনকারী ভাষণ দেন। তিনি আমেরিকায় এসেছেন প্রশান্ত মহাসাগরের পথে আর ফিরবেন আটলান্টিকের পথে। তিনি বলেন, "এ-দেশ একটি মহান দেশ। কিন্তু আমি এখানে স্থায়িভাবে বসবাস করতে চাই না। কারণ আমেরিকার অধিবাসিগণ বড় বেশি অর্থ-সচেতন। তারা অর্থকে সবকিছুর ওপরে স্থান দেয়। তোমাদের দেশের অধিবাসিদের অনেক

কিছু শোনবার আছে। যখন তোমাদের জাতি আমাদের মতো প্রাচীন হবে, তখন আরও বেশি প্রাজ্ঞ হবে। আমি শিকাগোকে খুব পছন্দ করি আর ডেট্রয়েট খুব সুন্দর শহর।"

তিনি কতদিন আমেরিকায় থাকতে চান—এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "আমি জানি না। আমি যতটা পারা যায় তোমাদের দেশটি দেখে নিচ্ছি। এর পরেই আমি পূর্বাঞ্চলে যাচ্ছি এবং বোস্টন ও নিউ-ইয়র্কে কিছুদিন থাকব। ঐ অঞ্চলে আমি আগে কখনো যাইনি।"

প্রাচ্যদেশীয় ব্যক্তিটি জানান যে, তাঁর বয়স তিরিশ বছর। তিনি জন্মেছেন কলকাতায় এবং ঐ শহরের একটি মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছেন। তাঁর বৃত্তির জন্যে তাঁকে তাঁর দেশের সর্বত্র যেতে হয় এবং সব সময়ই তিনি সকলেরই অতিথি হতে পারেন।

ভারতের জনসংখ্যা ২৮৫,০০০,০০০। এর মধ্যে ৬৫,০০০,০০০ মুসলমান। আর সবই প্রায় হিন্দু। মাত্র ৬০০,০০০ খ্রীস্টান আছে সে দেশে, এদের মধ্যে ২৫০,০০০ হলো ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত। সাধারণত আমাদের দেশের লোকেরা খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করে না, তারা তাদের নিজের ধর্মেই তৃপ্ত। অর্থলোভে কেউ কেউ খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করে থাকে। তাদের তা গ্রহণ করবার স্বাধীনতা আছে। আমরা বলি প্রত্যেক লোককে তার নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস নিয়ে চলতে দেওয়া হোক। আমরা খুব বুদ্ধিমান জাতি, আমবা রক্তপাতে বিশ্বাসী নই। আমাদের দেশেও দুষ্টলোক আছে এবং তাদের সংখ্যাই বেশি, তোমাদের দেশের মতোই। সব লোকই দেবদূতের মতো হবে—এ আশা করা অযৌক্তিক।

বিবে কানন্দ আজ রাত্রে স্যাগিনতে ভাষণ দেবেন।

গত রাত্রির ভাষণ

গত সন্ধ্যায় বক্তাটি যখন তাঁর ভাষণ দিতে আরম্ভ করেন তখন অপেরা হাউস ভালভাবে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ঠিক ৮-১৫ মি.-এ স্বামী বিবে কানন্দ তাঁর সুন্দর প্রাচ্য দেশীয় পোশাকে মঞ্চে এলেন। অল্প কথায় ডঃ সি.টি. নিউকার্ক তাঁর পরিচয় প্রদান করলেন।

বক্তৃতার প্রথমাংশ ছিল ভারতের বিভিন্ন ধর্মের এবং পুনর্জন্মবাদের ব্যাখ্যা। পুনর্জন্মবাদের প্রসঙ্গে বক্তা বলেন যে, বৈজ্ঞানিকের নিকট শক্তির

নিত্যতা তত্ত্বের যে ভিত্তি, ঐ তত্ত্বেরও সেই একই ভিত্তি। শক্তির নিত্যতা-তত্ত্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, তাঁর দেশের একজন দার্শনিক এ-তত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা। তাঁর দেশের লোকেরা সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস করে না। সৃষ্টির অর্থ হলো শূন্য থেকে কোন কিছুর আবির্ভাব ঘটানো। সে অসম্ভব, হতেই পারে না। এই বিশ্বসৃষ্টির কোন আদি নেই, যেমন কালের কোন আরম্ভ নেই। ঈশ্বর এবং সৃষ্টি দুটি সমান্তরাল রেখার মতো—আদিও নেই, অন্তও নেই। আর এগুলির সঙ্গে তুলনা করা যায়, এরকম আর কোন কিছুই নেই। তাদের সৃষ্টিতত্ত্বের কথা হলো, "সৃষ্টি আছে, ছিল, থাকবে।" তারা মনে করে যে শাস্তি হলো প্রতিক্রিয়া। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়। এটা হলো ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া। বর্তমান পরিস্থিতির দ্বারা ভবিষ্যতের পরিস্থিতি নির্ধারিত হয়। ঈশ্বর শাস্তি দেন—এ তত্ত্ব তারা বিশ্বাস করে না। বক্তা বলেন, "এ-দেশে তোমরা যে ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয় না, তার প্রশংসা করে থাক এবং যে ক্রুদ্ধ হয় তাকে অধঃপাতে পাঠাও। অথচ হাজার হাজার মানুষ ঈশ্বরকে ক্রুদ্ধ হবার অভিযোগে রোজ অভিযুক্ত করছে। সকলেই নীরোর নিন্দা করে থাকে, কারণ রোম যখন অগ্নিতে ভস্মীভূত হচ্ছিল, নীরো তখন মহানন্দে তার বাদ্যযন্ত্রে সঙ্গীত বাজাচ্ছিল। অথচ তোমাদের দেশে হাজার হাজার মানুষ ঈশ্বর তাই করছেন বলে অভিযোগ করে থাকে।"

হিন্দুদের ধর্মে কোন পরিত্রাণ তত্ত্ব নেই। যীশু এসেছিলেন কেবল পথ প্রদর্শন করতে। প্রত্যেক মানুষই দেবতা, কিন্তু যেন পর্দায় ঢাকা; তাদের ধর্ম কেবল সেই আবরণ উন্মোচন করবার প্রয়াস করে চলেছে। সেই আবরণ উন্মোচন কার্যকে খ্রীস্টানগণ নাম দিয়েছেন 'পরিত্রাণ', হিন্দুরা 'মুক্তি'। ঈশ্বর বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা।

তারপর বক্তা তাঁর দেশের বিভিন্ন ধর্মকে সমর্থন করবার প্রয়াস করলেন। তিনি বললেন—"রোমান ক্যাথলিক চিন্তাধারা যে পুরোপুরি বৌদ্ধ ধর্ম হতে গৃহীত হয়েছে—এ-কথা প্রমাণিত। পাশ্চাত্যের অধিবাসীদের কর্তব্য ভারতের নিকট হতে একটি জিনিস শিক্ষা করা—তা হলো সহনশীলতা।"

অন্যান্য যে সকল বিষয় তিনি সমালোচনা করেছেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করবার প্রয়াস পেয়েছেন, তা হলো : খ্রীস্টধর্ম প্রচারকদের প্রসঙ্গ, প্রেসবিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের অত্যুৎসাহ এবং অসহিষ্ণুতা, এ দেশের মানুষদের অর্থের উপাসনা করার প্রবণতা এবং পুরোহিতবর্গের বিষয়।

এই শেষোক্ত শ্রেণী এই ব্যবসায়ে এসেছেন, কারণ এতে অর্থ আছে। তিনি জানতে চান যদি তাঁদের পারিশ্রমিকের জন্যে ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করতে হয়, তাহলে তাঁরা কতদিন এ কাজে লেগে থাকবেন? ভারতের বর্ণপ্রথা, আমাদের দক্ষিণাঞ্চলের সভ্যতা, আমাদের সাধারণ জ্ঞান এবং আরও নানা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনান্তে তিনি তাঁর ভাষণ সমাপ্ত করেন।[৭]

বে সিটি থেকে স্বামীজী মিচিগানের স্যাগিন শহরের অভিমুখে যাত্রা করেন, সেখানে তিনি বুধবার ২১ মার্চ তারিখে বক্তৃতা করেন। সম্ভবত তাঁর এ সময়কার কার্যাধ্যক্ষ কানন্দকে আর চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে উপস্থাপিত করছিলেন না, সেজন্য শ্রোতার সংখ্যা কম হয়েছিল। এ পরিস্থিতি "স্যাগিন ইভনিং নিউজ" পত্রিকার সম্পাদককে যতদূর সম্ভব উত্তেজিত করেছিল।

এই পত্রিকাটি এবং শহরের "ক্যুরিয়ার হেরাল্ড" নামক অপর সংবাদপত্রটি—দুটিই স্বামীজীর ওখানে আগমনের বিবরণ দিয়েছেন স্বামীজী একজন বৌদ্ধ—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে। বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের মধ্যে এই বিভ্রান্তি তখন আমেরিকার ছোটখাট শহরেই শুধু নয়—ধর্মমহাসভানুষ্ঠানের সময় শিকাগো শহরেও ছিল। বিপুল সংখ্যক পাঠকদের দ্বারা পঠিত এডউইন আর্নল্ড কর্তৃক রচিত 'লাইট অব এশিয়া' গ্রন্থখানি এর জন্য অংশত দায়ী। অংশত দায়ী পাশ্চাত্যের অখ্রীস্টীয় ধর্মসমূহ সম্বন্ধে অজ্ঞতা, আর অংশত দায়ী স্বামীজী কর্তৃক প্রায়শই বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গের উল্লেখ। যাই হোক, সংবাদপত্রগুলি প্রায়ই তাঁকে বৌদ্ধ পুরোহিত বলে অভিহিত করত, এমনকি এখানে তাঁর ভাষণের পরও করেছে। এমনকি স্যাগিনতে স্বামীজীর ভাষণের শিরোনামা নিয়েও বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল। হয়তো তার কারণ ছিল এই যে, তিনি ভাষণ দিতে চেয়েছিলেন "এশিয়ার আলোর ধর্ম—বৌদ্ধধর্ম" সম্বন্ধে, কিন্তু পরে পরিবর্তিত হয়ে বিষয়টি দাঁড়ায়—"ধর্ম-সমন্বয়।"

মার্চের ১৯, ২০, ২১, ২২ তারিখে যথাক্রমে "স্যাগিন ইভনিং নিউজ" পত্রিকায় নিম্নলিখিত ঘোষণা ও প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হয়ঃ

খ্যাতনামা বৌদ্ধ কানন্দ যিনি বিশ্বমেলার ধর্মমহাসভায় প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তিনিই বুধবার সন্ধ্যায় অ্যাকাডেমিতে ভাষণ দেবেন। তাঁর বিষয় হলো "বৌদ্ধধর্ম।"

বৌদ্ধ সন্ন্যাসী স্বামী বিবে কানন্দ যিনি আগামীকাল রাতে "এশিয়ার আলোর ধর্ম—বৌদ্ধধর্ম" বিষয়ে ভাষণ দেবেন, তিনি বিশ্বমেলা পরিষদের সভাপতি এবং প্রাক্তন সিনেট সদস্য পামারের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন।

কানন্দ এসে পৌঁছেছেন

হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ আজ অপরাহ্ণে বে সিটি থেকে এসে পৌঁছেছেন এবং তিনি ভিনসেন্টে আছেন। তিনি উচ্চবিত্ত আমেরিকাবাসীদের পোশাকে সজ্জিত এবং সুন্দর ইংরেজী বলেন। তাঁর উচ্চতা মাঝারির চেয়ে কিছুটা বেশি। শারীরিক গঠন সুদৃঢ়। গাত্রবর্ণ ভারতীয়দের মতো। জনৈক সংবাদপত্রের প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, গৃহশিক্ষকদের নিকট এবং যে-সকল ইউরোপীয় ভারত-দর্শনে আগমন করেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে তিনি ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করেছেন। তিনি আরও বলেন যে তাঁর আজ রাতের ভাষণ হবে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যামূলক এবং তাতে তিনি দেখাবেন যে, তারা পৌত্তলিক নয়। তারা একটি ভবিষ্যৎ অবস্থায় বিশ্বাস করে।

ধর্ম-সমন্বয়

কানন্দ বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে ভাষণ দিলেন।
বৌদ্ধধর্ম পৃথিবীতে পূর্ণতার বাণী প্রচার করে
খ্রীস্টধর্ম তলোয়ারের সাহায্যে প্রবর্তিত বলে তিনি অভিযোগ করেন।

গতকল্য সন্ধ্যায় সঙ্গীত অ্যাকাডেমিতে বহু-কথিত হিন্দু-সন্ন্যাসী স্বামী বিবে কানন্দ "ধর্মের সমন্বয়" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। শ্রোতার সংখ্যা বেশি না হলেও প্রত্যেকেই প্রখর মনোযোগ সহকারে তাঁর আলোচনা শুনেছেন। বক্তা প্রাচ্য পোশাক পরে এসেছিলেন এবং অত্যন্ত সমাদরে অভ্যর্থিত হন। মাননীয় রোল্যাণ্ড কোনর অমায়িকভাবে বক্তার পরিচয় করিয়ে দেন। ভাষণের প্রথমাংশ বক্তা নিয়োগ করেন ভারতের বিভিন্ন ধর্ম এবং জন্মান্তরের ব্যাখ্যানে। ভারতের প্রথম বিজেতা আর্যগণ খ্রীস্টানরা যেমন নতুন দেশ জয়ের পর করে থাকে, সেইরূপ দেশের তৎকালীন অধিবাসীদেরকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করেন নি। তাঁরা উদ্যোগী হয়েছিলেন অমার্জিত সংস্কারের লোকেদের সুসংস্কৃত করতে। ভারতবর্ষে যারা স্নান করে না এবং মৃত জন্তু ভক্ষণ করে, হিন্দুরা তাদের ওপর বিরক্ত। উত্তর ভারতের অধিবাসী আর্যরা দক্ষিণাঞ্চলের অনার্যদের ওপর নিজেদের আচার ব্যবহার জোর করে চাপাবার চেষ্টা করে নি। তবে অনার্যেরা আর্যদের অনেক রীতিনীতি ধীরে ধীরে নিজেরাই গ্রহণ করে। ভারতের দক্ষিণতম প্রদেশে বহু শতাব্দী ধরে কিছু কিছু খ্রীস্টান আছে। স্পেনিয়ার্ডরা সিংহলে খ্রীস্টধর্ম নিয়ে যায়।

তারা মনে করত যে অখ্রীস্টানদের বধ করে তাদের মন্দিরসমূহ ধ্বংস করবার জন্য তারা ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট।

বিভিন্ন ধর্ম যদি না থাকত, তা হলে একটি ধর্মও বেঁচে থাকতে পারত না। খ্রীস্টানদের নিজস্ব ধর্ম চাই। হিন্দুদেরও প্রয়োজন স্বকীয় ধর্মবিশ্বাস বজায় রাখা। যে-সব ধর্মের মূলে কোন শাস্ত্রগ্রন্থ আছে, তারা টিকে থাকবে। খ্রীস্টানরা ইহুদীগণকে খ্রীস্টধর্মে আনতে পারে না কেন? পারসীকদেরও খ্রীস্টান করতে পারে নি কি কারণে? মুসলমানরাও খ্রীস্টান হয় না কেন? চীন এবং জাপানে খ্রীস্টধর্মের প্রভাব নেই কেন? বৌদ্ধধর্ম যাকে প্রথম প্রচারশীল ধর্ম বলতে পারা যায় কখনো তরবারির সাহায্যে অপরকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করে নি। তবুও তা খ্রীস্টধর্মের চেয়ে দ্বিগুণ লোককে স্বমতে এনেছে। মুসলমানরা সবচেয়ে বেশি বল প্রয়োগ করলেও তিনটি বড় প্রচারশীল ধর্মের মধ্যে তাদের সংখ্যাই সবচেয়ে কম। মুসলমানদের বিজয়ের দিন শেষ হয়ে গেছে। খ্রীস্টধর্মাবলম্বী জাতিরা রক্তপাত করে ভূমি দখল করছে। এ খবর আপনারা প্রত্যহই পড়ে থাকেন। কোন্ প্রচারক এর প্রতিবাদ করছেন? অত্যন্ত রক্তপিপাসু জাতেরা যে ধর্ম নিয়ে এত জয়গান করে, তা তো খ্রীস্টের ধর্ম নয়। ইহুদী ও আরবগণ খ্রীস্টধর্মের জনক। কিন্তু এরা খ্রীস্টানদের দ্বারা কতই না নির্যাতিত হয়েছে। ভারতবর্ষে খ্রীস্টধর্মের প্রচারকদেরকে বেশ যাচাই করে দেখা হয়েছে, খ্রীস্টের আদর্শ থেকে তাঁরা বেশ দূরে।

বক্তা বলেন, তিনি রূঢ় হতে চান না, তবে অপরের চোখে খ্রীস্টানদের কিরকম দেখায়, তাই তিনি উল্লেখ করছেন; যে-সব মিশনারী নরকের জ্বলন্ত গহ্বরের কথা প্রচার করেন, তাঁদেরকে লোকে সন্ত্রাসের সঙ্গে দেখে থাকে। মুসলমানরা ভারতে তরবারি ঝনৎকারে আক্রমণের ওপর আক্রমণ প্রবাহ চালিয়ে আসছে। কিন্তু আজ তারা কোথায়? সবধর্মই চূড়ান্ত দৃষ্টিতে যা দেখতে পায়, তা হলো একটি চৈতন্যসত্তা। কোন ধর্ম এরপর আর কিছু শিক্ষা দিতে পারে না। প্রত্যেক ধর্মেই একটি মুখ্য সত্য আছে, আর কতকগুলো গৌণভাব তাকে আচ্ছন্ন করে থাকে। যেন একটি মণি—একটি পেটিকার মধ্যে রাখা আছে। মুখ্য সত্যটি হলো মণি, গৌণ ভাবগুলো পেটিকাস্বরূপ। ইহুদীদের শাস্ত্রকে মানলাম বা হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থকে—এটা গৌণ ব্যাপার।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে মূল সত্যের আধারটিও বদলায়। কিন্তু মূল সত্যটি অপরিবর্তিত থেকে যায়। প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের যাঁরা শিক্ষিত ব্যক্তি, তাঁরা ধর্মের মূল সত্যকে ধরে থাকেন। শুক্তির বাইরের

খোলাটি দেখতে সুন্দর নয়, তবে ঐ খোলার ভেতর তো মুক্তো রয়েছে। পৃথিবীর সমুদয় জনসংখ্যার একটি অল্প অংশ মাত্র খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করার আগেই ঐ ধর্ম বহু মতবাদে বিভক্ত হয়ে পড়বে। এইটাই প্রকৃতির নিয়ম। পৃথিবীর নানা ধর্ম নিয়ে যে একটা মহান ঐকতান বাদ্য চলছে, তার মধ্যে শুধু একটি যন্ত্রকেই স্বীকার করতে চাও কেন? সমগ্র বাদ্যটিকেই চলতে দাও। বক্তা বিশেষ জোর দিয়ে বলেন, পবিত্র হও। কুসংস্কার ছেড়ে দিয়ে প্রকৃতির আশ্চর্য সমন্বয় দেখতে চেষ্টা কর। কুসংস্কারই ধর্মকে ছাপিয়ে গোল বাধায়। সবধর্মই ভাল, কেননা মূল সত্য সর্বত্রই এক। প্রত্যেক মানুষ তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ ব্যবহার করুক। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে, সকল পৃথক ব্যক্তিকে নিয়ে একটি সুসমঞ্জস সমষ্টি গঠিত হয়। এই আশ্চর্য সামঞ্জস্যের অবস্থা ইতঃপূর্বেই রয়েছে। প্রত্যেকটি ধর্মমত সম্পূর্ণ ধর্মসৌধটির গঠনে কিছু না কিছু যোগ করেছে।

*বক্তা তাঁর ভাষণে বরাবর তাঁর স্বদেশের ধর্মসমূহকে সমর্থন করে যান। তিনি বলেন, রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের যাবতীয় রীতিনীতি যে বৌদ্ধদের গ্রন্থ থেকে গৃহীত, তা প্রমাণিত হয়েছে। নৈতিকতার উচ্চমান এবং পবিত্র জীবনের যে আদর্শ বুদ্ধের উপদেশ থেকে পাওয়া যায়, বক্তা কিছুক্ষণ তার বর্ণনা করেন; তবে তিনি বলেন যে, ব্যক্তি ঈশ্বরে বিশ্বাস সম্পর্কে বৌদ্ধধর্মে অজ্ঞেয়বাদই প্রবল। বুদ্ধের শিক্ষার প্রধান কথা হলো—'সৎ হও, নীতিপরায়ণ হও, পূর্ণতা লাভ কর।'**

শ্রোতাদের মধ্যে কিছু লোক বক্তার ভাষণ শেষে মন্তব্য করেন যে, বক্তা যদি তাঁর ভাষণটি আরও দীর্ঘায়ত করতেন, তাহলেও তাঁদের ভাল লাগত এবং তাঁরা পুনরায় তাঁর ভাষণ শোনবার ইচ্ছাও ব্যক্ত করেন। তাঁর বয়স মাত্র ত্রিশ। কিন্তু তিনি একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি এবং উচ্চস্তরের বৌদ্ধিক গুণসমূহ আয়ত্ত করেছেন বলে জানা যায়। তাঁর জন্ম কলকাতায় এবং তিনি উক্ত শহরের একটি মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছেন। তাঁর কণ্ঠস্বর কোমল এবং সুরেলা। তিনি যে ইংরেজী বলেন তা এত ভাল যে, লক্ষ্যে পড়ে। এখান থেকে তিনি বোস্টন ও নিউ ইয়র্ক যাবেন। এ-দেশ দেখা হয়ে গেলে তিনি ইউরোপ দর্শনে যাবেন এবং যখন তিনি নিজের দেশে পৌঁছবেন, পৃথিবী পরিভ্রমণের এই সকল অভিজ্ঞতা তিনি কাজে লাগাবেন।

নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি ঐ একই সংবাদপত্রে একই তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল।

---

* বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ৭৬-৭৮

তিনি জ্ঞানপ্রদ

সেইজন্যই লোকেরা তাঁর কথা শুনতে চায় না।

স্যাগিনর লোকজনদের কি হয়েছে? ব্যাপার কি তাদের? কদিন ধরে ঘোষণা করা হয়েছে যে হিন্দু-সন্ন্যাসী কানন্দ এখানকার অ্যাকাডেমিতে ভাষণ দেবেন। বেশ কয়েক বছরের মধ্যে যে-সকল বিশিষ্ট অভ্যাগত আমেরিকায় এসেছেন তিনি তাঁদের অন্যতম। হিন্দুস্থানে তিনি আমাদের দেশে ডঃ হার্পার, ডঃ সামার, ডঃ এলিয়ট এবং ডঃ এঞ্জেলো যে স্থানে, সেই স্থান অধিকার করে আছেন। এ যুগের পণ্ডিতবর্গের মধ্যে তিনি উচ্চস্থানে আছেন। তিনি এসেছিলেন প্রাচীনতম ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে বলতে। তিনি ইংরেজী বলেন অনর্গল এবং তিনি একজন বাগ্মীও। অথচ এই বিশিষ্ট অতিথি শূন্য দর্শকাসনের সামনে কথা বললেন! যদি কানন্দ ঘাঘরা-নৃত্য জানতেন বা উষ্ণ দেশসমূহের আঞ্চলিক সঙ্গীত শোনাতেন তাহলে হয়তো দর্শকেরা আসত। কিন্তু যেহেতু তাঁর বক্তব্য ছিল শিক্ষাপ্রদ এবং অজানিতভাবে আগ্রহ-উদ্দীপক, সেজন্য মোটামুটিভাবে ভাল সংখ্যক দর্শক আসেনি।

"স্যাগিন ক্যুরিয়ার হেরাল্ড" নামক সংবাদপত্রটি স্বামীজীর আগমনের সংবাদ মার্চ মাসের ২২ তারিখ বৃহস্পতিবার নিম্নলিখিত প্রবন্ধের মাধ্যমে উপস্থাপিত করে ঃ

সুদূর ভারত থেকে

হিন্দুধর্ম প্রচারক কানন্দের স্যাগিনয় আগমন এবং অ্যাকাডেমিতে স্বল্পসংখ্যক শ্রোতাদের নিকট মনোগ্রাহী ভাষণ দান

গতকাল সন্ধ্যায় ভিনসেন্ট হোটেলের দালানে একজন সুগঠিত এবং সুদৃঢ় আকৃতির আকর্ষণীয় মানুষ উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর শ্যামবর্ণ গায়ের রঙের দরুন তাঁর মুক্তোর মতো দাঁতের সারির শুভ্রতা বেশি প্রকট হয়ে উঠেছিল। প্রশস্ত ও সুউচ্চ ললাটের নিচে তাঁর চোখে বুদ্ধিমত্তা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। এই ভদ্রলোকটিই হলেন হিন্দুধর্ম প্রচারক স্বামী বিবে কানন্দ। শ্রী কানন্দের আলাপচারিতা ছিল বিশুদ্ধ এবং ব্যাকরণ-সম্মত ইংরেজী মাধ্যমে, তাঁর সামান্য বৈদেশিক উচ্চারণের ধরন তাতে একরূপ তীক্ষ্ণতা এনে দিচ্ছিল। ডেট্রয়টের সংবাদপত্রের পাঠকেরা জ্ঞাত আছেন যে, কানন্দ সেখানে কয়েকবার বক্তৃতা দিয়েছেন এবং খ্রীস্টানদের সমালোচনা করার জন্য তিনি কারো কারো বিরাগভাজন হয়েছেন। সুপণ্ডিত বৌদ্ধটির অ্যাকাডেমিতে ভাষণ দেবার উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রাক্কালে "ক্যুরিয়ার হেরাল্ড"

পত্রিকার প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে কয়েক মুহূর্ত কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলেন। কথা প্রসঙ্গে শ্রী কানন্দ বলেন যে, খ্রীস্টানদের মধ্যে ন্যায়পরতা হতে চ্যুতি প্রায়শই ঘটতে দেখে তিনি বিস্ময়াহত। কিন্তু সব ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ভালমন্দ দুইই আছে। একটি কথা যা তিনি বলেছিলেন তা নিশ্চয়ই আমেরিকাবাসীর মতো কখনই নয়—যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরীক্ষা করে দেখেছেন কিনা, উত্তরে তিনি বলেন "না, আমি একজন ধর্মপ্রচারক মাত্র।" এতে তাঁর আগ্রহের অভাব এবং সঙ্কীর্ণতা—এ উভয়ই প্রকাশ পেয়েছে এবং একজন বৌদ্ধ প্রচারক যাঁর ধর্মীয় বিষয়সমূহে এত জ্ঞান, তাঁর মুখে একথা আদৌ মানায় নি।

হোটেল থেকে অ্যাকাডেমি এক পা এবং রাত্রি আটটার সময় রোলাণ্ড কোম্নর স্বল্পসংখ্যক দর্শকমণ্ডলীর নিকট বক্তাকে পরিচিত করে দিলেন। বক্তার পরনে ছিল রক্তবর্ণ কোমরবন্ধনী দিয়ে বাঁধা দীর্ঘ কমলালেবু রঙের পরিচ্ছদ, মাথায় ছিল পাগড়ি, যা মনে হয় স্বল্প-ব্যাসের চাদর দিয়ে পাকানো।

বক্তা প্রথমেই বললেন যে, তিনি ধর্মান্তরিত করবার কাজে ব্রতী নন, বৌদ্ধধর্মে অন্য ধর্ম ও বিশ্বাসের লোকদের ধর্মান্তরিত করার ব্যাপার নেই। তাঁর বক্তব্য বিষয় হলো "ধর্ম-সমন্বয়"। শ্রী কানন্দ তাঁর ভাষণে বলেন যে, বহু প্রাচীন ধর্ম জন্মলাভ করে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

তিনি বলেন বৌদ্ধরা ওখানকার অধিবাসীদের দুই-তৃতীয়াংশ, অপর এক-তৃতীয়াংশ হলো অন্যান্য বিভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণ। বৌদ্ধদের মধ্যে নরকাগ্নি-দহনের ব্যাপার নেই। সেদিক দিয়ে তাদের সঙ্গে খ্রীস্টানদের পার্থক্য রয়েছে, খ্রীস্টানরা ইহলোকে একজনকে পাঁচ মিনিটের জন্য ক্ষমা প্রদর্শন করে, পরলোকে অনন্ত শাস্তি দেবার কথা বলে। বুদ্ধ হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা প্রচার করেছেন। বৌদ্ধধর্মীয় বিশ্বাসের এটি হলো আজকের দিনে একটি মূল কথা। খ্রীস্টানরা এ-কথা প্রচার করে, কিন্তু নিজেদের ধর্মীয়-শিক্ষা নিজেরা পালন করে না।

তিনি দক্ষিণাঞ্চলের কৃষ্ণবর্ণের অধিবাসীদের (নিগ্রো) কথা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করেন। তাদের শ্বেতকায়দের সঙ্গে হোটেলে একত্রে বসবাস করতে বা যানবাহনে একত্রে ভ্রমণ করতে দেওয়া হয় না। এমন কি তাদের সঙ্গে কোন রুচিবান ব্যক্তি কথা অবধি বলে না। তিনি বলেন যে তিনি দক্ষিণাঞ্চল হয়ে এসেছেন, তিনি নিজে জেনে এবং প্রত্যক্ষ করে এসে কথা বলছেন।

ভাষণটি তার অনন্যতার জন্য খুব আগ্রহ-উদ্দীপক হয়েছিল এবং আরও অধিক দর্শকপূর্ণ সভাগৃহের যোগ্য ছিল।

সর্বতোভাবেই স্যাগিনর অধিবাসিগণ তাঁকে উপেক্ষা দেখিয়েছেন এমনকি আতিথ্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও। বক্তৃতার পূর্বে স্বামীজী হোটেলের দালানে বসেছিলেন—এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, শহরে কেউ এমন কি মান্যবর রোলাণ্ড কোন্নরও তাঁকে সান্ধ্য ভোজে আমন্ত্রণ জানান নি। তাঁকে তাঁর নিজস্ব ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করতে হয়েছে এবং যদি ১৮৯০ এর দশকে ছোট শহরের হোটেলগুলি যা ছিল এই ভিনসেন্ট হোটেলটি তাই-ই হয়ে থাকে, তাহলে একাকী ভোজন করা, বসে থাকা বা অপেক্ষা করার পক্ষে স্থানটি ছিল নিরানন্দ ও কষ্টকর। তাঁর মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণকালে এ রকম আরও অনেক অভিজ্ঞতার মধ্যে এটিও একটি অন্যতম হয়ে থাকবে।

॥ ২ ॥

ডেট্রয়েট থেকে স্বামীজী সোজা নিউ ইয়র্কে যান, সেখানে তিনি দার্শনিক আলোচনায় আগ্রহী একদল ব্যক্তির দ্বারা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন—তাঁদের মধ্যে ছিলেন জনৈক শ্রীমতী স্মিথ, ডাঃ ও শ্রীমতী এগবার্ট গার্নসি এবং আর একজন মহিলা কুমারী হেলেন গোল্ড। এপ্রিলের ২ তারিখে আমরা তাঁকে দেখতে পাই গার্নসিদের ফরটি থার্ড ও ফরটি ফোর্থ স্ট্রীটের মধ্যবর্তী ফিফ্‌থ্‌ অ্যাভিনিউ-এর পাঁচশ আটাশ নম্বর বাড়িতে বসবাস করছেন। তিনি এ-সম্পর্কে শ্রীমতী হেলকে লেখেন, "বাস্তাটি মনোরম নির্জন রাস্তা"—এই কথাগুলি তখনকার দিনের ফিফ্‌থ্‌ অ্যাভিনিউ-র একটি সুন্দর চিত্ররূপ প্রস্ফুটিত করে তোলে। সুরম্য প্রাসাদশ্রেণীর মহিমান্বিত শান্তি যেন মাঝে মাঝে ছুটন্ত গাড়ির অশ্বক্ষুরধ্বনি ও চলন্ত চাকার ঘর্ঘর শব্দে ব্যাহত। গার্নসিদের প্রস্তরনির্মিত পাঁচতলা বাড়িতে এসে পৌঁছবার অল্প পরেই স্বামীজী শ্রীমতী হেলকে চিঠি লেখেন। তাঁর সে চিঠিটির কথা আমরা সম্প্রতি জানতে পেরেছি। চিঠিটি নিচে দেওয়া হলো ঃ

নিউ ইয়র্ক
২ এপ্রিল, ১৮৯৪

প্রিয় মা,

আমি নিউ ইয়র্কে এসে পৌঁছেছি। আমি যে ভদ্রলোকের অতিথি

হয়ে এসেছি, তিনি খুব চমৎকার ব্যক্তি, পণ্ডিত (আর ধনী)। তাঁর একটি মাত্র পুত্র ছিল, তাকে তিনি গত জুলাই মাসে হারিয়েছেন। এখন কেবলমাত্র একটি কন্যা বর্তমান। বৃদ্ধ দম্পতি এতে বড় কঠিন আঘাত পেয়েছেন, কিন্তু তাঁরা পূতচরিত্র, ঈশ্বরদত্ত এ আঘাত বীরের মতো সহ্য করে চলেছেন।

বাড়ির গৃহিণীটি অত্যন্ত দয়ালু এবং সৎ। তাঁরা যথাসাধ্য আমার সহায়তা করছেন এবং আরও যে যথেষ্ট করবেন এতে আমার কোন সন্দেহ নেই।

আমি এরপর কি ঘটে তার জন্য অপেক্ষা করছি। এই বৃহস্পতিবার (এপ্রিলের পাঁচ তারিখ) তাঁরা ডাক্তারের নিজস্ব সংস্থা ইউনিয়ন লীগ ক্লাব ও অন্যান্য যে-সকল সংস্থার সঙ্গে তিনি যুক্ত সেগুলি হতে কয়েকজন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানাবেন। দেখা যাক ফল কি হয়? এ শহরের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো এই বৈঠকখানার বক্তৃতা এবং এই ধরনের বক্তৃতায় মঞ্চ হতে প্রদত্ত বক্তৃতা অপেক্ষা বেশি কাজ হয়।

এ শহরটি খুবই পরিচ্ছন্ন। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর কালো ধোঁয়ার উদ্গীরণ এখানে নেই এবং যে রাস্তাটিতে ডাক্তার বাস করেন সেটি ভারী সুন্দর একটি নির্জন রাস্তা।

আশা করি বোনেরা ভাল আছে এবং নাট্যশালায় এবং নিজেদের বসার ঘরে সঙ্গীতসুধা উপভোগ করছে।

নাট্যশালার সঙ্গীতকে, যার সম্বন্ধে কুমারী মেরী আমাকে লিখেছেন আমার ধন্যবাদের সঙ্গে তারিফ করা উচিত বলে মনে করি।

আশা করি নাট্যশালার গায়কগণ তাদের কণ্ঠ ও শ্বাসনালীর অভ্যন্তরভাগ প্রদর্শন করছে না।

দয়া করে ভাই স্যামকে আমার গভীর ভালবাসা জানাবেন। আমি নিশ্চিত যে, সে বিধবা মহিলাদের সম্বন্ধে সাবধান হয়ে চলছে। ব্যাগলিদের কয়েকজন কচিকাঁচা শিকাগো যাচ্ছে—তারা আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে এবং আমি জানি যে, আপনার তাদের ভাল লাগবে।

আর লেখবার কিছু নেই—

শ্রদ্ধা ভালবাসাসহ
আপনার আজ্ঞাবহ পুত্র বিবেকানন্দ

পুনশ্চ ঃ এখন আমাকে কারো ঠিকানা জেনে নিতে হয় না। শ্রীমতী শেরম্যান (শ্রীমতী ব্যাগলির বিবাহিতা কন্যা) আমাকে এ বি সি প্রভৃতি আদ্যক্ষর মুদ্রিত একটি ছোট খাতা দিয়েছেন, তাতে আমার যে-সকল

ঠিকানা প্রয়োজন সেগুলি সব লিখে দিয়েছেন। এখন থেকে সেজন্য সবগুলি ঠিকানা আমি একইভাবে লিখব। স্বনির্ভরতার কি সুন্দর দৃষ্টান্তই না আমি![৮]

(এই ঠিকানার বইটি সম্ভবত এ ধরনের যে কয়টি উপহার তিনি প্রথম পেয়েছিলেন তারই একটি, কারণ এর পরই তিনি ভগিনী কৃস্টিনকে গোপনে জানাবেন যে, তিনি ঠিকানার বই প্রায়ই এধার ওধার রাখছেন বা একেবারেই হারিয়ে ফেলেছেন।)

শিকাগোর হেলদের বা ডেট্রয়েটের ব্যাগলিদের মতো নিউ ইয়র্কে গার্নসিরা স্বামীজীকে তাঁদের প্রিয় সন্তানটির মতো গ্রহণ করে পরিবারভুক্ত করে নিয়েছিলেন। সত্যসত্যই তাঁকে দেখে তাঁদের ওই বয়সী হারানো সন্তানটিকে মনে পড়ত। ডাঃ এগবার্ট গার্নসির তখন বয়স একাত্তরের কাছাকাছি। তিনি ছিলেন প্রথিতযশা, ও জনপ্রিয় একজন চিকিৎসক, যিনি হোমিওপ্যাথি এবং সনাতন চিকিৎসা-পদ্ধতির উৎকৃষ্টতর অংশসমূহের সমন্বয় সাধন করে চিকিৎসা চালিয়ে সফল হয়েছিলেন। এ ছাড়া তিনি ছিলেন লেখক, বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক, ব্রুকলিন ডেলি টাইমস পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, নিউ ইয়র্ক মেডিক্যাল নিউজ টাইমস পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদক। নিউ ইয়র্ক শহরের চিকিৎসা-সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক এবং প্রখ্যাত প্রতিপত্তিশালী ইউনিয়ন লীগ ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা এবং সর্বোপরি ছিলেন একজন উদার-হৃদয় দিলখোলা মানুষ। এরূপ কথিত আছে এবং তা নিঃসন্দেহে সত্যও বটে যে, বেট হার্ট বর্ণিত "দ্য-ম্যান হুজ ইয়োক ওয়াজ নট ইজি"-শীর্ষক গল্পের চিকিৎসক তিনিই, যাঁকে বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তিনি একজন "উদার-রুচি ও বিপুল অভিজ্ঞতার মানুষ, যিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ ব্যয় করেছেন মানুষের দুঃখকষ্ট দূর করবার প্রচেষ্টায়।"

আমরা এখন এর পরবর্তী সপ্তাহে নিউ ইয়র্কে স্বামীজীর অবস্থান সম্পর্কে যা কিছু জানতে পেরেছি তা পেয়েছি ১০ এপ্রিল তারিখে শ্রীমতী হেলকে লেখা তাঁর আর একটি চিঠি থেকে। তিনি তখনও গার্নসিদের সঙ্গে ছিলেন কিন্তু চিঠিতে একটি উল্লেখ থেকে জানতে পারি যে, মধ্যে তিনি কয়েকদিন কুমারী হেলেন গোল্ডের অতিথি হয়েছিলেন। এ সময় একদিন সার্কাস দেখতেও গিয়েছিলেন। এপ্রিলের ২ তারিখে লেখা চিঠিটার মতো এই চিঠিটাও মাত্র সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এখানে এটি পুরোপুরি উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

নিউ ইয়র্ক
১০ এপ্রিল, ১৮৯৪

প্রিয় মা,

আমি এইমাত্র আপনার চিঠি পেলাম। আমার "মুক্তি ফৌজের" (স্যালভেশন আর্মি) প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা আছে; বস্তুত এরা এবং অক্সফোর্ড মিশনের (প্রচার সংস্থার) ভদ্রমহোদয়রা হলেন একমাত্র খ্রীস্টধর্ম প্রচারগোষ্ঠী যাঁদের প্রতি আমার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা আছে। এঁরা ভারতের জনসাধারণের মধ্যে, জনসাধারণের মতো করে এবং জনসাধারণের জন্য দিন যাপন করে থাকেন। ঈশ্বর তাঁদের আশীর্বাদ করুন। কিন্তু তাঁরা যদি কোন ছলচাতুরির আশ্রয় নেন, আমি তার জন্য খুব খুবই দুঃখিত হব। আমি ভারতে কোন 'লর্ড' উপাধিধারীর কথা শুনি নি, সিংহলের তো নয়ই। আমেরিকাবাসী এবং হিন্দুদের মধ্যে যতখানি পার্থক্য, সিংহলের সঙ্গে উত্তর ভারতের লোকদের তফাৎটা তার থেকে বেশি। বৌদ্ধ পুরোহিতদের সঙ্গে হিন্দুদের কোন সম্পর্কই নেই। আমাদের পোষাক, রীতিনীতি, ধর্ম, খাদ্য, ভাষা দক্ষিণ ভারতীয়দের থেকেও একেবারে আলাদা। সিংহলের কথা তো ধরাই যায় না। আপনি তো ইতোমধ্যেই জেনে গেছেন যে, নরসিংহ যে ভাষায় কথা বলে, আমি তার এক বর্ণও বলতে পারি না, যদিও তার ভাষা হলো মাদ্রাজের। ভাল, আপনারা তো হিন্দুরাজাদের 'প্রিন্স' অর্থাৎ 'রাজা' আখ্যা দিয়ে থাকেন— কিন্তু 'লর্ড' বলেন না— যদিও 'লর্ড' উপাধিটা 'প্রিন্স' বা 'রাজা' খেতাবের থেকে উচ্চতর নয়।

জনৈক শ্রীমতী (আর্থার) স্মিথ ছিলেন শিকাগোতে—আমার তাঁর সঙ্গে শ্রীমতী স্টকহামের বাড়িতে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি আমাকে গার্নসি পরিবারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। ডাঃ গার্নসি এই শহরের একজন প্রধান চিকিৎসক এবং একজন অত্যন্ত সৎ ভদ্রলোক। তাঁরা আমাকে খুব ভালবাসেন এবং খুব চমৎকার লোক তাঁরা। আগামী শুক্রবার [১৩ এপ্রিল] আমি বোস্টনে যাচ্ছি। আমি নিউ ইয়র্কে আদৌ বক্তৃতা দিচ্ছি না। আমি এখানে ফিরে এসে কিছু বক্তৃতা করব।

গত কয়েকদিন ধরে আমি প্রখ্যাত ধনী গোল্ডের কন্যা কুমারী হেলেন গোল্ডের প্রাসাদোপম গ্রামের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলাম। জায়গাটি শহর থেকে এক ঘণ্টার রাস্তা। তাঁর গাছপালা জন্মানোর কাঁচের বাড়িটি পৃথিবীর মধ্যে এক অতি সুন্দর ও অতি সুবৃহৎ, তাতে নানারকমের সব আশ্চর্য

আশ্চর্য গাছপালা ও ফুল আছে। তাঁরা ধর্মে প্রেসবিটেরিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তিনি খুব ধর্মপ্রাণা মহিলা। সেখানে আমার সময় খুব সুন্দর কেটেছে।

আমি আমার বন্ধু শ্রীফ্ল্যাগের সঙ্গে কয়েকবার সাক্ষাৎ করেছি। তিনি সানন্দে আকাশ ভ্রমণ করছেন।

এখানে আর একজন খুব ধর্মপ্রাণা ও ধনী মহিলা শ্রীমতী স্মিথ আছেন। তিনি আজ আমাকে সান্ধ্য ভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে জানাই—টাকা তোলার ব্যাপারটা আমি পরিত্যাগ করেছি। আমি নিজেকে আর নিচে নামাতে পারছি না। যখন একটা উদ্দেশ্য সামনে ছিল, আমি এ কাজ করতে পেরেছি। সেটা যখন চলে গেল, তখন আমার নিজের জন্য আমি অর্থ উপার্জন করতে পারি না।

ফিরে যাবার মতো যথেষ্ট অর্থ আমার আছে। এখানে এসে আমি একটি পেনিও উপার্জন করবার চেষ্টা করিনি এবং বন্ধুরা আমাকে যা উপহার দিতে চেয়েছেন, তা আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। বিশেষ করে ফ্ল্যাগ—আমি তার অর্থ প্রত্যাখ্যান করেছি। ডেট্রয়েটে 'আমি দাতাদের অর্থ ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি এবং তাদের বলেছি আমার প্রকল্প সফল হবার কোন সম্ভাবনা না থাকায় তোমাদের টাকা রাখবার কোন অধিকার আমার নেই। কিন্তু তাঁরা আমার প্রস্তাবে রাজি হননি, বলেছেন আমি টাকাটা ইচ্ছে হলে জলে ফেলে দিতে পারি। কিন্তু জেনেশুনে আমি আর টাকা গ্রহণ করতে পারি না। মা, আমি খুব সচ্ছল। সর্বত্র প্রভু আমার জন্য সহৃদয় মানুষদের পাঠাচ্ছেন এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থা করছেন—সুতরাং আমার পাশবিক ঐহিকতার মধ্যে প্রবেশের কোন প্রয়োজন নেই।

নিউ ইয়র্কের লোকেরা যদিও বোস্টনের লোকেদের মতো অত মেধাবী নয়, কিন্তু তারা অত্যন্ত খাঁটি। বোস্টনের লোকেরা কি করে সকলের কাছ থেকে সুবিধা নিতে হয় তা ভালভাবে জানে এবং আমার ভয়, তাদের হাত দিয়ে হয়তো জলও গলবে না!! প্রভু তাদের আশীর্বাদ করুন! আমি যাব বলে কথা দিয়েছি এবং আমাকে যেতেই হবে—কিন্তু প্রভু আমাকে অজ্ঞ হোক, দরিদ্র হোক, খাঁটি মানুষদের সঙ্গে রাখুন, আমাকে যেন প্রবঞ্চক এবং বড় বড় কথা বলে, যাদের সম্পর্কে আমার গুরুদেব বলতেন শকুনি—শকুনি অনেক উঁচুতে ওঠে, কিন্তু নজর ভাগাড়ের দিকে—এরকম লোকদের ছায়া মাড়াতে না দেন। আমি কয়েকদিনের জন্য শ্রীমতী

গ্রীডের অতিথি হব এবং বোস্টনের কিছুটা দেখে আমি নিউ ইয়র্কে ফিরে আসব।

আশা করি বোনেরা ভাল আছে এবং তাদের ঐকতান যন্ত্রসঙ্গীত প্রচুর উপভোগ করছে। এই শহরে সঙ্গীতের আয়োজন বেশি কিছু নেই, এটা একটা আশীর্বাদ(?)।

সেদিন বার্নুমের সার্কাস দেখতে গিয়েছিলাম; সেটা নিঃসন্দেহে বড় চমৎকার জিনিস।

আমি এখনও শহরে ঘুরে বেড়াইনি। এ রাস্তাটি চমৎকার এবং নির্জন।

আমি সেদিন বার্নুমে খুব সুন্দর সঙ্গীত শুনলাম—এরা একে বলে স্পেনীয় সেরিনেড। (রাত্রিবেলায় প্রেমিকার মনোরঞ্জনের জন্য যা গাওয়া হয়) সে যাই হোক আমি খুব উপভোগ করেছি। যদিও কুমারী গার্নসি ভাল বাজাতে জানেন না কিন্তু ঐসব পৃথিবীর শব্দঝঙ্কার সৃষ্টিকারী বস্তুগুলির ভালই সংগ্রহ আছে তাঁর। সুতরাং তিনি যে সে-সব বাজাতে পারলেন না—এজন্য আমার দুঃখ হয়।

আপনাদের অধীন

বিবেকানন্দ

পুঃ— সম্ভবত শ্রীমতী ব্যাগলির অতিথি হিসাবে আমি অ্যানিস্কোয়ামে যাব। এবারের গ্রীষ্মে তিনি একটি সুন্দর বাড়ি পেয়েছেন। তার আগে আমি যদি পারি তো একবার শিকাগো ফিরে যাব।[৯]

উপরোক্ত চিঠিগুলির মধ্যে অধিকাংশেরই কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই, কিন্তু দুটো একটা বিষয়ে আরো বিশদভাবে কিছু বলা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ যেমন কুমারী হেলেন গোল্ড যার গ্রামের বাড়িতে স্বামীজী কয়েকটি দিন কাটিয়েছেন, তাঁর সম্বন্ধে আরও দু একটা কথা বলা যেতে পারে। নিঃসন্দেহে ইনি হলেন হেলেন মিলার গোল্ড, আমেরিকার যারা সর্বাপেক্ষা ধনী পরিবার, যারা 'দস্যু ব্যারন' বলে অভিহিত, তাদের মধ্যে যিনি ছিলেন সবচেয়ে বে-হিসাবী, ফাট্‌কা খেলায় কুশলীশ্রেষ্ঠ এবং এক্ষেত্রের অধীশ্বরস্বরূপ, সেই জে. গোল্ডের প্রথমা কন্যা এবং তাঁর উত্তরাধিকারি।[১০] ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে শ্রীযুক্ত গোল্ডের মৃত্যু হয়, মৃত্যুকালে তিনি পঞ্চাশ কোটি ডলার মূল্যের সম্পত্তি (এখনকার মূল্যমানে এক হাজার কোটি) রেখে গিয়েছিলেন তাঁর ছয়টি সন্তানদের মধ্যে ভাগ করে দেবার জন্য। এই বিপুল সম্পত্তির যে অংশ হেলেন গোল্ডের ভাগে পড়েছিল, তার মধ্যে ছিল হাডসন নদীতীরস্থ

আরভিংটনে লিণ্ডহার্স্ট নামক সম্পত্তি, যার আয়তন ছিল পনেরশো বিঘা মতন, যার মধ্যে ছিল অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্য সমন্বিত ঘাসে ঢাকা বড় বড় উদ্যান, দুষ্প্রাপ্য ঝোপঝাড়, যত্নে লালিত গাড়ি চলার পথ, অলঙ্কৃত ফোয়ারাসমূহ, বিরাট প্রবেশ পথ, যা দিবারাত্র নিজস্ব রক্ষীদের দ্বারা সুরক্ষিত থাকত।[১১] গথিক শৈলীর দুর্ভেদ্য দুর্গের আকৃতিবিশিষ্ট চল্লিশটি কক্ষসহ বাড়িটি হতে উপযুক্ত দূরত্বে অবস্থিত ছিল আরো অনেকগুলি প্রবেশপথ সংলগ্ন পৃথক পৃথক অট্টালিকা, আস্তাবল, গাড়ি রাখার জন্য পৃথক গৃহ, দাসদাসীদের আবাস, সাঁতারের জন্য পুষ্করিণী, বল খেলার জন্য সঙ্কীর্ণ রুদ্ধ পথ, যা সব সুব্যবস্থিত ভূসম্পত্তির ক্ষেত্রে থেকেই থাকে। সত্যই সেই জাঁকজমকের যুগে একটি গ্রামের বাড়ির জন্য এ সকল আবশ্যিক ছিল। জে. গোল্ড তাঁর সমপর্যায়ের লোকদের মতে সাদাসিধে এবং কৃচ্ছ্রতার মধ্যে জীবন যাপন করেছেন, টাকা খরচ করার চেয়ে উপার্জন করার দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি। কিন্তু একটি বিষয়ে তিনি সকলকে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন, সেটি হলো লিণ্ডহার্স্টে গাছপালা ফুলফল জন্মানোর জন্য কাঁচের বাড়িটির ব্যাপারে, যার সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছেন—এটি ছিল সুবৃহৎ একটি বাড়ি। সেটি আসলে একটি নয়, অনেকগুলি কাঁচের বাড়ির সমষ্টি।[১২] যেখানে শ্রীযুক্ত গোল্ড হাজার হাজার অনন্য নির্বাচিত গাছপালা ও ফুলের সঙ্গে বিশ্বের সকল দেশের দুর্লভ অর্কিড জন্মিয়েছিলেন। সবশুদ্ধ দশ হাজার গাছ ছিল সেখানে, যা শ্রীযুক্ত গোল্ডের ব্যক্তিগত পরিদর্শনায় একদল সুশিক্ষিত মালীদের দ্বারা লালিতপালিত হতো।[১৩] স্বামীজীর নিজের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, পিতার মৃত্যুর পর হেলেন গোল্ড সেই উদ্ভিদসহ কাঁচের বাড়িটি যথাযথ অবস্থায় লালিত করেছিলেন।

লিণ্ডহার্স্টে এবং ফিফ্‌থ্‌ অ্যাভিনিউ ও ফরটি সেভেন্‌থ্‌ স্ট্রীটের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত বাড়িটি যেটি কুমারী গোল্ড উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন যেটা কিনা গার্নসিদের বাড়ির থেকে খুব দূরে নয়, সেখানে তিনি দুই ছোট ভাই ও এক ছোট বোনকে নিয়ে বসবাস করতেন। এই শেষোক্ত বোনটি পরে ইউরোপের ভাগ্যান্বেষী একজন অভিজাত ব্যক্তিকে বিবাহ করে ইংলণ্ডের সম্মানসূচক 'কাউন্টেস' উপাধিধারিণী হন। যদিও হেলেন গোল্ড ভগিনীর বিবাহে অমূল্য একটি হীরকখণ্ড উপহার দেবার, লিণ্ডহার্স্টের সম্পত্তির সংস্কারের জন্য দেড় কোটি ডলার ব্যয় করার, কিম্বা নিজস্ব রেলগাড়িতে ভ্রমণ করবার ক্ষমতা রাখতেন, কিন্তু তিনি বোনের মতো (এবং আমেরিকার

আরো অনেক ভূসম্পত্তির অধিকারিণীর মতো) উচ্চ সম্মানসূচক উপাধিলাভের আকাঙ্ক্ষার অংশীদার ছিলেন না। কিম্বা তিনি তাঁর ভাইদের মতো ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি অর্জনের ও আমন্ত্রণ-আপ্যায়নের ব্যাপারে বল্গাহীন অমিতব্যয়িতার রুচি পছন্দ করতেন না। তিনি মিতাচারীর জীবন যাপন করতেন এবং স্বামীজী যেরূপ উল্লেখ করেছেন "তিনি অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা মহিলা ছিলেন।" পরে তিনি শ্রীযুক্ত ফিনলে জে. সেফার্ড নামক এক ভদ্রলোককে বিবাহ করেন এবং সারাজীবন ধরে লক্ষ লক্ষ টাকা বিভিন্ন সৎকার্যে ও বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থাকে দান করেন।

লোকে অবাক না হয়ে পারবে না যে, কুমারী গোল্ড স্বামীজীর প্রতি আগ্রহশীল হওয়া সত্ত্বেও কেন তাঁর আদর্শানুযায়ী কাজের জন্য এককালীন কয়েক লক্ষ ডলার দেননি, যদিও এই পরিমাণ টাকা তাঁর কাছে লিণ্ডহার্স্টের সুশোভিত জলপ্রবাহের মতো আদি-অন্তহীন ধারায় বইত। এর উত্তর হয়তো প্রথমে বাংলা মাসিক পত্রিকা, 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত এবং পরে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় আলোচিত দেবেন্দ্রকুমার রায়ের স্মৃতিচারণায় পাওয়া যাবে। শেষোক্ত পত্রিকাটির প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদটি নিম্নোক্তরূপ ঃ

> *(স্মৃতিচারণার লেখক) একদিন স্বামীজীকে তাঁর আমেরিকা এবং ইউরোপে কোন বিশেষ অভিজ্ঞতার কথা বলতে অনুরোধ করেন। স্বামীজী তদুত্তরে বলেন—আমেরিকায় বাস করার সময় একজন উত্তরাধিকার সূত্রে বিত্তশালিনী মহিলা তাঁর ব্যক্তিত্বে ও অনন্য বাগ্মীতায় আকর্ষিত হয়ে তাঁর বিপুল বিত্ত ও নিজেকে স্বামীজীর জীবনব্রতে সহায়তার জন্য দান করতে চান। স্বামীজী তাঁকে এই সহৃদয় প্রস্তাবের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কিন্তু তিনি তাঁকে বলেন যে, তিনি এ দান গ্রহণ করতে পারেন না, কারণ একজন সন্ন্যাসব্রতধারী হিসাবে তিনি তাঁর সর্বস্ব—তাঁর দেহ-মন-আত্মা তাঁর একমাত্র জীবন-দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণকেই অর্পণ করেছেন।*[১৪]

এই উত্তরাধিকার সূত্রে বিত্তশালিনী মহিলা যে কুমারী গোল্ডই—তা নয়। ১৮৯০-এর দশকে আমেরিকায় এ-রকম বিপুল বিত্তের উত্তরাধিকারিণীরা আরও ছিলেন, হয়তো একাধিক বিত্তশালিনী স্বামীজীর পায়ে তাঁদের সর্বস্ব অর্পণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু যেখানে কোন প্রকার বন্ধনের সূত্র রয়েছে, সেখানে তিনি কিছুই গ্রহণ করেননি।

কোন বন্ধনের ব্যাপার না থাকলেও স্বামীজী এ সময় তাঁর ভারতের

কাজের জন্য অর্থ গ্রহণ করছিলেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীযুক্ত উইলিযাম্ জোসেফ ফ্ল্যাগের সাহায্যের প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। শ্রীযুক্ত ফ্ল্যাগ ছিলেন একজন খ্যাতনামা আইনবিদ্, কংগ্রেস সদস্য, গ্রন্থকার, এবং তুলনামূলক অধ্যাত্ম-তত্ত্বের ছাত্র। থিওসফির প্রতি তাঁর একটু বিশেষ ঝোঁক ছিল। তাঁর কন্যাতুল্যা আত্মীয়া ছিলেন শ্রীমতী কর্ণেলিয়া ভাণ্ডারবিল্ট (দ্বিতীয়)—শ্রীযুক্তা ভ্যাণ্ডারবিল্ট তখন আমেরিকার সামাজিক জীবনের রাজ্ঞী এবং এমন বিপুল অর্থসম্পদের অধিকারিণী যা পরিমাপ করে কেউ শেষ করতে পারবে না। বিপুল ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ এ বৎসর স্বামীজীর পাশ্চাত্য জীবনে অত্যন্ত নিকটে বা অনতিদূরে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কিছু চাননি। যেমন যেমন আমন্ত্রণ পেয়েছেন তিনি ভাষণ দিয়েছেন, লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। তিনি নিজেই লিখেছেন—"আমি আমার স্বভাব অনুযায়ী জীবনকে খুব সহজভাবে নিয়েছি। আমার নয়, তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে—এটাই আমার জীবনের আদর্শ।" তাঁর সামনে অনেক দরজাই খুলে যেত। তাঁর ১০ এপ্রিলের চিঠিতে তিনি লিখছেন "একজন অত্যন্ত ধনী ও পুণ্যশীলা মহিলা" শ্রীমতী স্মিথের কথা, যিনি তাঁকে সান্ধ্যভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এ রকম আরও ছিলেন, ছিলেন ধনশালিনী শ্রীমতী ব্রীড, যাঁর সাক্ষাৎ আমরা পরে পাব।

৫ এপ্রিল, তারিখে বোস্টন ইভনিং ট্রানস্ক্রিপ্ট পত্রিকায় 'আমাদের হিন্দু অতিথি যিনি আসছেন'—এই শিরোনামা দিয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রথম অনুচ্ছেদটি বাদে সমগ্র প্রবন্ধটি ডেট্রয়েটের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের অংশবিশেষের সঙ্কলন এবং এটি তাঁর ইংরেজী রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে 'ভারত কি তমসাচ্ছন্ন দেশ'* এই শিরোনামায় পুনঃ প্রকাশিত হয়েছে। এখানে অবশ্য আমাদের প্রথম অনুচ্ছেদটিই প্রয়োজন। এটি নিম্নোক্তরূপ :

সুয়ামে (স্বামী) বিবে কানন্দ বোস্টনে আসছেন তাঁর জাঁকজমকপূর্ণ কমলা রঙের মহিমান্বিত শিরোভূষণ এবং নৈতিক ও বৌদ্ধিক সকল ব্যাপারে তাঁর প্রগতিশীল চিন্তাধারা নিয়ে। তাঁর শিকাগো শহরে অবস্থানকালে ধর্মমহাসভায় যাঁদেরই কোন আগ্রহ ছিল, তাঁরাই "ভ্রাতা বিবেকানন্দ"—যে নামে ডাকা তাঁর পছন্দ—তাঁকে জানেন। তিনি আমেরিকা ভ্রমণে এসেছেন নিজস্ব একটি উদ্দেশ্য নিয়ে—সেটি হলো এই জড়বাদী অর্থ-উপাসক

* বাণী ও রচনা, ১ম সংস্করণ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৮-১৩

দেশকে ধর্মীয় বিশ্বাসে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে তিনি সহায়তা করতে পারেন কিনা তা দেখতে। তিনি সত্যই একজন বিরাট মানুষ—মহান, সরল, ঐকান্তিক এবং আমাদের পণ্ডিতদের অধিকাংশের সঙ্গে তুলনায় অতুলনীয় পাণ্ডিত। লোকে বলে যে, হার্ভার্ডের একজন অধ্যাপক [অধ্যাপক জন হেনরী রাইট] ধর্মমহাসভার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিকট তাঁকে শিকাগো ধর্মমহাসভায় আমন্ত্রিত করার জন্য চিঠি লিখবার সময়ে লিখেছিলেন এই কথা—"ইনি আমাদের সকলের একত্রিত পাণ্ডিত্য অপেক্ষাও অধিকতর পাণ্ডিত্যের অধিকারী।" তিনি বোস্টনে আসছেন এখানকার ডজন খানেক সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা বেশ কিছু লোকের নিকট লেখা চিঠিপত্র নিয়ে, যেগুলো শিকাগোর রীতি অনুযায়ী সেখানকার চিন্তা, কর্ম ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্ণধারদের দ্বারা লেখা।

স্বামীজী বোস্টনে এপ্রিলের প্রথমাংশে কোন বক্তৃতা করেছিলেন কিনা তা জানা যায় না। সম্ভবত তিনি করেন নি, কারণ বোস্টনের সংবাদপত্রসমূহে তাঁর সম্পর্কে আর কোন উল্লেখ মে মাসের মধ্যভাগের পূর্বে পাওয়া যায় না। আমরা পরে দেখব মে মাসে তিনি কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কিন্তু "নর্দাম্পটন ডেলী হেরাল্ড" পত্রিকায় ১৩ এপ্রিল তারিখের একটি উল্লেখ হতে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছই যে, অন্ততপক্ষে ঐ তারিখের আগে তিনি বোস্টনে পৌঁছেছেন এবং অনেকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন এবং হয়তো দু-একটি ঘরোয়া অধিবেশনে কিছু বক্তব্য রেখেছেন। সংবাদপত্রে উল্লেখিত উক্ত বিষয়টি নিম্নোক্তরূপ ঃ

বোস্টনের সামাজিক জীবনে একজন শীর্ষস্থানীয়া মহিলা বিবেকানন্দের জন্য এক অভিনব আমোদের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি তাঁর আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে দর্শন, বিজ্ঞান বা ধর্মের ক্ষেত্রে যে কোন বিভ্রান্তিকর জটিল সমস্যা হিন্দু সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থাপিত করতে বলেন। তাঁরা এগিয়ে এলেন, প্রশ্ন করলেন, উত্তর পেলেন এবং যাবার সময় বলে গেলেন "এমন একটি সত্যের কথা বলা হলো, যার অর্ধেক বলা হয়নি।"

এর দ্বারা যাই বোঝাতে চাওয়া হোক না কেন, এটা নিশ্চিত যে ১৪এপ্রিল তারিখে যখন নিউ ইংলণ্ডের গ্রামাঞ্চল সবুজ হয়ে উঠছিল, তখন স্বামীজী ম্যাসাচুসেটসের নর্দাম্পটনে (বোস্টন থেকে নব্বই মাইলের মতো পশ্চিমে অবস্থিত) গিয়েছিলেন এবং এপ্রিলের ১৫ তারিখে সেখানকার স্মিথ কলেজে ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর যে সকল চিঠিপত্র এখন পাওয়া যায়

তাতে তিনি এই শহরে বা এই কলেজে ভাষণ দেবার জন্য আমন্ত্রণের কথা কিছু উল্লেখ করেন নি, কিন্তু তিনি নিশ্চিতভাবে এ-রকম একটি আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন এবং সাময়িকভাবে ডেট্রয়েট পরিত্যাগ করবার পূর্বে তা গ্রহণও করেছিলেন, কারণ এপ্রিলের ২ তারিখে নর্দাম্পটন ডেলী হ্যাম্পশায়ার গেজেট-এ আমরা নিম্নোক্ত বিজ্ঞপ্তিটি পাই ঃ

যিনি ধর্মমহাসভায় আলোড়ন তুলেছিলেন সেই হিন্দু যাজক সুয়ামী বিবে কানন্দ সম্ভবত শীঘ্রই এ শহরে বক্তৃতা দিতে আসছেন।

কয়েকদিন পর বক্তৃতার তারিখ স্থির করা হয়। এপ্রিলের ৬ তারিখে 'নর্দাম্পটন ডেলী হেরাল্ড' পত্রিকায় এবং 'ডেলী হ্যাম্পশায়ার গেজেট'-এ নিম্নোক্ত বিজ্ঞপ্তি দুটি যথাক্রমে প্রকাশিত হয়েছিল ঃ

শনিবার, ১৪ এপ্রিল তারিখে নর্দাম্পটন শহরের অধিবাসিবৃন্দের অসাধারণ পণ্ডিত হিন্দু সন্ন্যাসী বিবে কানন্দের ভাষণ শোনার সুযোগ হবে। ধর্মীয় অর্থে যদিও কেউ তাঁর সঙ্গে একমত হবেন না, কিন্তু এমন কেউ নেই যিনি কৌতূহলবশত বা অন্য কোন কারণে তাঁর কথা শুনতে চাইবেন না।

এই শহরে শনিবার ১৪ এপ্রিল তারিখে বক্তৃতা দিতে যাচ্ছেন হিন্দু পুরোহিত বিবে কানন্দ—তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে ডেট্রয়েটে যাঁর বাড়িতে তিনি অতিথি হয়ে এসেছেন সেই (প্রাক্তন) রাজ্যপাল-পত্নী শ্রীমতী ব্যাগলি বলেন—"ধর্মমহাসভায় আর কেউ তাঁর চেয়ে অধিক আগ্রহ-উদ্দীপক ছিলেন না বা তাঁর চেয়ে আর কারও কথা অধিক স্মরণে রাখা হয়নি।"

এই শান্ত মহাবিদ্যালয়-সমৃদ্ধ শহরে স্বামীজীর আগমন সম্পর্কে সংবাদের জন্য আমাদের কেবলমাত্র সংবাদপত্রসমূহের ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই। স্মিথ মহাবিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্রী মার্থা ব্রাউন ফিঙ্কে যিনি তখন তাঁর সাক্ষাৎলাভ করেছিলেন, তিনি বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদের অনুরোধে তাঁর স্মৃতিচারণা করেন যা, 'স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমার স্মৃতিচারণা'—এই শিরোনামায় ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যদিও ঐ শহরে স্বামীজীর আগমন সম্পর্কে শ্রীমতী ফিঙ্কের স্মৃতি নির্ভুল নয় (তিনি ভুল করে নভেম্বর ১৮৯৩ বলে উল্লেখ করেছেন) এবং যদিও স্বামীজীর ভাষণের বিষয়বস্তু সম্পর্কেও তাঁর স্মৃতি সুস্পষ্ট নয়, তবুও স্বামীজী তাঁর মনে অবিস্মরণীয় গভীর ছাপ রেখেছিলেন, যা কখনও মলিন হয় নি। তাঁর স্মৃতিচারণার মাধ্যমে আমরা পরিচয় পাই স্বামীজীর শ্রদ্ধা-মিশ্রিত

ভীতি-উদ্দীপক মহিমার, তাঁর শিশুর মতো আনন্দময় সৌহার্দের মনোভাবের এবং তাঁর বিপুল বুদ্ধিমত্তার এবং পাণ্ডিত্যের, যার সহায়ে তিনি যে-সকল কৃষ্ণবর্ণ-পরিচ্ছদ-ভূষিত গম্ভীরবদন ধর্মপ্রচারক, অধ্যাপক, তাঁকে খ্রীস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিতে এসেছিলেন, তাঁদের প্রতি পদক্ষেপে নির্মমভাবে প্রতিহত করেছিলেন। ফিঙ্কে লিখছেন ঃ

"ধর্মমহাসভা শেষ হলে, তাঁর অনুরাগীদের ব্যক্তিগত সহায়তার ওপর নির্ভর না করে স্বাধীনভাবে নিজের ব্যয় নির্বাহ করবার জন্যে স্বামীজী একটি বক্তৃতা-ব্যবস্থাপক সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে আমেরিকার পূর্বাঞ্চল হতে আরম্ভ করে বিভিন্ন রাজ্যগুলি ভ্রমণে যান এবং নভেম্বরের গোড়ায় ম্যাসাচুসেটসের নর্দাম্পটন শহরে আসেন। এই মনোরম প্রাচীন শহরটি বোস্টন এবং নিউ ইয়র্কের মধ্যবর্তী, এটি ক্যালভিন কুলিজের জন্মস্থান বলে খ্যাত। টম পর্বত এবং হলিইয়ক পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে যেখানে নদীটি প্রবেশ করেছে তার কেবল আগে কনেক্টিকাট উপত্যকার স্বল্প উচ্চ পর্বতের ওপর এটি অবস্থিত। বন্যার ঋতুতে তার সংলগ্ন নিচু মাঠগুলি যখন জলে ভরে গিয়ে ঝিকমিক করে তখন হলিইয়ক পর্বতমালার গাঢ় বেগুনি রঙের আভায় তার রেখাচিত্রটি দিগন্তে অঙ্কিত হয়। দুই ধারে উন্নতশির মহিমান্বিত এলম্ বৃক্ষরাজি শোভিত রাস্তাগুলিসহ এই শান্ত জায়গাটির একটি ঘুমন্ত পরিবেশ আছে, যা হঠাৎ ছাত্রীদলের আবির্ভাবে জেগে উঠে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এ শহরের বৌদ্ধিক জীবনের কেন্দ্র একটি মহিলা বিদ্যায়তন, স্মিথ মহাবিদ্যালয়, যা ১৮৭৫ সালে সোফিয়া স্মিথ নারীদের উচ্চশিক্ষার জন্য স্থাপন করেছিলেন।

"১৮৯৩-এর প্রথমদিকে আমি নবাগত ছাত্রী হিসাবে এ মহাবিদ্যালয়ে প্রবেশ করি। আমি তখন আঠার বছরের একটি অপরিণত বালিকা মাত্র। চিন্তায় শৃঙ্খলা আসেনি, কিন্তু আগ্রহের সঙ্গে মানস ও আত্মিক লোকের দিকে হাত বাড়াই। বিদ্যায়তনের বহুশয্যাবিশিষ্ট ছাত্রীনিবাসে সকল ছাত্রীর স্থান সঙ্কুলান হতো না, সেজন্য আমি আর তিনজন নবাগতের সঙ্গে কলেজের নিকটে একটি চতুষ্কোণ বাদামী রঙের বাড়িতে বাস করতাম। এই বাড়িটির কর্ত্রী, তাঁর স্বাধীন চিত্তের জন্য এবং সবকিছুকে পরিহাসের দৃষ্টিতে দেখবার প্রবণতার জন্য তাঁর স্বেচ্ছাচারী শাসন-প্রবৃত্তি সত্ত্বেও, আমাদের নিকট প্রিয় ছিলেন। বিদ্যায়তনে বক্তৃতাদিতে সকল ছাত্রীর উপস্থিতি বাধ্যতামূলক ছিল এবং প্রায়ই এ ধরনের বক্তৃতাদির ব্যবস্থা হওয়াতে বহু খ্যাতনামা চিন্তাক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আমাদের বিদ্যায়তনে আসতেন।

"বিদ্যায়তনের নভেম্বর মাসের প্রচারপত্রে স্বামী বিবেকানন্দের নাম প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি দুটি ভাষণ দেবেন বলা হয়েছিল। তিনি যে একজন হিন্দু-সন্ন্যাসী ছিলেন তা আমরা জানতাম, আমরা আর কিছু জানতাম না, কারণ সাম্প্রতিককালের ধর্মমহাসভায় তিনি যে খ্যাতি অর্জন করেছেন তা আমাদের কানে পৌঁছায়নি। তারপর একটি উত্তেজনামূলক খবর বেরিয়ে পড়ল যে, তিনি আমাদের বাড়িটায় থাকবেন, আমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করবেন এবং আমরা তাঁকে 'ভারত' সম্বন্ধে যে-কোন প্রশ্ন করতে পারব। যাঁকে নিঃসন্দেহে হোটেলগুলি প্রবেশাধিকার দিতে অস্বীকার করেছিল এরকম একজন কৃষ্ণবর্ণের মানুষকে নিজ গৃহে স্বাগত জানিয়েছিলেন, এর থেকেই বোঝা যায় আমাদের গৃহকর্ত্রীর সহনশীলতার সীমা কতদূর প্রসারিত ছিল। তার অনেকদিন পরে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে নিউ ইয়র্ক শহরে সাঙ্গোপাঙ্গসহ আশ্রয়ের সন্ধানে বিফল মনোরথ হয়ে ঘুরতে হয়েছিল।

"ভারতের নাম আমার নিকট শিশুকাল থেকে সুপরিচিত ছিল। ভারতে ধর্মপ্রচারে গিয়েছিলেন এমন একজন তরুণকে আমার মা বিবাহ করতে প্রায় উদ্যত হন নি কি? এবং আমাদের চার্চ মিশনারি আসোসিয়েশন থেকে প্রতিবছর ভারতের জেনানাদের জন্য একটি করে বাক্স কি পাঠানো হতো না? ভারত একটি উষ্ণ দেশ, যেখানে প্রচুর সাপ-খোপ আছে, যেখানে 'অন্ধ পৌত্তলিকরা কাঠ ও পাথরের নিকট মাথা নত করে।' আশ্চর্যের বিষয় আমার মতো পাঠে আগ্রহশীল ছাত্রীও সেই মহান দেশের ইতিহাস ও সাহিত্য সম্বন্ধে কত কম জানত : একজন খাঁটি ভারতীয়ের সঙ্গে কথা বলার এ একটি পরম সুযোগ বই কি!

"নির্দিষ্ট দিনটি এসে গেল, অতিথির জন্য নির্দিষ্ট ঘরটি প্রস্তুত করা হলো এবং একটি মহিমান্বিত কান্তি আমাদের আবাসে প্রবেশ করল। স্বামীজীর পরনে ছিল কালো রঙের প্রিন্স অ্যালবার্ট কোট, গাঢ় রঙের প্যান্ট আর হলদে রঙের পাক দিয়ে জড়ানো একটি পাগড়ি তাঁর অতি সুগঠিত মস্তকটিকে ঘিরে ছিল। কিন্তু তাঁর মুখে দুর্জ্ঞেয়ভাব, চক্ষু হতে আলোক বিচ্ছুরণ এবং তাঁর মধ্যে শক্তির একটি সর্বাঙ্গীণ বিচ্ছুরণ—যা ছিল বর্ণনাতীত। আমরা শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ে চুপ করেছিলাম। আমাদের গৃহকর্ত্রী ভয় পাবার পাত্রী নন। তিনি একটি প্রাণবন্ত আলোচনা চালালেন। আমি স্বামীজীর পাশেই বসেছিলাম এবং আমার সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় মন এত পরিপূর্ণ ছিল যে, আমি একটিও বলবার মতো কথা খুঁজে পাইনি।

“সেদিনের বক্তৃতার আমি কিছুই স্মরণ করতে পারি না। কেবল রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ, কমলা রঙের কোমর বন্ধনী এবং হলুদ রঙের পাগড়ি পরিহিত মঞ্চে সেই মহিমান্বিত মূর্তিটি আমি স্মরণ করতে পারি এবং ইংরেজী ভাষার ওপর সেই অপূর্ব দখল এবং তাঁর সঙ্গীতময় কণ্ঠস্বরের সুরমূর্ছনা, তাও স্মরণ করতে পারি। কিন্তু যে-সকল ধারণা দিয়েছিলেন তিনি সেগুলি আমার মনের মধ্যে দৃঢ়মূল হয়নি অথবা দীর্ঘ কতকগুলি বছর অতীত হয়ে যাওয়ায় সেগুলি স্মৃতিপট থেকে মুছে গেছে। কিন্তু এর পরবর্তী তর্ক বিতর্ক আমার স্মরণে আছে।

“আমাদের বাড়িতে মহাবিদ্যালয়ের সভাপতি, দর্শন শাস্ত্রের বিভাগীয় প্রধান এবং অন্যান্য অধ্যাপকবৃন্দ, নর্দাম্পটন গির্জাসমূহের পুরোহিতগণ ও একজন খ্যাতনামা লেখক এলেন। আমরা ছাত্রীরা বসার ঘরের এককোণে ইঁদুর ছানার মতো চুপচাপ বসেছিলাম এবং আগ্রহের সঙ্গে পরবর্তী আলোচনা শুনেছিলাম। এই আলোচনার একটি বিশদ বিবরণ দেওয়া আমার সাধ্যাতীত, যদিও এই দৃঢ় ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে যে, বিষয়টি ছিল খ্রীস্টধর্ম এবং কেন একে একমাত্র সত্যধর্ম বলা হবে। বিষয়টি যে স্বামীজীর নির্বাচিত ছিল তা নয়। যেই তাঁর মহিমান্বিত উপস্থিতি কালো কোট পরিহিত কঠোরমূর্তি ভদ্রলোকদের সম্মুখীন হলো সকলের মনে হলো তাঁকে যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করা হয়েছে। নিশ্চয়ই চিন্তাজগতে এই সকল চিন্তার ধারকদের একটি বাড়তি সুবিধা ছিল। তাঁরা তাঁদের ধর্মগ্রন্থ এবং পাশ্চাত্য দর্শনসমূহ, কবি ও ভাষ্যকারদের রচনাসমূহ উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছেন। সুদূর ভারতের একজন হিন্দু, তিনি তাঁর চিন্তাধারাকে—তা তিনি যতই পণ্ডিত হোন না কেন, এঁদের সকলের সামনে দাঁড় করাবেন, এটা কে ভাবতে পারে? যে ফল হয়েছিল তা আশ্চর্যজনক আর তার প্রতিক্রিয়া আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব, কিন্তু তার গভীরতা আমি বাড়িয়ে বলতে পারি না।

“বাইবেল গ্রন্থের যে-সকল উদ্ধৃতি দেওয়া হলো, স্বামীজী তার উত্তর দিলেন ঐ একই গ্রন্থ হতে আরও উপযুক্ত উদ্ধৃতির দ্বারা। নিজের যুক্তির সমর্থনে তিনি পাশ্চাত্য দার্শনিক ও ধর্ম বিষয়ে লেখকদের উদ্ধৃতি দিলেন। এমন কি পাশ্চাত্য কবিদের রচনাও তিনি ভালভাবে জানতেন, দেখা গেল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও টমাস গ্রের (বিখ্যাত কবিতা ‘এলিজি’ হতে নয়) থেকেও তিনি উদ্ধৃতি দিলেন। আমি যে-জগতের মানুষ, সেই জগতের প্রতি আমার সহানুভূতির উদ্রেক হলো না কেন? স্বামীজী ধর্মের সংজ্ঞাকে প্রসারিত

করে সমগ্র মানবজাতিকে তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করলেন। তার ফলে যে মুক্তির হাওয়া সমস্ত ঘরকে ছেয়ে ফেলল, আমার মন কেন তাতে উল্লসিত হয়ে উঠল ? তার কারণ কি তাঁর কথাগুলি আমার মনের গভীর আকাঙ্ক্ষাসমূহ প্রতিফলিত করেছিল, অথবা তার কারণ ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের চৌম্বক আকর্ষণ? আমি বলতে পারি না। আমি শুধু জানি যে. তাঁর জয়ে আমি নিজেকে জয়ী মনে করেছিলাম।

"[বেলুড় মঠের জনৈক সন্ন্যাসী] আমাকে বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন মূর্তিমান ভালবাসা। কিন্তু আমার কাছে তিনি সে রাত্রে শক্তির মূর্ত বিগ্রহরূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন। আমি মনে করি আমার পরবর্তী কালের অর্জিত জ্ঞানের দ্বারা তা ব্যাখ্যা করতে পারব। নিঃসন্দেহে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত এই সকল বিরাট পণ্ডিত ব্যক্তিরা সঙ্কীর্ণচিত্ত ছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল আবদ্ধ। তাঁদের আত্মম্ভরিতা 'তারা জ্ঞানী।' তাঁরা কি করে এ বক্তব্য গ্রহণ করবেন, 'যে, যে, ভাবেই আমার নিকট আসুক না কেন, আমি তার কাছেই পৌঁছবই'? শিকাগোতে সম্প্রতি স্বামীজী খ্রীস্টধর্মযাজকদের তীব্র বিদ্বেষের পাত্র হয়েছিলেন এবং নিঃসন্দেহে তাঁর কথাগুলি কঠোর হয়ে পড়েছিল, যেহেতু পাশ্চাত্য-চিন্তার এই প্রাতিনিধিদের মধ্যেও তিনি একই মনোভাব প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁদের কাছে ভালবাসার আবেদনে কাজ হবার নয়, কিন্তু শক্তি তাঁদের সন্ত্রস্ত কবতে পারে, যদিও জোর করে তাদের সহমত নাও পাওয়া যেতে পারে। আলোচনা অত্যন্ত ভদ্রভাবে আরম্ভ হলেও ক্রমে তা কম প্রীতিপূর্বক হলো, তারপর তাতে তিক্ততার অনুপ্রবেশ ঘটল। পরে খ্রীস্টধর্মের সমর্থকদের অনুতাপের বিষয় হয়ে দাঁড়াল, কেন না তাঁরা অনুভব করলেন যে তাঁরা কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন। আর সত্যিই তাই হলো। কারণ জয়ের সেই প্রতিক্রিয়ায় আজও পর্যন্ত আমার মন ভরে আছে।

"পরদিন খুব ভোরে স্নানের ঘর থেকে প্রবল জল পড়ার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গভীর স্বরে অজানা ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণের ধ্বনি ভেসে এল। আমার বিশ্বাস আমাদের মধ্যে কয়েকজন দরজার কাছে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে শোনবার চেষ্টা করেছিল। প্রাতরাশের সময় আমরা জিজ্ঞাসা করলাম তিনি কি আবৃত্তি করছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন—'প্রথম আমি আমার ললাটে জলস্পর্শ করলাম। তারপরে বক্ষঃস্থলে এবং প্রতিবারেই সর্বজীবের জন্য কল্যাণ কামনা করে প্রার্থনা জানালাম।' এই উত্তর সজোরে আমাকে আঘাত করল। আমিও সকালে প্রার্থনা করতে অভ্যস্ত ছিলাম, কিন্তু সে

প্রার্থনা সর্বপ্রথম আমারই জন্য। তারপর আমার পরিবারের জন্য। সমগ্র মানব জাতিকে আমার পরিবারভুক্ত করে নিয়ে তাদেরকে আমার নিজের চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা কখনও মনে হয়নি।

"প্রাতরাশের পর স্বামীজী প্রস্তাব করলেন একটু হেঁটে বেড়াতে যাবেন এবং আমরা চারজন ছাত্রী দু-জন করে দু-পাশে থেকে ঐ মহিমান্বিত ব্যক্তিটিকে গর্ব ভরে শহরের রাস্তায় সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে গেলাম। আমরা যেতে যেতে সসঙ্কোচে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে সচেষ্ট হলাম। উনি সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দিলেন এবং তাঁব সুন্দর দন্তরাজি উন্মুক্ত করে হাসলেন। তিনি যা যা বলেছিলেন, তাব মধ্যে একটা কথাই মনে আছে। খ্রীস্টীয় মতবাদ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, প্রতিনিয়ত 'যিশুর রক্ত' কথাটির ব্যবহার তাঁর মনে ঘৃণার উদ্রেক করে। মন্তব্যটি আমাকে ভাবাতে শুরু করল। আমিও তো সেই স্তবটি শুনতে ঘৃণার উদ্রেক অনুভব করি, যাতে বলা হয়েছে—'ইমানুয়েলের শিরা হতে সংগৃহীত রক্তে পরিপূর্ণ একটি ঝরণা আছে।' কিন্তু গির্জা কর্তৃক গৃহীত মতবাদের এই সমালোচনা করা কি অসীম সাহসিকতার ব্যাপার! আমার মনে মুক্ত চিন্তার জন্ম সেই মুহূর্তের জাগরণ থেকে, যা সেই স্বাধীনতা প্রেমিক আমার মধ্যে এনে দিয়েছিলেন। আমি তারপর আমাদের কথাবার্তাকে তাঁর বক্তৃতায় উল্লিখিত ভারতের পবিত্র গ্রন্থ বেদের অভিমুখে নিয়ে গেলাম। তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন নিজে পড়ে দেখতে এবং মূল গ্রন্থ পড়ে দেখতে। আমি তৎক্ষণাৎ সঙ্কল্প করলাম সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করব, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলছি যে, আমি সে সঙ্কল্প কখনও রক্ষা করিনি। অবশ্য বাইরের দিক থেকে দেখলে আমি হলাম একটি উত্তম বীজ, কাঁটায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে যা দাঁড়ায় তাই।" [১৫]

কিন্তু স্বামীজীর প্রভাবের ক্ষেত্রে ওসব কাঁটা কিছুই নয়। মার্থা ব্রাউন ফিঙ্কে সেই সকল শত শত লোকদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত, যাঁরা তাঁদের অন্তরের অন্তস্তলে তাঁর সজীব আধ্যাত্মিকতার উন্মেষের স্পর্শ লাভ করেছিলেন। যদিও মার্থা সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীজীর উপদেশ অনুসরণ করেননি, কিন্তু ফল উদ্‌গমটা ছিল কেবলমাত্র সময়ের ব্যাপার। মার্থার স্মৃতিচারণার শেষ কথাগুলি হলো :

অনেকে মিশরের পাথরে তৈরি শবাধারে দৃষ্ট বীজগুলির কথা পড়েছেন, যেগুলি হাজার হাজার বছর আগে সমাহিত করা হয়েছিল, তবুও যেগুলির মধ্যে এখনও সেই প্রাণশক্তি অটুট আছে, যার থেকে নতুন গাছ জন্মাতে

পারে। আমার মনে ও হৃদয়ে বাইরে থেকে দেখতে গেলে প্রাণশক্তি বিহীন হয়ে নিহিত ছিল ভারতের সেই মহান বাণীদূতের বহুদূরের স্মৃতি, কিন্তু তা গত এক বছরে নতুন চারাগাছের জন্ম দিয়েছে। এই স্মৃতি অবশেষে আমাকে এ দেশে (ভারতে) নিয়ে এসেছে। মধ্যবর্তী বছর গুলিতে—যে বছরগুলি ছিল দুঃখ, দায়িত্ব ও আনন্দ মিশ্রিত সংগ্রামের—আমার অন্তরাত্মা এ মতবাদ, সে মতবাদ পরীক্ষা করে দেখছিল, সেগুলির কোনটাকে আমি বাঁচার জন্যে চাই কি না। সবসময়ই ফল সন্তোষজনক হয়নি। মতবাদ এবং আচার নিয়ম, গোঁড়া বিশ্বাসীরা যে-সকলকে এত গুরুত্ব দিয়েছে, তা আমার কাছে গুরুত্বহীন বলে মনে হয়েছে, আত্মার যে স্বাধীনতা আমি এত আকাঙ্ক্ষা করি তাকে তা যেন খর্ব করেছে।

স্বামীজী যে বিশ্ববাণী প্রচার করেছেন, অবশেষে তার মধ্যে আমার পরিতৃপ্তি খুঁজে পেলাম। আমাদের মধ্যে দিব্য-চেতনা আছে, আমরা প্রথম থেকেই ঈশ্বরের অংশ এবং এ কথা প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রেই সত্য—এই সত্যে বিশ্বাসলাভের পর মানুষের আর চাওয়ার কি থাকতে পারে? আমি তাই ভারতের মাটিতে এসে অনুভব করছি, আমি যেন আমার স্বদেশে এসেছি। [১৬]

যাতে হাজার হাজার মানুষ যত শীঘ্র সম্ভব এই স্বদেশের পথ খুঁজে পায় ঠিক সেইজন্যই স্বামীজী আমেরিকায় তাঁর অবস্থান দীর্ঘায়ত করতে এবং যত জায়গায় পারা যায় তত জায়গায় যাওয়ার জন্যে, যত মানুষের সঙ্গে কথা বলা যায়, তত মানুষের সঙ্গে কথা বলার জন্যে বাধ্য বাধকতা অনুভব করেন নি কি?

নর্দাম্পটনের সংবাদপত্রগুলি—ডেলী হেরাল্ড এবং ডেলী হ্যাম্পশায়ার গেজেট—উভযেই কদিন ধরেই তাঁর আগমন বার্তা আগাম ঘোষণা করেছে। নিম্নলিখিত সংবাদগুলি, যা এই কাগজগুলির কোনটাতে না কোনটাতে প্রকাশ লাভ করেছিল এবং ধর্মমহাসভার পরে তাঁর যে বহু বিস্তৃত খ্যাতি লাভ হয়েছিল আর বড় বা ছোট যে শহরেই যান না কেন সর্বত্র যে আবেগময় অভ্যর্থনা লাভ করেছেন, সেই সকল বিষয়ের ওপরেই আলোকপাত করে :

একজন উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ ও সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি এবং বিশ্বমেলার ধর্মমহাসভার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব স্বামী বিবেকানন্দ এপ্রিলের ১৪ তারিখ

সন্ধ্যায় শহরের সভাগৃহে বক্তৃতা করবেন। তাঁকে নিশ্চয়ই সংখ্যায় প্রচুর বুদ্ধিদীপ্ত শ্রোতৃমণ্ডলী স্বাগত জানাবেন এবং তাঁকে তা জানানো উচিত হবে।

হিন্দু সন্ন্যাসী বিবে কানন্দের ধর্মমহাসভায় উচ্চারিত একটি প্রার্থনার অংশবিশেষ হলো—"তুমিই হচ্ছ তিনি যিনি বিশ্বের ভার গ্রহণ করেন, তুমি আমার এই জীবনের সামান্য ভার বহনের সহায় হও।"

সম্প্রতি স্বামী বিবেকানন্দ ডেট্রয়েটে এসে সেখানে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছেন। সকল শ্রেণীর মানুষ তাঁর কথা শুনতে ভিড় করে এসেছেন। বিশেষ করে বিভিন্ন বৃত্তির মানুষেরা তাঁর যুক্তি ও চিন্তার সারবত্তায় গভীর আগ্রহ অনুভব করেছেন। একমাত্র এখানকার রঙ্গমঞ্চই তাঁর বিপুল সংখ্যক শ্রোতাদের পক্ষে স্থান সঙ্কুলানের মতো উপযুক্ত প্রশস্ত স্থান। তিনি অতি চমৎকার ইংরেজী বলেন এবং "তিনি যেমন সুদর্শন তেমনি অতি সৎ-স্বভাব"—ডেট্রয়েট নিউজ পত্রিকা (১৮৯৪-এর ৫ এপ্রিল তারিখের বোস্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্ট পত্রিকা হতে গৃহীত অনুলিপি)।

শনিবার সন্ধ্যায় শহরের সভাগৃহে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতার জন্য টিকিট খুব ভাল বিক্রি হচ্ছে।

ধর্মমহাসভার বক্তৃতাসূচীর একেবারে শেষের দিকে ছাড়া বিবেকানন্দকে বলতে দেওয়া হতো না। উদ্দেশ্য, লোকজন যাতে শেষ পর্যন্ত বসে থাকে। কোন একটি উষ্ণ দিনে যখন কোন একজন নীরস গদ্যময় অধ্যাপক দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর বক্তব্য রেখে চলেছেন এবং শয়ে শয়ে লোক সভাগৃহ ছেড়ে উঠে যাচ্ছে, তখন শুধু ঘোষণা করে দিলেই হতো যে সমাপ্তিসূচক আশীর্বচনের পূর্বে বিবেকানন্দ একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেবেন। বিপুল শ্রোতৃমণ্ডলীকে পুরোপুরি ধরে রাখার জন্য এরূপ একটি ঘোষণাই যথেষ্ট ছিল এবং হাজার হাজার শ্রোতা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকত এই অতি লক্ষণীয় ব্যক্তির পনের মিনিটের ভাষণ শোনবার জন্য।

ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দ কর্তৃক উচ্চারিত প্রার্থনার অংশ-বিশেষ—"সব নিয়মের মধ্যে মুখ্য নিয়ম—পদার্থ ও শক্তির প্রতি কণার মধ্যে সেই

'এক' আছেন যাঁর শাসনে বায়ু প্রবাহিত হয়, অগ্নি দহন করে, মেঘ বর্ষণ করে, মৃত্যু পৃথিবীতে অলক্ষ্যে সতর্কতার সঙ্গে তার পদসঞ্চার ঘটায় আর তাঁর স্বরূপ কি? তিনি সর্বত্র আছেন—তিনি শুদ্ধ পবিত্র এবং অরূপ, সর্বশক্তিমান ও সকল করুণার বিগ্রহ, তুমিই আমাদের পিতা, আমাদের প্রিয়তম বন্ধু।"

অবশেষে স্বামীজীর আগমনের নির্ধারিত দিনটি—১৩ এপ্রিল এসে পড়ল এবং ঠিক যেমন, আমরা শ্রীমতী ফিঙ্কের স্মৃতিচারণায় পড়েছি—"একটি মহিমান্বিত কান্তি" নর্দাম্পটনে প্রবেশ করল। 'ডেলী হেরাল্ড' দেখল তার প্রত্যাশা পূর্ণ হয়েছে, তার ১৪ এপ্রিলের প্রতিবেদনে লেখা হলো ঃ

খ্যাতনামা হিন্দু দার্শনিক, ধর্মীয় ব্যাক্তিত্ব, লেখক এবং বাগ্মী স্বামী বিবে কানন্দ, যিনি এই শহরের সভাগৃহে আজ ভাষণ দেবেন, গতকাল অপরাহ্নে এলম্ স্ট্রীটস্থ এক বাসভবনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আহূত ভদ্রমহোদয়দের একেবারে মুগ্ধ করে রেখেছিলেন। বহুদিকে প্রসারিত বুদ্ধি, সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা ও উদার সংস্কৃতিসম্পন্ন এই শিক্ষার্থী যাজকের বিনয়নম্র মর্যাদার সঙ্গে আরও যুক্ত হয়েছে তাঁর ব্যক্তিত্বের অসাধারণ চৌম্বক আকর্ষণ। প্রাচীন পৃথিবী হতে সমাগত বহু সমাদৃত এই আগন্তুক আমাদের নতুন পৃথিবীর বীরপূজকদের নিকট এমন একজন মানুষ যাঁর সঙ্গে সামাজিক সাক্ষাৎকার উদারতা শিক্ষার তুল্য।

স্বামীজীর নর্দাম্পটনের সভাগৃহে প্রদত্ত ভাষণটি, যার তাৎপর্য শ্রীমতী ফিঙ্কে তাঁর স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারেন নি, ডেলী হেরাল্ড পত্রিকায় সংক্ষেপিত হয়ে এবং সম্পাদকীয় মন্তব্যসহ এপ্রিলের ১৬ তারিখে নিম্নলিখিতরূপে প্রকাশিত হয় ঃ

আমাদের হিন্দু ভ্রাতার সহিত একটি সন্ধ্যা

স্বামী বিবে কানন্দ দ্বিধাহীনভাবে এ ব্যাপারে শেষ নিষ্পত্তি করে দিলেন যে, সমুদ্রের পরপারে এমন কি দূরতম প্রত্যন্ত দেশের প্রতিবেশিগণ তুচ্ছ বর্ণের, ভাষার, আচার-আচরণ এবং ধর্মের পার্থক্য সত্ত্বেও সত্যিই আমাদের আত্মীয়। রৌপ্যঘণ্টাধ্বনির মতো সঙ্গীতময় উচ্চারণে হিন্দু সন্ন্যাসী শনিবার সন্ধ্যায় শহরের সভাগৃহে প্রদত্ত তাঁর ভাষণের ভূমিকা করলেন তাঁর এবং পৃথিবীর প্রতিটি মুখ্য জাতির উৎপত্তির ইতিহাসের রূপরেখা অঙ্কিত করে, যার দ্বারা প্রমাণিত হলো এই সত্য যে বংশগতভাবে রক্তের

সম্বন্ধ একটি অত্যন্ত সহজ ঘটনা, যা অনেকে জানে না বা সবসময় স্বীকার করতে চায় না।

তারপরে হিন্দুদের কতকগুলি প্রথা সম্বন্ধে যে ভাষণটি দেওয়া হলো তা অবশ্য বসার ঘরের উপযোগী কথাবার্তার মতো, তাতে মনোরম আলাপচারিতায় সুদক্ষ ব্যক্তির স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতার প্রকাশ ছিল এবং তাঁর শ্রোতাদের মধ্যে যাদের এ ব্যাপারে স্বাভাবিক ও অর্জিত আগ্রহ ছিল, তাদের নিকট বক্তা স্বয়ং এবং তাঁর চিন্তা নানা কারণে—যার সবটা এখানে বলা যাবে না, গভীর আকর্ষণ উদ্রেক করেছিল। অন্যদের নিকট বক্তা তাঁর শব্দের সাহায্যে চিত্র সৃষ্টিকে আরও বড় করে না দেখানোয় হতাশার কারণ হয়েছিলেন। ভাষণটি যদিও আমেরিকার প্রচলিত রীতি অনুসারে অত্যন্ত দীর্ঘ হয়েছিল, তবুও তাতে সেই অদ্ভুত জনসমষ্টির স্বল্প সংখ্যক প্রথা ও আচার-ব্যবহার মাত্র বিবেচিত হয়েছিল। শ্রোতাগণ এই প্রাচীনতম জাতির সুযোগ্য প্রতিনিধির মুখে তাদের ব্যক্তিগত, আইনগত, গৃহজীবন সম্পর্কিত, সামাজিক ও ধর্মীয়-জীবন সম্পর্কিত আরও অনেক কিছু আনন্দের সঙ্গে শুনতে চেয়েছিলেন। এগুলি মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে আগ্রহী সাধারণ শিক্ষার্থী অত্যন্ত আকর্ষণীয় মনে করে অথচ এ সম্বন্ধে সে অতি অল্পই জানে।

হিন্দুর জীবনের ব্যাখ্যা শুরু করা হলো একটি হিন্দু বালকের জন্মের সময়কার চিত্র দিয়ে। তারপর বর্ণিত হলো তার শিক্ষা, তার বিবাহের চিত্র; তার পারিবারিক জীবনের উল্লেখ যৎসামান্য করা হলো। কারণ বক্তা প্রায়শই প্রসঙ্গ ছেড়ে ইংরেজী ভাষা-ভাষী জাতিদের প্রথা ও ধারণাসমূহের সঙ্গে তুলনামূলক মন্তব্য করতে ব্যাপৃত হচ্ছিলেন এবং সিদ্ধান্তগুলি সবসময় নিজেদের প্রথার সমর্থনে চলে যাচ্ছিল, যদিও খুবই ভদ্রতার সঙ্গে, সহৃদয়তার সঙ্গে, সুশোভন করে সেগুলিকে প্রকাশ করা হচ্ছিল। তাঁর শ্রোতাদের মধ্যে যাঁরা মোটামুটিভাবে সর্বশ্রেণীর হিন্দুদের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন, তাঁরা বক্তাকে উল্লিখিত প্রত্যেকটি বিষয়ে একটি দুটি আপত্তিজ্ঞাপক প্রশ্ন করতে পারতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যখন তিনি অতিশয় বাক্‌পটুতার সঙ্গে অতি সুন্দর করে ভারতীয় নারীর মহিমা সম্পর্কে ধারণাসমূহ ব্যক্ত করে বলছিলেন যে ভারতে সর্বদা নারীকে ঈশ্বরের মাতৃভাবের প্রতীক হিসাবে দেখা হয়, তার নিকট সর্বদা শ্রদ্ধায় মাথা নত করা হয়, এমন কি এমন ভক্তির সঙ্গে পূজা করা হয় যা

আমেরিকায় নারীত্বের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল, নিঃস্বার্থ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান, স্বামী ও পিতারা কল্পনাও করতে পারেন না, তখন কেউ কেউ এরকম প্রশ্ন করতে চাইতে পারতেন যে এই সকল সুন্দর তত্ত্বকথা অধিকাংশ হিন্দুগৃহে যেখানে স্ত্রী, মা ও কন্যাগণ অবস্থান করছেন, সেখানে কি বাস্তবে প্রতিফলিত?

তিনি মুনাফালোভী, ভোগবিলাস-সন্ধানী, স্বার্থানুসন্ধী, 'ডলার-ভিত্তিক বর্ণবিভেদে বিশ্বাসী' প্রবলপ্রতাপ শ্বেতকায় ইউরোপীয় ও আমেরিকার জাতিগুলিকে নৈতিক ও আইনগত দিক থেকে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধে অপরাধী বলে যে বর্ণনা করেছেন তা যথার্থ, অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সে কথাগুলি উপস্থাপনা করা হয়েছে। ধীর, কোমল, শান্ত, আবেগহীন সঙ্গীতময় কণ্ঠস্বরে ধৃত চিন্তাগুলি অত্যন্ত শারীরিক শক্তি প্রয়োগে উচ্চারিত বাক্যাবলীর মতোই শক্তিময় ও অগ্নিময়রূপে প্রকাশিত হয়েছে এবং সোজা তাঁকে 'তুমিই অবতার' পুরুষগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এই স্তরে উন্নীত করেছে। কিন্তু যখনই বংশ, প্রকৃতি ও সংস্কৃতিতে সম্ভ্রান্ত এই শিক্ষিত হিন্দু অসচেতনভাবে প্রসঙ্গ হতে চ্যুত হয়ে সুস্পষ্টরূপে আত্মকেন্দ্রিক, আত্মচর্চায় নিযুক্ত, মুখ্যত স্বীয় আত্মার পরিত্রাণার্থ নিযুক্ত, নেতিবাচক এবং নিষ্ক্রিয়, বলা বাহুল্য স্বার্থপূর্ণ আলস্য-উৎপাদক নিজ ধর্মকে অপর যে ধর্ম প্রাণবন্ত, উদ্যমশীল, আত্মবিস্মৃতিপূর্ণ, যার নিকট পরের মঙ্গলই প্রথম ও শেষকথা, যে ধর্ম পৃথিবীর সর্বত্র গমনশীল ও কর্মভিত্তিক এবং জগতে সর্বাধিক উপযোগী, যাকে আমরা খ্রীস্টধর্ম নামে অভিহিত করে থাকি, যার নামে পৃথিবীর নয়-দশমাংশ প্রকৃত নৈতিক, আধ্যাত্মিক, মানবিক কাজকর্ম এতাবৎ সম্পন্ন হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে—তার অবিবেচক কিছু সমর্থক যতই কিছু দুঃখজনক ও স্থূল ভুল করে থাকুন না কেন, সেই ধর্মের তুলনায় অধিক উন্নত বলে প্রমাণ করতে চাইছিলেন, তখনই তিনি নিজেকে একটু বেশি ছোট করে ফেলছিলেন।

কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দকে দেখা বা শোনা যে একটি বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় তাতে কোন সন্দেহ নেই, যার সুযোগ কোন বুদ্ধিমান, সুবিবেচক আমেরিকাবাসীর হারানো উচিত নয়। আমরা যেখানে আমাদের জাতির বয়স কয়েক শত বৎসরের মাপকাঠিতে পরিমাপ করে থাকি, সেখানে যে জাতি তার বয়স গণনা করে থাকে কয়েক সহস্র বৎসরের পরিমাপে, তার মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির সুন্দরতম অভিব্যক্তির একটি

উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত যদি কেউ দেখতে চান, তার এ সুযোগ ছাড়া কখনই উচিত নয়।

রবিবার সন্ধ্যায় বিশিষ্ট হিন্দুটি স্মিথ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিকট সান্ধ্য প্রার্থনার সময় যে ভাষণটি দেন, বস্তুত তার বিষয় ছিল ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মাতৃত্ব আর এই ভাষণটি যে প্রত্যেক শ্রোতার মনে গভীর দাগ কেটেছিল, তা তাদের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়। সমস্ত চিন্তাধারাটির বৈশিষ্ট্য ছিল প্রকৃত ধর্মীয় মনোভাব এবং উপদেশের মধ্যে যে উদারতা আছে, সেই অনন্য উদারতা।

নিঃসন্দেহে স্বামীজীর হিন্দুধর্মের মূল্য "প্রমাণ করবার প্রচেষ্টাই" বক্তৃতা শেষে উচ্চতম ডিগ্রীধারী পণ্ডিতদের তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার প্ররোচনা দিয়েছিল। শ্রীমতী ফিঙ্কের স্মৃতিচারণা থেকে আমরা জানতে পারি তার পরে কি ঘটেছিল—একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি স্বামীজী যে শহরেই গিয়েছেন সেখানেই ঘটেছে, যা উপস্থিত শ্রোতাদের হৃদয়ে জয়ের এবং উল্লাসের অনুভূতি এনে দিয়েছিল। যাঁরা স্বদেশীয় ধর্মযাজকদের নীরস সঙ্কীর্ণ উপদেশ-মূলক বক্তৃতা শুনে শুনে আধ্যাত্মিক দিক থেকে অপুষ্টিতে ভুগছিলেন তাঁরা স্বামীজীর ভাষণে তাঁদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ এমন জোরের সঙ্গে, এমন নিপুণতার সঙ্গে হতে দেখে বিপুল আনন্দ লাভ করলেন।

পরের দিন রবিবার ১৫ এপ্রিল অপরাহ্নে স্মিথ মহাবিদ্যালয়ে তিনি ভাষণ দেন। উপরে উদ্ধৃত শেষ অনুচ্ছেদটি ছাড়া এ বক্তৃতা প্রসঙ্গে আমরা আরও যা কিছু জানতে পারি তা হলো ১৮৯৪-এর মে মাসের স্মিথ মহাবিদ্যালয়ের মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত ক্ষুদ্র একটি সংবাদ থেকে, যা নিম্নলিখিতরূপ ঃ

রবিবার ১৫ এপ্রিল, হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ, যাঁর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ ধর্মমহাসভায় প্রচুর সহানুভূতিসূচক মন্তব্যের বিষয় হয়েছিল—তিনি এখানে সান্ধ্য প্রার্থনার প্রাক্কালে বলেন—আমরা মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব এবং ঈশ্বরের পিতৃত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা বলি, কিন্তু খুব কম লোকই এ কথাগুলির অর্থ অনুধাবন করি। সত্যিকারের ভ্রাতৃত্ব তখনই সম্ভব যখন আমাদের আত্মা বিশ্ব-পিতার এত নিকটে পৌঁছয় যে ঈর্ষা এবং শ্রেষ্ঠত্বের দাবির ক্ষুদ্রতা দূর হয়ে যায়, কারণ তখন আমরা এ সকলের ঊর্ধ্বে আরোহণ করি। আমাদের সযত্নে দেখতে হবে আমরা যেন হিন্দু পুরাণ বর্ণিত সেই কুয়োর ব্যাঙ না হয়ে যাই, যে দীর্ঘদিন

ধরে একটি সঙ্কীর্ণ স্থানে অবস্থান করার দরুন প্রশস্ততর স্থানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিল।

নর্দাম্পটন থেকে স্বামীজী ম্যাসাচুসেটস-এর অন্তর্গত লীন শহরে এলেন। লীন বোস্টন থেকে দশ মাইল দূরে অবস্থিত একটি শিল্প শহর। লীনের খ্যাতি প্রাথমিকভাবে এখানকার জুতো উৎপাদনের জন্য এবং আরও কারণ খ্রীস্টীয় বিজ্ঞান ভাবনার প্রবর্তক মেরি বেকার এডি তাঁর জীবনব্রত প্রচার আরম্ভের পূর্বে উনবিংশ শতাব্দীব মধ্যভাগে এখানে বসবাস করতেন। স্বামীজী যাঁর অতিথি হয়েছিলেন সেই শ্রীমতী ফ্রান্সিস ডব্লিউ. ব্রীড ছিলেন লীনের সমাজের একজন নেত্রী, তাঁর সঙ্গে স্বামীজীর পূর্ববর্তী বৎসরে সালেমে পরিচয় হয় এবং তিনি তা ভুলেও যান। গোড়ায় তিনি শিকাগোর অধিবাসী ছিলেন, নিঃসন্দেহে সেখানে তিনি হেল পরিবারকে জানতেন। তিনি একজন জুতো উৎপাদনের ক্ষেত্রে জনৈক মুখ্য ব্যক্তিকে বিবাহ করেছিলেন। শ্রীব্রীড একটি চামড়ার কারখানারও মালিক ছিলেন এবং স্বামীজী যখন ওখানে আসেন তখন তিনি বেশ ধনী। ব্রীডদের কয়েকটি সন্তান হয়েছিল এবং তাঁরা বাস করতেন একটি বিশাল বাড়িতে, যেখানে তাঁরা বহু লোককে আপ্যায়ন করতেন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথানুযায়ী বিপুল ব্যয়বাহুল্যের সঙ্গে। সকল প্রকার সংবাদ-দাতাদের মতানুযায়ী শ্রীমতী ব্রীড ছিলেন একজন অতি সম্ভ্রান্ত নারী লক্ষণীয়ভাবে সুন্দরী, অন্যের ওপর প্রভুত্ব বিস্তারে পটু, নাটকীয় হাবভাবসম্পন্ন এবং অর্থব্যয়ের ক্ষেত্রে অমিতব্যয়ী। কথিত আছে তাঁর রুশ দেশীয় একটি বরফের ওপর দিয়ে চলার গাড়ি ছিল; পাশাপাশি তিনটি ঘোড়া সেই গাড়িকে টানত। শীতের সময়ে কালো পশুচর্ম-নির্মিত পোশাকে সুরক্ষিত হয়ে, শ্রীমতী ব্রীড জাঁকজমকের সঙ্গে ঐ গাড়িটিতে চড়ে লীনের রাস্তায় জনসাধারণের মনে ভীতিমিশ্রিত সম্ভ্রম জাগিয়ে বেড়িয়ে বেড়াতেন। যদি স্বামীজী বছরের আরও গোড়ার দিকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তিনটি অশ্ববাহিত ওই রুশ দেশীয় গাড়িটিতে চড়তেন। কিন্তু মধ্য এপ্রিলে তখন বরফ গলে গিয়ে বসন্তের পদসঞ্চার ঘটেছে। তথাপি যদি গাড়িটি শ্রীমতী ব্রীডের ব্যয়বহুল রুচির পরিচায়ক হয়, তাহলে শীত বা বসন্ত যাই এসে থাকুক না কেন, স্বামীজী লীনে যে সপ্তাহটি কাটালেন তাতে তাঁকে যে যথেষ্ট পরিকল্পিত আড়ম্বরের সঙ্গে আপ্যায়ন করা হয় এতে কোন সন্দেহ নেই।

লীনে স্বামীজী দুটি ভাষণ দেন—প্রথমটি ১৭ এপ্রিল তারিখের অপরাহ্নে নর্থ শোর ক্লাবে—একটি মহিলাদের সংঘ যেটি অভিহিত হতো 'উচ্চতম

শ্রেণীর সামাজিক ও সাহিত্যিক সংস্থা' হিসাবে, যার প্রাক্তন সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী ব্রীড; অপরটি ১৮ এপ্রিল সন্ধ্যায় অক্সফোর্ড সভাগৃহে সর্বসাধারণের সমক্ষে।

স্বামীজীর প্রথম বক্তৃতা যা "ভারতের আচার-ব্যবহার ও প্রথা" নামে বিবৃত তা "লীন ডেলি ইভনিং আইটেম"-এর ১৮ এপ্রিল + সংখ্যা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তা নিম্নরূপ :

নর্থ শোর ক্লাব

মঙ্গলবার অপরাহ্ণে অনুষ্ঠিত সভা। ভারত থেকে আগত একজন শিক্ষিত সন্ন্যাসী সুয়ামী বিবে কানন্দ দ্বারা প্রদত্ত বক্তৃতা—তাঁর দেশের আচার-ব্যবহার ও প্রথা সম্বন্ধে বিবরণসূমহ।

মঙ্গলবার অপরাহ্ণে নর্থ শোর ক্লাবের সভায় শ্রোতার সংখ্যা ছিল প্রচুর এবং তারা ছিল বুদ্ধিমত্তায় উজ্জ্বল। এদের মধ্যে ছিলেন উচ্চতম সংস্কৃতির প্রতিনিধিবর্গ ও নামীদামী বহু বিশিষ্ট অতিথি। ভারত হতে আগত সুয়ামী বিবে কানন্দ, একজন বিদগ্ধ সন্ন্যাসী, যিনি সাবলীলতার সঙ্গে ইংরেজী বলেন। তিনি তাঁর নিজের দেশের আচার-ব্যবহার ও প্রথাসমূহ সম্পর্কে এক গভীর চিত্তাকর্ষক বিবরণ দান করেন। হলুদ বর্ণ পোশাক ও উপযুক্ত পাগড়ি পবিহিত সুয়ামী বিবে কানন্দ তাঁর ভাষণ শুরু করলেন এই বলে যে, তাঁর দেশ উত্তর ও দক্ষিণ এই দু ভাগে বিভক্ত। এই দু ভাগের ভাষা ও রীতিনীতির মধ্যে এতই তফাত যে কেউ কারও কথা বুঝতে পারে না। এই কারণে উত্তর ভাগ থেকে আগত এই বক্তা দক্ষিণ ভাগ থেকে আগত কারও সঙ্গে ধর্মমহাসভায় সাক্ষাৎ হলে ইংরেজীতে বাক্যালাপ করতে বাধ্য হতেন। সারা দেশে নটি মুখ্য ভাষা এবং একশটি প্রাদেশিক ভাষা প্রচলিত।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে কিছু কিছু ঐক্য থাকলেও প্রত্যেক সম্প্রদায় তার নিজস্ব ধর্মমত ও বিধানসমূহ নিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে অনেক অসত্য বিবরণ ভারত সম্বন্ধে লেখা হয়েছে। এই সমস্ত ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞান থেকে অনেক অত্যন্ত ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। কোন একজন হিন্দুর কাছে সব কিছুই ধর্মের অধীন, ধর্মের বিরোধী কিছুই সে গ্রহণ করে না। তার ধর্মীয় বিশ্বাস হলো—জীবন উপভোগের জন্য নয়, ভোগ জয়ের জন্য এবং নিজের ওপরে পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করা, এটাই সর্বোচ্চ

স্তরের সভ্যতা। জাতি-ভেদ যা কিনা বিলুপ্ত হতে চলেছে তা হলো আর্য ও অনার্য—ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্যে। ব্রাহ্মণ হলো, যে সহস্র সহস্র বৎসরব্যাপী শিক্ষা-সংস্কৃতির সন্তান, যে কঠোর নিয়ম মেনে জীবন যাপন করে; আর শূদ্র, যে অজ্ঞ তাকে প্রচুর স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাকে অত সব কঠোর নিয়ম মানতে হয় না।

ভারতে মাতাকে সবচেয়ে বেশি ভক্তিশ্রদ্ধা কবা হয়। পুত্র সন্ন্যাসী হয়ে ঘরে ফিরলে পিতা তাকে অভিবাদন করার সময় হাঁটু গেড়ে বসে মাটিতে মাথা ঠেকাবেন, কিন্তু সন্ন্যাসী তার মায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসবে। ভারতের মহিলারা তাদের শিশুদের কুমিরের মুখে নদীতে নিক্ষেপ করে না। কোন বিধবাকে তার স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারা হয না, যদি না কোন বিধবা স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জন করতে আগ্রহী হন।

উচ্চ শ্রেণীতে বিবাহ বিচ্ছেদ স্বীকৃত নয়; খুব নিচুস্তরের স্ত্রীলোকও যদি তার স্বামীকে ত্যাগ করে, তবুও স্বামীর সম্পত্তিতে তার স্বত্বাধিকার থাকে। স্বামীব প্রতি স্ত্রীর ভালবাসা কিরূপ হবে তা দেখাবার জন্য ভারতের সর্বোত্তম কাব্য রামায়ণের গাথা থেকে সুন্দর কিছু অংশ আবৃত্তি করে সুয়ামী বিবে কানন্দ শোনালেন। এটা ছিল রামের প্রতি সীতার ভালবাসা সম্পর্কিত। তিনি আরও বললেন, 'যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন' সম্বন্ধে আজকাল অনেক কিছুই বলা হয় এবং পাশ্চাত্য জাতিরা একে ভারতের বিরুদ্ধে একটি যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করে। তাদের বক্তব্য—তাদের সম্পদ, উন্নতি আর শক্তি প্রমাণ করে যে, তারা শ্রেষ্ঠতর এবং তাদের ধর্ম উন্নততর ও পবিত্র।

কিন্তু ভারত দেখেছে অনেক শক্তিধর জাতির উত্থান ও পতন, যাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল জয়ের ক্ষমতা ও এই ঐহিক জীবনের গরিমা করায়ত্ত করা। ভারত বার বার লুণ্ঠিত হয়েছে, বিজেতার শৃঙ্খল পরিধান করেছে এবং অত্যাচারের বোঝা অদম্য ধৈর্যের সঙ্গে বহন করেছে আর সকলের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করেছে। এর কারণ ভারত জেনেছিল যে, তার অধিবাসিগণ এমন একটি ধর্মকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে আছে, যা একটি উন্নত আধ্যাত্মিকতার ওপর সুদৃঢ়ভাবে অবস্থিত, কেবলমাত্র তাৎক্ষণিক ভোগবাদের নড়বড়ে বালির স্তূপের ওপর তার অবস্থান নয়।

ঐ একই দিনে "লীন ডেলি ইভনিং আইটেম" স্বামীজীর আগামী জনসভায় বক্তৃতার কথা আগ্রহের সঙ্গে ঘোষণা করল। (যে বক্তৃতার কোন প্রতিবেদন দেখতে পাওয়া যায়নি) ঃ

"আজকের সন্ধ্যায় অক্সফোর্ড হলে হিন্দু পণ্ডিতের বক্তৃতা এমন একটি ঘটনা যা কখনই উপেক্ষণীয় নয়। নর্থ শোর ক্লাবে প্রদত্ত মঙ্গলবার অপরাহ্নের ভাষণ যে-সব মহিলারা শুনেছেন তা অল্পদিনের মধ্যে তাঁরা ভুলতে পারবেন না। যাঁরা নূতন ও নির্ভীক বক্তব্য শুনতে চান, তাঁদের উচিত এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাছে গিয়ে তাঁর ভাষণ শোনা।"

শ্রীমতী ব্রীড যতখানি লীনের ততখানি বোস্টনের লোক; সেজন্য যে সপ্তাহটি স্বামীজী তাঁর সঙ্গে অতিবাহিত করলেন সে সপ্তাহটিতে তিনি অধ্যাপক জন হেনরী রাইটের সঙ্গে নূতন করে বন্ধুত্ব করলেন এবং নিশ্চয়ই আরও অনেকের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করে থাকবেন। স্বামীজীর এ সপ্তাহটির জীবন সম্পর্কে (এবং আরও অনেক কিছু সম্পর্কে) সংবাদ আমরা পাই এযাবৎ অপ্রকাশিত তাঁর একটি চিঠি মারফত যা তিনি নিউ ইয়র্ক থেকে মে মাসের ২৫ তারিখে ইসাবেল ম্যাককিণ্ডলিকে লিখেছিলেন। পত্রটি নিম্নলিখিতরূপ ঃ

প্রিয় ভগিনী,

তোমার চিঠি আমার কাছে গতকাল পৌঁছেছে। তুমি একেবারে ঠিক কথা বলেছ, আমি 'উন্মাদ ইন্টিরিয়ার'-এর মজাটা উপভোগ করেছি। [স্বামীজী এখানে 'নীল-নাসা' প্রেস্‌বিটেরিয়ান সংবাদপত্র 'শিকাগো ইন্টিরিয়ার'-এর কথা বলছেন। এই কাগজটি তাঁর প্রবল বিরোধিতা করছিল] কিন্তু ভারতের যে-সকল চিঠিপত্র তুমি কাল পাঠিয়েছ, যে-গুলির কথা 'মা-গীর্জা' তাঁর চিঠিতে শুভ-সংবাদ বলে উল্লেখ করেছেন, তা অবশ্যই দীর্ঘদিন পরে পাওয়া শুভ সংবাদ। এর মধ্যে দেওয়ানজীর [হরিদাস বিঠলভাই দেশাই] একটি অতি সুন্দর চিঠি রয়েছে। বৃদ্ধটি সর্বদাই চান আমাকে সাহায্য করতে, এখনও আমাকে সাহায্য করতে চাইছেন—ঈশ্বর তাঁকে আশীর্বাদ করুন। তা ছাড়া আছে কলকাতা থেকে প্রকাশিত আমার সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা। তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে, অন্তত আমার জীবনের ক্ষেত্রে একবার ঈশ্বর কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি তাঁর স্বদেশে সম্মানিত হয়েছেন। তার মধ্যে আছে আমেরিকায় ও ভারতের সাময়িক পত্র-পত্রিকায় আমার সম্পর্কে প্রকাশিত কিছু টুকরো অংশ। এর মধ্যে কলকাতার সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত অংশগুলির সংকলন বিশেষভাবে সন্তোষজনক, যদিও সেগুলির মধ্যে অতিরঞ্জনের ভাব এত প্রকট যে, আমি তোমাকে সেটি পাঠাতে চাইছি না। তারা আমাকে খ্যাতিমান, আশ্চর্য-পুরুষ—এই সকল অর্থহীন বিশেষণে অভিহিত করেছে, কিন্তু তারা আমার কাছে সমগ্র জাতির কৃতজ্ঞতা

পাঠিয়েছে। এখন আমাদের জাতির লোকেরাও আমাকে যা খুশি বলুক আমি গ্রাহ্য করি না, শুধু একটি কথা ছাড়া। আমার একজন বৃদ্ধা মা আছেন, যিনি সারা জীবন ধরে অনেক কিছু সহ্য করেছেন, তবুও তার মধ্যেও তিনি তাঁর প্রিয়তম সন্তান—আমাকে ঈশ্বর এবং জনগণের সেবায় উৎসর্গ করেছেন এমন এক সময়ে যখন আমাকে তাঁর সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন ছিল। সেই মা যখন শুনবেন সেই সন্তান কোন এক দূর দেশে পশুর মতো অনৈতিক জীবন যাপন করছে—যা মজুমদার কলকাতায় গিয়ে বলে বেড়াচ্ছে—তখন সেই সংবাদ তাঁকে একবারে মৃত্যুর মুখে পৌঁছে দেবে। কিন্তু ঈশ্বর মহান, তাঁর সন্তানদের অনিষ্টসাধন কে করতে পারে ?

এখন থলের ভিতর থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে—আমি না চাইতেই। আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রধান একটি সংবাদপত্র আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমি আমেরিকায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেছি বলে ঈশ্বরকে সেটির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। পত্রিকাটির সম্পাদক কে জান ? মজুমদারের সম্পর্কিত ভ্রাতৃস্থানীয় এক ব্যক্তি। বেচারা মজুমদার!! সে ঈর্ষান্বিত হয়ে অসত্য বলে নিজের এবং নিজের কাজেরই ক্ষতিসাধন করেছে। ঈশ্বর জানেন আমি কখনও আত্মপক্ষ সমর্থনে একটি কথাও বলিনি।

আমি ফোরাম পত্রিকার আগের সংখ্যায় শ্রীযুক্ত গান্ধীর প্রবন্ধ পড়েছি।

তুমি যদি গত মাসের 'রিভিউ অব রিভিউজ' পত্রিকাটি পেতে আর মাকে তা হতে ভারতে অহিফেন ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশ্নের আলোচনা প্রসঙ্গে হিন্দুদের সম্পর্কে ভারতের ইংরেজ শাসকদের একজন উচ্চতম কর্মচারী কি সাক্ষ্য দিয়েছে তা পড়ে শোনাতে! তিনি ইংরেজদের সঙ্গে তুলনা করে হিন্দুদের একেবারে আকাশে তুলে দিয়েছেন। স্যার লেপেল গ্রিফিন—আমাদের জাতির একজন সর্বাপেক্ষা প্রবল শত্রু ছিলেন। কোন্ কারণে তাঁর এই দিক পরিবর্তন ?

বোস্টনে শ্রীমতী ব্রীডদের সঙ্গে আমার খুব ভাল সময় কেটেছে এবং আমি অধ্যাপক রাইটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। আমি আবার বোস্টনে যাচ্ছি। দরজি আমার জন্য একটি নতুন আলখাল্লা তৈরি করেছে—আমি কেম্ব্রিজ (হার্ভার্ড) বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে যাচ্ছি এবং ওখানে আমি অধ্যাপক রাইটের অতিথি হয়ে থাকব—বোস্টনের সংবাদপত্রে ওখানকার লোকেরা আমার উদ্দেশে স্বাগত জানিয়ে খুব সুন্দর সুন্দর সব কথা লিখেছে।

এই সকল অর্থহীন ব্যাপারে আমার বড় ক্লান্তি এসেছে—মে মাসের শেষের দিকে আমি শিকাগো ফিরে আসব এবং সেখানে কয়েকদিন কাটিয়ে আবার পূর্বাঞ্চলে ফিরব।

গতরাত্রে আমি ওয়ালডর্ফ হোটেলে বক্তৃতা দিয়েছি। শ্রীমতী স্মিথ [শ্রীমতী আর্থার স্মিথ, প্রাচ্য ধর্ম বিষয়ে একজন সুপরিচিত বক্তা, যাঁর সঙ্গে স্বামীজীর শিকাগোতে সাক্ষাৎ ঘটে] প্রতিটি টিকিট দু ডলারে বিক্রি করেছেন। আমার বক্তৃতার সময় সভাকক্ষ পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, যদিও কক্ষটি ছোট ছিল। আমি টাকাটা এখনও দেখিনি, আশা করছি সারা দিনের মধ্যে দেখব।

লীনে আমি একশ ডলার পেয়েছিলাম, যা আমি এখন পাঠাচ্ছি না, কারণ আমার নতুন পোশাক তৈরি এবং এরকম আরও সব অর্থহীন ব্যাপার সম্পন্ন করাতে হবে।

আমি বোস্টনে অর্থ উপার্জনের আশা করি না। কিন্তু আমি পারলে আমেরিকার মস্তিষ্ক স্পর্শ করে তাকে নাড়া দিতে চাই—

তোমার স্নেহশীল ভ্রাতা[১৭]

বিবেকানন্দ

স্বামীজী শ্রীমতী স্মিথের 'আলাপচারী চক্রের' অধিবেশনে ওয়ালডর্ফ হোটেলে মঙ্গলবার ২৪ এপ্রিল সন্ধ্যায় বক্তৃতা করেন। এক অর্থে এটি ছিল একটি ঐতিহাসিক বক্তৃতা, কারণ এখনও পর্যন্ত আমরা যতদূর জানি, এটাই ছিল স্বামীজীর নিউ ইয়র্কে প্রদত্ত প্রথম বক্তৃতা। ইসাবেল ম্যাককিণ্ডলিকে লেখা চিঠিতে সভাকক্ষ (ছোট হলেও) যে পূর্ণ ছিল—এ সংবাদটি ছাড়া এই বক্তৃতাটি সম্বন্ধে আজও পর্যন্ত আমাদের জ্ঞান 'নিউ ইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন'-এ পরের দিন প্রকাশিত নিম্নলিখিত একটি সংক্ষিপ্ত সংবাদে নিবদ্ধ ঃ

ভারত ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে

গত সন্ধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ ওয়ালডর্ফ হোটেলে মিসেস আর্থার স্মিথের 'কথোপকথন-চক্রে'র নিকট 'ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। গায়িকা মিস্ সারা হামবার্ট ও মিস্ অ্যানি উইলসন অনেকগুলি সঙ্গীত পরিবেশন করেন। বক্তা একটি কমলালেবু রঙের কোট এবং হলদে-পাগড়ি পরেছিলেন যাকে 'ভিক্ষুকের পরিচ্ছেদ' বলা হয়। এটাই হলো ভগবান এবং মানব-সেবার জন্য সর্বত্যাগী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর বেশ।

বক্তা পুনর্জন্মবাদের আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, যাঁদের পাণ্ডিত্য অপেক্ষা কলহ-প্রিয়তা বেশি, এমন অনেক ধর্মযাজক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছেন, পুনর্জন্ম যদি থাকে তা হলে লোকের তা স্মরণ হয় না কেন? এর উত্তর এই যে, স্মরণ করতে না পারার ওপর কোন ঘটনার সত্যাসত্য স্থাপন করা ছেলেমানুষি! মানুষ তো তার জন্মের কথা মনে করতে পারে না এবং জীবনে ঘটেছে এমন আরো অনেক কিছুই তো সে ভুলে যায়।

বক্তা বলেন, খ্রীস্টধর্মের 'শেষ বিচারের দিন'-এর মতো কোন বস্তু হিন্দু ধর্মে নেই। হিন্দুদের ঈশ্বর শাস্তিও দেন না, পুরস্কৃতও করেন না। কোন প্রকার অন্যায় করলে তার শাস্তি অবিলম্বে স্বাভাবিকভাবেই ঘটবে। যতদিন না পূর্ণতা লাভ হচ্ছে ততদিন আত্মাকে এক দেহ থেকে দেহান্তরে প্রবেশ করতে হবে। *

উপস্থিত প্রচুর শ্রোতাদেব মধ্যে ছিলেন ডঃ ও শ্রীমতী ডিউই, ডঃ ও শ্রীমতী গার্নসি এবং কুমাবী গার্নসি, শ্রীমতী ডেভিড কিং (ছোট), শ্রীমতী ভ্যান নর্মান, কুমারী ফেবে কাজিনস্, কুমারী ফিলিপস্, শ্রীযুক্ত সি. এ্যামোরী স্টীভেনস, শ্রীযুক্ত চার্লস এ. মন্টগোমারী, শ্রীমতী জে. সি. ওয়ার্ড, ডঃ আব. বি. করীব, শ্রীযুক্ত ক্যানন নোয়েলস্, শ্রী ও শ্রীমতী টমাস ই. ক্যালভার্ট, শ্রীযুক্ত রোডেরিক পেরী হিউজেস এবং শ্রীমতী আর্থার স্মিথ।

স্বামীজী নিউ ইয়র্কে এপ্রিলের ২৪ তারিখ থেকে মে-র ৬ তারিখ অবধি ছিলেন, অবশ্যই নানা সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, নানা জায়গায় ঘরোয়া বৈঠকে কথা বলছিলেন এবং অনেক লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করছিলেন। ইসাবেল ম্যাককিণ্ডলিকে নিউ ইয়র্ক থেকে লেখা অপ্রকাশিত আর একটি চিঠিতে তিনি তাঁর এ সময়কার কার্যকলাপ সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলেছেন। এ চিঠিটাতেও অত্যন্ত বিরক্তিকর কর্তব্যকর্মের মধ্যেও তাঁর স্বভাবে শিশুর মতো আনন্দোচ্ছল দিকটিরও এক ঝলক দর্শন মেলে। (যদিও চিঠিটির তারিখ তিনি মে মাসের ২ তারিখ বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু খামের ওপর ডাকঘরের ছাপ এবং চিঠির ভিতরে যা আছে তার সাক্ষ্য থেকে প্রতীয়মান যে এটি লেখা হয়েছিল মে মাসের ১ তারিখে)

* বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ৮৩-৮৪

প্রিয় ভগিনী *২ (১ মে) ১৮৯৪*

আমি তোমাকে পুস্তিকাটি এখন পাঠাতে পারব না বলে মনে হচ্ছে কিন্তু কাল ভারত থেকে সংবাদপত্রের একটুকরো কর্তিত অংশ পেয়েছি যা তোমাকে এইসঙ্গে পাঠাচ্ছি। তুমি এটি পড়া হয়ে গেলে দয়া করে শ্রীমতী ব্যাগলিকে পাঠিয়ে দিও। এই পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমজুমদারের আত্মীয। বেচারা মজুমদারের জন্য আমার এখন দুঃখ হচ্ছে!

[এই শেষ বাক্য দুটি বাঁদিকের শূন্য প্রান্তভাগে আড়াআড়িভাবে লেখা হয়েছে।]

আমি আমার কোটের জন্য সঠিক কমলা রঙ এখানে খুঁজে পেলাম না, তাই হলুদ মিশ্রিত একটা আসলে লাল রঙ, যা কমলা রঙের পর সবচেয়ে ভাল, তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হলো।

কোটটি কয়েকদিনের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে যাবে।

সেদিন ওয়ালডর্ফে বক্তৃতা দিয়ে আমি ৭০ ডলার পেয়েছি এবং আশা করছি, আগামীকালও বক্তৃতা দিয়ে আরও কিছু বেশি পাওয়া যাবে।

৭ থেকে ১৯ তারিখ পর্যন্ত বোস্টনে নানা রকম সভাসমিতির কথা আছে, কিন্তু বোস্টনের লোকেরা টাকাকড়ি খুব কম দেয়।

গতকাল আমি ১৩ ডলার দিয়ে একটা ধূমপানের নল কিনেছি। আশা করি পিতা পোপকে একথা বলে দেবে না (নলটি শ্রীযুক্ত হেলকে উপহার দেবার জন্য কেনা হয়েছিল)। কোটের দাম পড়বে ত্রিশ ডলার। আমি খাবার দাবার এবং প্রয়োজনমত যথেষ্ট অর্থ ঠিক পেয়ে যাচ্ছি—আশা করছি পরবর্তী বক্তৃতার পর ব্যাঙ্কে কিছু রাখতে পারব।

আমি মাংসের একটা বড় টুকরো এখন খেয়ে নিয়েছি, কারণ আজ সন্ধ্যায় আমি একটি নিরামিষ ভোজসভায় বক্তৃতা করতে যাচ্ছি।

আমি নিরামিষাশী কারণ যখন নিরামিষ আহার পাই তখন আমি নিরামিষ আহারই পছন্দ করি। পরশুদিন আমার আর একটি নিমন্ত্রণ আছে—মধ্যাহ্ন ভোজের, সেটি লাইম্যান অ্যাবটের সঙ্গে। মোটের ওপর আমার সময় খুব ভাল কাটছে এবং আশা করছি যে বোস্টনেও সময় ভালই কাটবে শুধু সেই অতি জঘন্য বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া যা সত্যই বিরক্তিকর। যাই হোক যেই ১৯ তারিখ দিনটি কোটে যাবে বোস্টনের বরবটি ভাজা থেকে এক লাফে শিকাগোর ভাপা শূকর মাংসে পৌঁছে যাব! তখন আমি প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নেব, দু-তিন সপ্তাহ কেবল বিশ্রাম নেব আর কেবল বসে বসে গল্প বলব এবং ধূমপান করব।

প্রসঙ্গক্রমে বলি নিউ ইয়র্কের লোকগুলি কিন্তু খুব ভাল কেবল তাদের যত টাকা আছে, তত মেধা নেই।

আমি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা করতে যাচ্ছি, তিনটে বক্তৃতা বোস্টনে, আর তিনটে হার্ভার্ডে—সবকটিরই ব্যবস্থাপনা করেছেন শ্রীমতী ব্রীড। এরা এখানেও কিছু আয়োজন করছে, যার জন্য শিকাগো যাবার পথে আর একবার আমাকে নিউ ইয়র্কে আসতে হবে এবং এদের খুব সজোরে কয়েকটা ধাক্কা দিতে হবে, তারপর সংগৃহীত অর্থ নিয়ে আমি শিকাগোতে পলায়ন কবব।

যদি তোমরা নিউ ইয়র্ক বা বোস্টন থেকে এমন কিছু চাও যা শিকাগোতে পাওয়া যায় না, তাহলে শিগ্‌গির লিখে জানাও। আমার কাছে এখন অনেক ডলার, এখন তুমি যা চাইবে, আমি তোমাকে পাঠিয়ে দেব তৎক্ষণাৎ। মনে করো না এতে অশোভন কিছু আছে। আমার মধ্যে কোন প্রবঞ্চক নেই। আমি যদি তোমার ভাই হই, তো সত্য সত্যই ভাই—আমি জগতে একটি জিনিসই ঘৃণা করি—তা হলো প্রবঞ্চনা।

তোমার স্নেহশীল ভাই[১৮]
বিবেকানন্দ

(ভারতীয় পাঠকদের জেনে নিতে হবে যে, বোস্টন হলো ভাজা বরবটির জন্য বিখ্যাত আর শিকাগো ভাপা শূকর মাংসের জন্য। যদিও শ্রীরামকৃষ্ণের মতে স্বামীজী যে-কোন খাবার খেতে পারেন, এমনকি যেগুলি শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ সেগুলিও খেলে কোন অনিষ্ট হবে না,[১৯] *এখানে কিন্তু তিনি নিজ খাদ্যাভ্যাসের কথা বলছেন না, তিনি এখানে আমেরিকার উত্তম খাদ্যবস্তু নিয়ে মজা করেছেন মাত্র।)*

নিউ ইয়র্কে স্বামীজীর দ্বিতীয় ভাষণটি মে মাসের ২ তারিখ সন্ধ্যায় কুমারী মেরী ফিলিপস-এর বাড়িতে দেওয়া হয়; মেরী ফিলিপস তাঁর ওয়ালডর্ফ হোটেলের বক্তৃতার সময় উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি স্বামীজীর ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের অন্যতম হয়েছিলেন, যিনি তাঁকে আতিথ্য ও সাহায্য দান করতেন, যাঁর নিউ ইয়র্কের ৩৮ নং পশ্চিম রাস্তায় ১৯ নং বাড়িটি স্বামীজী পরে তাঁর প্রধান কার্যালয় হিসাবে ব্যবহার করেছেন এবং ভারতে লিখিত চিঠিপত্রের উত্তর পাঠাবার ঠিকানা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীতে কুমারী ফিলিপস সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'তাঁর কাজে একজন

স্বেচ্ছা-নিবেদিত-প্রাণ কর্মী এবং নিউ ইয়র্ক শহরে নারীদের জন্য সেবা ও বৌদ্ধিক কর্মক্ষেত্রে একজন নেত্রীস্থানীয়া হিসাবে নানামহলে খ্যাত'। আমরা তাঁর বাড়িতে প্রদত্ত স্বামীজীর ভাষণ সম্বন্ধে যা কিছু জানতে পারি তা হলো 'নিউ ইয়র্ক ডেলী ট্রিবিউন' পত্রিকার ১৮৯৪-এর মে মাসের ৩ তারিখে প্রকাশিত নিম্নলিখিত ক্ষুদ্র নিবন্ধ হতে ঃ

ভারত ও পুনর্জন্ম সম্বন্ধে ভাষণ

স্বামী বিবেকানন্দ কুমারী মেরী ফিলিপস-এর ওয়েস্ট থার্টিএইটথ স্ট্রীটের ১৯ নং বাড়িটিতে গত সন্ধ্যায় "ভারত এবং পুনর্জন্ম" সম্পর্কে একটি ভাষণ দেন। তিনি হিন্দুধর্ম বা ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখ করেন যে তাঁদের এই ধর্মের কোন বিশেষ নাম নেই; সব ধর্মই সত্য—এই বিশ্বাসই তাঁদের নিকট ধর্ম বলে বিবেচিত এবং কোন একটিমাত্র মতবাদ একমাত্র সত্যধর্ম—এ বিশ্বাস হলো সাম্প্রদায়িকতা। তাঁর ভাষণে কার্যকারণ সম্বন্ধযুক্ত কর্মবাদকে ব্যাখ্যা করা হয়। বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতির পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও ব্যাখ্যাত হয়। এই পৃথিবীতে আমরা এ জন্মে যা কিছু করি তা আগের জন্মের জীবনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যা পরের জন্মে পরিবর্তিত হতে পারে—এই তত্ত্বটি বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়। উপস্থিত বিপুল সংখ্যক শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন কুমারী এমা থার্সবি, রোডেরিক পেরী হিউজেস, অধ্যাপক লিওঁ ল্যাণ্ডসবার্গ, অধ্যাপক উডফোর্ড, ডঃ হলম্যান, টমাস ই. ক্যালভার্ট, এমার্সন ক্লাবের কয়েকজন সদস্য, কুমারী এলিস আইভস, কুমারী ক্যাথরিন স্টাগ, শ্রীমতী স্যামুয়েল সোয়ান, শ্রী ও শ্রীমতী ডাবলডে, শ্রীমতী আর্থার স্মিথ. কুমারী ক্যারোলিন হুইটজার এবং আইজাক বি. মিলস।

যাঁরা স্বামীজীর 'ট্রিবিউন' কর্তৃক উল্লিখিত প্রথম দুটি ভাষণে যোগদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছেন যাঁরা পরবর্তী বৎসরগুলিতে তাঁর কাজের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ওয়ালডর্ফের বক্তৃতায় ডঃ ও শ্রীমতী এগবার্ট গার্নসি ছিলেন, যাঁদের সাক্ষাৎ আমরা পূর্বেই পেয়েছি এবং ছিলেন কুমারী মেরী ফিলিপস, যিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজ গৃহে স্বামীজীর বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছিলেন। এ ছাড়া আরও অনেককে তাতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তিনি, যাঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত গায়িকা কুমারী এমা থার্সবি এবং লিওঁ ল্যাণ্ডসবার্গ। প্রথমোক্ত জন যিনি পরে স্বামীজীকে তাঁর

ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রীমতী ওলি বুলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে থাকতে পারেন, নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতির একজন সদস্য হয়েছিলেন এবং এ-কথা সকলেই জানেন যে শেষোক্তজন স্বামীজীর অন্যতম পাশ্চাত্য সন্ন্যাসী-শিষ্য স্বামী কৃপানন্দ নামে অভিহিত হন। যদিও ট্রিবিউন-এ বলা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে লিওঁ ল্যাণ্ডসবার্গ মোটেই অধ্যাপক ছিলেন না, ছিলেন একজন লেখক ও সাংবাদিক, যিনি তখন ট্রিবিউন পত্রিকার কর্মী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। (স্বামীজী ও লিওঁ ল্যাণ্ডসবার্গ যে ১৮৯৪-এর মে মাসেই পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয়সূত্রে আবদ্ধ হন তা বোঝা যায় যখন আমরা দেখি যে জুন মাসের শেষে স্বামীজী যখন পুনর্বার নিউ ইয়র্কে এসেছেন তখন ল্যাণ্ডসবার্গ তাঁকে স্টেশনে নিতে আসছেন এবং রাত্রি যাপনের জন্য একটি ঘরের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন।)

স্বামীজী ১৮৯৪-এর এপ্রিল মাসে বাড়িতে বাড়িতে ও বিভিন্ন সংস্থা ও সমিতিতে মোট কতগুলি বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা আমাদের জানার উপায় নেই। আমরা এও জানতে পারি না কতজন বুদ্ধিজীবী ও ধর্মভাবাপন্ন মানুষের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেছিলেন, তাঁদের কাছে থেকে ওখানকার সমকালীন ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং বিনিময়ে ভারতের ধর্মের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়েছিলেন ও কোন কোন ক্ষেত্রে অন্ততপক্ষে তাঁদের চিন্তায় একটি নতুন রঙ এনে দিয়েছিলেন আর দিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। স্বামীজী ইসাবেল ম্যাককিণ্ডলিকে মে মাসের পয়লা তারিখে লেখা চিঠিতে তখনকার সামাজিক ও শিল্প সংস্কারের এবং ধর্মীয় ও ধর্মতত্ত্বীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি প্রখ্যাত পাদরী লাইম্যান অ্যাবটের সঙ্গে তাঁর মধ্যাহ্ন ভোজনের আমন্ত্রণের কথা উল্লেখ করেছেন। স্বামীজী যখন শ্রীযুক্ত অ্যাবটের সঙ্গে পরিচিত হন তখন তিনি ব্রুকলিন প্লাইমাউথ কংগ্রীগেশনাল গির্জার অধ্যক্ষ এবং আউটলুক পত্রিকার মুখ্য সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন প্রখ্যাত বক্তা হেনরী ওয়ার্ড বীচারের স্থলাভিষিক্ত হয়ে। 'আউটলুক' পত্রিকার পূর্ববর্তী নাম ছিল 'ক্রিস্টিয়ান ইউনিয়ন'। বিস্তৃত পাঠকমণ্ডলী কর্তৃক পঠিত এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এতে ধর্মীয় ও ঐহিক—এই উভয় বিষয়েই সম পরিমাণে লেখা থাকত। এর সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত কর্মিবৃন্দ যাঁরা স্বামীজীর সঙ্গে ভোজসভায় মিলিত হতে আহূত হয়েছিলেন, তাঁরা সব বোদ্ধা ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীযুক্ত অ্যাবটের সঙ্গে স্বামীজী সম্ভবত ধর্মমহাসভায় পরিচিত হয়েছিলেন, অ্যাবট ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের

সেই সকল খ্রীস্ট্রীয় ধর্মযাজকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাঁরা একটু রেখে ঢেকে তাঁর বন্ধু হয়েছিলেন। এই রাখাঢাকা ব্যাপারটা প্রত্যেক খ্রীস্ট্রীয় ধর্মযাজকদের মধ্যেই ছিল, তা তাঁরা যতই উদার হবার প্রয়াস পান না কেন, তাঁদের মধ্যে খুব কম জন-ই অখ্রীস্টীয় ধর্মের সত্যতা স্বীকার করে নিতে পেরেছিলেন। পৌত্তলিকদের ভাগ্য সম্বন্ধে সবচেয়ে উদার মত যা লাইম্যান অ্যাবট পোষণ করতেন এবং যা অনিচ্ছার সঙ্গে আমেরিকার বিদেশে প্রচার-সংক্রান্ত পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক (আমেরিকান বোর্ড অব কমিশনার্স ফর ফরেন মিশন) গৃহীত হয়েছিল, তা হলো এই যে, তারা চিরদিনের জন্য নরকে পতিত হবে না, মৃত্যুর পরও ঈশ্বরের করুণালাভের আর একটি সুযোগ তাদের মিলবে। লাইম্যান অ্যাবটের জীবন ও চিন্তার সম্বন্ধে একটি সমীক্ষায় ইরা ভি. ব্রাউন লিখছেন—"যদিও (অ্যাবট) যারা খ্রীস্টের কথা মানে না তাদের ভাগ্য সম্বন্ধে মতান্ধতার বশবর্তী হতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু তিনি কখনও অন্য ধর্ম সম্বন্ধে তীব্র প্রশংসার মনোভাবকেও প্রশ্রয় দেন নি।"[২০] এটা অবশ্য ঠিক যা সত্য তা থেকে একটু কমিয়ে বলা। যদিও শ্রীযুক্ত অ্যাবট স্বামীজীর অনুরাগী ছিলেন এ-কথা সত্য বলে ধরা যেতে পারে, তথাপি পরবর্তী কালে যখন ভারতে নিযুক্ত খ্রীস্টধর্ম প্রচারকগণ প্রশ্ন করে পাঠাবেন যে—"এ কথা কি সত্য যে, স্বামীজী শত শত খ্রীস্টধর্মাবলম্বিগণকে হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত করেছেন," উত্তরে তিনি নিম্নলিখিত কথাগুলি বলবেন—"আমেরিকায় আমরা এই ব্যাপারটির সঙ্গে পরিচিত যে, আপাতদৃষ্টিতে প্রেততত্ত্ববাদ, সম্মোহনবাদ, খ্রীস্ট্রীয় বিজ্ঞানবাদ, থিয়োসফি, হিন্দুধর্ম প্রভৃতি একের পর এক আপাত ধর্মান্তরকরণ ঘটিয়ে চলেছে, কিন্তু এই ধর্মান্তর বৌদ্ধিক অথবা ভালবাসার ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন আনে না, স্থায়ী উদ্দেশ্যসাধনের ক্ষেত্রে তো নয়ই—ব্যাপারটা (অর্থাৎ আপাত-রূপান্তরকরণ) অংশত ঘটে আবেগের তাড়নায়, অংশত অলস কৌতূহলের কারণে। এরই মধ্যে খ্রীস্টের প্রভাব বেড়েই চলেছে, পরিসংখ্যান দেখলে দেখা যায় জনসংখ্যার চেয়ে দ্রুত বেড়ে চলেছে, জনসংখ্যাও দ্রুত বেড়ে চলেছে এবং খ্রীস্টধর্মীয়দের কার্যকলাপ থেকে প্রতীয়মান যে যুক্তিসিদ্ধ এবং বস্তুনিষ্ঠ বিশ্বাস, যা কর্মে বেশি বিশ্বাসী, যা কেবল স্বপ্ন দেখায় না—তা বেড়েই চলেছে।"[২১] সুতরাং এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, যখন কোন খ্রীস্টীয় যাজক স্বামীজীর দিকে ডান হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তখন তাঁর বাঁ হাত গোঁড়ামির খুঁটি শক্ত করে ধরে রেখেছে। স্বামীজী তাঁর নিউ ইয়র্ক

পরিদর্শনকালে সম্ভবত আরও খ্যাতনামা খ্রীস্টীয় যাজকদের সাক্ষাৎলাভ করেছিলেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় এটা অসম্ভব নয় যে, ডঃ ও শ্রীমতী গার্নসি এ সময়ে স্বামীজীকে সম্মানিত করেছেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মযাজকদের সঙ্গে তাঁকে ভোজসভায় আহ্বান করে, যেরূপ আমরা কনস্টানস্ টাউনের "স্বামী বিবেকানন্দকে যেরূপ জেনেছি" শীর্ষক ১৯৩৪ সালে প্রবুদ্ধ ভারতে প্রকাশিত প্রবন্ধে পড়ি। যদিও শ্রীমতী টাউন স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের কথা চল্লিশ বছর অতিবাহিত হবার পূর্বে লিপিবদ্ধ করেন নি, তথাপি এ ঘটনাটি এমন যা তাঁর মনে সুস্পষ্ট জাগ্রত ছিল। যদি গার্নসিদের আয়োজিত রবিবারের অপরাহ্নের ভোজটি স্বামীজীর নিউ ইয়র্কে প্রথম আগমনের কালে দেওয়া হয়ে থাকে, যুক্তির দিক থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে তাই-ই হয়েছিল, তাহলে এটি নিশ্চয় দেওয়া হয়েছিল ২৯ এপ্রিল তারিখে, কারণ সেবারে নিউ ইয়র্কে তাঁর স্বল্পকালীন অবস্থানকালে এটিই ছিল একমাত্র রবিবার। এই কিছুটা উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাটি সম্পর্কে শ্রীমতী টাউন, যিনি সে সময় ছিলেন কুমারী গিবনস্, লিখছেন :

> *"আমি যখন তাঁর সাক্ষাৎলাভ করি তখন তাঁর বয়স ছিল সাতাশ (প্রকৃতপক্ষে ৩১)। আমার তাঁকে প্রাচীন ভাস্কর্যের নিদর্শন দেবমূর্তির মতো সুন্দর মনে হয়েছিল। অবশ্য তাঁর গায়েব রঙ ছিল কালো, তাঁর বিশাল আয়ত চক্ষু দুটি দেখলে মধ্যরাত্রির নীলবর্ণের কথা মনে পড়ে যায়। অন্য ভারতীয়দের তুলনায় তিনি ছিলেন দীর্ঘকায়—অন্যেরা ক্ষুদ্রাকার অস্থি দ্বারা গঠিত হবার কারণে আমাদের চোখে ক্ষুদ্রকায বলে মনে হতো। তাঁর মাথাটি ছিল একরাশ ছোট ছোট ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশে আবৃত।...*
>
> *"আমাদের সাক্ষাৎ ঘটেছিল খুব অস্বাভাবিক পরিবেশে। শিকাগোতে তাঁর বিজয় অভিযানের পর তাঁকে নিউ ইয়র্কে আসবার জন্য আমন্ত্রণের ধারা বর্ষিত হয়। নিউ ইয়র্ক হলো সেই শহর যেখানে সবসময় পৃথিবী-শ্রেষ্ঠদেরই সম্বর্ধনা জানানো হয়। এখানে এ সময় একজন বিখ্যাত চিকিৎসক বাস করতেন—ডাঃ এগবার্ট গার্নসি, তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক এবং অক্ষরে অক্ষরে অতিথিবৎসল যাকে বলে তাই। ফরটিফোর্থ স্ট্রীটে ফিফথ অ্যাভিনিউতে তাঁর অতি সুন্দর একটি সুবৃহৎ বাড়ি ছিল। যত প্রখ্যাত ব্যক্তিদের নিউ ইয়র্কের সমাজে পরিচিত করে দেওয়া ছিল ডাঃ গার্নসির নিকট অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার, আর এ ব্যাপারে অবশ্যই তাঁর সুন্দরী*

স্ত্রী ও কন্যার আন্তরিক অনুমোদন ছিল। ধর্ম ও বিশ্ব-শান্তির জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে দৃঢ় সৌহার্দের বন্ধন গড়ে উঠুক এই যিনি চেয়েছিলেন সেই মহান স্বামীকে ইনি বিশেষ সম্মান দেখাবেন—এটা প্রত্যাশিতই ছিল।

এই প্রত্যাশা পূরণের জন্য ডাঃ গার্নসি এক রবিবার অপরাহ্নে একটি ভোজসভায় নানা ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের ডেকেছিলেন। আর নিজে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন রবার্ট ইঙ্গারসোলের মতবাদের, কারণ; ইঙ্গারসোল স্বয়ং ঐ সময়ে নিউ ইয়র্কে অনুপস্থিত ছিলেন। মহামান্য কার্ডিনালের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজে ভোজসভায় যোগদান করতে কিংবা অন্য কাউকে প্রতিনিধি হয়ে আসতে দিতে অস্বীকার করলেন। যেহেতু আমি ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলাম এবং জেসুইট যাজক, উইলিয়াম ও ব্রায়েন পার্দো, এস. জে. কর্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলাম, সেহেতু ঐ ভোজসভায় আমার আতিথ্যলাভের সুযোগ ঘটল। ডাঃ গার্নসি আমার চিকিৎসক ছিলেন, তিনি আমাকে ক্যাথলিক মতের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। ডঃ পার্কহার্স্ট এসেছিলেন এবং আমেরিকার বিখ্যাত অভিনেত্রী মিনি ম্যাডার্ন ফিস্কে যিনি তখন গার্নসিদের সঙ্গে অতিথি হয়ে বাস করছিলেন তিনিও ছিলেন। আমার স্মরণে আছে যে খাবারের টেবিলে মোট চোদ্দজন উপস্থিত ছিলেন।

গোড়ায় সকলের মধ্যে একটি মৌন চুক্তি হয়েছিল যে, ঐ স্বামীর সঙ্গে ধর্মীয় মত-পার্থক্য প্রসঙ্গে এবং তাঁর অখ্রীস্টীয় (পৌত্তলিক কথাটি অত্যন্ত কড়া শোনাবে) দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি খুবই শিষ্টতা দেখানো হবে। হায়! যেই ভোজসভার কাজ এগিয়ে চলল উষ্ণ বিতর্ক স্বামীর সঙ্গে বাধল না, বাধল যিশুর বাণী প্রচারক ভ্রাতৃবৃন্দের নিজেদের মধ্যেই।

আমি স্বামীর পাশে বসেছিলাম। আমাদের নিজেদের সম্প্রদায়গুলির মধ্যে হাস্যকর অসহিষ্ণুতা দেখে আমরা হাসি চেপে নীরবতা অবলম্বন করেছিলাম। মাঝে মাঝে আমাদের আপ্যায়নকর্তা দক্ষতার সঙ্গে বিজ্ঞ বা হাস্যরসপূর্ণ মন্তব্য করছিলেন যাতে গরম হয়ে ওঠা আলাপ-আলোচনা সত্যিই হজমের পক্ষে ক্ষতিকারক না হয়ে ওঠে। স্বামী মাঝে মাঝে ছোটখাট ভাষণ দিচ্ছিলেন তাঁর দেশ বা দেশের জনজীবনের প্রথাসমূহ যা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ অন্যরকম সে সকল বিষয়ে এবং সে সকলের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যখনই তিনি তাঁর ধর্ম বা দর্শন সম্পর্কে বলছিলেন তখনই তাঁর জয় হচ্ছিল। আমেরিকায় বেদান্তকেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারতের কোথাও এঁর চেয়ে উদারমনা এবং সহিষ্ণু আর কাউকে পাওয়া সম্ভব ছিল না।

তিনি সেই অনুষ্ঠানে তাঁর সেই কমলা রঙের আলখাল্লা, লাল গোলাপ রঙের কোমরবন্ধনী আর সাদার মধ্যে সোনালীছটাযুক্ত পাগড়িতে সজ্জিত ছিলেন। তাঁর পদযুগল নরম বাদামী রঙের চামড়ার চটি ছাড়া অনাবৃত ছিল।

এই ভোজসভাতেই আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সূত্রপাত। পরে বসার ঘরে এসে তিনি আমাকে বললেন, "কুমারী গিবনস্, তোমার ও আমার দর্শনচিন্তা এক এবং আমাদের উভয়ের বিশ্বাসের মূল কথাও অভিন্ন।"[২২]

ডঃ চার্লস এইচ. পার্কহার্স্ট, ভোজসভায় এসেছিলেন, তখনকার দিনের খ্রীস্ট ধর্মযাজকদের মধ্যে ইনি সব চেয়ে খ্যাতিমানদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি কেতাদুরস্ত ম্যাডিসন স্কোয়ারের প্রেসবিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের গির্জার ভারপ্রাপ্ত যাজক ছিলেন এবং তখনকার আরও অন্যান্য ধর্মযাজকের মতোই তিনিও সমকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে কথা বলতে ভালবাসতেন, কিন্তু অন্যদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য ছিল এইখানে যে, তিনি শুধু উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হতেন না, তদানীন্তন নিউ ইয়র্ক শহরেব রাজনীতিতে তিনি এক প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। ১৮৯২-এর ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখে এক বিখ্যাত ধর্মোপদেশমূলক ভাষণে তিনি তাঁর গির্জার মঞ্চ হতে মেয়রকে, জেলা অ্যাটর্নিকে এবং পুলিসকে প্রকাশ্যে নিন্দা করেছিলেন। তিনি এই বক্তৃতায় ঘোষণা করেন—"এঁরা সকলেই সবসময় সরকারি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অপরাধমূলক কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে আমাদের নাগরিক জীবনকে ক্লেদাক্ত করে তুলেছেন, নিউ ইয়র্ক শহরকে তাঁরা কবে তুলেছেন নষ্টামি, অমিতাচার এবং জঘন্য কাজকর্ম বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল স্থল।"[২৩] এই অভিযোগগুলি, যা ভিত্তিহীন ছিল না, একটি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল এবং পার্কহার্স্টের ওপর এগুলি প্রমাণ করার দায় এসে পড়েছিল। সুতরাং যা একজন মর্যাদাসম্পন্ন ধর্মযাজকের পক্ষে অত্যন্ত শক্ত কাজ ছিল—একজন দুর্বৃত্তের ছদ্মবেশ ধারণ করা—তিনি তাই ধারণ করে তিন সপ্তাহ ধরে নিউ ইয়র্ক শহরের পাপাচারীদের আস্তানাগুলিতে ঘুরে বেড়ান। এভাবে প্রত্যক্ষদ্রষ্টা হিসাবে যে সাক্ষ্যসমূহ তিনি সংগ্রহ করেন তা দ্বিতীয়বার চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এবং পরিণামে মেয়র টেমানী হল ১৮৯৪-এর নির্বাচনে পরাজিত হন, তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এমন একজন মেয়র যিনি ছিলেন সংশোধনবাদী।

যদিও ডঃ গার্নসির ভোজসভায় স্বামীজী ও ডঃ পার্কহার্স্ট দুজনে দুজনকে কিভাবে মানিয়ে নিয়েছিলেন তার কোন লিখিত বিবরণ নেই, মনে হয় তাঁরা পরস্পরের সাহচর্য উপভোগ করেছিলেন, কেননা ধর্মযাজকটি ছিলেন নম্র, পণ্ডিত এবং সাহসী। মোটের ওপর উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন বিচিত্র

চরিত্রের এবং অগ্নিকাণ্ড ঘটাবার মতো—এ মতের অংশীদার ছিলেন কুমারী গিবনসের মাতাও। কনস্টান্স টাউন তাঁর স্মৃতিচারণায় আরও বলেছেন ঃ

আমি তখন আমার মায়ের সঙ্গে কেন্দ্রীয় নগর উদ্যানের মুখোমুখি ১নং ইস্ট এইট্টিফার্স্ট স্ট্রীটের বেরেসফোর্ড ভবনে থাকতাম। আমার মা দক্ষিণ দেশীয়া ছিলেন, তাঁর মধ্যে ফরাসী রাজরক্ত ছিল এবং তিনি দক্ষিণ ক্যারোলিনার চালর্সটনের অধিবাসিনী, তাঁর কালো চোখ ও চুলের জন্য তিনি প্রখ্যাতা সুন্দরী ছিলেন। তিনি খুব হাস্যরসিক ছিলেন এবং চার্চ অব ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সামাজিক আমোদপ্রমোদে যোগদান করে খুব আনন্দ লাভ করতেন। সেখানে তিনিই অভিজাত শ্রেণীর সব কিছু আভিজাত্য রক্ষা করতেন। আমি এবং স্বামী ঐ পরিধির বহির্ভূত ছিলাম। গার্নসিদের ভোজসভা থেকে ফিরে আমি আমার মাকে তাঁর সম্পর্কে বললাম যে, তিনি এক আশ্চর্য মনেব অধিকারি। আমাদের মধ্যে যে একটা বিবাট শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে তাও বললাম। উত্তরে তিনি বললেন—"কি ভয়ঙ্কর ভোজসভা! ঐ সকল মেথডিস্ট, ব্যাপটিস্ট, প্রেসবিটেরিয়ানদের মধ্যে আবার একজন কমলাবর্ণের পোশাক পরিহিত কালো অখ্রীস্টান! কিন্তু তিনি ক্রমে বিবেকানন্দকে পছন্দ করতে লাগলেন এবং তাঁর মতকে শ্রদ্ধা করতে আরম্ভ করলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি একটি বেদান্ত-কেন্দ্রে যোগদান করেন। তাঁর নিকট আমার মা ছিলেন খুব চিত্তবিনোদনকারী এবং এত বছর পবেও আমি মানসচক্ষে দেখি তাঁর সম্পর্কে মায়ের মন্তব্যগুলি শুনে তিনি প্রফুল্লভাবে হাসছেন।"[২৪]

শ্রীমতী টাউনের স্মৃতিচারণা উদ্ধৃত করতে করতে আমরা সম্ভবত ১৮৯৪-এর বসন্তকালের পরে ঘটেছিল এমন একটি ঘটনা এখানে টেনে আনতে পারি, কারণ যে নিউ ইয়র্কে অসাধারণ ঘটনাই সাধারণ, সেখানে স্বামীজী যে কি পরিমাণ উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিলেন তার দৃষ্টান্ত বহন করছে এই ঘটনাটি। শ্রীমতী টাউন লিখছেন ঃ

কোন এক সোমবারের বাতে 'ফস্ট' নাটকের তারকা-সম্বলিত অভিনয় হচ্ছিল মেট্রোপ'লটন অপেরা গৃহে, সেখানে সমাজের শীর্ষ স্থানীয় মহিলাবৃন্দ নানাবিধ মণিমুক্তার অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে বিশেষ আসনগুলিতে বসেছিলেন। তাঁবা গল্প করছিলেন, পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করছিলেন, দেরি করে প্রবেশ করছিলেন যাতে সকলে তাঁদের দেখতে পায় এবং অপেরা

শোনা ছাড়া আর সব কিছুই করছিলেন। সেখানে পূর্ণযৌবনা মেলবা, দ্য রেজকস এবং বয়রমেয়িস্টার ছিলেন।[+] এর আগে ঐ স্বামী কখনও অপেরা শুনতে যাননি এবং আমাদের দাতাদের জন্য নির্দিষ্ট আসনগুলি ছিল ঐকতান বাদকদের আসনের নিকটে, বিশেষভাবে লক্ষ্যে পড়ে এমন একটি স্থানে। আমিই ঐ স্বামীকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবাব প্রস্তাব দিয়েছিলাম। মা তাঁকে বললেন—"কিন্তু আপনি যে কৃষ্ণবর্ণ, লোকে কি বলবে?" এ কথায় তিনি হেসে উঠে বললেন—"আমি আমার বোনের পাশে বসব, সে কিছু মনে করবে না আমি জানি।"

সেদিন তাঁকে যত সুন্দর দেখাচ্ছিল, তেমনটি বোধ হয় আর কোনদিনই দেখায় নি। আমাদের আশেপাশে সকলে তাঁকে দেখে এত মুগ্ধ হয়েছিল যে আমি নিশ্চিত জানি, তারা সে রাত্রে অপেরা শোনেনি।

আমি বিবেকানন্দকে 'ফস্ট'-এর কাহিনীটি ব্যাখ্যা করে বোঝাবার প্রয়াস করেছিলাম। মা আমার কথাগুলি শুনতে পেয়ে বললেন—"কি করছ তুমি? একজন তরুণী হয়ে তোমার এই ভয়ঙ্কর গল্পটি কোন পুরুষের নিকট বলা উচিত নয়।"

স্বামী শুনে বললেন—"যদি গল্পটি ভালই না হয়, তাহলে মেয়েকে এখানে আসতে দিলেন কেন?"

মা উত্তর দিলেন—"বেশ কথা, অপেরাতে যাওয়া একটা কাজ। সব নাটকের গল্পই খারাপ হয়, কিন্তু কারও সে কাহিনীগুলি আলোচনা করার প্রয়োজন নেই।"

হায়! কি অসার মানুষগুলি আর কি পরিমাণ তাদের বোকামি! পরে যখন অনুষ্ঠানটি চলছে স্বামী বললেন—"বোন, গায়ক ভদ্রলোকটি যে সুন্দরী মেয়েটির প্রতি প্রেম নিবেদন করছে, সে কি সত্যিই তার প্রেমে পড়েছে?"

"ও, হ্যাঁ স্বামী"

"কিন্তু ও মেয়েটির প্রতি অন্যায় করেছে এবং তার জন্যই মেয়েটি দুঃখ পেয়েছে?"

আমি বিনয়নম্রভাবে বললাম—"হ্যাঁ"।

স্বামী বললেন—"ও, এখন আমি দেখছি যে ও ঐ সুন্দরী মেয়েটির প্রেমে পড়েনি, পড়েছে ঐ লাল পোশাক পরিহিত লেজওয়ালা ভদ্রলোকটির—অর্থাৎ শয়তানের।" এইভাবে সেই শুদ্ধ মন ন্যায়বিচারের

মানদণ্ডে ওজন করে দেখেছিল যে নাটকটি এবং তার শ্রোতাগণের মধ্যে সারবস্তু কিছু ছিল না।

উচ্চবিত্ত সমাজের চোখের মণি একটি অতি অল্পবয়সী মেয়ে নাটকের দুটি অঙ্কের মাঝখানে বিরতির সময়ে মায়ের নিকট এসে বলল—"আমার মা ঐ হলদে রঙের আলখাল্লা পরা মহিমান্বিত ব্যক্তিটিকে জানতে ভয়ানক কৌতূহলী হয়েছেন।"[২৫]

যদিও ১৮৯০-এর দশকে দু চাকার গাড়ি, তারের গাড়ি, ঘোড়ার গাড়িরই ভিড় দেখা যেত নিউ ইয়র্ক শহরে, মোটর গাড়ি, বাস অথবা ট্যাক্সির নয় এবং যদিও তখন সর্বোচ্চ আকাশছোঁয়া বাড়িটি বিশতলার চেয়ে বেশি উঁচু ছিল না, তবুও পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের প্রধান শহররূপে রূপ নিয়েছিল এই শহরটি ইতঃপূর্বেই, রূপ নিয়েছিল নতুন পৃথিবীর সভ্যতার প্রাণকেন্দ্ররূপে। সকল জাতির, সকল দেশের, সকল সম্প্রদায়ের মানুষের প্লাবন একে মানুষের হাসি আনন্দ, দুঃখ-কান্না এবং সংগ্রামের এমন একটি আধার করে তুলেছিল যে, একে পরিপূর্ণভাবে জানা হয়ে দাঁড়িয়েছিল খুবই মুশকিলের ব্যাপার। স্বামীজী স্পষ্টতই নিউ ইয়র্ক শহরকে খুব পছন্দ করতেন, এখানকার জনসাধারণের মধ্যে নতুন নতুন ধারণাকে স্বাগত জানানোর জন্য যে একটি উন্মুক্ত মনোভাব প্রকট ছিল এবং সেই সকল ধারণাকে কার্যে পরিণত করবার মতো যে একটি শক্তি নিহিত ছিল তা পছন্দ করতেন। কবি হ্যারিয়েট মনরো রচিত "একটি কবির জীবন" নামক আত্মজীবনীতে আমরা শহরের কেন্দ্রস্থলে ফিফ্‌থ অ্যাভিনিউ-এর অসমান প্রস্তর নির্মিত ফুটপাথ সংলগ্ন রাস্তায় লৌহচাকার ঘর্ঘর শব্দ এবং অশ্বক্ষুরধ্বনির মধ্যে স্বামীজীর এ সময়কার জীবনের একঝলক দর্শন পাই :

"পরবর্তী কালে [ধর্মমহাসভা উত্তরকালে] আমি তাঁকে ভাল করে জানবার সুযোগ পাই এবং বহু বছর পরেও আমি স্মরণ করব ফিফ্‌থ অ্যাভিনিউতে তাঁর সঙ্গে সেই সাক্ষাৎকার ও কথাবার্তার ঘটনাটি যখন তিনি ঊর্ধ্বে একটি আকাশচুম্বী বাড়ির শীর্ষদেশে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে এমন কিছু বলেছিলেন যা আমাকে অনুভব করিয়েছিল যে নবীন পৃথিবী তাঁর ঠিক ততখানি রোমাঞ্চকর মনে হয়েছিল যতখানি আমাদের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনসমূহকে মনে হয় এবং আমাদের নতুন সতেজ প্রাণশক্তির ওপর আস্থা স্থাপন করে আরও ঐক্যবদ্ধ এবং গৌরবময় পৃথিবীর আশা করেছিল তাঁর ভবিষ্যতের স্বপ্নে মগ্ন সেই দৃষ্টি।"[২৬]

সত্যসত্যই স্বামীজী যেখানেই মানুষের প্রাণশক্তি ও সৃজনশীলতার অভিব্যক্তি দেখেছেন, সেখানেই তিনি জগন্মাতার প্রাণশক্তি এবং সৃষ্টিশক্তির লীলা দর্শন করেছেন। যে-কোন ধরনের শক্তির প্রকাশ মানুষের অন্তরের গভীরে নিহিত আত্মশক্তির উৎসেরই উদ্ঘাটন। এ ব্যাপারে একটি আকাশচুম্বী বাড়ি নির্মাণের মধ্যে যে-শক্তির অভিব্যক্তি, তা যে ঐশী শক্তি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ঘটায়, তার থেকে পৃথক নয় বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর নিজের মধ্যেও যে শক্তি ও বল মূর্তি ধারণ করেছিল, তাও সেই একই শক্তি।

আরও অন্যান্য ব্যক্তিদের আত্মজীবনীতেও দেখা যায়, যারা তাঁকে কখনও না কখনও দেখেছেন, তারা অন্ততপক্ষে কয়েক লাইন স্মৃতিচারণাস্বরূপ লিখেছেন এবং তাঁরা যা লিখেছেন তার সবগুলি হতেই আমাদের নিকট স্পষ্ট এই বার্তা পৌঁছে যায় যে, তাঁর মধ্য হতে একটা শক্তির বিকিরণ ঘটত। যাঁরা তাঁকে একবাবমাত্র দেখেছেন তাঁরাও কখনও তাঁকে ভোলেননি। বিখ্যাত ভাস্কর ম্যালভিনা হফ্‌ম্যানের 'হেড্‌স এ্যান্ড টেল্‌স' গ্রন্থ হতে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলি উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

ভাবত আমার শিশুকালের কতকগুলি সুস্পষ্ট স্মৃতির একটিকে পুনর্বার জাগিয়ে দিল, আমার বাবার দিক থেকে একজন আত্মীয় ওয়েস্ট থার্টিএইট্‌থ স্ট্রীটে একটি সাদাসিধে পান্থনিবাসে থাকতেন, সেখানে উত্তেজনাময় একটি সন্ধ্যা কাটিয়েছিলাম সেকথা মনে পড়ে গেল। শহরের কয়েকজন পান্থশালা নিবাসী প্রাচীনপন্থী ব্যক্তির মধ্যে সহসা এনে ফেলা হয়েছিল একজন নবাগতকে—প্রাচ্য-দেশীয় দার্শনিক ও ধর্মাচার্য স্বামী বিবেকানন্দকে। তিনি যেই ভোজনকক্ষে প্রবেশ করলেন, অমনি একটি স্তব্ধতা নেমে এল সেখানে। তাঁর গাঢ় ব্রোঞ্জ রঙের মুখমণ্ডল ও হাতদুটি, তাঁর বিরাট ছোট ছোট ভাঁজে গড়া পাগড়ি এবং পরিচ্ছদের রঙের সঙ্গে একটি বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটিয়েছিল।

তাঁর গভীর আয়ত কালো চোখ দুটি আশপাশের লোকদের প্রায় লক্ষ্য করছিল না, কিন্তু তাঁকে ঘিরে একটি শান্তি ও শক্তির পরিমণ্ডল ছিল, যা আমার ওপর একটি অবিস্মরণীয় ছাপ ফেলেছিল। সকল ব্রহ্মোপাসক আচার্যদের মতোই তিনি যেন রহস্যময় ধর্মীয় দূরত্বকে মূর্ত করে তুলেছিলেন, তার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন সহযাত্রী সকল মানুষের প্রতি একটি করুণাপূর্ণ স্নিগ্ধকোমল এক সবল মনোভাব।

আমরা অনেক বছর পরে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা শহরের বাইরে

বেলুড়ে তাঁর হাজার হাজার অনুরাগী ভক্তবৃন্দ কর্তৃক নির্মিত মর্মর স্মৃতিসৌধটি দর্শন করেছিলাম। সেই সমাধিবেদীর ওপর যেই যুঁই ফুলের মালাটি নিবেদন করলাম, সঙ্গে সঙ্গে আবেগের সঙ্গে স্মরণে এল এই কথা যে—আমি যখন এই দিব্যাত্মা মানুষটিকে দর্শন করেছিলাম তখন একটিও কথা না বলে তিনি ভারতের যে মর্মকথা অনেক বেশি উদ্‌ঘাটিত করে দেখিয়েছিলেন, পরে তার চেয়ে বেশি ভারত সম্বন্ধে অনেক জেনে এবং ভারতীয়দের মুখে পরে অনেক বক্তৃতা শুনেও উপলব্ধি করিনি।[২৭]

এমনকি নাস্তিকরাও স্বামীজীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতেন, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁরা তাঁকে পছন্দ করতেন। এ বিষয়ে একটি মজার দৃষ্টান্ত আমরা অ্যালবার্ট স্পলডিংয়ের 'রাইজ টু ফলো' শীর্ষক আত্মজীবনীতে পাই। নিম্নলিখিত ঘটনাটি বীণাবাদকের শৈশবের সঙ্গে সম্পর্কিত, যখন তিনি সেন্ট্রাল পার্ক সাউথ এবং সেভেন্থ্ এ্যাভিনিউয়ের মধ্যে অবস্থিত একটি বড় বাড়ির এক অংশে বাস করতেন। যদিও ঘটনাটি হয়তো ১৮৯৪-এর আরও শেষের দিকে ঘটেছিল, তথাপি এটি এখানেই বলা যেতে পারে, কারণ ঘটনাটি স্বামীজীর যে একটি সর্বজনীন আকর্ষণ ছিল সে-বিষয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ ঃ

একবার একজন ভারতীয় স্বামী সান্ধ্যভোজে আমন্ত্রিত হয়ে এলেন। তিনি প্রখ্যাত বিবেকানন্দ ছাড়া আর কেউ নন। আমার মাসীমা স্যাঁলোর তাঁকে একজন মনোমুগ্ধকর ব্যক্তিত্ব বলে মনে হয়েছিল, যদিও তাঁর অনুরাগিবৃন্দ তাঁর মধ্যে যে উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিকতা দেখতে পেতেন, তা তিনি দেখতে পেতেন না। তাঁর উদ্দেশে অনুরাগীদের আকাশ পূর্ণ করা জয়গানের কড়া প্রত্যুত্তর দিতেন তিনি। যদি কেউ স্বামীজীর কঠোর তপস্বীসুলভ কৃচ্ছ্রতার জীবনের কথা উল্লেখ করতেন, তিনি কড়া উত্তরে বলতেন—"ঈশ্বর আমাদের করুণা করুন। কৃচ্ছ্রতার জীবনই বটে! আমি তোমাদের বলছি ঐ ব্যক্তির বিরাটকায় শরীরটি গাছের পাতা বা শেকড়বাকড় খেয়ে গড়ে ওঠেনি।"

"কিন্তু স্যাঁলী মাসী তুমি জান যে, তুমিও তাঁকে পছন্দ কর। তুমি যে তাঁকে পছন্দ কর তা তো তোমার আচরণেই স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছ।"

"নিশ্চয়ই আমি তাঁকে পছন্দ করি, আমি প্রচুর লোককে পছন্দ করি। কিন্তু আমি তাদের পছন্দ করি বলেই তারা যে ন্যাজারেথের যিশু আমি তা মনে করি না।" নিঃশ্বাস বন্ধ করে তিনি চাপা হাসিকে আটকে দিলেন পাছে পবিত্র আত্মার নিন্দা করা হয়।

সান্ধ্য আমোদপ্রমোদের আসর সবসময় সঙ্গীতমুখর হয়ে উঠত। স্বামীও রেহাই পেতেন না, যদিও আমার মায়ের বিবেকের দংশন ছিল, সান্ধ্য সঙ্গীতের আসর অতি দীর্ঘ হয়ে পড়ার পূর্বেই তিনি তাতে ছেদ ঘটিয়ে দিতেন। [২৮]

॥ ৪ ॥

এপ্রিলের ২৫ তারিখে এবং পুনরায় মে মাসের ৪ তারিখে স্বামীজী নিউ ইয়র্ক থেকে তাঁর বোস্টনের পরিচিত অন্তরঙ্গ বন্ধু অধ্যাপক জন হেনরী রাইটকে চিঠি লেখেন। নিম্নলিখিত পত্র দুটি অধ্যাপক রাইটের পুত্র শ্রীযুক্ত জন কে. রাইটের সদাশয়তায় আমাদের হস্তগত হয়েছে। এ-দুটি পত্র স্বামীজীর জীবনের এই সময়কার ভ্রমণসূচী কি ছিল তা নির্ণয় করতে বিশেষ সহায়তা করে। এ-দুটি হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ছিল ঃ

প্রিয় অধ্যাপকজী,

আপনার আমন্ত্রণের জন্য গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। ৭ই মে যাচ্ছি। বিছানা?—বন্ধু, আপনার ভালবাসা এবং মহৎ প্রাণ পাথরকেও পাখির পালকের মতো কোমল করতে পারে।

সালেমে লেখকদের প্রাতরাশে যোগ দিতে পারলাম না বলে দুঃখিত। ৭ই ফিরছি।

আপনার বিশ্বস্ত [২৯]
*বিবেকানন্দ**
৪ মে ১৮৯৪

প্রিয় অধ্যাপকজী,

আপনার সহৃদয় লিপি এখনই পেলাম। আপনার কথামত কাজ করে আমি যে খুবই সুখী হব তা বলাই বাহুল্য।

কর্ণেল হিগিনসনের চিঠিও পেয়েছি—তাঁকে উত্তর পাঠাচ্ছি।

আমি রবিবার (৬ মে)বোস্টনে যাব। মিসেস্ হাউ-এর উইমেন্‌স্ ক্লাবে সোমবার বক্তৃতা দেবার কথা।

আপনার সদা বিশ্বস্ত [৩০]
*বিবেকানন্দ***

---

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পত্র সংখ্যা ৮৮, পৃঃ ৩২৯
** ঐ, পত্র সংখ্যা ৯১ পৃঃ ৩৩২

কর্নেল টমাস ওয়েন্টওয়ার্থ হিগিনসনের সম্পর্কে আমরা আরও অনেক কথা পরে শুনব। ইনি ধর্মমহাসভায় একজন প্রতিনিধি হয়েছিলেন এবং ছিলেন সে যুগের একজন উদারমনা লেখক। তিনি ফ্রী রিলিজিয়াস অ্যাসোসিয়েশন (মুক্ত ধর্মচিন্তক সমিতি)-এর কাজকর্মে আগ্রহী ছিলেন। এই সমিতির মূল প্রেরণা যে ধারণাটি, তা ধর্মমহাসভায় পঠিত তাঁর প্রবন্ধেরও বিষয় ছিল—"বিভিন্ন ধর্মের পারস্পারিক সহানুভূতি।" এই প্রবন্ধটি বোস্টনে একটি প্রচণ্ড উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। আমরা পরে জানতে পারব যে স্বামীজী ম্যাসাচুসেট্সের অন্তর্গত প্লাইমাউথে ১৮৯৪-এর আগস্ট মাসে ফ্রী রিলিজিয়াস অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা অনুষ্ঠিত এক সভায় বক্তৃতা করতে আহূত হন।

উপরিউক্ত চিঠিটি থেকে পাঠকেরা এ সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছেন যে, স্বামীজী বোস্টনে এলেন মে মাসের ৬ তারিখ রবিবারে এবং শ্রীমতী হাউ-এর আমন্ত্রণে মে মাসের ৭ তাবিখ সোমবারে একটি মহিলা সমিতিতে ভাষণ দেন।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, এই শ্রীমতী হাউ হলেন সেই বিখ্যাত জুলিয়া ওয়ার্ড হাউ যিনি অনেক বছর আগে এক অগ্নিময় প্রেরণার মুহূর্তে 'ব্যাটল হিম্ অব দি রিপাব্লিক' লিখেছিলেন এবং যিনি অসংখ্য ন্যায্য আন্দোলনের সমর্থক হিসাবে খ্যাত ছিলেন, যথা—শান্তি-আন্দোলন, সর্বজনীন ভোটাধিকার, রাশিয়ার মুক্তি, মেয়েদের উচ্চ-শিক্ষা এবং এবম্বিধ আরও বহু আন্দোলনের সমর্থক হিসাবে খ্যাত ছিলেন। শ্রীমতী হাউ এবং কর্ণেল হিগিনসন উভয়েই ছিলেন নিউ ইংল্যাণ্ড সংস্কৃতির যে-স্বর্ণযুগ গৃহযুদ্ধের পূর্বে তার শিখরে পৌঁছেছিল, সেই সংস্কৃতির শেষ ধারক এমন কয়েকজন নরনারীদের মধ্যে অন্যতম। শতাব্দীর নব্বই দশকেই হারিয়ে যাওয়া অতীতের স্মৃতিসুখের জন্য আকুলতার যুগ এসে পড়েছিল। বোস্টনকে দেখে মনে হতো যে, সে একদিকে যেন অতীতের গৌরবময় দিনে প্রত্যাবর্তন করেছে, অপরদিকে মনে হতো এর পরে কি যে আসছে তা না জানতে পেরে সে আকুল দিশেহারা। বস্তুত এ সময়টা ছিল মূল্যবোধে দ্রুত পরিবর্তনের যুগ, যখন যা কিছু শক্তি-সমন্বিত, প্রাণবন্ত, আদর্শভিত্তিক, তা যেন শেষ হয়ে আসছিল, তার পরিবর্তে তেমন কিছু মূল্যবান বস্তু লাভ হচ্ছিল না। অবশ্য কয়েকজন দৃঢ়চেতা ব্যক্তি সেই পুরান সাহিত্যিক এবং পাণ্ডিত্যের ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছিলেন, তাঁরা সত্য সত্যই

'আমেরিকার এথেন্স'-এ যে বাণিজ্যিক মনোবৃত্তি এবং উপযোগিতাবাদের বিজয় অভিযান ক্রমবর্ধমান হয়ে চলেছিল সে বিষয় সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে বিরাজ করছিলেন। নিউ ইংল্যাণ্ডের সংস্কৃতির ইতিহাস প্রণেতা ভ্যান ওয়াইক ব্রুকস লিখেছেন—"এইসকল মহানুভব, সুযোগ্য এবং উদার-হৃদয় ব্যক্তিবর্গের নিকট সাধারণ বা নিম্নবর্গের বলে কিছু ছিল না, এঁরা সকলেই মানবপ্রকৃতিকে চিরজয়ী দেখতে চাইতেন। তাঁরা কালের লক্ষণগুলিকে উপেক্ষা করে সে সকলের ঊর্ধ্বে বাস করতেন, ঠিক যেমন এমার্সন সারাজীবন ধরে করেছেন।" [৩১] এইসকল মনুষ্যকুলে শ্রেষ্ঠ নরনারীদের অন্যতমা শ্রীমতী হাউ-এর ১৮৯৪তে বয়স ছিল পঁচাত্তর, ব্রুকস তাঁকে যেভাবে অঙ্কিত করেছেন, স্বামীজী তাঁকে ঠিক সেই রকমই দেখেছেন "হাবেভাবে বৃদ্ধা দিদিমার মতো শ্রীমতী হাউ যে কতরকম ন্যায়ের জন্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তার লেখাজোখা ছিল না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রতিদিন সকালে লেসের ওড়নায় সজ্জিত হয়ে সকলের সামনে উপস্থিত হতে তিনি কখনও ভুলতেন না। কোন সভার কোন উল্লেখযোগ্যতা থাকত না যদি না তিনি সেখানে ফুলের মতো হালকা রেশমের ওড়না এবং গোলাপী রেশমের পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে তাঁর 'রণ সঙ্গীত' কবিতাটি পাঠ করতেন। সুবিচার বা করুণা প্রদর্শনের আবেদন নিয়ে ন্যায়ালয়ে যাবার বেলায় তাঁর বার্ধক্য কোন বাধা ছিল না, এমন একটা দিনও নেই যেদিনটি কোন ন্যায্য অধিকার দাবির জন্য আন্দোলনের দিন নয়—এই ছিল তাঁর নিকট অনুসরণীয় সংক্ষিপ্ত নীতিবাক্য।... তিনি ছিলেন একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান—এ ব্যাপারে তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ডঃ [এডওয়ার্ড এভারেট] হেল।" [৩২]

স্বামীজী এবং এইসকল আদর্শবাদী, দৃঢ়চেতা, পুরাতনপন্থী বোস্টনবাসিগণ পরস্পরের সঙ্গে অতি সুন্দর মানিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁদের হৃদয়ে তখনও অতীন্দ্রিয়বাদের আদর্শ জীবন্ত ছিল, সম্ভবত সেজন্যই তরুণদের সাহচর্য অপেক্ষা এঁদের সাহচর্যে স্বামীজী অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছেন, কারণ তরুণদের সেই অন্তর্দৃষ্টি বা অন্তরের সেই প্রসারতা ছিল না, যা এঁদের ছিল। একটি নীরস পাণ্ডিত্যপূর্ণ বুদ্ধিবাদ (অন্তত কিছুদিনের জন্য) আমেরিকার অধিবাসীদের প্রতিভার যে বৈশিষ্ট্য—চিন্তার ঐশ্বর্য এবং গভীরতা—তার স্থান অধিকার করেছিল। জলধারার সরসতার উৎসগুলি এইরূপ শুষ্ক হয়ে যাওয়ায়, এই অনুর্বরতা দেখে স্বামীজীকে বলে উঠতে হতো—"ওঃ এরা এত নীরস।" [৩৩]

স্বামীজী শ্রীমতী হাউ-এর মহিলা সমিতিতে (নিঃসন্দেহে এটি হলো

নিউ ইংল্যাণ্ড ওম্যান্স ক্লাব, যার সভানেত্রী ছিলেন জুলিয়া ওয়ার্ড হাউ) ভাষণ দেবার ঠিক পরের দিনটিতে ভাষণ দেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত 'হার্ভার্ড অ্যানেক্স' নামে খ্যাত মহিলাদের জন্য তদানীন্তনকালে প্রতিষ্ঠিত একটি মহাবিদ্যালয়ে। স্বামীজীর আমেরিকায় এই কালের জীবন সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে ইতঃপূর্বে আমরা জন হেনরী রাইট-এর চিঠি ও কাগজপত্র হতে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়েছি। এখন আমরা তাঁর পরিচালিত একটি পত্রিকার মাধ্যমে স্বামীজীর কার্যকলাপ সম্বন্ধে এমন কিছু জানতে পারব যা আগে জানা যায়নি এবং তাঁর ব্যক্তিত্বেব সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের ওপর তাঁর প্রভাব কি সুগভীরভাবে পড়েছিল তা অনুভব করতে পারব। শ্রীমতী রাইট-এর পুত্র শ্রীযুক্ত জন কে. রাইট কর্তৃক দেওয়া কাগজপত্রের মধ্যে থেকে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলি নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে দেখা যায় যে তাঁর পত্রিকা অনেকাংশেই 'কার্টল্যাণ্ডস' নামক একটি কল্পিত পরিবারের প্রতিদিনের জীবনের বর্ণনায় ভরা।

মে ৭, ১৮৯৪

শ্রীযুক্ত কার্টল্যান্ড [ডঃ রাইট] একজন প্রাচ্যদেশীয় ব্যক্তি—স্বামী বিবেকানন্দকে পরবর্তী সপ্তাহটি তাঁর সঙ্গে কাটাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন; কিন্তু স্বামীজী বোস্টনের একটি হোটেলে থাকাই স্থির করলেন। এতে অবশ্য শ্রীমতী কার্টল্যান্ড-এর একটু স্বস্তি হলো, যদিও তিনি প্রাচ্যদেশবাসীটিকে পছন্দ করতেন, কিন্তু অতি নিকটে সর্বক্ষণ একজন পৌত্তলিক দেবতাকে নিয়ে মালপত্র বাঁধাছাঁদার কাজটি তিনি ঠিক নিয়ন্ত্রণ করে উঠতে পারবেন না, তাঁর সেরকম ভয়ই হয়েছিল। এর পূর্ববর্তী গ্রীষ্মকালে ইনি তাঁদের সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়েছেন।+

শনিবার, ১২ মে, ১৮৯৪

মঙ্গলবার [৮ মে] বিবেকানন্দ অ্যানেক্স-এ তাঁর নিজ ধর্ম সম্বন্ধে ভাষণ দিলেন। এটি অত্যন্ত কবিত্বপূর্ণ, ভক্তিরসে পূর্ণ এবং সেইরকম গভীর আবেগের সঙ্গে বলা হয়েছিল, যা তৎক্ষণাৎ ধর্মান্তর ঘটায়। কোন কোন মহিলার অকিঞ্চিৎকর মুখমণ্ডল স্থির মনোযোগের জন্য কঠিন হয়ে গিয়েছিল এবং মনে হচ্ছিল তাঁরা যেন প্রতিটি স্নায়ুতন্তুকে তাঁর বক্তব্য অনুসরণ করবার জন্য অতিরিক্ত চাপ দিচ্ছেন, কিন্তু যখন তিনি আমাদের দোষত্রুটিগুলি বলতে আরম্ভ করলেন এবং আমাদের ভ্রান্তি ও দোষত্রুটিগুলি দেখিয়ে দিতে লাগলেন, তখন তিনি অনেকটা নিচু স্তরে নেমে এলেন এবং তখন তাঁরা সেই উত্যক্ত হাসি হাসতে লাগলেন, যার জন্ম হয় ব্যঙ্গাত্মক তীব্র মন্তব্যের হুল ফুটলে।

তিনি বললেন—ভারতের উচ্চবর্ণের বিধবারা পুনর্বিবাহ করে না, নিম্নবর্ণের বিধবারা বিবাহ করতে পারে, পান-ভোজন, নৃত্য—সবই করতে পারে। যতজন খুশি স্বামী গ্রহণ করতে পারে, তাদের সকলের সঙ্গেই বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারে, সংক্ষেপে আমাদের উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা যা কিছু সুবিধা ভোগ করে থাকে সে সকলই তারা ভোগ করতে পারে। শুনে আমরা সকলেই হাসলাম।...

বৃহস্পতিবার [১০ মে] বিবেকানন্দ বোস্টনে শ্রীযুক্ত কলিজের আবাসে গোল টেবিলের বৈঠকে বক্তৃতা দিলেন। তিনি আমেরিকাবাসীদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে আমোদ অনুভব করতে লাগলেন। খুব সরসতাপূর্ণ, আবার তিক্ত, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবিদ্রূপ, যা তাঁদেব প্রাপ্য ছিল তা খুব পরিচ্ছন্নভাবে করা হলো, সব ঠিক ঠিক লক্ষ্যে নিক্ষিপ্ত হলো, কিন্তু মানুষটিব মধ্যে আরও উচ্চতব কিছু দেবার মতো বস্তু ছিল। তাঁকে হলুদ রঙেব পাগড়ি এবং হলুদ মিশ্রিত লাল রঙের আলখাল্লায় ছবির মতো সুন্দর দেখাচ্ছিল এবং তিনি অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে ভাষণটি দিলেন। এ দেশকে তিরস্কার করলেন ধনিক সম্প্রদায় দ্বারা শাসিত হবার জন্যে, এদের অ-নৈতিকতার জন্যে, ধর্মের অভাবের জন্যে।

তিনি বললেন—"আমরা যখন ধর্মোন্মত্ত হই, তখন আমরা নিজেদের ওপর অত্যাচার করি, বিশাল গাড়ীর চাকার তলায় নিজেকে নিক্ষেপ করি, নিজের গলা কাটি, আমরা সুতীক্ষ্ণ শলাকার শয্যায় নিজেরা শয়ন করি; কিন্তু তোমরা যখন ধর্মোন্মাদ হও তখন তোমরা অন্যের গলা কাটো, অন্যের অঙ্গে অগ্নি নিক্ষেপ করে অত্যাচার কর এবং অন্যকে তীক্ষ্ণ শলাকার শয্যায় শয়ন করাও। তোমরা সযত্নে নিজের চামড়া বাঁচিয়ে চল।"[৩৪]

এ কথা সুস্পষ্ট যে শ্রীমতী রাইট স্বামীজীকে খুব সম্মান দিতেন এবং তাঁর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন ও তাঁর মধ্যে একজন বিরাট মাপের মানুষকে আবিষ্কার করেছিলেন, কিন্তু এও স্পষ্ট পরিস্ফুট যে, স্বামীজী তাঁর যে দিকটায় কিছুতেই ডাহা মিথ্যার সঙ্গে মিষ্ট ব্যবহার ও আপস করতে অপারগ ছিলেন, শ্রীমতী রাইটের মনে তাঁর সেদিকটা বিতৃষ্ণার উদ্রেক করত।[৩৫] ভয়ঙ্কর ঝড়ো বাতাস যেমন সব জঞ্জাল উড়িয়ে পরিষ্কার করে দেয়, ঠিক তেমনি স্বামীজী যা মৃত, যা মানুষের জীবন-অরণ্যের বিস্তারের পথে বাধাস্বরূপ সে সকলই সমূলে উৎপাটিত করে ছিন্নভিন্ন করে দিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নতুন উপযুক্ত প্রাণবন্ত বীজসমূহ ছড়িয়ে দিতেন।

তিনি লোকেদের তাদের অপ্রীতিকর দোষত্রুটিগুলি দেখিয়ে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করবার পক্ষে যথেষ্ট সমর্থ ছিলেন, কারণ তিনি সঙ্গে সঙ্গে আরও গভীরতর সত্যের উদ্ঘাটন না করে তা কখনও করতেন না। তাঁর হৃদয় এত করুণাপূর্ণ ছিল, মানুষের মঙ্গল সাধন করবার মতো এত ক্ষমতা তাঁর ছিল যে, যখন তিনি তাঁর 'সরস, তিক্ত, তীক্ষ্ণ হুলটি ফোটাতেন' তখন কদাচিৎ কেউ কোন মন্তব্য করত। তাঁর এই দিকটির চিত্রায়নের জন্য আমরা প্রধানত শ্রীমতী রাইট-এর নিকট ঋণী—স্বামীজী বক্তৃতা দিচ্ছেন কতকগুলি সারি সারি অকিঞ্চিৎকর মুখমণ্ডলের মধ্যে, তাদের অন্তস্তল উদ্ঘাটিত করে বাইরে এনে তাদের সমগ্র চিন্তার মধ্যে এবং জীবনেব মধ্যে যে-সকল অসঙ্গতি ও স্ববিরোধিতা বর্তমান, তিনি তা দেখিয়ে দিলেন।

তাঁর এই যে কার্যপদ্ধতিটি এটি অবশ্য সকলকে আনন্দ দিত না। তাঁর জীবনীতে বলা হয়েছে বোস্টনে একবার স্বামীজী 'মদীয় আচার্যদেব' সম্বন্ধে ভাষণ দেবার সময় বিরাট জনসমাগম হয়েছিল। তারপরের অনুচ্ছেদটিতে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলা হয়েছে—"দীপ্ত হুতাশনের মতো বৈরাগ্যের জ্বলন্ত বিগ্রহ স্বামীজী যখন দেখলেন সম্মুখে উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে অধিকাংশ নরনারীই মানসিকতায় ঘোর ঐহিক, তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার প্রতি অনুরাগ ও ঐকান্তিকতার নিতান্তই অভাব, তিনি বুঝলেন যে, এদের সামনে রামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর যে প্রকৃত ভক্তিভাব এবং তিনি রামকৃষ্ণকে যেভাবে বুঝেছেন তা বলা হবে সেই পবিত্রতম সত্তার অপমান করা। সুতরাং তিনি সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে অন্তর্নিহিত স্থূল, দেহবাদী এবং জড়বাদী ধারণাসমূহকে কঠোর নিন্দাসূচক সমালোচনা শুরু করলেন। ফল হলো শত শত লোক আকস্মিকভাবে সভাগৃহ ছেড়ে চলে গেল, কিন্তু তিনি তাতে বিচলিত না হয়ে নিজের বক্তব্য অবিচলিতভাবে শেষ পর্যন্ত বলে গেলেন। পরদিন সকালে সংবাদপত্রগুলিতে বিভিন্ন ধরনের সমালোচনা প্রকাশ পেল। তার কতকগুলি ছিল তাঁর সমর্থনসূচক, আবার কতকগুলি তিনি যা বলেছেন সেগুলির বিশ্লেষণসহ তীব্র নিন্দাসূচক। কিন্তু প্রত্যেকটিতেই তাঁর নির্ভীকতা, আন্তরিকতা এবং স্পষ্টবাদিতার উল্লেখ করা হয়েছিল।" [৩৬]

এ পর্যন্ত অনুসন্ধান করে বোস্টনের সংবাদপত্রগুলিতে ওখানকার শ্রোতৃবৃন্দকে বক্তৃতার মাধ্যমে বেত্রাঘাত করা হয়েছে এমন কোন প্রতিবেদন খুঁজে পাওয়া যায় নি। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, এই বক্তৃতাটি আমরা যে সময়কার বলে উল্লেখ করছি সে সময়কার নয়, কারণ স্বামীজী কর্তৃক

মে মাসের ১ তারিখে ইসাবেল ম্যাককিণ্ডলিকে লেখা চিঠি অনুসারে হার্ভার্ড ও বোস্টনে মিলিয়ে মে মাসের প্রথম ভাগে তাঁর সবশুদ্ধ ছটি বক্তৃতা দেবার কথা। তার সবকটা তো পূর্বে দেওয়া হয়েছে বলে হিসাব পাওয়া গেছে। এর কোনটাই বিশাল জনসভায় বা "মদীয় আচার্যদেব" সম্বন্ধে দেওয়া হয়নি।

আমরা দেখেছি তাঁর প্রথম বক্তৃতাটি মে মাসের ৭ তারিখে শ্রীমতী হাউ-এর মহিলা সমিতিতে দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়টি ৮ তারিখে র‍্যাডক্লিফ মহাবিদ্যালয়ে, তৃতীয়টি মে মাসের ১০ তারিখে বোস্টনে 'শ্রীযুক্ত কলিজ-এ গোল টেবিল'-এ দেওয়া হয়। যদিও ৫ এপ্রিল তারিখে 'বোস্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্ট' পত্রিকা স্বামীজীর আগমনবার্তা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে পরিবেশন করেছিল, কিন্তু বোস্টনের অন্যান্য পত্রিকাগুলির মতো এটিও স্বামীজীর প্রথম তিনটি ভাষণের প্রতিবেদন প্রকাশ করতে শৈথিল্য দেখিয়েছিল। অবশ্য মে মাসের ১২ তারিখে 'ট্রান্সক্রিপ্ট' পত্রিকা নিম্নলিখিত ঘোষণাগুলি প্রকাশ করে ঃ

বক্তৃতার বিজ্ঞপ্তি

শ্রীযুক্ত সুয়ামী বিবে কানন্দ 'ভারতের আচার-ব্যবহার ও প্রথাসমূহ' সম্বন্ধে পরবর্তী সোমবার অপরাহ্নে [১৪ মে] টাইলার স্ট্রীটের দিবা বিভাগের শিশু শিক্ষালযের সাহায্যার্থে অ্যাসোসিয়েশান সভাভবনে একটি ভাষণ দেবেন।

শ্রীযুক্ত সুয়ামী বিবে কানন্দ "ভারতের ধর্মসমূহ" সম্বন্ধে পরবর্তী বুধবার [১৬ মে] অপরাহ্নে ১৬নং ওয়ার্ডে অবস্থিত দিবা বিভাগের শিশু শিক্ষালয়ের সাহায্যার্থে সভা ভবনে ভাষণ দেবেন। যে-সকল বিষয় তিনি ব্যাখ্যা করবেন তার মধ্যে থাকবে প্রতিমা উপাসনা এবং পৌত্তলিকতার মধ্যে প্রভেদ, ইষ্টদেবতা সম্বন্ধে বিবিধ ভারতীয় ধারণা এবং প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকদের উপদেশসমূহ।

স্বামীজীর ১৪ মে তারিখের ভাষণ যা স্থানীয় একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্যার্থে প্রদত্ত হয়, "বোস্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্ট" এবং "বোস্টন হেরাল্ড" এই উভয় পত্রিকায় ১৫ মে তারিখে কিছু মন্তব্যসহ প্রকাশিত হয়। দুটি কাগজের প্রতিবেদন এতই এক যে, কেবলমাত্র হেরাল্ড পত্রিকাটির এখানে উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। এটি নিম্নলিখিতরূপ ঃ

ভারতের ধর্ম

ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ প্রদত্ত বর্ণনা

গতকল্য ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের 'ভারতীয় ধর্ম' (বস্তুত ভারতীয় আচার-ব্যবহার) সম্বন্ধে বক্তৃতা শোনবার জন্য অ্যাসোসিয়েশন হলে মহিলাদের খুব ভিড় হয়। ১৬নং ওয়ার্ডের ডে নার্সারী বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে এই বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল। (বস্তুত টাইলার স্ট্রীট ডে নার্সারী বিদ্যালয়)। এই ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী গত বৎসর শিকাগোতে যেমন সকলের মনোযোগ ও উৎসাহ আকর্ষণ করেছিলেন, এবার বোস্টনে অনুরূপ ঘটেছে। তাঁর আন্তরিক সাধু মার্জিত চাল-চলন দ্বারা তিনি বহু অনুরাগী বন্ধু লাভ করেছেন।

বক্তা বলেন : হিন্দুজাতির ভেতর বিবাহকে খুব বড় করে দেখা হয় না। কারণ এই নয় যে, আমরা স্ত্রীজাতিকে ঘৃণা করি। আমাদের ধর্ম নারীকে মাতৃবুদ্ধিতে পুজো করার উপদেশ দেয় বলেই এরূপ ঘটেছে। প্রত্যেক নারী হলেন নিজের মায়ের মতো—এই শিক্ষা হিন্দুরা বাল্যকাল থেকে পায়। কেউ তো আর জননীকে বিবাহ করতে চায় না। আমরা ঈশ্বরকে মা বলে ভাবি। স্বর্গবাসী ঈশ্বরের আমরা আদৌ পরোয়া করি না। বিবাহকে আমরা একটি নিম্নতর স্থূল অবস্থা বলে মনে করি। যদি কেউ বিবাহ করে তবে ধর্মপথে তার একজন সহায়ক সঙ্গীর প্রয়োজন বলেই করে।

তোমরা বলে থাকো যে আমরা হিন্দুরা আমাদের নারীদের প্রতি মন্দ ব্যবহার করি। পৃথিবীর কোন্ জাতি স্ত্রী জাতিকে পীড়া দেয়নি? ইউরোপ বা আমেরিকায় কোন ব্যক্তি অর্থের লোভে কোন মহিলার পাণি-গ্রহণ করতে পারে এবং বিবাহের পর তার অর্থ আত্মসাৎ করে তাকে পরিত্যাগ করতে পারে। পক্ষান্তরে ভারতে কোন স্ত্রীলোক যদি ধনলোভে বিবাহ করেন, তা হলে তাঁর সন্তানদের ক্রীতদাস বলে মনে করা হয়। বিত্তবান পুরুষ বিবাহ করলে তাঁর অর্থ তাঁর পত্নীর হাতেই যায় এবং সেজন্য টাকাকড়ির ভার যিনি নিয়েছেন, সেই পত্নীকে পরিত্যাগ করার সম্ভাবনা খুব কম থাকে।

তোমরা আমাদিগকে পৌত্তলিক, অশিক্ষিত, অসভ্য প্রভৃতি বলে থাকো, আমরা শুনে এরূপ কটুভাষী তোমাদের ভদ্রতার অভাব দেখে মনে মনে হাসি। আমাদের দৃষ্টিতে সদ্‌গুণ এবং সৎকুলে জন্মই জাতি নির্ধারণ করে,

টাকা নয়। ভারতে টাকা দিয়ে সম্মান কেনা যায় না। জাতি প্রথায় উচ্চতা অর্থদ্বারা নিরূপিত হয় না। জাতির দিক দিয়ে অতি দারিদ্র এবং অত্যন্ত ধনীর একই মর্যাদা। জাতিপ্রথার এ একটা চমৎকার দিক।

বিত্তের জন্য পৃথিবীতে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটেছে। খ্রীস্টানরা পরস্পর পরস্পরকে মাটিতে ফেলে পদদলিত করেছে। ধনলিপ্সা থেকেই জন্মায় হিংসা, ঘৃণা, লোভ এবং চলে প্রচণ্ড কর্মোন্মত্ততা, ছোটাছুটি, কলরব। জাতিপ্রথা মানুষকে এ সকল থেকে নিষ্কৃতি দেয়। তা তাকে অল্প টাকায় জীবন যাপন করতে সক্ষম করে এবং সকলকেই কাজ দেয়। জাতিপ্রথায় মানুষ আত্মার চিন্তা করবার অবসর পায়। আর ভারতীয় সমাজে এটাই তো আমরা চাই।

ব্রাহ্মণের জন্ম দেবার্চনার জন্য। জাতি যত উচ্চ, সামাজিক বিধি নিষেধও তত বেশি। জাতিপ্রথা আমাদেরকে হিন্দুজাতিরূপে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই প্রথায় অনেক ক্রটি থাকলেও বহু সুবিধা আছে।

মিঃ বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহের বর্ণনা করেন। তিনি বিশেষ করে বারাণসীর (?) প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়টির উল্লেখ করেন। ওটির ছাত্র ও অধ্যাপকদের মোট সংখ্যা ছিল ২০,০০০।

বক্তা আরও বলেন, 'তোমরা যখন আমার ধর্ম সম্বন্ধে বিচার করতে বস, তখন ধরে নাও যে, তোমাদের ধর্মটি হলো নিখুঁত আর আমারটি ভুল। ভারতের সমাজের সমালোচনা করার সময়েও তোমরা মনে কর, যে পরিমাণ ওটি তোমাদের আদর্শের সঙ্গে মেলে না, সেই পরিমাণ ওটি অমার্জিত। এই দৃষ্টিভঙ্গী অর্থহীন।

*শিক্ষা সম্পর্কে বক্তা বলেন, ভারতে যারা অধিক শিক্ষিত, তাঁরা অধ্যাপনার কাজ করেন। অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিতেরা পুরোহিত হয়।**

যেখানে স্বামীজী অবস্থান করছেন, সেই বেলভিউ হোটেল বিকন স্ট্রীটস্থ স্টেট হাউসের নিকট অবস্থিত এবং কম ব্যয়সাপেক্ষ। এখান থেকে তিনি শ্রীমতী হেলকে দুখানি চিঠি লেখেন, তাতে তিনি পুত্রোচিত স্বাধীনতার সঙ্গে এবং ঘনিষ্ঠভাবে প্রতিদিনের জীবনের খুঁটিনাটি—সামান্যতম বিষয়টিও লেখেন। এর থেকে আমরা (অন্যথায় যা জানা যেত না) সে-সকল বিষয়

* বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ৮৪-৮৫

জানতে পারি। ১৮৯৪ সালের ১১ মে এবং ১৪ মে তারিখে লেখা এই দুখানি চিঠি পরপর নিচে তুলে ধরা হলো ঃ

বোস্টন, ১১ মে, ১৮৯৪

প্রিয় মা,

৭ তারিখ থেকে প্রতিদিন অপরাহ্ণ বা সন্ধ্যায় আমি এখানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছি। শ্রীমতী ফেয়ারচাইল্ডের বাড়িতে শ্রীমতী হাউ-এর ভাগনীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। সে এসেছিল আজ তার বাড়িতে নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানাতে। আমি এখনও শ্রীযুক্ত ভোলডিনেনের সাক্ষাৎ পাইনি। বক্তৃতা দিয়ে এখানে যে অর্থ পাওয়া যায় তা যৎসামান্য, আবার তার থেকে সকলেই কিছু কিছু কেটে নিতে চায়। আমি বাচ্চাদের কাছ থেকে তাদের শিশুসুলভ অর্থহীন কলকাকলীভরা একটা লম্বা চিঠি পেয়েছি। আপনার শহর অর্থাৎ নিউ ইয়র্ক বোস্টনের থেকে অনেক বেশি টাকাকড়ি দেয়, সেজন্য আমি সেখানে চলে যেতে চাইছি। কিন্তু এখানে প্রায় প্রতিদিনই কাজ পাওয়া যায়।

আমার মনে হচ্ছে আমার একটু বিশ্রাম প্রয়োজন। আমি অনুভব করছি যে, আমি বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আর অবিরাম এখান থেকে সেখানে ভ্রমণ আমার স্নায়ুতন্ত্রকে কিছুটা নাড়াচাড়া দিয়েছে তবে আশা করি শিগ্‌গিরই, নিরাময় লাভ করব। শেষের কদিন ঠাণ্ডা লেগে আমি সামান্য জ্বরে কষ্ট পাচ্ছি, তা সত্ত্বেও বক্তৃতা দিয়েছি, আশা করছি দু-এক দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠব।

আমি ৩০ ডলার দিয়ে একটি সুন্দর আলখাল্লা কিনেছি, রঙটা ঠিক পুরানটার মতো নয়, কিন্তু এতে লাল রঙের সঙ্গে হলুদের মিশ্রণটি একটু বেশি—কিন্তু নিউ ইয়র্কেও ঠিক ঠিক পুরানটার মতো রঙ পাওয়া গেল না।

খুব একটা বেশি কিছু লেখবার নেই—কারণ লিখলে তা সেই বক্তৃতা, বক্তৃতা আর বক্তৃতার কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করতে হবে। আমার খুব ইচ্ছা শিকাগোতে পালিয়ে যাই, গিয়ে মুখ একেবারে বন্ধ করে রাখি এবং আমার মুখ, ফুসফুস এবং মনকে দীর্ঘ বিশ্রাম দিই। যদি আমাকে নিউ ইয়র্কে ডাকা না হয়, আমি শিগ্‌গিরই শিকাগো আসছি।

আপনার বশংবদ[৩৭]

বিবেকানন্দ

(স্বামীজীর উপরি-উক্ত চিঠির প্রথম বাক্যটি হতে মনে হয় ৯ মে তারিখে অপরাহ্ণে বা সন্ধ্যায় তিনি যেন একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন; কিন্তু এটার সম্বন্ধে বর্তমানে আমাদের নিকট কোন সংবাদ নেই)।

বোস্টন, মে ১৪, ১৮৯৪

প্রিয় মা,

আপনার চিঠি দীর্ঘ না হয়েও এত মনোমুগ্ধকর হয়েছে যে আমি তার প্রতিটি কথা উপভোগ করেছি।

আমি শ্রীযুক্তা পটার পামারের একটা চিঠি পেয়েছি। তিনি আমাকে আমার দেশের কয়েকজন মহিলাকে তাদের সমাজ ইত্যাদি সম্বন্ধে লিখতে অনুরোধ জানাতে লিখেছেন। আমি যখন শিকাগোতে আসব, তাঁর সঙ্গে দেখা করব, ইতোমধ্যে আমি যা জানি তা তাঁকে লিখব। আপনি বোধহয় ইতোমধ্যে নিউ ইয়র্ক থেকে আমার পাঠানো ১২৫ ডলার পেয়ে থাকবেন। আগামীকাল আমি এখান থেকে একশ ডলার পাঠাচ্ছি। বোস্টনের অধিবাসীরা যে যার নিজেদের নিজেদের তালেই থাকতে চায়!!

ওঃ এরা কি নীরস—এমন কি মেয়েরাও নীরস তত্ত্বকথা আলোচনা করে—এখানটা আমাদের বারাণসীর মতো, যেখানে সবাই নীরস তত্ত্বকথা বলে। এখানে কেউই 'আমার প্রিয়' কথাটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে না। ধর্ম এখানে কেবলই যুক্তি এবং অত্যন্ত পাথুরে। "আমার প্রিয়"-কে যারা ভালবাসে না আমি, সে যেই হোক, তাকে গ্রাহ্য করি না। একথা কুমারী হাউকে যেন বলবেন না, সে তাতে দোষ ধরতে পারে।

পুস্তিকাটি [কলকাতা হতে প্রেরিত] আমি ইতঃপূর্বে পাঠাইনি, কারণ ভারতীয় সংবাদপত্রের উদ্ধৃতিগুলি আমি পছন্দ করছি না—বিশেষ করে তারা খুঁজে পেতে কারো না কারো ওপর দোষ চাপাতে চায়। আমাদের লোকেরা ব্রাহ্মসমাজকে এত অপছন্দ করে যে তারা সুযোগ পেলেই তাদের তা দেখাতে চায়, এটা আমার পছন্দ নয়। কেউ কোন মানুষের প্রতি যতই শত্রুতা প্রদর্শন করুক না কেন, তাতে তার জীবনের সৎকাজগুলি মুছে যায় না এবং তারপর তারা [ব্রাহ্মগণ] ধর্মের ক্ষেত্রে শিশুমাত্র। তারা খুব একটা ধর্মভাবাপন্ন লোক নয় অর্থাৎ তারা শুধু প্রচার করা আর যুক্তি দেখানো এটাই চেয়েছে—কিন্তু তারা 'প্রিয়তমের' দর্শনলাভের জন্য সাধনা করেনি। কেউ যতক্ষণ তা না করছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার কোন ধর্ম আছে এ-কথা আমি বলতে পারি না। তার গ্রন্থ থাকতে পারে,

নিয়মকানুন থাকতে পারে, মতবাদ থাকতে পারে, কথা থাকতে পারে, যুক্তি থাকতে পারে, কিন্তু তার ধর্ম নেই, কারণ ধর্ম আরম্ভ হয় যখন আত্মা 'প্রিয়'কে পাবার প্রয়োজন অনুভব করে, অভাব বোধ করে, আকুলতা অনুভব করে, তার পূর্বে নয়। সুতরাং একজন সাধারণ গৃহীর কাছ থেকে যা লভ্য, তার অতিরিক্ত কিছু তাদের কাছে আমাদের সমাজের আশা করার নেই।

আমি এ-মাস শেষ হবার আগেই শিকাগোতে আসছি—আমি যা ক্লান্ত কি বলব।

আপনার স্নেহধন্য[৩৮]
বিবেকানন্দ

যদিও তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তবুও বিশ্রাম পাবার আগে তাঁকে আরও বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। যেদিন এই চিঠিটা লেখেন তার পরের দিন বোস্টনের ২৫ মাইল উত্তরে যেখানে পণ্য উৎপাদনের একটি বিরাট কেন্দ্র—বিশাল প্যাসিফিক মিল অবস্থিত, ম্যাসাচুসেট্সের অন্তর্গত সেণ্ট লরেন্সে গেলেন পূর্ব ব্যবস্থামত একটি বক্তৃতা দেবার জন্যে। মে মাসের ১৬ তারিখে এ বক্তৃতার যে বিবরণটি "ইভনিং ট্রিবিউন" পত্রিকায় বেরিয়েছিল তার পূর্ণ বয়ান হলো ঃ

হিন্দু সন্ন্যাসীর ভাষণ

স্বামী বিবেকানন্দ উচ্চবর্ণের ভারতীয়দের ধর্ম সম্বন্ধে ভাষণ দিলেন।

গত সন্ধ্যায় বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ উপলক্ষে এখানকার লিবার্টি সভাগৃহটি পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ বিগত গ্রীষ্মকালে শিকাগোতে ধর্মমহাসভায় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তিনি এ দেশের আচার-ব্যবহার-প্রথা প্রভৃতি শিক্ষা করবার জন্য এখন এখানে কিছুদিন অতিবাহিত করছেন। বক্তৃতাটি হলো মহিলা সংস্থার ব্যবস্থাপনায়, ব্যাপারটি নতুন এবং খুবই আগ্রহ ও উদ্দীপনা সঞ্চার হয়েছিল। বিশিষ্ট হিন্দুটিকে পরিচিত করিয়ে দিলেন মহিলা সঙ্ঘের সভানেত্রী কুমারী ওয়েদারবী, যিনি তাঁর ভাষণে ভারতের সুপ্রাচীনত্ব, তার আশ্চর্য ইতিহাস এবং হিন্দু জাতির উচ্চ বৌদ্ধিক গুণসমূহের কথা উল্লেখ করেন।

ঐ সন্ধ্যার বক্তা তাঁর দেশীয় পরিচ্ছদে অর্থাৎ উজ্জ্বল লাল রঙের আলখাল্লার সঙ্গে কোমরে একই রঙের কোমর-বন্ধনীতে ভূষিত ছিলেন

এবং ছবির মতো সুন্দর শ্বেতবর্ণ রেশমের একটি পাগড়ি ছিল তাঁর মস্তককে ঘিরে। প্রথম দৃষ্টিতেই যে-কোন ব্যক্তিরই চোখে পড়বে তাঁর শ্যামবর্ণ গায়ের রঙ, কালো স্বপ্নময় চোখ দুটি, উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণোচিত অন্তর্মুখী ভাব এবং প্রতিভাত হবে যে, তিনি এমন একজন যাঁর জীবন ধর্মের নিকট নিবেদিত এবং যিনি ব্রহ্মচর্যপরায়ণ। তিনি যে অতি উত্তম শিক্ষিত তা বোঝা গেল তাঁর ইংরেজী ভাষার ওপর আশ্চর্য দখল এবং তাঁর যুক্তি-জাল বিস্তার করবার ক্ষমতার যে পরিচয় তিনি রাখলেন তার মধ্যে, আর মাঝে মাঝে মিল্টন অথবা ডিকেন্সের লেখার উদ্ধৃতি দেওয়া দেখে বোঝা গেল যে তিনি ইংরেজী ভাষার সর্বোত্তম সাহিত্যের গুণগ্রাহী।

তিনি প্রথমে হিন্দু সমাজের বৈশিষ্ট্য বর্ণবিভাগ নিয়ে বললেন, বললেন যে এ প্রথা এখন আগের মতো অত কড়াভাবে প্রয়োগ করা হয় না, যদিও এখনও সবকিছুই জন্মের দ্বারা নির্ধারিত হয়। বিভিন্ন জাতির মিশ্রণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ না হলেও তাতে সন্তানদের অসুবিধায় পড়তে হয়। ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের ব্যক্তিকে তার জীবনের প্রথম অংশ বেদপাঠে বা পবিত্র গ্রন্থ পাঠে নিয়োগ করতে হয় এবং অন্তভাগে ঈশ্বরের ধ্যানে অতিবাহিত করতে হয়, এজন্য তাকে নিজের মধ্যে মানবীয় যা কিছু আছে তাকে অতিক্রম করে কেবল আত্মস্বরূপ হয়ে ওঠবার প্রচেষ্টা করতে হয়।

বক্তা কতকগুলি পাশ্চাত্য প্রথার—বিশেষ করে যেগুলি নারীর সামাজিক মর্যাদা সংক্রান্ত সেগুলির বিরূপ সমালোচনা করতে দ্বিধা করেন নি। তিনি জোর দিয়ে বললেন আমরা নারীর মধ্যে পত্নীকে পূজা করি। কিন্তু হিন্দুদের নিকট সকল নারীই মাতৃশক্তির প্রতিভূ। আমেরিকায় একজন নারী যেই তার রূপ যৌবন হারায়, তখনই সে খুব কঠিন দিনের সম্মুখীন হয়। কিন্তু ভারতে তাদের প্রতি এত উচ্চ সম্মান দেখানো হয় যে, একজন রাজাও একজন বয়স্ক রমণীকে পথ ছেড়ে দেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, হিন্দুর বাইবেল যাকে বলা যেতে পারে সেই বেদের কতকগুলি অসামান্য অংশ নারীদের দ্বারা রচিত, কিন্তু পৃথিবীর আর কোথাও এমন বাইবেল নেই যার কোন অংশ রচনায় নারীদের কোন ভূমিকা আছে।

বক্তা প্রসঙ্গত অন্তঃপুরে আবদ্ধ বিধবাদের কথা তাঁর আলোচনায় উল্লেখ করলেন, যাঁরা অন্যান্য দেশ থেকে আগত খ্রীস্টধর্মপ্রচারকদের সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন। কিছু সময় গেল ভারতে বিধবাদের ওপর নিষ্ঠুরতা অনুষ্ঠিত হয় বলে যে অপপ্রচার আছে তা খণ্ডন করতে গিয়ে,

একে তিনি অসত্য বলে অভিহিত করলেন। বিবাহ একটি অতি যত্ন-রক্ষিত প্রতিষ্ঠান; ব্রাহ্মণ কোন আত্মীয়কে বিবাহ করবে না—এ বিধিনিষেধ ছাড়াও ক্ষয়রোগগ্রস্ত বা দুরারোগ্য শারীরিক ব্যাধিগ্রস্তদের বিবাহ নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত। জাতিভেদের কঠোর নিয়ম যা এক ব্যক্তির স্পর্শ করা জলের গ্লাস হতে অপর ব্যক্তির জল পান করা নিষিদ্ধ করেছে এবং এরূপ সমগোত্রীয় আরও বিধিনিষেধসমূহ আরোপ করেছে, যদিও সেগুলি ধর্মের অঙ্গ নয়, তথাপি সেগুলি ২৮ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষের দেশে স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে একটি অতি সুফল এনেছে—তা হলো সংক্রামক ব্যাধির প্রসারে বাধা ঘটানো। বক্তা এদেশের রেলপথে, ট্রেনে, স্টেশনে সকলকে নির্বিচারে একই পাত্র থেকে জলপান করতে দেখে তীব্র শঙ্কা অনুভব করেছেন। ভারতে শিশুদের প্রথমেই সকল প্রাণীকে করুণা প্রদর্শন করতে শেখানো হয় এবং সে শিক্ষা এমন সর্বাত্মক যে, অতি ছোট শিশুও স্বভাবজাত প্রবৃত্তি বশে একটি পোকাকেও পদদলিত করবে না, সরে দাঁড়াবে তার পথ থেকে। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, পৌত্তলিকদের মধ্যে সেরকম লম্বা নামের সেবা সমিতির প্রয়োজনই হয় না, যেগুলি খ্রীস্টানদের দেশে আপন কর্তব্য পালনে প্রায়ই বিফল হয়।⁺ গৃহে সমাগত অতিথি— অর্থাৎ যে-কোন মানুষ যিনি গৃহদ্বারে এসে বলেন—"আমি ক্ষুধার্ত", তিনিই হিন্দুর নিকট ঈশ্বরের প্রতিভূস্বরূপ এবং তাঁর প্রতি যতদূর সম্ভব সমাদর ও সুবিবেচনা প্রদর্শিত হয়, গৃহকর্তার বা কর্ত্রীর আহারের পূর্বে তাঁকে আহার করানো হয়।

বক্তা দুঃখের সঙ্গে তাঁর দেশের দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করলেন, কারণ উচ্চবর্ণের মানুষেরা যেখানে আরামে দিনযাপন করে, সেখানে কোটি কোটি নিম্নশ্রেণীর মানুষের একমাত্র খাদ্য হলো শুষ্ক ফুল এবং অস্তিত্বের মানদণ্ডে তাদের স্থান এত নিচে যে তাদের প্রায় নিজস্ব কোন পরিচয় নেই—এবং তারা অত্যন্ত দয়ার পাত্র। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ইঙ্গিত দিলেন যে, খ্রীস্টান এবং মুসলমানগণ গত একশ বছর ধরে তাদের ধর্মোপদেশ দিয়ে আসছে তার পরিবর্তে খাদ্য এবং শিক্ষাদানই অধিক মঙ্গলকর হতো। এই অদ্ভুত জাতির লোকেদের অনেক সরল এবং প্রাচীন প্রথার কথা বলা হলো এমন সহজ এবং অকপটভাবে যে আজকের এই মনের ভাব গোপন করবার জন্যে কৌশলে শব্দ ব্যবহার করবার যুগে তা শুনতে খুব চিত্তাকর্ষক মনে হচ্ছিল। তিনি বলেন তাঁদের দেশে যুবক ও অবিবাহিত

যুবতীদের মধ্যে কখনও ভালবাসার অভিনয় বা চটুলতা দেখানো হয় না। তরুণীরা প্রকাশ্যস্থানে স্বামী সংগ্রহের জন্য সবল পদক্ষেপে ঘুরে বেড়ায় না, তা তারা যতই সাহসী হোক না কেন—যে-সকল কথা এই মহান এবং গৌরবময় সাধারণতন্ত্রের অধিবাসীদের মনে এই ধারণা এনে দিল যে, ডেনমার্কের অবস্থায় কিছুটা পচন ধরেছে হয়তো। যদি পক্ষপাতশূন্য বিচার করতে হয় তাহলে সবদিক দেখে তবেই বিচার করা সঙ্গত। অনেক শ্রোতা একজন হিন্দু পৌত্তলিকের মুখে তাদের প্রিয় আমেরিকার রীতিনীতির সমালোচনা শুনে বিভ্রান্ত হয়ে ফিরে যায়।

বক্তৃতাটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক হয়েছিল এবং উপস্থিত সকলে গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনেছিল। শেষকালে চিন্তাশীল সন্ন্যাসীটি যিনি সামাজিক প্রথানুযায়ী বাগাড়ম্বর কম করেছেন অথবা অর্থহীন কথা খুব কম বলেছেন, তাঁর সামনে প্রচুর (প্রশ্ন) উপস্থাপিত করা হয়। মনে হলো শ্রোতাদের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি, যিনি এই সাধারণতন্ত্রের জন্মের বহু পূর্ব হতে যে অজানা দেশটির অস্তিত্ব ছিল সেই দেশে গিয়েছিলেন, সেই ডঃ বোকারের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ জন্মেছে।[৩১]

কয়েকদিন পরে ১৮ মে তারিখে স্বামীজীর বক্তৃতাটি সম্বন্ধে আর একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল "লরেন্স আমেরিকান অ্যাণ্ড অ্যাণ্ডোভার এ্যাডভার্টাইজার" পত্রিকায়। এই প্রতিবেদনে স্বামীজীর একটি সুস্পষ্ট বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সত্যসত্যই তাঁকে (যেমনটি তাঁকে দু সপ্তাহ বা ততোধিক আগে কুমারী গিবন-এর নিকট মনে হয়েছিল) "শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের নিদর্শনের মতোই সুন্দর দেখাচ্ছিল।" অবশ্য এই প্রতিবেদনটির অভ্রান্ততা সম্বন্ধে দু-একটি জায়গায় প্রশ্ন করা যেতে পারে। এটিতে বলা হয়েছে ঃ

ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী

মহিলা সংঘের অতিথি স্বামী বিবেকানন্দ।

তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের উত্তম দিকগুলি দেখালেন এবং খ্রীস্টানদের সুস্পষ্ট একটি বাণী দিলেন।

লরেন্স মহিলা সংঘের ব্যবস্থাপনায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় লাইব্রেরি হল-এ ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ এক কৌতূহলী শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে ভাষণ দিলেন।

কুমারী ওয়েদারবী বক্তাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং তাঁকে সাদর

অভ্যর্থনা জানানোর পথ প্রশস্ত করে দিলেন এরূপ অভ্যর্থনা আমেরিকাবাসিগণ বিদেশ হতে আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দিতে কোন সময়ই ব্যর্থ হয় না।

কুমারী ওয়েদারবী তাঁর সম্বন্ধে বিশ্বধর্মমহাসভার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং বিশ্বমেলায় এক বিশেষ প্রভাব সৃষ্টিকারী—এ-কথা উল্লেখ করে সুবিবেচনার কাজ করেছিলেন।

গত সন্ধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ লরেন্সের শ্রোতৃমণ্ডলীর ওপর তাঁর নিশ্চিত প্রভাব বিস্তার করতে ব্যর্থ হননি। তাঁর পোশাক ছিল উজ্জ্বল লাল রঙের, তাঁর মস্তকের চারপাশে বাঁধা ছিল বারো গজ মাপের হলুদ রঙের রেশমের কাপড়, যার শেষপ্রান্ত তাঁর কাঁধ থেকে বুকের ওপর নেমে এসেছিল। তাঁর সৌন্দর্য নিঃসন্দেহে দেখবার মতো। ঋজু সুন্দর আকৃতি, দৃঢ় অথচ মার্জিত মুখমণ্ডল, অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ এবং নিখুঁত ভাবপ্রকাশক মুখভঙ্গি, সুগম্ভীর এবং সঙ্গীতমুখর কণ্ঠস্বর, এমন কণ্ঠস্বর যা শ্রোতৃবৃন্দকে বিদ্যুৎতরঙ্গের মতো উদ্দীপিত করতে পারে এবং যখন তাঁর জ্যোতি বিকিরণের সঙ্গে তাঁর মুখের বাঁকানো ভঙ্গি যুক্ত হয় তখন তা প্রবলতম ঘৃণাব্যঞ্জক হয়ে ওঠে। যখন কোন আবেগের মুহূর্তে তাঁর মুখ থেকে হিস্ হিস্ শব্দে বেরিয়ে আসে তাঁর জাতির জীবনে উদ্দেশ্য ভাল হলেও অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তখন শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে কারও কারও মনে জাগতে পারে এমন কথা যে—হে বিবেকানন্দ, তোমার পক্ষে কি কোন নারীর প্রেমিক হওয়া সম্ভব। তা যদি হয় তাহলে কি মহিমান্বিত ওথেলোই না তুমি হতে পারতে, কিন্তু হায়! এই অপূর্ব সৌন্দর্যের অধিকারি পুরুষটি একজন ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী, সেজন্য তিনি হয়তো কোনদিনই বিবাহ করবেন না।

তাঁর দেশে, তাঁর নিজ শ্রেণীর মধ্যে সকল নারীকেই তিনি মাতৃ সম্বোধন করে থাকেন। ব্রাহ্মণকে সকল নারীকেই মাতৃরূপে দেখতে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং কোন মানুষই মাকে বিবাহ করতে পারে না। ওই দেশের নারীর মধ্যে মায়ের সহজাত বৃত্তিগুলিকে বিকশিত করে তোলা হয়, এরই মধ্যে স্ত্রীর সহজাত মনোবৃত্তি চরম উৎকর্ষপ্রাপ্ত বলে তিনি মনে করেন এবং তাঁর বক্তৃতার সবচেয়ে সুন্দর অংশটি ছিল সেইটি যাতে তিনি তাঁর নিজের মাতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন আর তাঁর ভাষণে আরও লক্ষ্যে পড়েছে ক্ষুদ্র শিশুর দয়ালু হৃদয়ের কথা—যে শিশু সহজাত প্রবৃত্তিবশত একটি ক্ষুদ্র পোকাকেও পদদলিত করবে না, সরে দাঁড়াবে তার পথ থেকে।

বিবাহ প্রসঙ্গ

তাঁর বক্তৃতার একটি বৃহদংশ জুড়ে ছিল। যাদের আর্য বলে অভিহিত করা হয়, সেই উচ্চশ্রেণীভুক্ত মহিলাগণ বিবাহকে অশোভন বলে মনে করেন [?]। একজন বিধবা কখনও পুনর্বিবাহ করবে এরূপ আশা করা হয় না। যে পুরুষ কখনও বিবাহ করে না, তাকে উচ্চ সম্মান দেওয়া হয় এবং সত্যসত্যই সে পূজিত হয়, কিন্তু যে মুহূর্তে সে বিবাহ করবে, সব পালটে যাবে। যে ব্যক্তি কখনও বিবাহ করেন না তাকে উচ্চমনা, পবিত্রাত্মা এবং অধ্যাত্মপরায়ণ বলে মনে করা হয়।

আর্যদের মধ্যে বিবাহকালে কোন অর্থ দেওয়া হয় না [?] এবং যেহেতু নারী শিশুর সংখ্যা বেশি সেজন্য পিতার পক্ষে কন্যার বিবাহ দেওয়া দুরূহ ব্যাপার; এবং তার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার জন্য একটি স্বামী খুঁজে বার করবার কথা ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন।

নিম্ন দুটি বর্ণের জন্য বিবাহ-সংক্রান্ত বিধিনিয়ম সম্পূর্ণ অন্যরকম। তাদের মধ্যে বিধবাগণ পুনর্বিবাহ করে থাকে এবং ইচ্ছা করলে স্বামী স্ত্রী বিবাহ-বিচ্ছেদও করতে পারে। একজন শিশু জন্মগ্রহণ করলে একজন জ্যোতিষী এসে ঠিকুজি-কুষ্ঠি তৈরি করেন, পুত্র অথবা কন্যাটির ভবিষ্যৎ চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্ণয় করেন—নির্ণয় করা হয় সে মনুষ্য প্রকৃতির না রাক্ষস-প্রকৃতির। যদি রাক্ষস প্রকৃতির হয় তাহলে তার বিবাহ জাতির মধ্যে অন্য প্রকৃতির ব্যক্তির সঙ্গে দেওয়া হয়, এইভাবে রাক্ষস প্রকৃতির শিশুটির অবস্থার উন্নতি করবার একটি সূক্ষ্ম সুযোগ দেওয়া হয়।

বিবাহের ব্যাপারে সন্তানকে নিজের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করতে দেওয়া হয় না, কারণ তাহলে সে হয়তো প্রেমে পড়ে ভাল নাক বা ভাল চোখ দেখে বিবাহ করবে এবং এ-ভাবে নিজের মতে চললে সব কিছু নষ্ট করে ফেলতে পারে।

প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবনের কথা

এবং ঈশ্বরের উপাসনার কথা একমাত্র উচ্চশ্রেণীরা ভাবে, তারা বিবাহের কথা চিন্তা করে না। তিনি নিম্নশ্রেণীর করুণ দুর্দশার কথা বললেন, বললেন তাদের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার কথা। কোটি কোটি মানুষ নিজের নামটুকু লিখতে অসমর্থ। তৎসত্ত্বেও তিনি বললেন : আমরা সকলে তাদের

ধর্মোপদেশ দিচ্ছি, অথচ তাদের হাত প্রসারিত থাকে রুটির জন্য। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে দারিদ্র্য এত সাংঘাতিক যে, একজন হিন্দুর মাসিক গড় আয় হল মাত্র পঞ্চাশ সেন্ট। কোটি কোটি মানুষ সারাদিনে একবার মাত্র আহার করে, আরও কোটি কোটি মানুষ বন্য ফুল আহার করে বেঁচে থাকে।

তিনি, ভারতের নারীদের মধ্যে বিদুষী কেউ নেই, এই প্রচলিত ধারণার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, এ-ধারণা ভুল, ব্রাহ্মণ নারীগণ বিবাহ করলেও তাঁদের মধ্যে অনেক বিদুষী নারী আছেন এবং সুস্পষ্ট গর্বের সঙ্গে তিনি বলেন যে তাঁর দেশ ছাড়া অন্য কোন জাতির ধর্মগ্রন্থে কোন নারীর দ্বারা লেখা কোন অংশ নেই, কিন্তু তাঁর দেশের ধর্মগ্রন্থে অনেক সুন্দর সুন্দর অংশ নারীগণের দ্বারা রচিত।

স্বামী বিবেকানন্দ, বুঝতে ভুল না হয় এরূপ পরিষ্কার ইংরেজী শব্দের মাধ্যমে শ্রোতাদের একথা বুঝিয়ে দেন যে তাঁর দেশে খ্রীস্ট-ধর্ম প্রচারের দ্বারা উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। তিনি বলেন—"আমরা গ্রীকদের আসতে দেখেছি, পারসিকদের আসতে দেখেছি, দেখেছি স্পেনীয়দের বন্দুক ধারণ করে আমাদের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করবার প্রয়াস করতে, তথাপি আমরা হিন্দুই আছি এবং চিরদিন ধরে তাই থাকব।" যদি বিবেকানন্দ তাঁর উজ্জ্বল চোখের জ্যোতিকিরণ বর্ষণ করবার সমস্ত ক্ষমতা এবং ব্যঞ্জনাময় কণ্ঠস্বরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতেন তাহলে তাঁর নিম্নলিখিত কথাগুলি উচ্চারণ একটি অতি সুন্দর নাটকীয় ভাষণ হয়ে যেত—"আমি এখানে আমেরিকায় দাঁড়িয়ে সাহসের সঙ্গে বলছি—আমরা ভারতীয়রা আমাদের ধর্মের ওপরই দাঁড়িয়ে থাকব।" তিনি আরও বললেন, আমাদের রীতিনীতি আমাদের পক্ষেই ভাল এবং আমাদের তাঁরা স্বাগত করেন। আমেরিকার বহু সভায় সংস্কৃতিবান শ্রোতাদের সামনে দাঁড়িয়ে বহুবার এ-কথা বলেছেন এই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পণ্ডিত প্রবক্তা এবং তিনি আমাদের দেশে তাঁর সমস্ত শক্তি ও সাহস নিয়োগ করে কেবলমাত্র এ-কথা বলতেই এসেছেন অত্যন্ত ভদ্রভাবে কিন্তু অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে যে, দরিদ্র হিন্দুদের আমরা যেন আর কিছু না বলি, আমরা যেন নিজেদের চরকায় তেল দিই।

বক্তৃতার পর শ্রোতাদের মধ্যে অনেকে শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী ইয়ং-এর বাড়িতে যেখানে বিবেকানন্দকে আতিথ্য দেওয়া হয়েছিল সেখানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার যে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, তা আনন্দিত চিত্তে গ্রহণ করলেন। বিবেকানন্দ সেখানে নিজেকে একজন অত্যন্ত আনন্দদায়ক অতিথি হিসাবে প্রমাণ করলেন।

ঐ একই সংবাদপত্রের অন্য এক পৃষ্ঠায় একটি সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল, যার লেখক স্বামীজীর বক্তৃতাটি ভাল করে শোনেন নি, কিন্তু যেটুকু তিনি শুনেছেন তার দ্বারা তিনি অভিভূত হয়ে পড়েননি, কারণ ঠিক এই সময়েই ভারতে অবস্থিত স্বামীজীর শত্রুগণ সন্দেহের যে বীজ বপন করেছিলেন, তা আমেরিকায়ও পৌঁছতে শুরু করে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তা নরেন্দ্রে এসে পৌঁছয়— কিন্তু এ বিষয়ে পরে আরও বলা হবে। আমেরিকার পত্রিকাটির সম্পাদকীয় নিবন্ধটির প্রথম কয়েকটি অনুচ্ছেদ নিম্নোক্তরূপ :

বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ধারণাসমূহ

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় যে ব্যক্তিটি লাইব্রেরির সভাগৃহে মহিলা সংঘের সদস্যা এবং তাদের বন্ধুদের নিকট উপস্থিত হয়ে ভাষণ দেন, তিনি একজন ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী—পরনে তাঁর উজ্জ্বল লাল বর্ণের পরিচ্ছদ, কোমরের নিকট একটি লম্বা চাদর বাঁধা, মাথায় সাদা রেশমের পাগড়ি, তাঁর চক্ষু দুটি গভীর কালো এবং স্বপ্নময়, তাঁর চলাফেরায় ছিল দৃঢ় সঙ্কল্পের ছাপ।

তিনি কথাবার্তা বলার স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে তাঁর স্বদেশবাসী ও স্বধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের আচার ব্যবহার ও চিন্তাধারা প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাঁর বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা আদৌ সুসম্বদ্ধ ছিল না, তাঁর কণ্ঠস্বর এত নিচু গ্রামে ছিল ও তাঁর উচ্চারণ এত অস্পষ্ট ছিল যে, তিনি যা বলেছেন তার সবটা ধরতে পারা সম্ভব ছিল না। অপরদিকে তাঁর আত্মবিশ্বাস, তাঁর ইংরেজী শব্দের উত্তম ব্যবহার, তাঁর ইংরেজী ভাষাভাষীদের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয়ের সুস্পষ্ট অভিজ্ঞান, তৎকর্তৃক পাশ্চাত্য 'সভ্যতা' এবং 'ধর্মের' কতকগুলি ব্যাপারে খোলাখুলি সমালোচনা, হিন্দুসভ্যতার কালো দিকগুলির সাদাসিধে বর্ণনা—এগুলি অন্য আরও কারণগুলির মধ্যে শ্রোতাদের গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল এবং প্রচুর, সহানুভূতির উদ্রেক করেছিল, করতালিও সংগ্রহ করেছিল। অবশ্য এ-কথা বলতেই হবে যে, তাঁর শ্রোতাদের মনে মোটের ওপর যে ছাপ পড়েছিল, তা ঠিক তার 'অনুকূলে' নয়, বলা যেতে পারে তা ছিল 'মিশ্র'।

তাঁর সম্পর্কে, তাঁর আন্তরিকতা, সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে কোন বিচার বা সিদ্ধান্ত না দিয়ে পূর্বোক্ত আমেরিকান পত্রিকাটি ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহ

হতে এই সন্ন্যাসী এবং তাঁর পরিচয় সম্পর্কে নিম্নলিখিত অংশগুলি উদ্ধৃত করে—

[এরপর স্বামীজীর প্রতি শত্রুতার মনোভাব নিয়ে লেখা ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহ হতে কয়েকটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করে দেওয়া হয়েছে, আমাদের নিকট এ ব্যাপার পরবর্তী অধ্যায়ে বিবেচ্য হবে।]

"লরেন্স আমেরিকান" পত্রিকায় স্বামীজীর বক্তৃতার ওপর প্রতিবেদনের শেষ বাক্যটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই শহরে তাঁর সংক্ষিপ্ত অবস্থানকালে তিনি শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী ইয়ং-এর অতিথি হয়েছিলেন। রেভারেণ্ড জর্জ হেনরী ইয়ং ছিলেন ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত একজন ধর্মযাজক, যাঁর গির্জায় স্বামীজীকে এর পরের বারে ভ্রমণকালে ভাষণ দিতে হয়েছিল। ১৯৬০ সালের জানুয়ারি মাসের "বেদান্ত কেশরী" পত্রিকায় পরবর্তী পরিদর্শনের নিম্নবর্ণিত এই কাহিনীটি পাওয়া যায়, (কিন্তু এই পরবর্তী ভ্রমণের) কোন সঠিক তারিখ এখনও নির্ধারণ করা যায়নি।

মনে করা হয় যে ১৮৯৪-এর মে মাসের কিছু পরে স্বামী বিবেকানন্দ ম্যাসাচুসেট্সের অন্তর্গত লরেন্স শহরের ইউনিটেরিয়ান গির্জায় সান্ধ্য-উপাসনার কালে বক্তৃতা করেন এবং ইউনিটেরিয়ান ধর্মযাজক রেভারেণ্ড জর্জ হেনরী ইয়ং-এর বাড়িতে রাত্রিযাপন করেন।

সে সময় শ্রীমতী ইয়ং এবং তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা এ্যান শহরে না থাকায়, তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা শীলা সংসারের কাজকর্ম এবং পরিবারের ছোট দুটি সন্তান এলিনর এবং ফিলিপেরও দেখা শোনা করছিলেন।

শীলার স্মরণে আছে যে, স্বামীজী প্রাতরাশের টেবিলে তাঁর ডানদিকে, তাঁর ও তাঁর বাবার মাঝখানে বসেছিলেন, উলটো দিকে বসেছিল এলিনর ও ফিলিপ।

স্বামীজী টেবিল ত্যাগ করে পাশের ঘরে গেলেন। শীলা এবং এলিনর দুজনেরই মনে আছে যে, তিনি সেখানে গিয়ে পাগড়ি খুলে ফেলে বাচ্চাদের দেখালেন কিভাবে পাগড়ি বাঁধা হয়। পাগড়িটি শ্বেতবর্ণের ছিল এবং তাতে ছিল প্রচুর কাপড়।

জন্মদিনের যে বইটিতে স্বামীজী কিছু লিখে দিয়েছিলেন সেটি ছিল এলিনরের। এটি একটি ছোট্ট বই যাতে বছরের প্রত্যেক দিনের জন্যে বাইবেল থেকে একটি করে উদ্ধৃতি দেওয়া আছে। প্রত্যেকটি উদ্ধৃতির

পাশে একটু ফাঁকা জায়গা ছিল যেখানে বন্ধুরা তাদের জন্মদিনের তারিখসহ তাদের নাম সই করে দেবে।[৪০]

(বেদান্ত কেশরী পত্রিকায় এখানে যে অনুচ্ছেদগুলি উপরে উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলির সঙ্গে ছিল এই জন্মদিনের বইটির ডিসেম্বর মাসের একটি তারিখের প্রতিলিপি যার তলায় স্বামীজী নিজের নাম সই করেছিলেন ফিলিপের নামের পরে এবং তাতে তিনি লিখেছেন—"বড় হলে তোমার কাজে লাগবে এমনভাবেই ছোটবয়সের কাজগুলি করো।")

লরেন্সে ১৮৯৪-এর ১৫মে তারিখের বক্তৃতার পরদিন স্বামীজী বোস্টনে ফিরে আসেন, যেখানে সেই একই দিনে আরও দুটি বক্তৃতা দেবার কথা আগেই ঠিক হয়েছিল। প্রথমটি ছিল এ্যাসোসিয়েশন হল-এ (এটাও সাহায্যার্থে) "দেরি করে সময়টা দেওয়া হয়েছিল—৩-৩০ থেকে ৫-৩০-এর মধ্যে যাতে ব্যবসায়ীরা যোগদান করতে পারেন", এবং দ্বিতীয়টি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ধ্যে ৮টার সময় দেওয়া হয়েছিল। অপরাহ্নে দেওয়া "ভারতের ধর্মসমূহ" সম্বন্ধে বক্তৃতাটির একটি প্রতিবেদন ১৭ মে তারিখে বোস্টন হেরল্ডে প্রকাশিত হয়। সেটি নিম্নলিখিতরূপ :

ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী দ্বারা
১৬নং ওয়ার্ডের শিশু শিক্ষালয়ের দিবা বিভাগের সাহায্যার্থে গতকাল অপরাহ্নে প্রদত্ত ভাষণ।

১৬নং পল্লীর শিশু শিক্ষালয়ের দিবা বিভাগের সাহায্যার্থে গতকাল অপরাহ্নে ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ অ্যাসোসিয়েসন হল-এ ভারতের ধর্ম বিষয়ে ভাষণ দেন। বিশাল জনসমাবেশ হয়েছিল এই সভায়।

বক্তা প্রথমে মুসলমানদের কথা বলেন, যারা ভারতের মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ। তারা খ্রীস্টানদের বাইবেলের প্রাচীন এবং নতুন—এই দুই অংশেই বিশ্বাস করে, কিন্তু যিশুখ্রীস্টকে তারা শুধুমাত্র ঈশ্বরের বার্তাবহ বলে মনে করে। তাদের কোন গির্জা সংগঠন নেই, যদিও সেখানে কোরাণ পাঠ করা হয়।

আর একটি জাতি পারসী, তারা তাদের শাস্ত্রগ্রন্থের নাম দিয়েছে 'জেন্দ্-আবেস্তা'। তারা বিশ্বাস করে যে দুটি দেবতা সব সময় পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে ব্যস্ত—একজন ভালর দেবতা, নাম আরমুজদ, অপর

জন মন্দের অধিপতি, নাম আহরিমান। তারা বিশ্বাস করে যে, শেষ পর্যন্ত ভালরই জয় হয়, মন্দের নয়। তাদের নীতিশাস্ত্র আবদ্ধ হয়ে আছে এই কথাগুলির মধ্যে "সৎ-চিন্তা, সৎ-কথা, সৎ-কর্ম।"

খাঁটি হিন্দুরা বেদকে তাদের ধর্মীয় শাস্ত্রগ্রন্থ বলে মনে করে। তাদের জাতিভেদ প্রথানুসারে প্রত্যেক জাতির নিজস্ব প্রথা-নিয়ম প্রভৃতি মেনে চলতে হয়, কিন্তু ধর্মীয় বিষয়ে চিন্তার ব্যাপারে প্রত্যেকের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। তাদের ধর্মীয় পদ্ধতির একটি হলো তারা একজন পুণ্যাত্মা বা ঈশ্বরের দূত বলে পরিগণিত এরকম কাউকে খুঁজে বার করে এই সুবিধার জন্যে যে, এরূপ ব্যক্তির মধ্যে দিয়ে আধ্যাত্মিকতার যে তরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছে এর দ্বারা নিজেরা উপকৃত হতে পারবে।

হিন্দুর ধর্মের তিনটি পৃথক ধারা আছে—দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ—এই তিন মতবাদকে মনে হয় তিনটি পৃথক স্তর, যার ভিতর দিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধর্মীয় জীবনের বিকাশের পথে অগ্রসর হতে হয়।

তিনটি মতই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, কিন্তু যেখানে দ্বৈতবাদিগণ বিশ্বাস করে মানুষ ও ঈশ্বর পৃথক-সত্তাবিশিষ্ট, সেখানে অদ্বৈতবাদিগণ ঘোষণা করে যে, বিশ্বে একটিমাত্র অস্তিত্বই বর্তমান, এই একক অস্তিত্ব ঈশ্বরও নয়, আত্মাও নয়, এদের অতিক্রম করে আরও কিছু।

বক্তা হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেবার জন্য বেদ থেকে উদ্ধৃতি দিলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, ঈশ্বরকে পেতে হলে নিজের হৃদয় মধ্যে অনুসন্ধান করতে হবে।

ধর্ম কোন পুস্তিকা বা গ্রন্থ নয়, এ হলো মানব-হৃদয়ের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করা এবং সেখানে ঈশ্বর এবং অমরত্বের সন্ধান করা। বেদ বলেছেন—"আমি যাকে চাই, তাকেই ধর্ম-প্রবক্তা বানাই," এবং ধর্ম-প্রবক্তা হওয়াই হলো ধর্ম।

বক্তা জৈনদের কথা বলে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন—জৈনরা মূক জীবজন্তুকে বিশেষ করুণা প্রদর্শন করে, আর তাদের নীতি ধর্মের সারমর্ম একটি কথায় বলা যায়—"অন্যকে হিংসা না করাই সবচেয়ে বড় ধর্ম।"

১১মে তারিখে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যসূচিতে এবং হার্ভার্ড ক্রিমসন পত্রিকায় এদিন স্বামীজীর সান্ধ্য ভাষণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ঘোষণাটি প্রকাশিত হয়েছিল :

স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা

১৬মে বুধবার রাত্রি ৮টায় ১১নং সেভারে, হার্ভার্ড ইউনিয়নের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা দেবেন। জনসাধারণকে যোগদানের জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। বিবেকানন্দ ভারতের প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যধর্মে বিশ্বাসী। আট বছর ধরে তিনি ঋষি রামকৃষ্ণের শিষ্য ছিলেন। দেশজ জ্ঞানবিদ্যায় তাঁর পাণ্ডিত্য এবং অসাধারণ বাগ্মীতার দরুন পাশ্চাত্য দেশীয় শ্রোতাদের নিকট দেশীয় ধর্মবিশ্বাসের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় তিনি ছিলেন যথার্থ যোগ্য ব্যক্তি। বিশ্বধর্মসভায় তাঁর ভাষণ সকলের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল।

১৭ মে তারিখে হার্ভার্ড ক্রিমসন পত্রিকায় বক্তৃতাটির নিম্নলিখিতরূপ সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বের হয়—

বিবেকানন্দের ভাষণ

হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ গত সন্ধ্যায় সেভার হলে হার্ভার্ড রিলিজিয়াস (ধার্মিক) ইউনিয়নের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি ভাষণ দেন। ভাষণটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়েছিল; তাঁর সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর, বাকপটুতা এবং তাঁর অনুত্তেজিত আন্তরিক উপস্থাপনা তাঁর কথাগুলিকে গভীর ভাবোদ্দীপক করে তুলেছিল।

বিবেকানন্দ বলেন, ভারতে নানা সম্প্রদায় এবং মতবাদ আছে, তাদের মধ্যে অনেকে ব্যক্তি ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, আবার অনেকে মনে করে যে, ঈশ্বর ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অভিন্ন; কিন্তু যে সম্প্রদায়ভুক্তই হোক না কেন হিন্দু কখনও বলে না যে, তার ধর্মই একমাত্র সত্য এবং অন্যদের ধর্ম ভুল। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরের নিকট পৌঁছবার বহু বিভিন্ন পথ আছে; যে ব্যক্তি সত্যই ধর্মপরায়ণ, সে সম্প্রদায় বা বিশ্বাস কেন্দ্রিক ক্ষুদ্র বিবাদের ঊর্ধ্বে আরোহণ করে। ভারতে যখন একজন মানুষের এই জ্ঞান হয় যে, সে দেহমাত্র নয়, সে আত্মা, সে চৈতন্যস্বরূপ, তখনই সে ধর্মপরায়ণ হয়েছে বলা হয়, তৎপূর্বে নয়।

ভারতে সন্ন্যাসী হতে গেলে দেহকে একেবারে বিস্মৃত হতে হয়। অন্য মানুষদেরও আত্মস্বরূপে দেখতে হয়; তাই সন্ন্যাসীরা কখনও বিবাহ

করতে পারে না। যখন কেউ সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে তখন তাকে দুটি ব্রত পালন করতে হয়—এক, দারিদ্র্যকে বরণ করে নিতে হয়, দুই, ব্রহ্মচর্যপরায়ণ হতে হয়। সে কখনও কোন অর্থ, তা যে পরিমাণই হোক না কেন—গ্রহণ করতে পারে না। সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করবার সময় তাকে প্রথম যে কাজটি করতে হয় তা হলো নিজের কুশপুত্তলিকা নিজেকে দাহ করতে হয়, যার তাৎপর্য হলো ভূতপূর্ব শরীর, নাম এবং জাতি সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সে তখন একটি নতুন নাম পায়, তখন সে ধর্ম প্রচার করতে যেতে পারে, পরিব্রজ্যায় যেতে পারে, কিন্তু যাই করুক সে বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করতে পারবে না।

নিউ ইয়র্কের মতো বোস্টনেও স্বামীজী অনেক নতুন বন্ধুর সঙ্গে সৌহার্দসূত্রে আবদ্ধ হলেন এবং ইতোপূর্বে যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল তা আর একবার নতুন করে দৃঢ় করা হলো। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন কেমব্রিজের শ্রীমতী ওলি বুল যিনি তাঁর বাকি জীবন স্বামীজীর বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন। শ্রীমতী ওলি বুলের সঙ্গে স্বামীজীর কবে কখন প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে, তা আমরা ঠিক জানি না। যদি বোস্টনে হয়ে থাকে, তাহলে হয়েছে স্বামীজীর এখানে এপ্রিল মাসের ভ্রমণকালে কিম্বা আরও সম্ভবত মে মাসের ভ্রমণের সময়ে।

স্বামীজীর আমেরিকার প্রথম বন্ধু কুমারী কেটি স্যানবোর্ন যাঁর সঙ্গে ১৮৯৩-এর জুলাই মাসে শিকাগোতে আসার আগেই দেখা হয়েছিল, তাঁর প্রতি স্বামীজী নিশ্চয়ই লক্ষ্য রেখেছিলেন। অনেক দিন ধরে এ ধারণা পোষণ করা হচ্ছিল যে, স্বামীজী শিকাগো থেকে বোস্টনে রেলগাড়িতে যাওয়ার সময় কুমারী স্যানবর্নের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। যাই হোক এখন যা জানা যাচ্ছে তা হলো এই যে, যে রেলগাড়িতে ঐ সন্ন্যাসীকে দেখে কেটি স্যানবোর্ন প্রথম হতচকিত ও মুগ্ধ হয়েছিলেন, সেটা ছিল ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলওয়ের অ্যাটলান্টিক এক্সপ্রেস, যেটা ভ্যানকুভার থেকে উইনিপেগ-পর্যন্ত তার সুন্দর নৈসর্গিক দৃশ্যসম্বলিত পথে বহন করছিল এক দল বিশিষ্ট পর্যটককে যাঁরা ঐ দিকে যাচ্ছিলেন।[৪১] এই সন্ন্যাসী ছিলেন পৌরুষের এক অত্যুৎকৃষ্ট নমুনা—উচ্চতায় ৬ ফুট ২ ইঞ্চি, এক গর্বিত (মর্যাদাসম্পন্ন) জমকালো (চিত্তাকর্ষক) দীর্ঘপদক্ষেপবিশিষ্ট, যেন এই বিশ্বের শাসনকর্তা, আর তাঁর দুটি নরম কালো চোখ যা উত্তেজিত হলে অগ্নিবর্ষণ

করতে অথবা কথোপকথনের মাধ্যমে আমোদিত হলে আনন্দে নৃত্য করতে পারে। কুমারী স্যানবোর্ন বোস্টনের কাছে ম্যাসাচুসেট্সের অন্তর্গত মেটকাফে তাঁর "খামার বাড়ি" পরিদর্শনের জন্য পর্যটন গাড়ির যাত্রীদের উদারমনে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু স্বামীজীকে তিনি প্রায়ই মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ জানাতেন। পরে তাঁর মনে পড়ল, "আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার সময় আমি তাঁকে বলেছিলাম, যদি তিনি সৌভাগ্যক্রমে বোস্টনে আসেন তাহলে আমি তাঁকে কয়েকজন শিক্ষিত এবং স্বাভাবিক কৃষ্টিসম্পন্ন ভদ্রলোক ও মহিলাদের সামনে উপস্থিত করতে পারলে খুব আনন্দিত হতাম।" স্বামীজী এই আন্তরিক কথাগুলি ভুলে যাননি এবং আমরা জানি যে, এটা খুব ভালভাবেই রক্ষা করা হয়েছিল। [পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ (নতুন তথ্যাবলী) প্রথম অধ্যায়, প্রথম অংশ দ্রষ্টব্য।]

ইসাবেল ম্যাককিণ্ডলিকে লেখা তাঁর ১ মে তারিখের চিঠি অনুসারে স্বামীজী তাঁর বোস্টনের বক্তৃতাদি শেষ করে নিউ ইয়র্কে ফিরে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যতদূর জানা যায় তিনি তা করেননি, বরঞ্চ ক্লান্ত ও অসুস্থ বোধ হওয়ায় তিনি সোজা শিকাগোতে ফিরে যান। সেখানে তিনি মে মাসের ২৪ তারিখে পৌঁছন। তাঁর প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত চিঠিগুলি দেখে বিচার করতে হলে বলতে হয় যে, জুন মাসের বেশির ভাগ সময়ে তিনি হেল পরিবারের সঙ্গে কাটান এবং "ঝড়ের বেগে"[৪২] ডেট্রয়েট থেকে নিউ ইয়র্ক, সেখান থেকে বোস্টন, সেখান থেকে নর্দাম্পটন, তারপর লীন, লীন থেকে বোস্টন, বোস্টন থেকে নিউ ইয়র্ক ঘুরে আবার বোস্টন হয়ে অবশেষে নিজের বাড়ি শিকাগোতে পৌঁছে তাঁর যে বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল তা তিনি লাভ করেন।

নবম অধ্যায়ের টীকা

পৃষ্ঠা	সাঙ্কেতিক চিহ্ন	টীকা
৪০	+	'লীন ডেলি ইভনিং আইটেম'-হতে যে অংশটি এখানে উদ্ধৃত হয়েছে তা ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দে রে এবং ওয়াণ্ডা এলিস দ্বারা আবিষ্কৃত (গার্গী, "এ নিউ ফাইণ্ডিং", বেদান্ত কেশরী ডিসেম্বর ১৯৮৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এই নতুন আবিষ্কৃত তথ্যগুলি, লীন সিটি আইটেম হতে নেওয়া অপেক্ষাকৃত কম চিত্তাকর্ষক

তথ্য যেগুলি এ গ্রন্থের পূর্ববর্তী সংস্করণসমূহে দেখা গিয়েছে তার বদলে এখানে দেওয়া হলো।

৫৫ + মেট্রোপলিটান অপেরা কোম্পানীর ঐতিহাসিক নথিপত্র অনুসারে "ফস্ট" শ্রীযুক্তা টাউন বর্ণিত নট-নটী সহযোগে নিউ-ইয়র্কে অভিনীত হয় ১৮৯৪-এর ২৬ এপ্রিল তারিখে বৃহস্পতিবার রাত্রে। কিন্তু এপ্রিল মাস মেট্রোপলিটান অপেরা হাউসে অভিনয়ের পক্ষে অসময় ছিল এবং ওটি কোন সামাজিক অনুষ্ঠান হিসাবে অনুষ্ঠিত হয় নি। অভিনয়ের নট-নটী এবং সপ্তাহের ঐ দিনটি সম্পর্কে শ্রীযুক্তা টাউনের স্মৃতি যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে "ফস্ট"-এর এই বিশেষ অভিনয় অনুষ্ঠানটির দিনটি ছিল সম্ভবত ১৮৯৫-এর ২৮ জানুয়ারি সোমবার রাত্রি। একই অভিনেতৃবর্গ পুনর্বার "ফস্ট" নাটকটি নিউ ইয়র্কে মঞ্চস্থ করেন ১৮৯৬-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার রাত্রে, তখনও স্বামীজী নিউ ইয়র্ক শহরে ছিলেন।

৬২ + ১৮৯৪-এ ৬ মে রাত্রে, স্বামীজীকে সম্ভবত রাইটদের কেমব্রিজের ৬নং রিভারডেল অ্যাভিনিউস্থ আবাসে বসার ঘরের কৌচে শয়ন করতে দেওয়া হয়, যেটা কিনা পরের দিন সকালে তরুণ বয়স্ক অস্টিন রাইট আবিষ্কার করেন (প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশ দ্রষ্টব্য)। পরে বেলভিউ হোটেলে তাঁর জন্য যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তা সকলের পক্ষেই সুবিধাজনক হয়ে থাকবে।

৭২ + স্বামীজী হয়তো এখানে "আমেরিকার পশু ক্লেশ নিবারণী সমিতি"-র কথা উল্লেখ করেছেন।

দশম অধ্যায়

পরীক্ষা এবং জয়

॥ ১ ॥

জুন মাসে স্বামীজী যে সকল চিঠিপত্র লেখেন তার মধ্যে কিছু—আগের মতো ভারতের উদ্দেশ্যে লেখা। আমেরিকা পৌঁছবার পর থেকে কর্মব্যস্ত দিনগুলির মধ্যেও তিনি তাঁর স্বদেশের পুনরুজ্জীবন-সম্পর্কিত পরিকল্পনাদি বিষয়ে চিঠিপত্র লেখার সময় বার করে নিতেন। অর্ধ-পৃথিবী পরিক্রমাকালে তিনি তাঁর অনুগামীদের কখনও তীব্র তিরস্কার করে, কখনও প্রশংসা করে, কিন্তু সব সময় অনুপ্রাণিত করে, সেই কাজ—যা ছিল তাঁর হৃদয় হতে উৎসারিত অতি প্রিয় কাজ, যা কখনও তাঁর দৃষ্টির সমুখ থেকে দূরে সরে যায় নি অর্থাৎ শিক্ষার মাধ্যমে ভারতের জনগণের উন্নয়নের কাজ, তা করবার শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চার করেছেন তাঁর নিজের প্রাণবন্ত আত্মশক্তি হতে।

১৮৯৪-এর জুন মাস পর্যন্ত তিনি এ ধরনের চিঠি লিখে চললেন, কিন্তু এবার এর মধ্যে একটি নতুন জিনিসের অনুপ্রবেশ ঘটল।

ইতোপূর্বে একটি অধ্যায়ে এ কথা বলা হয়েছে যে, তাঁর আমেরিকা আগমনের পর প্রায় একটি বৎসর অতিক্রান্ত হলেও, ভারতের কাজের জন্য অর্থসংগ্রহের পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি নিজেই বলছেন—"একেবারেই সাফল্য লাভ করেনি।" যদিও ১৮৯৪-এ আমেরিকা একটি অর্থনৈতিক মন্দার কবলে পড়েছিল, কিন্তু এটিই তাঁর আর্থিক অসাফল্যের মুখ্য কারণ ছিল না। যাঁরা ধনবান, তাঁরা ধনবানই রয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁরা তুলনামূলকভাবে যে যৎসামান্য অর্থ তিনি সংগ্রহ করতে চেয়েছিলেন, তা দিয়ে দিতে পারতেন। এ বিষয়ে অসুবিধার কারণ আমেরিকার 'অর্থের অনটন' ছিল না। কিন্তু বস্তুত ধর্মমহাসভার উদ্বোধনের কাল হতে তাঁর খ্রীস্টান এবং হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত শত্রুরা আমেরিকাবাসীর চোখে তাঁর চরিত্র এবং কাজকে হেয় করবার জন্য অবিরাম প্রচার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ভারতস্থ হিন্দু সম্প্রদায়সমূহের পক্ষ

থেকে তাঁকে সরকারিভাবে সমর্থন জানাতে একটিও কথা না বলা এবং তাদের নীরবতার দ্বারা তাঁর সম্বন্ধে যে সকল মিথ্যা কলঙ্কের কথা লেখা এবং প্রচার করা হচ্ছিল, তাকেই অজ্ঞাতসারে সমর্থন জানানো। খুব অল্প করে বললেও বলতে হয় যে, এপ্রিল মাস নাগাদ অবস্থা খুবই অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চতুর্দিকে এই পরিস্থিতির দ্বারা পরিবৃত হয়ে এবং পাছে তাঁর আমেরিকাস্থ বন্ধুবর্গও তাঁর ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন এই ভয়ে তিনি এপ্রিলের ৯ তারিখে আলাসিঙ্গাকে লিখলেন মাদ্রাজের বিশিষ্ট হিন্দুদের নিয়ে একটি সভার ব্যবস্থা করতে, যে সভা তাঁর আমেরিকার কাজকে স্বীকৃতি দিয়ে এবং তাঁকে সমর্থন জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করবে।[১] তিনি ভাল করেই জানতেন যে, ভারতের জন-সমর্থনের অভাবের কারণ তাঁকে হিন্দুধর্মের মুখ্য প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতি দেবার বা তাঁর কাজ কর্ম সমর্থনে অনিচ্ছা নয়, তার কারণ জাতিগত বৈশিষ্ট্য—উদ্যমের অভাব। তাঁর কাছে এ সংবাদ ছিল যে, ধর্মমহাসভায় তাঁর বিজয়ের সংবাদ পৌঁছনো মাত্র সারা দেশ আনন্দ উল্লাসে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। তিনি দেশ থেকে "কলকাতায় প্রকাশিত একটি ছোট পুস্তিকা" পেয়েছিলেন যাতে কলকাতার সংবাদপত্রসমূহের উদ্ধৃতির একটি সঙ্কলন ছিল[২]—যেটির কথা তিনি কুমারী ইসাবেল ম্যাককিণ্ডলিকে ২৬ এপ্রিল তারিখের চিঠিতে লিখেছিলেন, যার সারমর্ম এত "উচ্চ-প্রশংসা" যে, তিনি ইসাবেলকে তা পাঠাতে অস্বীকার করেছিলেন। পুনরায় ১ মে তারিখে তিনি কুমারী ম্যাককিণ্ডলিকে লিখলেন যে, আগের দিন "ভারতবর্ষ থেকে অল্প কিছু সংবাদপত্রের কর্তিত অংশ" পেয়েছেন।[৩] কিন্তু ভারতবর্ষের সংবাদপত্রসূমহের প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় প্রভৃতি স্বামীজীর নিজের এবং তাঁর কাজকর্মের প্রতি সরকারিভাবে প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থনজ্ঞাপক হয়ে দাঁড়ায় নি, কারণ একে তো হিন্দুসমাজের সকলের মিলিত অভিমত তাতে প্রকাশিত হয়নি, তারপর এমন নয় যে, সেগুলি আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হয়েছে, যাতে সেখানে সকলে তা পাঠ করতে পারে। তাঁর শত্রুরা তাঁকে যেভাবে চিত্রিত করেছিল তাতে প্রয়োজন ছিল আমেরিকায় স্বামীজীকে হিন্দুধর্মের একজন স্বীকৃত ব্যাখ্যাতারূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়সমূহের নেতৃবর্গের দ্বারা তাঁকে সমর্থন দেওয়ার সরকারি স্বীকৃতি। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিদেশী শক্তির পদানত হয়ে থাকায় হিন্দুদের মধ্যে এমন জড়তা এসে গিয়েছিল যে যদিও স্বামীজীর সাফল্যে তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছিল, তথাপি একথা তাদের

মনেই হয়নি যে, তাদের সকলকে একত্রিত হয়ে জনসমক্ষে খোলাখুলি দেশের বিজয়ী প্রতিনিধিকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি জানানোর প্রয়োজন আছে এবং তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য আমেরিকার অধিবাসীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার দরকার আছে। এই সকল একান্ত ঐহিক ব্যাপারেও প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল তাদের জন্য স্বামীজী কর্তৃক পরিচালক ও নির্দেশকের ভূমিকা গ্রহণের।

আলাসিঙ্গাকে ৯ এপ্রিল তারিখে চিঠি* লেখার পরেও মাসের পর মাস কেটে গেল তবু কোন উত্তর পাওয়া গেল না। জুনের ২৮ তারিখে** একজন মাদ্রাজী শিষ্যকে লিখলেন ঃ

এখানে আমার কাজের প্রসারের আশা প্রায় শূন্য বললেই হয়। কারণ— যদিও প্রসারের খুব সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু নিম্নোক্ত কারণে সে আশা একেবারে নির্মূল হয়েছে ঃ

ভারতের খবর আমি যা কিছু পাচ্ছি, তা মাদ্রাজের চিঠি থেকে। তোমাদের পত্রে পত্রে ক্রমাগত শুনছি, ভারতে আমাকে সকলে খুব সুখ্যাতি করছে, কিন্তু সে তো তুমি জেনেছ আর আমি জানছি, কারণ আলাসিঙ্গার পাঠানো একটা তিন বর্গ ইঞ্চি কাগজের টুকরো ছাড়া আমি একখানা ভারতীয় খবরের কাগজে আমার সম্বন্ধে কিছু বেরিয়েছে, তা দেখিনি। অন্যদিকে, ভারতের খ্রীস্টানরা যা কিছু বলছে মিশনারীরা তা খুব সযত্ন সংগ্রহ করে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করছে এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমার বন্ধুরা যাতে আমাকে ত্যাগ করেন, তার চেষ্টা করছে। তাদের উদ্দেশ্য খুব ভালরকমেই সিদ্ধ হয়েছে, যেহেতু ভারত থেকে কেউ একটা কথাও আমার জন্য বলছে না। ভারতের হিন্দু পত্রিকাগুলো আমাকে আকাশে তুলে দিয়ে প্রশংসা করতে পারে, কিন্তু তার একটা কথাও আমেরিকায় পৌঁছয়নি। তার জন্য এদেশের অনেকে মনে করছে, আমি একটা জুয়াচোর! একে তো মিশনারীরা আমার পিছু লেগেছে, তার ওপর এখানকার হিন্দুরা হিংসা করে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে; এক্ষেত্রে আমার একটা কথাও জবাব দেবার নেই। এখন মনে হচ্ছে, কেবল মাদ্রাজের কতকগুলি ছোকরার পীড়াপীড়িতে ধর্মমহাসভায় যাওয়া আমার আহাম্মকি হয়েছিল,...। আমি কোন নিদর্শনপত্র নিয়ে আসিনি। আর যখন কারো অর্থ সাহায্যের

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সং, পত্র সংখ্যা ৮৭ পৃঃ ৩২৭

** ঐ, পত্র সংখ্যা ১০১ পৃঃ ৩৫০

আবশ্যক হয়, তার নিদর্শনপত্র থাকার দরকার। তা না হলে মিশনারী ও ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধাচরণের সামনে—আমি যে জুয়াচোর নই, তা কি করে প্রমাণ করব? মনে করেছিলাম, গোটা কতক বাক্য ব্যয় করা ভারতের পক্ষে বিশেষ কঠিন কাজ হবে না। মনে করেছিলাম মাদ্রাজে আর কলকাতায় কয়েকজন ভদ্রলোক জড়ো করে এক একটি সভা করে আমাকে এবং আমেরিকাবাসিগণকে আমার প্রতি সহৃদয় ব্যবহার করার জন্য ধন্যবাদসহ প্রস্তাব পাশ করিয়ে, সেই প্রস্তাবটা দস্তরমতো নিয়মানুযায়ী অর্থাৎ সেই সেই সভার সেক্রেটারীকে দিয়ে আমেরিকায় ডঃ ব্যারোজের কাছে পাঠিয়ে তাঁকে সেখানকার বিভিন্ন কাগজে ছাপাতে অনুরোধ করা। ঐরূপ বোস্টন, নিউইয়র্ক ও শিকাগোর বিভিন্ন কাগজে পাঠানো বিশেষ কঠিন কাজ হবে না। এখন দেখছি, ভারতের পক্ষে এই কাজটা বড়ই গুরুতর ও কঠিন! এক বছরের ভেতর ভারত থেকে কেউ আমার জন্য একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত করলে না। আর এখানে সকলেই আমার বিপক্ষে। তোমাদের নিজেদের ঘরে বসে আমার সম্বন্ধে যা খুশি বল না কেন, এখানে তার কে কি জানে? দু-মাসেরও ওপর হলো আলাসিঙ্গাকে আমি এ বিষয়ে লিখেছিলাম, কিন্তু সে আমার চিঠির জবাব পর্যন্ত দিলে না। আমার আশঙ্কা হয়, তার উৎসাহ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সুতরাং তোমায় বলছি, আগে এ বিষয়টি বিবেচনা করে দেখ। তারপর মাদ্রাজীদের এ চিঠি দেখিও। ...হায়! যদি ভারতে একটা মাথাওয়ালা কাজের লোক আমার সহায়তা করার জন্য পেতাম![৪]

স্বামীজী তাঁর বন্ধু, জুনাগড়ের দেওয়ান, হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকেও জুন মাসে লিখলেন ঃ

আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, যারা আমার পেছনে লেগেছে পরোক্ষভাবে তারা আমার উপকার করেনি, বরঞ্চ আমার প্রভূত ক্ষতি করেছে, কারণ আমাদের হিন্দুরা আমেরিকানদের এ-কথা বলবার জন্যে একটি অঙ্গুলি নির্দেশও করেনি যে আমি তাদের প্রতিনিধি। আমাদের লোকেরা আমার প্রতি সদয় ব্যবহারের জন্যে আমেরিকাবাসীদের ধন্যবাদ জানিয়েছে কি? তাদের কি জানিয়েছে যে, আমি তাদের প্রতিনিধি? বরঞ্চ মজুমদার, বোম্বাইয়ের নাগরকর [প্রথম খণ্ড, ১৯২-৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য] এবং সোরাবজী নামক একজন খ্রীস্টান মহিলা আমেরিকানদের বলে চলেছে যে, আমি আমেরিকায় এসে সন্ন্যাসীর পোশাক পরেছি এবং আমি সোজাসুজিভাবে একটি বিশুদ্ধ প্রতারকমাত্র।[৫]

স্বামীজীর শত্রুদের তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম, খ্রীস্টধর্মপ্রচারকগণ, যাঁদের সুপরিকল্পিত আক্রমণের কাহিনী পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় হলো যাঁরা পূর্বোক্ত ধর্মপ্রচারকদের ন্যায় আমেরিকা এবং ভারত—উভয় দেশেই সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিলেন এবং যাঁদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন তাঁর দেশবাসী। যদিও আমেরিকাতে থিওসফিস্টদের সংখ্যা অধিক ছিল না, কিন্তু তাঁরা স্বামীজীর বিরোধিতা করার ব্যাপারে খুব সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন, খ্রীস্টান মিশনারিদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁকে প্রতি পদে পদে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। যতদিন তিনি পাশ্চাত্যে ছিলেন ততদিন তাঁর কাজকর্মের কি পরিমাণ ক্ষতি করার চেষ্টায় থিওজফিস্টরা লিপ্ত ছিলেন, এ বিষয়ে তিনি সর্বসাধারণের সমক্ষে কিছু বলেননি, কিন্তু ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর প্রথম প্রদত্ত ভাষণগুলির মধ্যে একটিতে—"আমার সমরনীতি" শীর্ষক বক্তৃতায় তাঁদের অশোভন কার্যকলাপের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেন।[৬]

এই ভাষণেই প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজী তাঁর অপর এক শত্রুরও নাম ঘোষণা করেন, তিনি হলেন "ভারতের একটি সমাজ সংস্কারক দলের নেতা।" স্বামীজী বললেন—"এই ভদ্রলোকটিকে আমি আমার শিশুকাল হতে জানতাম। তিনি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুদের অন্যতম ছিলেন। যখন তাঁকে দেখলাম—দীর্ঘদিন পরে প্রবাসে আমার একজন দেশবাসীকে দেখে খুবই আনন্দিত হলাম, আর তাঁরই কাছ থেকে আমি এই ব্যবহার পেলাম! যেদিন ধর্মমহাসভা আমাকে সহর্ষে অভিনন্দিত করল, যেদিন শিকাগোতে আমি জনপ্রিয় হলাম, সেদিন থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়ে গেল, তিনি অনুচিত উপায় গ্রহণ করে আমার ক্ষতিসাধন করার জন্যে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা করতে প্রবৃত্ত হলেন।"[৭]

এখানে যে ভদ্রলোকটির কথা বলা হয়েছে, তিনি হলেন ব্রাহ্মসমাজের একজন নেতা—প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। এই দলটিই ছিল স্বামীজীর শত্রুদের মধ্যে তৃতীয় দল, যে দলের প্রত্যেকেই ছিলেন তাঁর স্বদেশবাসী। এককভাবে দেখতে গেলে শ্রীযুক্ত মজুমদার ছিলেন তাঁর সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু। ঘোর বিদ্বেষ ও ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে তিনি স্বামীজীর খ্যাতি ও প্রভাব বিনষ্ট করার জন্য সর্ববিধ উপায় অবলম্বন করেছিলেন। কলকাতার নববিধান ব্রাহ্মসমাজের শীর্ষ নেতা এবং "ইউনিটি অ্যাণ্ড দি মিনিস্টার" পত্রিকার সম্পাদক এই ব্যক্তি ভারতে একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আমেরিকাতেও মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন, কারণ ধর্মমহাসভানুষ্ঠানের দশবছর আগে আমেরিকায়

বক্তৃতা দিয়ে তিনি বিপুল সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাছাড়া, পাশ্চাত্যে তাঁর "প্রাচ্যের খ্রীস্ট" শীর্ষক গ্রন্থখানির জন্য তিনি খ্যাত ছিলেন। বস্তুত, প্রাচ্যের সৌরভ মিশ্রিত একপ্রকার খ্রীস্টধর্ম প্রচার করে তিনি আমেরিকাতে একজন অধ্যাত্ম-আলোকে আলোকিত পুরুষরূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, এবং এই খ্যাতির উত্তাপ তিনি বেশ উপভোগ করেছিলেন।

ধর্মমহাসভায় মজুমদার ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিত্ব করতে এসে সাদর অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন। তাঁর একটি ভাষণে কলম্বাসের নামাঙ্কিত সভাকক্ষে বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলী এত অনুপ্রাণিত হয়েছিল যে, একযোগে উঠে দাঁড়িয়ে সমস্বরে গেয়ে উঠেছিল এই সঙ্গীতটি—"হে আমার প্রভু, আমাকে তোমার আরও নিকটে নিয়ে চল", এ-কথা আগের একটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে। কিন্তু স্বামীজীই সেদিনটিকে জয় করে নিয়েছিলেন। ধর্মমহাসভায় মজুমদারের ভাগ্য-নির্ধারক জ্যোতিষ্ক দৃশ্যত ম্লান হয়ে পড়ে, কারণ আমেরিকা একজন খাঁটি হিন্দুকে দেখতে পেয়েছিল, পরে প্রিন্স ওল্‌কোন্‌স্কি যে মন্তব্য করেছিলেন তদনুসারে দেখতে পেয়েছিল একজন "খাঁটি মানুষ"কে। জানুয়ারি মাসে স্বামীজী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখলেন—"প্রভুর ইচ্ছায় আমি এখানে শ্রীমজুমদারের সাক্ষাৎ পেলাম। প্রথমে তিনি আমার প্রতি খুবই প্রীতিপরায়ণ ছিলেন, কিন্তু যেই সমগ্র শিকাগোর জনসাধারণ আমার কাছে বিপুল সংখ্যায় ভিড় করে এল, তখনই শ্রীমজুমদারের অন্তর্দাহ শুরু হলো। ভাই, আমি এই সকল দেখে শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ধর্মমহাসভায় মজুমদার খ্রীস্টান মিশনারিদের নিকট আমার কুৎসা রটনা করলেন এই বলে যে, আমি কেউ নই, আমি একজন ঠগ, একজন প্রতারক এবং আমি এখানে এসে সন্ন্যাসীর ভান করছি। এইভাবে তিনি আমার বিরুদ্ধে তাদের মন বিরূপ করে তুলতে সফল হন। ধর্মমহাসভার সভাপতি ব্যারোজের মনকে এমন বিরূপ করে দেন যে তিনি আমার সঙ্গে কথা বলার সময়ও সৌজন্য দেখাননি। তাদের গ্রন্থ ও পুস্তিকাসমূহে তারা আমাকে যথেষ্ট তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছে, কিন্তু গুরু আমার সহায়, মজুমদার কি করবেন?"[৮]

ধর্মমহাসভানুষ্ঠানের অল্প পরেই মজুমদার দেশে ফিরে যান এবং সেখানে তিনি তাঁর আয়ত্তাধীন সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে স্বামীজীর দুর্নাম রটনা করতে প্রবৃত্ত হন। স্বামীজী ১৮৯৪-এর মার্চ মাসের কোন সময়ে তাঁর নিকট "কলকাতাস্থ ভ্রাতৃবৃন্দ"-লিখিত এক চিঠিতে এ বিষয়টি জানতে পারেন।

চিঠিতে বলা হয়েছে [তিনি এ-কথাগুলি ১৮ মার্চ ১৮৯৪-এ মেরী

হেলকে লেখেন] যে, মজুমদার কলকাতায় ফিরেছেন এবং ওখানে বসে বলে বেড়াচ্ছেন যে, বিবেকানন্দ ওদেশে যতরকম সম্ভব পাপকার্যে লিপ্ত হয়েছে, বিশেষত সর্বনিম্নস্তরের অপবিত্রতায়ও লিপ্ত হয়েছে!!! ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে আশীর্বাদ করুন—আপনি দুঃখ পাবেন না—আমার দেশে আমার চরিত্র সকলে অত্যন্ত ভাল করে জানে, বিশেষ করে আমার আজীবন সঙ্গী ভ্রাতৃবৃন্দ আমাকে এত ভাল করে জানে যে, তারা এসকল জঘন্য বাজে কথা কখনও বিশ্বাস করবে না। তারা মজুমদারের এ প্রচেষ্টাকে অত্যন্ত কৌশলহীন বলে হাসবে। এই হচ্ছে আপনার আমেরিকার আশ্চর্য আধ্যাত্মিক মানুষ!!—এ অবশ্য তাদের ত্রুটি নয় যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি সত্যই আধ্যাত্মিক না হয়ে উঠছে অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিজের অভ্যন্তরে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে সত্যকারের অন্তর্দৃষ্টি না উন্মুক্ত হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মিক জগতের এক ঝলক দর্শন না লাভ হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভুষি থেকে আসল বীজের পার্থক্য, বা বড় বড় কথা থেকে গভীরতার পার্থক্য বুঝে ওঠা কারো পক্ষে কখনও সম্ভব নয়...। এতটা নিচে নেমে যাবার জন্য আমার হতভাগ্য মজুমদারের ওপর করুণা হচ্ছে। সে বলছে যে, আমেরিকার মেয়েদের সঙ্গে আমি পশুবৎ অপবিত্র জীবন যাপন করছি!! বৃদ্ধ বালককে ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন। আমি আশা করছি আমেরিকার মেয়েরা আমাকে বেশি ভাল করে চেনেন।[১]

আমেরিকার মেয়েরা, অন্তত পক্ষে যাঁরা স্বামীজীর সঙ্গে উত্তমরূপে পরিচিত হয়েছিলেন, তাঁরা অবশ্যই তাঁকে বেশি ভাল জানতেন। তাঁরা তাঁর সর্বাপেক্ষা অধিক অবিচলিত ও বিশ্বস্ত সমর্থক ছিলেন, তাঁরা তাঁর পক্ষ সমর্থন করতে এগিয়ে এলেন, যেমন শ্রীমতী ব্যাগলি [অষ্টম অধ্যায়] এসেছিলেন। তাঁরা সচেষ্ট হয়েছিলেন এই নিন্দা রটনাকারীদের পুরোপুরি দমন করতে। এই নিন্দারটনাকারীরা মজুমদারের এবং খ্রীস্টান মিশনারিদের কথায় কর্ণপাত করে বেনামে স্বামীজীর বন্ধুদের স্বামীজীর সম্বন্ধে সাবধান করে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল এবং যদিও এই সকল কৌশল যাঁরা তাঁকে ভাল করে জানতেন না তাঁদের অনেককে প্রভাবিত করেছিল, কিন্তু তাঁর বন্ধুদের ওপর কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শ্রীযুক্ত হেল একখানি বেনামী এবং কলঙ্ক-আরোপে পূর্ণ চিঠি পেয়েছিলেন, যার মধ্যে তাঁকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল, তিনি তাঁর কন্যা ও ভাগিনীদের যেন হিন্দু সন্ন্যাসীর সঙ্গে মেলামেশা না করতে দেন। এই উপদেশ-বাণী পাঠ করে শ্রীযুক্ত হেল

চিঠিখানি যেমনটি লোকে কীটদষ্ট আবর্জনার ক্ষেত্রে করে থাকে, তেমনি করে অগ্নিকুণ্ডে সমর্পণ করেছিলেন।

যদিও যাঁরা তাঁকে জানতেন তাঁরা মুহূর্তের জন্যও স্বামীজীর সত্যনিষ্ঠা এবং আচরণে সন্দেহ করেননি, তিনি নিজেই লিখছেন—"আমি কি তা তো আমার ললাটেই লেখা আছে"—তাঁর মুখমণ্ডল হতে সত্যের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতো। কিন্তু তিনিও মাসের পর মাস ধরে এই দুশ্চিন্তা নিয়ে বাস করেছেন যে তাঁর যাঁরা শ্রেষ্ঠ বন্ধু তাঁরাও তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন, আরও খারাপ কথা তাঁরা ভাবতে পারেন, ভাবতে পারেন যে, তাঁরা প্রবঞ্চিত হয়েছেন এবং তাঁদের আতিথ্যের অপব্যবহার ঘটেছে। এ ভয় ছাড়াও, তাঁর সম্বন্ধে অসদাচরণ এবং অপবিত্র জীবন যাপনের কাহিনীসকল যার উৎস ছিলেন তাঁর জনৈক স্বদেশবাসী, তাঁর হৃদয়কে নিশ্চয়ই অত্যন্ত পীড়িত করেছিল। যিনি পবিত্রতম, তাঁর বিরুদ্ধে নৈতিক শৈথিল্যের অভিযোগ! যাঁরা তাঁকে ভালবাসেন তাঁদের নিকট এই সকল নোংরা অপবাদ রটনা তাঁদের হৃদয় নিশ্চয় ভেঙ্গে দিয়েছে—এ চিন্তাও তাঁকে ভয়ানক কষ্ট দিচ্ছিল। যে কথা তিনি এপ্রিলের ২৫।২৬ তারিখে ইসাবেল ম্যাককিণ্ডলিকে লিখেছিলেন—"এখন আমি, তারা—এমন কি আমার দেশবাসী, কি বলছে তা আদৌ গ্রাহ্য করি না—শুধু একটি বিষয় ছাড়া। আমার একজন বৃদ্ধা মা আছেন। তিনি সারাজীবন ধরে অনেক কষ্ট পেয়েছেন। তারই মধ্যে তিনি আমাকে ঈশ্বরের এবং মানুষের সেবায় দান করবার দুঃখও সহ্য করেছেন—তাঁর সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় যে, যে তাঁর আশাভরসার স্থলস্বরূপ, তাকেই তিনি এভাবে দান করেছেন। সেই সন্তানকে দূরদেশে এক পশুর মতো অনৈতিক জীবন যাপনের জন্য সমর্পণ করেছেন—কলকাতায় মজুমদার যা বলে বেড়াচ্ছেন—এ কথা জানলে তিনি একেবারে মরে যাবেন।"[১০]

মজুমদারের আচরণ স্বামীজীর গুরুভাইদের দুঃখ দিয়েছিল এবং উত্তেজিত করেছিল। তাঁরা তাঁকে বিষয়টি চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা এত দূরে ছিলেন যে, স্বামীজী এজন্য তাঁর নিজের যে বেদনা তা জানাননি, বরঞ্চ তাঁদের সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং তাঁদের শক্ত হতে সাহায্য করেছেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে তিনি লিখলেন (সম্ভবত মার্চ মাসে) "আমি মজুমদারের কাণ্ডকারখানার কথা জেনে দুঃখিত হলাম। সকলের ওপরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই লোকেরা এইরকম আচরণ করে থাকে। আমার কি দোষ!

মজুমদার এখানে দশ বছর আগে এসেছিলেন, এসে অনেক খ্যাতি ও সম্মান অর্জন করেছিলেন; এখন আমি খ্যাতির চূড়ায়। গুরুর এরূপ ইচ্ছা। আমি এর কি করব? মজুমদারের পক্ষে এতে ক্রুদ্ধ হওয়াই ছেলেমানুষী। কিছু মনে করো না। তোমাদের মতো বিরাট মানুষদের উচিত নয় তার কথায় কান দেওয়া। আমরা যারা রামকৃষ্ণের সন্তান, তাঁর হৃৎপিণ্ডের রক্তের দ্বারা যাদের পুষ্টিসাধন হয়েছে, তাদের কি উচিত এরূপ কীটদংশনে ভয় পাওয়া? 'দুষ্টলোক মহৎ মানুষের আচরণের সমালোচনা করে কারণ তাঁরা যে অসাধারণ, তাঁদের উদ্দেশ্য এরা বুঝে উঠতে পারে না।' এ কথা স্মরণ করে এই বোকা লোকটিকে তোমরা ক্ষমা কর।"[১১]

মজুমদার যে স্বামীজীর প্রকৃত চরিত্র এবং তাঁর পটভূমিকার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, তা নয় কিন্তু। তিনি তাঁকে যে শুধু অনেক বছর ধরে জানতেন, তাই নয়, এমন কি ধর্মমহাসভানুষ্ঠানের পনের বছর আগে তিনি তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকেও জানতেন। তাঁর পদপ্রান্তেও বসেছেন এবং সেই বিরাট ঋষির উচ্চ প্রশংসায় মুখর হয়ে বিশ্বাসযোগ্য একটি প্রবন্ধ লিখে প্রকাশ করেছেন। "সেই আশ্চর্য মানুষটি যেখানে যান, সেখানে যে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়—আমার মন এখনও সেই জ্যোতির্মণ্ডলে ভেসে বেড়াচ্ছে"—এ কথাগুলি মজুমদারের। "...এই অনুপম এবং পবিত্র মানুষটি হলেন হিন্দু ধর্মের গভীরতা ও মাধুর্যের জীবন্ত প্রমাণ। তিনি ইন্দ্রিয়জয়ী, চৈতন্যময়, ধর্মীয় সত্যতার পূর্ণ বিকাশে আনন্দময় এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ-ধন্য, পবিত্রতায় ভূষিত।... তাঁর নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা, তাঁর গভীর অনির্বচনীয় পুণ্যময়তা, তাঁর বিদ্যাশিক্ষা বিনা অর্জিত সীমাহীন জ্ঞান, তাঁর শিশুর মতো প্রশান্তি এবং সকল মানুষের প্রতি ভালবাসা, তাঁর সম্পূর্ণ, সর্বগ্রাসী ঈশ্বরপ্রেমই ছিল তাঁর একমাত্র পুরস্কার।... ধর্মজীবন সম্বন্ধে আমাদের নিজেদের ধারণা অন্যরকম; কিন্তু যতক্ষণ তাঁকে আমাদের মধ্যে পাওয়া যায়, আমরা তাঁর পদতলে বসে সানন্দে শিক্ষা করব পবিত্রতা, সংসার-রাহিত্য, আধ্যাত্মিকতা এবং ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হওয়ার মহান ভাবগুলি।"[১২]

ধর্মমহাসভার পরে স্বামীজী যে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধানতম শিষ্য—এই কথাটি উত্তমরূপে জানা সত্ত্বেও মজুমদার যখন তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করার অভিযানে ব্যাপৃত হন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিঘাত করে এই প্রবন্ধটি। কথিত আছে যে, আমেরিকায় কোন এক সান্ধ্য সমাবেশে মজুমদার যখন স্বামীজী ও তাঁর গুরু সম্পর্কে নিন্দামন্দ রটনা করছিলেন, তখন উপস্থিত

একজন আমন্ত্রিত ব্যক্তি তাঁকে তাঁর এই প্রবন্ধটি হাতে তুলে দিয়ে বলেন আপনিই কি এটি লিখেছিলেন ? উত্তরে মজুমদার কি বলেছিলেন তা লিপিবদ্ধ করা হয়নি। অবশ্য তাঁর বলবার মতো কথা সামান্যই ছিল।

ধর্মমহাসভার কালে খুব সম্ভবত স্বামীজী মজুমদারের প্রবন্ধটি পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করে বিতরণ করেছিলেন (দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য), কারণ এটাই ছিল তাঁর গুরুর সর্বশেষ এবং সর্বোত্তম মূল্যায়ন। কিন্তু সে যাই হোক না কেন, স্বামীজী যখন ২৮ জুন একজন ভারতীয় শিষ্যকে চিঠি লেখেন তখন সুনিশ্চিতরূপে এই প্রবন্ধটির কথাই উল্লেখ করেছেন—"কথায় কথায় বলি, তুমি কি দয়া করে মজুমদাবের লেখা রামকৃষ্ণ-জীবনের রূপরেখার কয়েকটি কপি শিকাগোতে পাঠাবে ? কলকাতায় এর কপি অনেক আছে।"[১৩] নিঃসন্দেহে স্বামীজী তাঁর বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আরও জানতে চেয়েছিলেন, তাঁদের শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের এই রূপরেখাটি দিতে চেয়েছিলেন। সম্ভবত তিনি এ কথাটি সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন না যে, মজুমদারের কুৎসা রটনার সবচেয়ে ভাল জবাব হলো এই প্রবন্ধটি। কপিগুলি তাঁর নিকট সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি পৌঁছয়, শ্রীমতী হেল এগুলি বোস্টনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এগুলির প্রাপ্তিস্বীকার করে তিনি লিখেছেন ঃ

"বাণ্ডিলগুলি ভালভাবে এসে পৌঁছেছে। একটি হলো ভারত হতে প্রাপ্ত সংবাদপত্রসমূহের। অপরটি হলো দীর্ঘকাল আগে প্রকাশিত মজুমদারের লেখা আমার গুরুদেবের জীবনের রেখাচিত্র। দ্বিতীয় বাণ্ডিলে প্রকৃতপক্ষে দুটি পুস্তিকা আছে। একটি হলো আমার গুরুদেবের জীবনের রূপরেখা, অপরটি হলো একটি উদ্ধৃতি যাতে দেখা যায় কিভাবে শ্রীযুক্ত [কেশব] চন্দ্র সেন এবং মজুমদার যা 'নববিধান' বলে প্রচার করতেন, তা আমার গুরুদেবের জীবন থেকে চুরি করে নেওয়া। সুতরাং পরবর্তী পুস্তিকাটি বিতরণ করবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমি আশা করি আপনি আমার গুরুদেবের জীবনীটি সজ্জনদের মধ্যে বিতরণ করবেন।

"আমি অনুরোধ জানাচ্ছি শ্রীমতী গার্নসি, হাডসনের ফিসকিল, নিউ ইয়র্কের শ্রীমতী আর্থার স্মিথ এবং নিউ ইয়র্কের ১৯নং ওয়েস্ট থার্টি-এইট স্ট্রীট-এ শ্রীমতী ফিলিপসকে এটি পাঠাবেন। পাঠাবেন ম্যাসাচুসেট্সের অ্যানিস্কোয়ামে শ্রীমতী ব্যাগলিকে এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক ভাষার অধ্যাপক জন. রাইটকে ম্যাস্যাচুসেট্সে।

"সংবাদপত্রগুলির কেটে নেওয়া অংশগুলি নিয়ে আপনার যা ইচ্ছা

তাই করবেন এবং আশা করি আমার সম্পর্কে লেখা ভারতীয় সংবাদপত্রের কাটা অংশ পেলে আমাকে পাঠিয়ে দেবেন।"[১৪]

মজুমদারের আক্রমণাত্মক প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটি—যাতে স্বামীজীকে উচ্ছৃঙ্খল ভণ্ড বলা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে যে, তিনি একটি মনগড়া হিন্দুধর্ম প্রচার করছেন, যেটি ইউনিটি অ্যাণ্ড মিনিস্টার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং যেটি যে-ব্যক্তিই কোন না কোন কারণে তাঁর খ্যাতি নষ্ট করতে চেয়েছে, সে-ই উদ্ধৃত করেছে—সেটি আমেরিকার কাছে প্রথম পৌঁছয় বোস্টন ডেইলী অ্যাডভার্টাইজার পত্রিকার ১৬ মে ১৮৯৪ সংখ্যার নিম্নলিখিত প্রবন্ধের মাধ্যমে ঃ

ভারত হতে আগত দিব্যপুরুষ

*অনতিকাল পূর্বে বোস্টনের নিকটবর্তী অঞ্চলে আগ্রহ ও চর্চার বিষয় হয়েছিল বৌদ্ধধর্ম। কিন্তু যেমন প্রায় এক হাজার বছর আগে ভারতে বৌদ্ধধর্মকে অপসারিত করে খাঁটি হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, মনে হচ্ছে ঠিক সেইরকম করে বোস্টনের জনসাধারণের আগ্রহ বৌদ্ধধর্মকে অপসারিত করে হিন্দুধর্মের প্রতি সঞ্চারিত হয়েছে। এটি আংশিকভাবে ঘটেছে হিন্দু সন্ন্যাসী **বিবেকানন্দের** উপস্থিতি ও বক্তৃতাদির জন্য, যিনি পূর্বে ধর্মমহাসভায় প্রচুর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন।*

*ভারতে তিনি কতখানি সম্মানিত তার প্রমাণস্বরূপ তিনি মাদ্রাজের পাচিয়াপ্পা মহাবিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের একজন অধ্যাপকের লেখা একটি চিঠি উপস্থাপিত করেছেন। ভারত এত দূরবর্তী এক দেশ যে, স্বাভাবিকভাবেই খুব অল্প লোকই জানবে যে, পাচিয়াপ্পা মহাবিদ্যালয় হলো খ্রীস্টবিরোধীদের একটি কেন্দ্র এবং **ব্রাডলাফ** এবং **ইঙ্গারসোল** প্রকাশনা সংস্থার প্রকাশিত পুস্তকাদি হতে সেই প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ তাদের খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে ধারণা গঠন করে এবং তাকে আক্রমণের জন্য তথ্যাদিও সংগ্রহ করে থাকে। যদিও ভারতে তিনি কতখানি সম্মানিত সে সম্বন্ধে এরকম একটি প্রমাণ তিনি দাখিল করেছেন, তথাপি আমরা বিশ্বাস করি **বিবেকানন্দ** এ দেশে প্রকাশ্যে এই চূড়ান্ত খ্রীস্ট-বিরোধী জড়বাদ হতে তাঁর মতানৈক্য প্রকাশ করেছেন।*

__বিবেকানন্দের__ প্রতি ধর্মমহাসভায় কতখানি মনোযোগ দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে সংবাদ যখন ভারতে পৌঁছল, তখন স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয়

সংবাদপত্রসমূহ সে বিষয়ের ওপর এবং তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতাদির ওপর মন্তব্য প্রকাশ করল। ভারতের সংবাদপত্রসমূহের উক্ত মন্তব্যগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি আমরা লক্ষ্য করেছি ঃ দ্য ক্রিস্টিয়ান প্যাট্রিয়ট, ভারতীয় খ্রীস্টান সম্প্রদায় কর্তৃক সম্পাদিত দক্ষিণ ভারতের খ্রীস্টানদের মুখ্য সংবাদপত্র ; এর সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে একজন কেম্ব্রিজের স্নাতক আছেন। এই পত্রিকাটি ১৮৯৩-এর ৭ ডিসেম্বর তারিখে লেখে ঃ

"যদিও আমেরিকার সংবাদপত্রগুলি শিকাগো ধর্মমহাসভায় **বিবেখানন্দ স্বামী** নাম নিয়ে আবির্ভূত তরুণ হিন্দু সন্ন্যাসীকে ব্রাহ্মণ আখ্যা দিয়েছে—এবং এই ভুল সংবাদটি আবার আমাদের সহযোগী বেঙ্গলী পত্রিকা কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে, কিন্তু আমরা নিশ্চিতরূপে জানি যে, সে ব্রাহ্মণ নয়। সে কলকাতা উচ্চ-আদালতের আইন ব্যবসায়ী সিমুলিয়া পল্লী নিবাসী পরলোকগত বাবু **তারানাথ দত্তের** পুত্র বাবু (অর্থাৎ মিস্টার) **নরেন্দ্রনাথ দত্ত** ছাড়া আর কেউ নয়। বাবু **নরেন্দ্রনাথ দত্ত** কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী স্নাতক এবং কেবলমাত্র সম্প্রতি সে সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করেছে।"

কলকাতার ইণ্ডিয়ান ইভেঞ্জেলিক্যাল রিভিউ পত্রিকা এপ্রিল মাসের সংখ্যায় মন্তব্য করেছে ঃ "শিকাগো থেকে সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা কলকাতাবাসীরা জানতামই না যে, আমাদের মধ্যে এমন একজন প্রতিভাধর বরপুত্র আছেন, এখন মনে হচ্ছে যে আছেন। এ ঘটনা **যিশুরই** একটি কথার সত্যতা প্রমাণিত করে—'একজন দিব্যপুরুষ তাঁর দেশ ছাড়া অন্যত্র সম্মান না পেয়ে থাকেন না।' এর চেয়েও বড় কথা, খ্রীস্ট ধর্মের সত্যতার প্রমাণ আমরা স্বামীর মধ্যেই পেয়েছি। তিনি হিন্দুধর্ম বলে যা প্রচার করেছেন এবং যা তাঁর কথাগুলিকে শক্তি-সমন্বিত করেছে এবং প্রভাব সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে তা হলো খ্রীস্ট ধর্মোক্ত সত্যের মিশ্রণ যা কলকাতায় একটি খ্রীস্টান মিশনারি কলেজে বিদ্যালাভ করার কালে তিনি শিক্ষা করেছেন। এ সত্য হলো (১) মানুষের ভ্রাতৃত্ব এবং (২) মানুষের বিবেকের ওপর ঈশ্বরের প্রভুত্ব। যে হিন্দুধর্ম তিনি প্রচার করছেন বলে ঘোষণা করছেন তার ভিত্তি গড়ে উঠেছে এর বিপরীত একটি ভ্রান্ত মতের ওপর। হিন্দুধর্মের জাতিভেদপ্রথা এ দুটিরই বিরোধিতা করে। যারা উক্ত দুটি আদর্শের প্রভাবপুষ্ট হয়ে কাজ করে, তাদের তারা নির্যাতন করে অবশ্য যতদূর খ্রীস্টধর্মাবলম্বী সরকার তাদের তা করতে অনুমতি দেয়। যে ব্যক্তি অপর একজন মানব-ভ্রাতার

সঙ্গে আহার করে এবং তার ধর্মীয় কর্তব্য সম্বন্ধে আলোকিত বিবেকের নির্দেশ মেনে চলে এবং খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হয়, সারা ভারতে সে হিন্দুধর্মের দ্বারা দেহমনের মৃত্যুর বিধান মাধ্যমে নির্যাতিত হয়; তথাপি এই বাবুটি সমুদ্র ও নানা মহাদেশ অতিক্রম করে গিয়ে ধর্মমহাসভায় গিয়ে বলছে যে হিন্দুরা কাউকে নির্যাতন করে না এবং হিন্দুরা সকল মানুষকে ভ্রাতৃসম জ্ঞান করে ভালবাসে!"

নিম্নলিখিত অংশটি ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার যে শাখার নেতৃস্থানীয় সদস্য, তাদের মুখপত্র কলকাতা হতে প্রকাশিত ইউনিটি অ্যাণ্ড মিনিস্টার থেকে উদ্ধৃত ঃ

*"ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকা নব্য হিন্দু বাবু **নরেন্দ্রনাথ দত্ত** ওরফে বিবেখানন্দের প্রশংসা করে সাম্প্রতিক কয়েকটি সংখ্যায় সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখেছে। ঐ সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্যে এই স্তুতি প্রকাশে আমাদের কোন আপত্তি নেই, কিন্তু যেদিন থেকে সে নববৃন্দাবন রঙ্গমঞ্চে নাটকাভিনয়ের জন্য আমাদের নিকট এসেছিল, কিম্বা এই শহরে কোন একটি ব্রাহ্মসমাজে উপাসনাকালে সঙ্গীত পরিবেশন করত, তখন থেকে আমরা তাকে এত ভালভাবে জানি যে, সংবাদপত্রে যতই লেখা হোক না কেন, তার চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের যে বিচার সে বিষয়ে কোন নতুন আলোকপাত করতে পারবে না। আমরা আনন্দিত যে, আমাদের বন্ধু সম্প্রতি আমেরিকায় বক্তৃতাদি করে উত্তম প্রভাব সৃষ্টি করতে পেরেছেন, কিন্তু আমরা জানি যে, নব্য-হিন্দুধর্ম সনাতন হিন্দু ধর্ম নয়। শেষোক্ত সনাতন হিন্দুধর্মাবলম্বিগণ কখনও কালাপানি (সমুদ্র) পার হবে না, কখনও ম্লেচ্ছ আহার (বেজাতের অর্থাৎ খ্রীস্টান ও বিদেশীদের খাদ্য) গ্রহণ করবে না বা ছেদহীনভাবে ধূমপান এবং আনুষঙ্গিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করবে না। যে শ্রদ্ধা আমরা একজন খাঁটি হিন্দুকে দিয়ে থাকি, আধুনিক হিন্দুধর্মের অনুসরণকারীরা আমাদের কাছ থেকে সেই শ্রদ্ধা কখনও পাবে না। আমাদের সহযোগী **বিবেখানন্দের** খ্যাতি বাড়াবার জন্য তাঁর সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা নিয়োগ করতে পারেন, কিন্তু যখন তিনি সুস্পষ্টরূপে বাজে কথা ছেপে বার করবেন, তখন আমাদের সেগুলির জন্য কোন ধৈর্য নাও থাকতে পারে।"*

এইসবগুলি একত্রিতভাবে অনেককিছুর মধ্যে কয়েকটি জিনিস উদ্ঘাটিত করে যে, এই পৃথিবীর অন্যান্য অংশের মতো ভারতেও মনুষ্য প্রকৃতি একেবারে এক। হিন্দুধর্ম একটি নানা অর্থজ্ঞাপক শব্দ

*এবং খ্রীস্ট ধর্মের দুটি পৃথক উপস্থাপনা সমান সত্য হয়েও কিরূপ বিপুল পরিমাণে পৃথক হতে পারে তা স্মরণে রাখলে আমাদের এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, হিন্দুধর্ম বলতে **বিবেখানন্দ** যা বোঝেন, তা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার যা বোঝেন তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। গত গ্রীষ্মকালে শিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রাচ্যদেশীয় ধর্মমত সম্বন্ধে যে প্রবল প্রভাব-সৃষ্টিকারী এবং হর্ষধ্বনি দ্বারা সমর্থিত বক্তব্য উপস্থাপিত করা হয়েছে তা দেশের মাটিতে গোঁড়া সমর্থকেরা যা হিন্দুধর্ম বলে গ্রহণ করে থাকে তার থেকে বহুলাংশে ভিন্ন কিংবা এদেশে আগত হিন্দুগণ বা প্রাচ্যদেশীয়গণ অনেক ক্ষেত্রেই যে-সকল ধারণা প্রকাশ করেছেন যা খ্রীস্ট ধর্মের সঙ্গে তুলনীয় তা প্রকৃতপক্ষে, যদিও অসচেতনভাবে, খ্রীস্ট ধর্মীয় প্রচার-সংস্থা ও বিদ্যালয় থেকে আত্মস্থ করা হয়েছে—এ ব্যাপারে আমাদের নিকট সাক্ষ্য প্রমাণ এই যে প্রথম পৌঁছল তা কিন্তু নয়।*

স্বামীজীর প্রতি খ্রীস্টানগণ যা কিছু উৎক্ষিপ্ত করেছে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এ প্রবন্ধটি—যা ডেট্রয়েট ফ্রি প্রেস পত্রিকার ও চিঠিপত্র বিভাগে ১১ জুন তারিখে অক্ষরে অক্ষরে একেবারে হুবহু একরকম ছাপা হয়েছিল, এবং ১৮ মে তারিখের লরেন্স আমেরিকান পত্রিকায় উদ্ধৃত এবং আরও বিপুল সংখ্যক পাঠকদের দ্বারা পঠিত পত্র-পত্রিকায়ও ছাপা হয়েছিল, যার মধ্যে ছিল ৯ জুন তারিখে লাইম্যান অ্যাবোটের আউটলুক পত্রিকা, যা স্বামীজী হয়ত একজন 'প্রবঞ্চক', আমেরিকায় ক্রমবর্ধিষ্ণু এই সন্দেহ নিরাকরণ করতে সাহায্য করেনি। অন্যান্য অনেক বিষয়ের মধ্যে শ্রীযুক্ত মজুমদার তাঁর ইউনিটি এ্যাণ্ড মিনিস্টার পত্রিকার যে অনুচ্ছেদে নরেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে বিবেখানন্দের নব-বৃন্দাবন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করার কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানে এ কথা উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছেন যে—তিনি সেখানে সৎসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। কারণ একই নাটকে কেশবচন্দ্র সেনও অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া ব্রাহ্মসমাজের যে শাখার প্রধান ছিলেন কেশব, তারই একনিষ্ঠ সদস্যবৃন্দ এই ধর্মীয় নাটকটির প্রযোজনা করেছিলেন। সন্দেহ হয় স্বামীজীর যে-সকল শত্রু ইউনিটি অ্যাণ্ড মিনিস্টার থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তারা এই তথ্যগুলি জানতেন না, কারণ এ তথ্যগুলি ধরলে মজুমদার কর্তৃক বিবেকানন্দের বিষয় উল্লেখ করার তাৎপর্য পালটে যায়। কোন কোন আমেরিকান অবশ্য ভাল করে খবর রাখতেন, তারা মাথা ঠিক রেখেছিলেন, যা নিম্নলিখিত অস্বাক্ষরিত পত্রটি দ্বাবা প্রমাণিত হয়, পত্রটি বোস্টন ডেইলী অ্যাডভার্টাইজার পত্রিকায় ১৭মে তারিখে প্রকাশিত হয় ঃ

বিবেকানন্দ

সম্পাদক, অ্যাডভার্টাইজার সমীপেষু ঃ আপনার পত্রিকায় স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যে উদ্ধৃতিগুলি প্রকাশিত হয়েছে, তা কোন কোন জায়গায় জনসাধারণকে, বিশেষ করে যারা প্রতিটি লাইন ভাল করে পড়েনি, তাদের ভুল পথে চালিত করতে পারে।

যে উদ্ধৃতিগুলি ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহ হতে উদ্ধার করে দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে একটি ছাড়া আর সবগুলি খ্রীস্টধর্মপ্রচারকদের উক্তি হতে উদ্ধৃত। ব্যতিক্রম যে একটি পত্রিকা, সেটি সম্পাদনা করেন মজুমদার, যিনি ধর্মমহাসভায় 'ব্রাহ্মধর্ম'মতের প্রতিনিধিত্ব করেন, কিন্তু হিন্দুধর্মের কোন শাখা বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত নন।

তাছাড়া এই উক্তিগুলি নেওয়া হয়েছে বিবেকানন্দকে যাঁরা প্রশংসা করছেন এবং তাঁর মতকে যারা পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন এমন কয়েকটি 'হিন্দু' পত্রিকা যথা 'ইণ্ডিয়ান মিরর', 'বেঙ্গলী' প্রভৃতিকে আক্রমণ করে যে সকল প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল, সেগুলি থেকে। আমার হাতের কাছে কলকাতা থেকে প্রাপ্ত সেই সকল 'হিন্দু' পত্রিকাসমূহ রয়েছে, এবং এরূপ দুটি মুখ্য পত্রিকা 'ইণ্ডিয়ান মিরর', যেটি একটি হিন্দুর দ্বারা সম্পাদিত এবং নিঃসন্দেহে একটি মুখ্য পত্রিকা এবং আর একটি কলকাতার কাগজ 'অমৃতবাজার ফাব্রিকু' [পত্রিকা], যার সারা ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক রাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে এবং যেটি একজন হিন্দুর দ্বারা সম্পাদিত; এ দুটি কাগজ থেকে আমি দুটি উদ্ধৃতি পাঠাচ্ছি।

"আমরা এমন একটি মানুষকে চাইছিলাম যিনি ধর্মমহাসভাকে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে এমনভাবে আলোকিত করতে পারবেন যাতে সভ্যসমাজের নিকট এ ধর্ম তার সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, কেবলমাত্র তাই-ই নয়, এ ধর্মের প্রতি অন্যান্য ধর্মমতের আধ্যাত্মিক মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের শ্রদ্ধাও আকৃষ্ট হয়। যখন আমাদের নিকট বিবেখানন্দ সম্বন্ধে বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদগুলি পৌঁছল, তখন সকল ঘটনার যিনি নিয়ন্তা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমাদের হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেল এই ভেবে যে, তিনি তাঁর অচিন্ত্য উপায় দ্বারা ঠিক সময়ে ঠিক লোকটিকে যথাস্থানে উপস্থিত করেছেন। সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে এজন্য স্বামীজীকে অভিনন্দন জানাই যে, হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর উপর ন্যস্ত দায়টি বহন করবার পক্ষে যোগ্য বলে তিনি

নিজেকে প্রমাণিত করেছেন এবং এমন সুষ্ঠুভাবে তিনি তাঁর কর্তব্যকর্মটি সম্পাদিত করেছেন যে, সমগ্র হিন্দুজাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।"

"যাঁরা কেবল শুনে এসেছেন হিন্দুরা শয়তানের উপাসক, তাঁদের হিন্দুধর্মের সঙ্গে যথার্থ পরিচয় করে দিয়েছে সুপ্রসিদ্ধ রামকৃষ্ণ তরণহংসের (পরমহংস) শিষ্য প্রথিতযশা বিবেখানন্দের ভাষণাবলী।"

সুতরাং একথা সুস্পষ্ট যে, হিন্দুরা তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তিনিও কখনো খ্রীস্টধর্ম বা ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করছেন এমন ভাব দেখান নি।

ইতি আপনাদের বিশ্বস্ত

'এস্' [S]

যদিও 'এস' এবং হয়তো আরও কিছু অল্পসংখ্যক ব্যক্তি যাঁরা হিন্দুদের সংবাদপত্রসমূহ দেখেছিলেন তাঁরা দ্রুত স্বামীজীর পক্ষ সমর্থন করতে অগ্রসর হয়ে এলেন, কিন্তু আমেরিকায় উদ্ধৃত হচ্ছিল কেবলমাত্র তাঁর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন কাগজগুলি থেকেই, তাঁর প্রতি অনুকূলভাবাপন্ন কাগজ থেকে নয়। তাঁর কিছু স্বদেশবাসী অন্ততপক্ষে তখনকার জন্য, তার প্রতি কার্যত বিশ্বাসভঙ্গ করেছিলেন এবং সরকারিভাবে তাঁর সাহায্যার্থে কেউই এগিয়ে আসেননি। ২৮ জুন তারিখে স্বামীজী লিখছেন—"প্রতি মুহূর্তেই আমি ভারত থেকে কিছু পাবার আশা করছিলাম। না, এ সাহায্য কখনও এল না। বিশেষ করে গত দুমাস প্রতিটি মুহূর্ত আমার ভয়ানক মনোকষ্টে কেটেছে। ভারত থেকে একটি সংবাদপত্রও আসেনি। [একই চিঠিতে 'আলাসিঙ্গা প্রেরিত তিন বর্গ ইঞ্চি পরিমাণ যে কাগজের টুকরো'টির কথা তিনি নিজে উল্লেখ করেছেন সেটি ছাড়া] আমার বন্ধুরা অপেক্ষা করেছে—মাসের পর মাস অপেক্ষা করেছে, কিন্তু কিছুই আসেনি, একটি শব্দও আমার স্বপক্ষে উচ্চারিত হয়নি। ফলে অনেকে আমার সম্পর্কে শীতল হয়ে গেলেন এবং পরিশেষে আমাকে পরিত্যাগ করলেন। কিন্তু এ হলো মানুষের তথা পশুদের উপর নির্ভর করার শাস্তি—কারণ আমার দেশবাসীগণ এখনও মানুষ হয়নি। তারা প্রশংসালাভের জন্য প্রস্তুত, কিন্তু যখন তাদের দিক থেকে কিছু বলার প্রয়োজন হয়, তখন তারা একটি কথাও বলে না—তখন তাদের কোথাও দেখাই যায় না।"[১৫]

॥ ২ ॥

এই মাসগুলি ছিল স্বামীজীর মর্ম যাতনার মাস—এই মাসগুলিতে তাঁর

মাতৃভূমি [অন্তত্পক্ষে তিনি তাই মনে করেছিলেন] তাঁর সাহায্যার্থে একটি আঙ্গুলও তোলেনি, কিন্তু তিনি দ্বিধাহীনভাবে দেশের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া পরিত্যাগ করেননি। আমি বিশ্বাস করি না যে, এ বিষয়ে তাঁর সংগ্রামের রূপ যথার্থভাবে পুরোপুরি উপলব্ধি করা হয়েছে। ইতোপূর্বে তাঁর অধ্যাপক রাইটকে লেখা কয়েকটি অপ্রকাশিত চিঠি হতে জানা যায় যে, তাঁর শত্রুগণের দ্বারা কুৎসা রটনায় তাঁর বন্ধুগণ তাঁকে প্রতারক বলে মনে করবেন এই সর্বক্ষণের সম্ভাবনার দ্বারা তিনি কী গভীরভাবে বিচলিত হয়েছিলেন। অধ্যাপককে তাঁর নিজে কথা দেওয়া ছাড়াও তিনি অধ্যাপকের বন্ধুত্ব এবং বিশ্বাসের যোগ্যতা প্রমাণ করবার জন্য সকলপ্রকার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রমাণ পাঠিয়ে যাচ্ছিলেন। এটা কখনও হতেই পারে না যে, ডঃ রাইট স্বামীজীকে সন্দেহ করেছিলেন। কিন্তু ওপরে উদ্ধৃত বোস্টন ইভনিং এ্যাডভার্টাইজার পত্রিকার প্রবন্ধটি প্রকাশের পর স্বামীজী তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি যে মিথ্যা, তা প্রমাণ করবার জন্য বাধ্যবাধকতা অনুভব করলেন। ২৪ মে-র আগে বোস্টন থেকে নিম্নলিখিত চিঠিখানি লেখেন—(যে তাবিখে, তাঁর অধ্যাপককে লেখা পরবর্তী চিঠি হতে আমরা জানতে পারি যে, তিনি শিকাগোতে উপস্থিত ছিলেন) ঃ

১৭নং বিকন স্ট্রীট

প্রিয় অধ্যাপকজী,

এতদিনে আপনি নিশ্চয়ই পুস্তিকাটি এবং চিঠিগুলি পেয়েছেন। আপনি যদি চান, আমি আপনাকে শিকাগো থেকে ভারতীয় রাজা এবং মন্ত্রিগণের লেখা চিঠি—এঁদের মধ্যে একজন মন্ত্রী রয়াল কমিশনের অধীনস্থ অহিফেন কমিশনের সদস্য ছিলেন—পাঠিয়ে দিতে পারি। আপনি যদি চান আমি তাঁদের লিখব আমি যে একজন প্রবঞ্চক নই সে বিষয়ে আপনাকে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য লিখতে। কিন্তু হে ভ্রাতঃ আমাদের জীবনের আদর্শ হলো নিজেকে লুকিয়ে রাখা, চেপে রাখা এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে অস্বীকার করা।

আমাদের সব ছাড়বার কথা, গ্রহণ করবার কথা নয় কোন কিছুই। যদি আমার 'প্রিয় ধারণাটি' আমার মাথায় না থাকত তাহলে আমি কখনও এখানে আসতাম না। আমি ধর্মমহাসভায় যোগদান করেছিলাম এই আশা নিয়ে যে, এতে আমার কাজের সহায়তা হবে—বস্তুত আমার দেশের

লোকেরা প্রথম প্রথম যখন আমাকে এদেশে পাঠাতে চেয়েছিল, আমি সর্বদা প্রত্যাখ্যান করেছি! আমি এসেছিলাম তাদের এই কথা বলে যে—"আমি ঐ সমাবেশে যোগদান করতেও পারি, নাও করতে পারি, এরপরেও যদি তোমরা চাও তো আমাকে পাঠাতে পার।" তারা আমাকে পাঠিয়েছে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে।

বাকি সব আপনি করেছেন।

হে আমার দয়ালু বন্ধু, আমি আপনার এ বিষয়ে সন্তোষ উৎপাদনের জন্য নৈতিকভাবে বাধ্য—বাকি পৃথিবীকে আমি গ্রাহ্য করি না—একজন সন্ন্যাসীর আত্মপক্ষ সমর্থন করতে নেই। সুতরাং আমি প্রার্থনা জানাচ্ছি আপনি ঐ পুস্তিকাটি বা চিঠিগুলি কোনমতে প্রকাশ করবেন না বা ওগুলি থেকে কোন কিছু কাউকে দেখাবেন না, প্রাচীনপন্থী ধর্মযাজকদের যে চেষ্টা তাকে আমি গ্রাহ্য করি না, কিন্তু মজুমদারকে যে ঈর্ষার জ্বর আক্রান্ত করেছে, তা আমাকে ভয়ানক আঘাত দিয়েছে এবং আমি আশা করছি তিনি উত্তমরূপে সব বুঝবেন—কারণ সারা জীবন তিনি একজন মহান এবং সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন এবং লোকের কল্যাণ সাধন করবার প্রয়াস করেছেন! কিন্তু এ ঘটনা আমার গুরুদেবের একটি কথা প্রমাণ করছে—"কালির ঘরে বাস করলে—তুমি ঠেকাতে যতই চেষ্টা কর না কেন, তোমার কাপড়ে কালি লাগবেই।"

সুতরাং একজন পবিত্র এবং সৎ থাকতে যতই চেষ্টা করুক না কেন—সংসারে বাস করলে—তার কিছুটা অধঃপতন হবেই।

ঈশ্বরের পথ সংসারেব বিপরীতমুখী এবং অল্প—খুবই অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই—ঈশ্বর এবং সংসার—উভয়কে একই সঙ্গে পেয়ে থাকে।

আমি জীবনে কখনো ধর্মপ্রচারক ছিলাম না এবং কখনো হবও না—আমার স্থান হচ্ছে হিমালয়ে—আমি এ পর্যন্ত এই সন্তোষ লাভ করেছি যে, পূর্ণ বিবেকের সঙ্গে দ্বিধাহীনভাবে আমি বলতে পারি—"হে আমার ঈশ্বর আমি আমার ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে ভয়ঙ্কর কষ্ট দেখেছি এবং অনুসন্ধান করেছি পরিত্রাণের পথ এবং তা খুঁজে পেয়েছি; আমি সেই পন্থা প্রয়োগ করবার প্রয়াস করেছি, কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয়েছি—সুতরাং তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"

তাঁর আশীর্বাদ আপনার ও আপনার পরিজনদের ওপর চিরদিন সতত বর্ষিত হোক—

আপনার স্নেহধন্য
বিবেকানন্দ

৫৪১ ডিয়ারবর্ন অ্যাভিনিউ শিকাগো
আমি কাল কিংবা পরশু শিকাগো যাচ্ছি

আপনার[১৬]
বিঃ

স্বামীজী যে পুস্তিকাটির কথা এখানে উল্লেখ করেছেন চিঠি লেখার পূর্বেই সেটি পাঠিয়েছেন বলে, নিঃসন্দেহে সেটি হচ্ছে সেই পুস্তিকাটি যেটির সম্বন্ধে ২৬ এপ্রিল তারিখে তিনি ইসাবেল ম্যাককিণ্ডলিকে লিখেছেন "আমার সম্বন্ধে কলকাতা হতে প্রকাশিত পুস্তিকা—যাতে প্রকাশিত এই কথা যে, আমি আমার জীবনে অন্তত একবার ঈশ্বরের দূত হিসাবে নিজের দেশে সম্মানিত হয়েছি।" কিন্তু স্পষ্টত পুস্তিকা বা চিঠিপত্র অধ্যাপককে পুরোপুরি সন্তুষ্ট করেনি, অন্ততপক্ষে স্বামীজীর তাই মনে হয়েছে কারণ শিকাগো থেকে লিখিত দ্বিতীয় একটি চিঠিতে তিনি ভারতে যে তাঁর উচ্চ সম্মান রয়েছে সে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ জুড়ে দিয়েছেন। তাঁর "শ্রীযুক্ত মজুমদারের দলের নেতা" কথাটির উল্লেখ অবশ্য প্রয়াত কেশবচন্দ্র সেন সম্পর্কে যিনি কলকাতায় ব্রাহ্মসমাজের একজন নেতা ছিলেন। নিম্নলিখিত পত্রটিতে আমরা প্রথম জানলাম যে, কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে স্বামীজীর ধারণা খুব উচ্চ ছিল না, যদিও কেশব শ্রীরামকৃষ্ণের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন।

প্রিয় অধ্যাপকজী,

এইসঙ্গে আমি আপনাকে রাজপুতানার অন্যতম শাসক মহামান্য খেতড়ির মহারাজের পত্র পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেইসঙ্গে ভারতের অন্যতম বৃহৎ দেশীয় রাজ্য জুনাগড়ের প্রাক্তন মন্ত্রীর পত্রও পাঠালাম। ইনি আফিং কমিশনের একজন সদস্য এবং 'ভারতের গ্লাডষ্টোন' নামে খ্যাত। মনে হয় এগুলি পড়লে আপনার বিশ্বাস হবে যে—আমি প্রতারক নই।

একটা কথা আপনাকে বলতে ভুলে গেছিলাম। আমি কখনই মিঃ মজুমদারের 'নেতা'র মতাবলম্বী হই নি। যদি মজুমদার তেমন কথা বলে থাকেন, তিনি সত্য বলেন নি।

চিঠিগুলো পড়ার পর আশাকরি অনুগ্রহ করে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। পুস্তিকাটির কোন দরকার নেই, ওটার কোন মূল্য দিই না।

প্রিয় বন্ধু, আমি যে যথার্থই সন্ন্যাসী, এ বিষয়ে সর্বপ্রকারে আপনাকে আশ্বস্ত করতে আমি দায়বদ্ধ। কিন্তু সে কেবল 'আপনাকেই'। বাকি নিকৃষ্ট লোকেরা কি বলে না বলে, আমি তার পরোয়া করি না।

'কেউ তোমাকে বলবে সাধু, কেউ বলবে চণ্ডাল, কেউ বলবে উন্মাদ, কেউ বলবে দানব, কোনদিকে না তাকিয়ে নিজের পথে চলে যাও'।—এই কথা বলেছিলেন বার্ধক্যে সন্ন্যাসগ্রহণকারী রাজা ভর্তৃহরি—ভারতের একজন প্রাচীন সম্রাট ও মহান্ সন্ন্যাসী।

ঈশ্বরের চিরন্তন আশীর্বাদ আপনার উপর বর্ষিত হোক। আপনার সকল সন্তানের জন্য আমার ভালবাসা এবং আপনার মহীয়সী পত্নীর উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধা।

আপনার সদাবান্ধব
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ : পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর দলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল, কিন্তু সে কেবল সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে। মজুমদার ও চন্দ্র সেনকে আমি সবসময় আন্তরিকতাহীন বলে মনে করেছি এবং এখনো সে মত পরিবর্তনের কোন কারণ ঘটেনি। ধর্মীয় ব্যাপারে অবশ্য আমার বন্ধু পণ্ডিতজীর সঙ্গেও আমার বিশেষ মতপার্থক্য রয়েছে। তার মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো—আমার কাছে সন্ন্যাস সর্বোচ্চ আদর্শ, তাঁর কাছে পাপ। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজীরা সন্ন্যাসী হওয়াকে পাপ বলে মনে তো করবেই!!

আপনার বি*

ব্রাহ্মসমাজ আপনাদের দেশের 'ক্রিশ্চান সায়েন্স' দলের মতো কিছু সময়ের জন্য কলকাতায় বিস্তৃতি লাভ করেছিল। তারপর গুটিয়ে গেছে। এতে আমি সুখীও নই, দুঃখীও নই। তার কাজ সে করেছে। যেমন সমাজসংস্কার। তার ধর্মের দান এক কানাকড়িও নয়। সুতরাং এ জিনিস লোপ পেয়ে যাবে। যদি ম মনে করেন আমি সেই মৃত্যুর অন্যতম কারণ, তিনি ভুল করেছেন। আমি এখনও ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার কার্যের প্রতি প্রভূত সহানুভূতিপূর্ণ। কিন্তু ঐ 'অসার' ধর্ম প্রাচীন 'বেদান্তের

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সং, পত্রসংখ্যা ৯৪, পৃঃ ৩৩৪-৩৫

বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না। আমি কি করব? সেটা কি আমার দোষ? ম-কে বুড়ো বয়সে ছেলেমিতে পেয়েছে এবং তিনি যে ফন্দি নিয়েছেন, তা আপনাদের খ্রীস্টান মিশনারীদের ফন্দিবাজির চেয়ে এক চুল কম নয়। প্রভু তাঁকে কৃপা করুন এবং শুভপথ দেখান।

আপনাদের বিবেকানন্দ

আপনি কবে এনিস্কোয়ামে যাচ্ছেন? অস্টিন এবং বাবেশীকে আমার ভালবাসা, আপনার পত্নীকে আমার শ্রদ্ধা। আপনার জন্য গভীর প্রেম ও কৃতজ্ঞতা, যা ভাষায় প্রকাশে আমি অসমর্থ।

সদা প্রেমবদ্ধ
বিবেকানন্দ

অধ্যাপক রাইটের কাগজপত্রের মধ্যে ১৮৯৪-এর এপ্রিলের ৭ তারিখে লেখা খেতড়ির মহারাজার একটি চিঠি পাওয়া গিয়েছে, যা স্বামীজী তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। এতে লেখা ছিল—

আমার প্রিয় গুরুদেব,

আমি ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখের লেখা আপনার করুণাপূর্ণ চিঠিখানি পেয়ে খুবই আনন্দিত হয়েছি। আপনার নিকট একবারের বেশি চিঠি লিখিনি বলে আপনি পরোক্ষে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন। অবশ্য আমি স্বীকার করছি এ-কথা কিন্তু একই সময়ে আমাকে বলতে অনুমতি করুন যে, আপনি দীর্ঘদিনের জন্য শিকাগো থাকবার সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত কয়েকমাস ধরে আমার চিঠি আপনার নিকট পৌঁছে দিতে অক্ষম হয়েছিলাম। তারপর থেকে আমি প্রায় সবসময় ভ্রমণ করছিলাম—বোম্বে, দ্বারকা, ভেরাবল, গীর্ণার প্রভৃতি স্থান দর্শনে গিয়েছিলাম এবং তারপর রামপুর গিয়েছিলাম নবাব সাহেবের বিবাহ উপলক্ষে আনন্দ-উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান করতে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমার মনে হয় আমার আপনার নিকট ক্ষমা চাওয়া উচিত।

আমি জানি যে, যিনি আমার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানী, তাঁকে আমার উপদেশ দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তবুও সাহস সংগ্রহ করে বলছি আপনার দেশবাসীদের পেছন থেকে আক্রমণের চেষ্টায় আপনার বিরক্ত হওয়া উচিত নয়, কারণ "ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে 'কাচ কাচই মণি মণিই'।" [অর্থাৎ "বেচাকেনার সময়" অর্থাৎ যথার্থ মূল্য নির্ধারণ-কালে "কাচ কাচই হয়, মণি মণিই হয়।"] আপনার মতো মানুষও

যদি মহৎ সুসভ্য পাশ্চাত্যবাসীদের সহায়তা লাভ করে নিজ মাতৃভূমির উন্নতি সাধনের জন্য দীর্ঘদিন ধরে লালিত আপনার যে পরিকল্পনা তা পরিত্যাগ করেন তাহলে কে এই কাজ সম্পন্ন করবে? যদিও আমি সবসময় আপনার সঙ্গ কামনা করি—কারণ কে জানে কে কতদিন বাঁচবে, তথাপি আমার স্বার্থপর হওয়া উচিত নয় এবং আপনাকে আমার বলা উচিত যে, আমাদের প্রিয় যে ভারতভূমি, যখন বর্তমানের বাষ্পীয় এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদির আবিষ্কারের চিহ্নমাত্র ছিল না, তখন এমন সকল শক্তিমান মানুষ সৃষ্টি করেছিল যাঁরা 'আত্মজ্ঞান' লাভ করেছিলেন—তার দারিদ্র্য ও দুর্দশা দূরীকরণের জন্য আপনার সর্বোত্তম প্রয়াসকে নিযুক্ত করুন। সে যুগকে হয়ত আজকের পাশ্চাত্য তত্ত্বসমূহ দ্বারা 'অন্ধকারের যুগ' বলে অভিহিত করা হবে কারণ তাদের মতানুযায়ী মানুষ তখন অনভিজ্ঞ নবীন ছিল।

আপনার পুণ্যদর্শন লাভের জন্য আমার যে আকাঙ্ক্ষা তা আমাকে প্ররোচিত করছে আপনাকে শীঘ্রই ফিরে আসতে বলতে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্য কিছু আমার কলমকে সে কথা লিখতে বাধা দিচ্ছে এবং আমাকে বিপরীত কথা লেখাচ্ছে অর্থাৎ লেখাচ্ছে : আপনাকে অনুরোধ করতে যে যেখানে এখনও মনুষ্যকুলে যারা জহুরি তাদেরই বাসা, সেখানেই অবস্থান করুন।

স্বামী অখণ্ডানন্দ এখন এখানে আছেন। তিনি এই চিঠির সঙ্গেই একই খামে আপনাকে একটি পৃথক চিঠি দিয়েছেন। জগমোহন জয়পুরে রয়েছে কিন্তু সে খুব খুশি হবে যখন সে জানবে যে, আমি তার হয়ে আপনাকে দণ্ডবৎ [সাষ্টাঙ্গ প্রণাম] তার অনুরোধ ছাড়াই জানিয়েছি।

খেতড়ির পাহাড়ী অঞ্চলে যে বাঘটি ঘুরে বেড়াচ্ছিল এবং সুরক্ষার ব্যবস্থা না হওয়া অবধি প্রায় পঞ্চাশটি মহিষ মেরে খেয়েছিল, সেটিকে আমরা ধরেছি।

আমার আন্তরিক দণ্ডবৎসহ
আমি গর্বের সঙ্গে সই করছি
আপনার[১৮] অজিত সিং

উপর্যুক্ত এই চিঠিটা ছাড়া স্বামীজী অধ্যাপক রাইটকে আরও পাঠান ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় ফেব্রুয়ারি ২২ তারিখে প্রকাশিত একটি মুখ্য সম্পাদকীয় প্রবন্ধ। এখন বিবর্ণ এবং জীর্ণ হয়ে যাওয়া সংবাদপত্রটির পাশে আড়াআড়িভাবে

স্বামীজীর স্বহস্তে লেখা কয়েকটি কথা রয়েছে—"ভারতে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী পত্রিকা" [এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধটিই শ্রীযুক্ত "এস" তাঁর চিঠিতে ভাষান্তর করে তুলে দিয়েছেন।]

আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ

যখন বিশ্বমেলার অঙ্গীভূত ধর্মমহাসভার কার্যকরী সমিতি বিশ্বের প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়কে ও বিভিন্ন ধর্মমন্দিরের সঙ্গে যুক্ত ধর্মসংস্থাকে এই সভায় তাঁদের প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য আমন্ত্রণ জানান, তখন আমাদের চিন্তা হয়েছিল যে, এমন কাউকে আমরা পাব কিনা যিনি প্রকৃত হিন্দুদের মধ্য হতে উদ্ভূত খাঁটি হিন্দু হবেন, কিন্তু যিনি সমুদ্র পার হতে আপত্তি করবেন না, আবার সেই সঙ্গে ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মকে এমনভাবে আলোকিত করতে পারবেন যাতে সভ্য জগতের সামনে প্রমাণিত হয় এর সত্যতা, তাই শুধু নয়, অন্য-ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যাঁরা আধ্যাত্মিকতা-প্রবণ এবং ধর্মীয়ভাবাপন্ন তাঁদের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা এ ধর্মের জন্য অর্জন করে আনতে পারবেন। কিন্তু যখন আমরা বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পেলাম যে, স্বামী বিবেকানন্দ কি-রকম দক্ষতা, জ্ঞান এবং বাগ্মিতা সহায়ে ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যা করেছেন, শুধু যে এ ব্যাপারে আমাদের সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর হলো তাই নয়, আমাদের সমস্ত ঘটনার যিনি নিয়ন্তা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করলাম এবং মনে হলো তিনি তাঁর অচিন্ত্য উপায়ে যোগ্য স্থানে যোগ্য লোকটি পাঠিয়েছেন। এটা হলো কাল এবং যুগের দাবি যে হিন্দুধর্ম, যাকে পুরোপুরি না বুঝে বিশেষ করে খ্রীস্টান মিশনারিদের দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে যার প্রতি অন্যায্য বিচার করা হয়েছে, তাকে বিশ্বের সম্মুখে তার সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হোক। বিশ্ব ধর্মমহাসভাই ছিল সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান, যেখান থেকে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা অভিযোগগুলি বারেবারে স্বার্থদুষ্ট লোক ও সম্প্রদায়সমূহ করে এসেছে—সে সকলের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করা যায় এবং সেখান থেকে এর গুণাবলী এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যাতে লোকেরা বিশ্বের সকল শ্রেষ্ঠ ধর্মগুলির মধ্যে এর যথার্থ স্থান নির্দেশ করতে পারে। এটি জাতীয় অভিনন্দনের বিষয় যে, বিশ্ব ধর্মসভায় হিন্দুধর্মের এই সুমহান প্রতিনিধি তাঁর ওপর ন্যস্ত দায়ের উপযুক্ত ছিলেন এবং তাঁর কর্তব্য তিনি এমনভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছেন যাতে তিনি সমগ্র হিন্দু

সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠীর কৃতজ্ঞতাভাজন হতে পেরেছেন। [এখানে ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর ভাষণ পুনর্বার মুদ্রিত করা হয়েছে। তারপর প্রবন্ধটি আবার চলেছে :]

সুমহান হিন্দুধর্মের তত্ত্বগুলির প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাতা হিসাবে তাঁর খ্যাতি আমেরিকার শহরে নগরে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং আমরা শুনেছি যে, যবে থেকে ধর্মমহাসভা শেষ হয়েছে তবে থেকে অসংখ্য মানুষ স্বামীজীর দর্শনপ্রার্থী হয়েছে, বিভিন্ন স্থান থেকে বক্তৃতা দেবার জন্য বিপুলভাবে তাঁর আমন্ত্রণ এসেছে এবং আমেরিকায় তাঁর অবস্থান বিলম্বিত করার জন্য তাঁর ওপর চাপ এসেছে। শ্রী এ. ওয়ান নামক আমেরিকার একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ভদ্রসন্তান ২৭ ডিসেম্বর তারিখে কলকাতায় এক বন্ধুকে লেখেন :

"শ্রীযুক্ত স্বামী বিবেকানন্দ এ দেশের সর্বত্র অপূর্ব সব বক্তৃতা দিচ্ছেন। তিনি এখন খুবই জনপ্রিয়।" যেমনটি আশা করা যেতে পারে ঠিক সেইরকমভাবে কয়েকজন পাদ্রী [সংবাদপত্রের উল্লিখিত স্তম্ভের তলায় স্বামীজীর নিজের হাতে লেখা কয়েকটি কথা রয়েছে—'পাদ্রী, অর্থ মিশনারি, তবে ভাষাটি অপকর্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয়'] স্বামীজীর ব্যাখ্যার দ্বারা বিচলিত হয়ে, আমেরিকার অধিবাসীদের চোখে তাঁকে হেয় করবার জন্য একটি প্রচেষ্টা করে; তাদের এই অপচেষ্টায় আমরা শুনেছি—অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই শুনেছি—সহায়তা করেছেন একজন হিন্দুবংশোদ্ভূত মানুষ। কিন্তু তাঁর বিপক্ষীয়রা তাঁর বা তাঁর ধর্মপ্রচাব পন্থায় কিছুমাত্র ক্রুটি খুঁজে বার কবতে অক্ষম হয়েছেন এবং স্বামীজী অব্যাহতভাবে আমেরিকায় এবং কানাডায় লোকের দৃষ্টিতে বড় হয়ে ওঠেন, এই জনপ্রিয়তা এখন এত উচ্চ গ্রামে পৌঁছেছে যে আমাদের বলা হচ্ছে তাঁকে প্রকারান্তরে প্রায় পুজোই করা হচ্ছে।

শত শত আমেরিকানদের হিন্দুধর্মের শিক্ষা সম্বন্ধে এই উৎসাহ এবং উচ্চ সমাদর দেখে আমরা যদি একথা বলি তাতে কি কিছু অন্যায় হবে যে, খ্রীস্টান জনসাধারণ হিন্দুধর্মের সারমর্মের মধ্যে এক উচ্চতর এবং অধিক সত্য এমন ধর্মীয় জীবনাদর্শ পেয়েছে যা তাদের খ্রীস্টধর্ম দিতে পারেনি ?

আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারের বাস্তব ফলাফল যাই হোক না কেন, এ সম্পর্কে কোন প্রশ্নই চলতে পারে না যে ইতোমধ্যে এর ফলে সভ্য জগতের চোখে সত্য হিন্দুধর্মের গুণাবলী তুলে ধরা হয়েছে

এবং এটি একটি এমন কাজ যার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের নিকট সমগ্র হিন্দু জনসমাজের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

যদি অধ্যাপক রাইটের মনে কখনও স্বামীজীর সততা সম্বন্ধে কোন সংশয় দেখা দিয়েও থাকে তা এ সময় কার্যত দূর হয়ে গিয়েছিল। আর একজন অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু কিন্তু তখনও বিবেকের দংশনে ক্লিষ্ট হচ্ছিলেন, অন্ততপক্ষে স্বামীজী তাই মনে করেছিলেন। জুনের ১৮ তারিখে স্বামীজী পুনর্বার অধ্যাপক রাইটকে লেখেন, চিঠিটি নিম্নোক্তরূপ ঃ

প্রিয় অধ্যাপকজী,

অন্য চিঠিগুলি পাঠাতে বিলম্বের জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন—আমি সেগুলি আগে খুঁজে পাইনি। আমি এক সপ্তাহের মধ্যে নিউ ইয়র্কে যাচ্ছি।

জানি না আমি অ্যানিস্কোয়ামে আসব কিনা। আমি আপনাকে পুনরায় চিঠি না লেখা পর্যন্ত চিঠিগুলি আমাকে ফেরত পাঠাবার প্রয়োজন নেই। বোস্টনের সংবাদপত্রে আমার বিরুদ্ধে লেখা প্রবন্ধটি পাঠ করে শ্রীমতী ব্যাগলি মনে হয় যেন বিচলিত হয়েছেন। তিনি ডেট্রয়েট থেকে আমাকে ওটির একটি কপি পাঠিয়েছেন—এবং আমার সঙ্গে পত্রালাপ বন্ধ করে দিয়েছেন। ঈশ্বর তাঁকে আশীর্বাদ করুন। তিনি আমার ওপর প্রচুর দয়া বর্ষণ করেছেন।

ভ্রাতঃ, আপনার মতো দৃঢ় হৃদয় তো সকলেব নয়। আমাদের এই জগৎসংসার একটি অদ্ভুত জায়গা। এ দেশের লোকেরা আমার প্রতি যে পরিমাণ সদয় ব্যবহার করেছে... এমন কি যখন আমি একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক ছিলাম আমার কোন পরিচয়পত্রও সঙ্গে ছিল না তখনও তারা যা করছে তজ্জন্য, ঈশ্বরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। যা কিছু ঘটে মঙ্গলের জন্যই ঘটে।

আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ ঃ ইস্ট ইণ্ডিয়ার ডাকটিকিটগুলি আপনার সন্তানদের জন্য পাঠালাম, যদি তারা পছন্দ করে।[১১] *

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সং, পত্রসংখ্যা ৯৬, পৃঃ ৩৩৯

এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত যে, ডেট্রয়েটে যিনি তাঁকে আতিথ্য দিয়েছিলেন সেই শ্রীমতী ব্যাগলি বোস্টন ডেলী অ্যাডভার্টাইজারের প্রবন্ধটির দ্বারা বিচলিত হতে পারেন। তিনি স্বামীজীকে অতি উত্তমরূপে জানতেন এবং স্বামীজী অধ্যাপক রাইটকে উপর্যুক্ত চিঠিটি লেখবার পর তাঁর পক্ষ সমর্থন করে দৃঢ়তার সঙ্গে কতকগুলি চিঠি লেখেন—যে চিঠিগুলি এই গ্রন্থের ১ম খণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি ইতোপূর্বেই স্বামীজীকে অ্যানিস্কোয়ামে তাঁর বাড়িতে গ্রীষ্মাবকাশ অতিবাহিত করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং জুনের ২২ তারিখের চিঠিটি ধরে বিচার করতে হলে তিনি কোন মতেই তাঁর আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করে নেন নি। উপর্যুক্ত প্রবন্ধটি পাঠাবার পর তাঁর যে নীরবতা তাকে স্বামীজী ভুল বুঝেছিলেন। কিন্তু যা সত্য তা হলো, চারদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে স্বামীজী মনে করেছিলেন শ্রীমতী ব্যাগলিও তাঁর ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। এ ধারণা তাঁকে ভয়ানক গভীরভাবে আঘাত দিয়েছিল সন্দেহ নাই। [জুলাইয়ের শেষ দিকের পূর্বে তিনি এ আঘাত থেকে মুক্তি পান নি, যতক্ষণ না শ্রীমতী ফ্রান্সিস ব্রীড তাঁকে বোঝাতে পারলেন যে, শ্রীমতী ব্যাগলির আমন্ত্রণ ঠিকই আছে এবং স্বামীজী অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর হয়েছেন। জুলাইয়ের ২৩ তারিখে তিনি শ্রীমতী হেলকে লিখলেন "শ্রীমতী ব্যাগলিকে আমি চিঠি দিয়েছি" এবং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে শ্রীমতী ব্যাগলি তাঁর এ চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করেছিলেন, কারণ আমরা জানি তিনি আগস্ট মাসে সত্যসত্যই তাঁর অতিথি হয়েছিলেন।]

কিন্তু জুন মাসটি, যেটি স্বামীজী শিকাগোতে কাটিয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে ভয়ানক নৈরাশ্যের দরুণ অন্ধকারময় ছিল। এমন কি তাঁর 'মাতা গীর্জা' ও 'পিতা পোপ'ও ছিলেন কোন একটি স্বাস্থ্যকর স্থানে এবং বালিকাচতুষ্টয়ও এ মাসের শেষভাগে শহরের বাইরে চলে যায়। তথাপি, এসব সত্ত্বেও, জুনের ২৬ তারিখে তিনি ভাগনীদের উদ্দেশে সম্ভবত তাঁর সকল চিঠির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর চিঠিখানি লিখেছিলেন। চিঠিটি প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু মূল চিঠিটি, যেটি ইসাবেল ম্যাককিণ্ডলি তাঁকে এককভাবে লেখা চিঠিগুলির সঙ্গে রক্ষা করেছিলেন, সেটি প্রকাশিত চিঠিটি থেকে কিছুটা পৃথক। যেহেতু চিঠিটা নিঃসন্দেহে এক আধ্যাত্মিক ভাবাবেগের মধ্যে লেখা হয়েছিল—আমার মনে হয় পাঠকেরা হয়ত স্বামীজীর মূল চিঠিটি ঠিক যেভাবে আছে সেইভাবেই দেখতে চাইতে পাবেন। তাছাড়া এটি আমাদের কাহিনী বর্ণনার জন্যও অপরিহার্য, কারণ এর মধ্যে প্রকাশিত সঙ্কটকালে তাঁর মনের গভীরতর-অবস্থা। তিনি লেখেন ঃ

প্রিয় ভগিনীগণ,—

শ্রেষ্ঠ হিন্দী কবি তুলসীদাস তাঁর রামায়ণের মঙ্গলাচরণে বলেছেন, 'আমি সাধু অসাধু উভয়েরই চরণ বন্দনা করি; কিন্তু হায়, উভয়েই আমার নিকট সমভাবে দুঃখপ্রদ—অসাধু ব্যক্তি আমার নিকট আসামাত্র আমাকে যাতনা দিতে থাকে, আর সাধু ব্যক্তি ছেড়ে যাবার সময় আমার প্রাণ হরণ করে নিয়ে যায়।" আমি বলি 'তথাস্তু'। আমার কাছে ভগবানের প্রিয় সাধু ভক্তগণকে ভালবাসা ছাড়া সুখের আর ভালবাসার জিনিস আর কিছুই নেই; আমার পক্ষে তাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ মৃত্যুতুল্য।

কিন্তু এসব অনিবার্য। হে আমার প্রিয়তমের বংশীধ্বনি। তুমি আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চল, আমি অনুগমন করছি। হে মহৎস্বভাবা মধুর প্রকৃতি সহৃদয়া পবিত্রস্বভাবাগণ! হায়, আমি যদি ষ্টোয়িক (stoic) দার্শনিকগণের মতো সুখদুঃখে নির্বিকার হতে পারতাম।

আশাকরি তোমরা সুন্দর গ্রাম্য দৃশ্য বেশ উপভোগ করছ—

'যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥'—গীতা

—সমস্ত প্রাণীর পক্ষে যা রাত্রি, সংযমী তাতে জাগ্রত থাকেন; আর প্রাণিগণ যাতে জাগ্রত থাকে; আত্মজ্ঞানী মুনির পক্ষে তা রাত্রিস্বরূপ।

এই জগতের ধূলি পর্যন্ত যেন তোমাদের স্পর্শ করতে না পারে; কারণ, কবিরা বলে থাকেন, জগৎটা হচ্ছে একটা পুষ্পাচ্ছাদিত শব মাত্র। তাকে স্পর্শ করো না। তোমরা হোমা পাখির বাচ্চা—এই মলিনতার পঙ্কিল পল্বল স্বরূপ জগৎ স্পর্শ করবার পূর্বেই তোমরা আকাশের দিকে আবার উড়ে যাও।

'যে আছ চেতন ঘুমায়ো না আর'।

'জগতের লোকের ভালবাসার অনেক বস্তু আছে—তারা সেগুলি ভালবাসুক; আমাদের প্রেমাস্পদ একজন মাত্র—সেই প্রভু। জগতের লোক যাই বলুক না, আমরা সে সব গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না। তবে যখন তারা আমাদের প্রেমাস্পদের ছবি আঁকতে যায় ও তাঁকে নানারূপ কিম্ভূত-কিমাকার বিশেষণে বিশেষিত করে, তখনই আমাদের ভয় হয়। তাদের যা খুশি তাই করুক, আমাদের নিকট তিনি কেবল প্রেমাস্পদমাত্র—তিনি আমার প্রিয়তম প্রিয়তম প্রিয়তম, আর কিছুই নন।'

'তাঁর কত শক্তি, কতগুণ আছে—এমন কি আমাদের কল্যাণ করবারও কত শক্তি আছে, তাই বা কে জানতে চায়? আমরা চিরদিনের জন্য বলে রাখছি আমরা কিছু পাবার জন্য ভালবাসি না। আমরা প্রেমের দোকানদার নই, আমরা কিছু প্রতিদান চাই না। আমরা কেবল দিতে চাই।'

'হে দার্শনিক। তুমি আমায় তাঁর স্বরূপের কথা বলতে আসছ, তাঁর ঐশ্বর্যের কথা—তাঁর গুণের কথা বলতে আসছ? মূর্খ, তুমি জানো না, তাঁর অধরের একটি মাত্র চুম্বনের জন্য আমাদের প্রাণ বের হবার উপক্রম হচ্ছে। তোমার ওসব বাজে জিনিস পুঁটলি বেঁধে তোমার বাড়ি নিয়ে যাও—আমাকে আমার প্রিয়তমের একটি চুম্বন পাঠিয়ে দাও—পারো কি?'

'মূর্খ, তুমি কার সামনে নতজানু হয়ে ভয়ে প্রার্থনা করছ? আমি আমার গলার হার নিয়ে বগলসের মতো তাঁর গলায় পরিয়ে দিয়ে তাতে একগাছি সুতো বেঁধে তাঁকে আমার সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে যাচ্ছি—ভয়, পাছে এক মুহূর্তের জন্য তিনি আমার নিকট থেকে পালিয়ে যান। ঐ হার—ঐ প্রেমের হার, ঐ সূত্র প্রেমের জমাট বাঁধা ভাবের সূত্র। মূর্খ, তুমি তো সূক্ষ্ম তত্ত্ব বোঝ না যে, যিনি অসীম অনন্তস্বরূপ, তিনি প্রেমের বাঁধনে পড়ে আমার মুঠোর মধ্যে ধরা পড়েছেন। তুমি কি জানো না যে, সেই জগন্নাথ প্রেমের ডোরে বাঁধা পড়েন—তুমি কি জানো না যে, যিনি এত বড় জগৎটাকে চালাচ্ছেন, তিনি বৃন্দাবনের গোপীদের নূপুর ধ্বনির তালে তালে নাচতেন?'

এই যে পাগলের মতো যা তা লিখলাম, তার জন্য আমায় ক্ষমা করবে। অব্যক্তকে ব্যক্ত করবার ব্যর্থ প্রয়াসরূপ আমার এই ধৃষ্টতা মার্জনা করবে—এ কেবল প্রাণে প্রাণে অনুভব করার জিনিস। সদা আমার শুভাশীর্বাদ জানবে।

তোমাদের ভ্রাতা
*বিবেকানন্দ**

এইরূপে দেখা যাচ্ছে যে-সময় বাইরে তাঁর জীবনে চলছে পরীক্ষা এবং দুর্দশা, সেই সময়ও তাঁর অন্তরের অভ্যন্তরে মন ও হৃদয় কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক প্রেম ও আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে আছে।

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম সং, পত্রসংখ্যা ১০০, পৃঃ ৩৪৮-৫০

॥ ৩ ॥

ইতোমধ্যে, যখন তিনি তাঁর মাদ্রাজী শিষ্যবর্গকে তাঁর সমর্থনে একটি জনসভার আয়োজন করতে না পারার জন্য তিরস্কার করছেন, তখন আলাসিঙ্গা এবং অন্যান্যরা, বস্তুত তাঁর নির্দেশই পালন করছিলেন এবং এখন যা বিখ্যাত মাদ্রাজ সভা নামে অভিহিত, যেটি অনুষ্ঠিত হয় ১৮৯৪-এর ২৮ এপ্রিল, সেটিরই সংগঠন করছিলেন। যদিও স্বামীজীর একটি চিঠিতে—যার মধ্যে স্বামীজীর হাতে লেখা নয়, অন্য কেউ ২৮ মে তারিখটি বসিয়েছেন—তাতে একটি অপ্রকাশিত বাক্য আছে যার মধ্যে এই সঙ্কেত পাওয়া যায় যে, এরকম একটি সভা যে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তা স্বামীজী জেনেছিলেন। কিন্তু সভার বিবরণী তাঁর কাছে জুলাইয়ের প্রথম দিকের পূর্বে পৌঁছয়নি। অবশেষে যখন একটি ভুল ঠিকানায় লেখা এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণসহ আলাসিঙ্গার চিঠি স্বামীজীর হাতে এসে পৌঁছয় তখন আসবার পথে, স্বামীজী যেমন লিখছেন, "সারা দেশ ঘুরে আমার কাছে পৌঁছেছে।" কিন্তু বিষয়টির সেখানেই ইতি হয়নি। জুলাইয়ের ১১ তারিখে তিনি আলাসিঙ্গাকে চিঠির উত্তর দিলেন এবং তাতে বিশদভাবে নির্দেশ দিলেন ঐ মাদ্রাজের সভার প্রস্তাবগুলি নিয়ে কি করতে হবে, যাতে ওগুলি সঠিক সরকারি সূত্রের মাধ্যমে আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহের নিকট পৌঁছয়, যাতে সেগুলি তাঁর যে জিনিসের অভাব এতদিন ছিল, সেই পরিচয়পত্রের কাজ করে। তিনি তাঁকে আরও নির্দেশ দেন এগুলির প্রতিলিপি অধ্যাপক রাইটকে, "যিনি সর্বপ্রথম আমেরিকায় আমার বন্ধুরূপে দাঁড়িয়েছিলেন" বলে স্বামীজী লিখেছেন, শ্রীযুক্ত পামার ও ডেট্রয়েটের শ্রীমতী ব্যাগলিকে, শ্রীমতী হেলকে—যিনি এই চিঠির অপ্রকাশিত অংশে লিখিত বর্ণনানুযায়ী "আমার পরম বন্ধু" যেন পাঠানো হয়।—যাতে এই প্রচেষ্টা কিছুমাত্র ব্যর্থ না হয় সে বিষয়ে তাঁর আগ্রহ দেখে অনুমান করা যায় যে, ভারতের প্রাণের এই স্পন্দন দেখে তিনি কতখানি স্বস্তি অনুভব করেছিলেন। ঐ চিঠিরই অপর একটি অপ্রকাশিত অংশে তিনি লেখেন—"যদি কলকাতা থেকেও বড় বড় নাম দিয়ে—এরকম সব আসে, তাহলে আমেরিকানরা যাকে বলে 'boom' তাই পাব আর যুদ্ধের অর্ধেক জয় হয়ে যাবে। তখন ইয়াঙ্কিদের বিশ্বাস হবে যে, আমি হিন্দুদের যথার্থ প্রতিনিধি।"[২১] *

* বাণী ও রচনা ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম সং, পত্রসংখ্যা ১০৫, পৃঃ ৩৬০-৬৩

মাদ্রাজ সভা-সংক্রান্ত চিঠিপত্র এবং প্রস্তাবাদি আরও দুমাস অতিবাহিত হবার পূর্বে আমেরিকায় পৌঁছয়নি, সুতরাং সংশয় চলতেই থাকে। সমস্ত ব্যাপারটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, স্বামীজীর কাছে ছিল ঘৃণার বস্তু। দুশ্চিন্তা, একটা 'ব্যবসায়িক প্রকৃতির আকস্মিক বিস্ফোরণের' প্রয়োজনীয়তা, তাঁর নিজের সততা প্রমাণ করা, সীমাহীনভাবে সংবাদপত্রসমূহের কর্তিত প্রয়োজনীয় অংশ সংগ্রহ করা—এ সমস্তই, তিনি অনুভব করেছিলেন, নাম-যশ ও অর্থলিপ্সা-রহিত হয়ে কাজ করার যে আদর্শ তিনি জীবনে বহন করছিলেন, তার ওপর কালিমার আলিম্পনস্বরূপ। আগস্টের ২৩ তারিখে (যখন অ্যানিস্কোয়ামে বাস করছিলেন) তিনি শ্রীমতী হেলের নিকট এই লোকপ্রিয়তার জীবন সম্বন্ধে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন (সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে একটি সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন), কারণ তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন যে এ বিষয়ে তাঁর অভিযোগ এবং একে তাঁর অতিক্রম করে যাওয়া—এ উভয় ব্যাপারই তিনি [শ্রীমতী হেল] বুঝবেন।)

"আপনি যাঁর নাম করেছেন আমি তাঁকে ভাল করেই জানি [২৩ আগস্টের দীর্ঘ চিঠির মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে তিনি লেখেন] তাঁকে আপনি আমার সম্বন্ধে যে সংবাদ ইচ্ছে হয় দিতে পারেন। আমি এই খবরের কাগজের টুকরো পাঠানো, আমার নিজের দিকে সকলের সহানুভূতির ঢল নামানো—এ সব আর গ্রাহ্য করি না। আমার এই সকল ভারতীয় বন্ধুরা আমাকে খবরের কাগজের এই সকল আবোল-তাবোল নিয়ে বড় বিরক্ত করছে। তারা সব অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং পবিত্র-হৃদয় বন্ধু। আমার কাছে এখন এই সকল খবরের কাগজের টুকরো আর বেশি নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি করে আমি বোস্টন ট্রান্সক্রিপ্ট পত্রিকার একটি সংখ্যার একটুখানি পেলাম। এটা আমি আপনাকে পাঠিয়ে দিলাম। লোকপ্রিয়তার এই যে জীবন এ বড়ই বিরক্তিকর। আমি প্রায় গবেট হয়ে গেছি। কোথায় পালাব? ভারতে আমি ভয়ানকভাবে জনতার লোক হয়ে গেছি—দলে দলে লোক আমাকে অনুসরণ করে আমার জীবন শেষ করে দেবে। আমি ল্যাণ্ডসবার্গের মাধ্যমে ভারতের একটি চিঠি পেলাম। এক আউন্স যশ লাভ মানে এক পাউণ্ড শান্তি এবং পবিত্রতা হারানো। আমি আগে একথা কখনও ভাবিনি। আমি এই প্রচারে সম্পূর্ণ বিরক্ত হয়ে উঠেছি। আমি আমার নিজের ওপর খুবই বিরক্ত। প্রভু নিশ্চয়ই আমাকে শান্তি ও পবিত্রতার পথ দেখিয়ে দেবেন। মা, আমি আপনার নিকট স্বীকার করছি—প্রতিযোগিতারূপ শয়তানের হৃদয়ের

সাম্যাবস্থা নষ্ট করবার জন্য মাথাচাড়া দেওয়াকে বাদ দিয়ে এমন কি ধর্মের ক্ষেত্রেও কোন মানুষ জনপ্রিয়তার জীবন যাপন করতে পারে না। যারা একটি ধর্মীয় মতবাদমাত্র প্রচার করে বেড়ায়, তারা কখনও এটা অনুভব করে না, কারণ তারা কখনও 'ধর্ম' কি তা জানে না, কিন্তু যারা ঈশ্বরের সন্ধান করে, জগতকে চায় না—তারা তৎক্ষণাৎ অনুভব করে যে, নামযশের প্রতিটি কণা তাদের পবিত্রতার মূল্যে পেতে হয়। ঠিক যতটা নাম যশ হবে ততটাই নিঃস্বার্থপরতা, লোভ, নাম ও যশের প্রতি অনীহার ক্ষয় হয়। ঈশ্বর আমাকে সহায়তা করুন—মা, আমার জন্য প্রার্থনা করুন। আমি আমার নিজের ওপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছি। জগৎ এরকম কেন যে, কেউ নিজেকে সামনে না এনে কিছু করতে পারে না। কেন একজন লুকিয়ে থেকে, অদৃশ্যভাবে, নজরে না এসে কিছু করতে পারে না! জগৎ এখনও পৌত্তলিকতা থেকে এক পাও এগোয় নি। তারা ভাবাদর্শকে অবলম্বন করে কাজ করতে পারে না। তারা আদর্শের দ্বারা চালিত হতে পারে না—তারা ব্যক্তি চায়, মানুষ চায়। যদি কোন মানুষ কোন কিছু করতে চায়, তাকে শাস্তি পেতেই হবে, তার পরিত্রাণের কোন আশা নেই। এ জগতটা একদম বাজে জায়গা। শিব, শিব, শিব।

প্রসঙ্গক্রমে বলি আমি টমাস অ্যা কাম্পিসের একটি অপূর্ব সুন্দর সংস্করণ পেয়েছি—আমি সেই প্রাচীন সন্ন্যাসীকে কি ভয়ানক ভালবাসি। তিনি এই মায়ার আবরণের অন্তরালে কি আছে তার আশ্চর্য দর্শন লাভ করেছিলেন। খুব অল্প লোকই এরকমটা পেরেছে। আমার কাছে এটাই ধর্ম। এই ছলনাময় পৃথিবীকে চাই না। কোন দ্বিধায় দোলা নয়—কেবল বড় বড় কথা নয়, অনুমান নয়—আমি মনে করি, আমি বিশ্বাস করি, আমি চিন্তা করি—এসব কিছুই নয়। আমি কি ভয়ানকভাবে চাই আমি যদি টমাস অ্যা কেম্পিসের সঙ্গে যাকে সুন্দর পৃথিবী বলে অভিহিত করা হয় সেই ছলনাময় জগৎপ্রপঞ্চের বাইরে গিয়ে তাকে কেবলই অতিক্রম করে করে যেতে পারতাম—এ জিনিস কেবল অনুভব করবার, একে প্রকাশ করা যায় না। মা এই হলো ধর্ম, এখানেই ভগবান আছেন। এখানেই পৃথিবীর সকল সন্ত, সকল ধর্ম-প্রবক্তা এবং অবতারপুরুষ মিলিত হন। বাইবেল ও বেদের কলকাকলীকে অতিক্রম করে, সম্প্রদায়, চাতুর্যময় কৌশলসমূহকে অতিক্রম করে, প্রতারণা ও মতবাদসমূহকে অতিক্রম করে যে স্থান, সেখানে সব জ্যোতির্ময়, সব প্রেমে ভরা—সেখানে এ পৃথিবীর

কোন পূতিবাষ্প পৌঁছতে পারে না। আমাকে কে সেখানে নিয়ে যাবে? মা, আপনার আমার প্রতি সহানুভূতি আছে? শতরকমের বন্ধনে পড়ে আমার আত্মা আর্তনাদ করছে—এ সব বন্ধনে আমি নিজে আমার হৃদয়কে আবদ্ধ করছি। কার ভারত? তাকে কে গ্রাহ্য করে? সব কিছুই তাঁর। আমরা কে? তিনি কি মৃত? তিনি কি নিদ্রিত? যাঁর আদেশ ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না—একটি হৃৎস্পন্দনও ঘটে না যিনি আমার নিজের চেয়েও আমার নিকটতর। জগতের ভাল করা বা মন্দ করা বা ধুলো হয়ে উড়ে যাওয়া এ সকল অর্থহীন অসার আবোল-তাবোল কথা। আমরা কিছুই করি না, আমরা নেই, জগৎ নেই। তিনি আছেন, তিনি আছেন, কেবল তিনিই আছেন। তিনি ছাড়া আর কারও অস্তিত্ব নেই, তিনি আছেন।

ওঁ। অদ্বিতীয় তিনি, তিনি আমার মধ্যে আছেন, আমি তাঁর মধ্যে আছি, আমি হল'ম আলোর সমুদ্রের মধ্যে বিন্দুপ্রমাণ কাচখণ্ড। আমি নই, আমি নই, তিনি আছেন, তিনি আছেন।

ওঁ অদ্বৈত।[২২]

স্বামীজী এই চিঠি লেখার এক সপ্তাহ পরে, মাদ্রাজের সভার সংবাদ আমেরিকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো এবং ৩০ আগস্ট তারিখে বোস্টন ইভনিং ট্রানস্ক্রিপ্ট পত্রিকার নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় মাধ্যমে তিনি অবশেষে জানতে পারলেন যে, অন্ততপক্ষে তাঁর কাজের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মমাফিক স্বীকৃতি তাঁকে দেওয়া হয়েছে ঃ

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় এসেছিলেন এ দেশের ধর্মবিশ্বাস বিবর্জিত ব্যক্তিদের জড়বাদের অনুশাসনের অধীনতা হতে মুক্ত করে সজীব আধ্যাত্মিক বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত করে তাদের বিশ্বাসের জগতে একটা রূপান্তর ঘটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে। ধর্মমহাসভায় তিনি যে প্রভাব সৃষ্টি করেছিলেন এবং তারপর হতে এ দেশের বিভিন্ন অংশে তাঁর যে প্রচার কর্ম চলেছে তা সকলেই ভাল করে জানেন। ভারতে কর্তব্যরত আমাদের প্রচারকদের মতোই যে-সকল ভদ্রলোক আমেরিকায় প্রচারক হিসাবে এসেছেন তাঁরা সকলে একই মতের ও পথের অনুবর্তী নন এবং তাঁরা পরস্পরের ভাল কাজ সম্পর্কে পরস্পর অবহিতও নন। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে যে হিন্দু সন্ন্যাসীটি এলিয়ট এবং প্লাইমাউথে বক্তৃতা দিচ্ছেন, তাঁর প্রতি শিকাগো ধর্মমহাসভায় আমেরিকার জনসমক্ষে প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য বিধিবদ্ধভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে

মাদ্রাজের নেতৃস্থানীয় হিন্দুগণের একটি জনসভার কার্যবিবরণী সম্পর্কিত একটি প্রচারপত্র প্রাপ্তি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার। এই সভার সভাধিপতি তাঁর ভাষণে বলেন যে, তাঁরা সমবেত হয়েছেন ওখানে সর্বজন পরিচিত এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় পরমহংস স্বামী বিবেকানন্দকে মহান আমেরিকাবাসিগণ সহানুভূতিপূর্ণ অভ্যর্থনা জানানোয় তাদের প্রতি প্রীতি ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবার উদ্দেশ্যে, তাছাড়া স্বামীকে আমেরিকার ধর্মমহাসভায় এবং অন্যত্র তিনি যে স্মরণীয় কাজকর্ম করেছেন তার জন্যও উচ্চ প্রশংসা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে। এ-বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, একটি সুমহান দেশে তাঁর এই পরিভ্রমণ এবং সেখানে তাঁর কর্মকাণ্ড একটি অতি উচ্চস্তরের শুভ বিষয়ের পূর্বাভাস। তিনি বিশ্বাস করেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর মতো দেশের সেবা করবার ব্যাপারে বিরাট দক্ষতাসম্পন্ন অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের দ্বারা এরূপ আরও অনেক বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণের এবং এতদপেক্ষা আরও বৃহৎ কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠানের এটি হলো সূত্রপাত। তিনি এ বিষয়ে একেবারে নিঃসংশয় যে, উপস্থিত সকলে তাঁর সঙ্গে এ-বিষয়ে একমত হবেন যে দীর্ঘ অনাগত কালের জন্য তাঁরা হবেন কেবল শিক্ষার্থী এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার যা কিছু ভাল এবং প্রশংসনীয় তা শিক্ষা করতে এবং তা আত্মস্থ করতে তাঁরা প্রচেষ্টা করবেন। তারপর প্রথামত আমেরিকাকে যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে তাতে আবেগপূর্ণ ভাষায় বলা হয়েছে :

"আমাদের অতীত ইতিহাসের সমস্ত সঙ্কট এবং অবমাননার মধ্যে, আমাদের অধঃপতিত অবস্থার মধ্যেও আমরা হিন্দুগণ আমাদের প্রাচীন ধর্মে আস্থা অক্ষুণ্ণ রেখে এসেছি—যে ধর্মের মূল এবং কেন্দ্রীয় ধারণাসমূহ আপনাদেব সম্মুখে আমাদের প্রতিভাসম্পন্ন প্রতিনিধি দৃষ্টি আকর্ষণকারী শক্তি ও সাফল্যের সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন। আমাদের যাদের স্বামী বিবেকানন্দকে সাক্ষাৎভাবে জানবার সৌভাগ্য হয়েছে তাদের মনে আপনাদের সুমহান স্বাধীন দেশে তাঁর জীবনব্রতের পুরোপুরি সাফল্য অর্জন সম্বন্ধে কখনও বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগেনি। তাঁর বিরাট প্রতিভা, এ ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ, প্রজ্ঞা ও বাগ্মিতা সুফল প্রসব করবে—এটা আমরা জানতাম। ভারত এখনও আধ্যাত্মিকতার নিবাসভূমি, যেমন একদিন সে ছিল বিশ্ব সভ্যতার শিশু অবস্থায় তার ধাত্রীস্বরূপা, সাধুতা ও পবিত্রতা এখনও আমাদের জনসাধারণের শক্তিস্বরূপ এবং যতদিন এরূপ থাকবে, আমাদের যে সুপ্রাচীন বিশ্বাস—আমাদের মাতৃভূমি হলো পুণ্যভূমি এবং আমাদের জাতি হলো

ঈশ্বর নির্বাচিত—এ বিশ্বাস আমাদের পরিত্যাগ করবে না। আমাদের অ্যাংলো-স্যাক্সন বংশোদ্ভূত শাসকগণ যারা আপনাদের নিকট-আত্মীয়, আমাদেরও দূরসম্পর্কিত আত্মীয়—তারা এ দেশে প্রবল শক্তিমত্তার ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের বিধি নির্দেশিত ভূমিকা পালন করে চলেছে। ইতোমধ্যেই নবযৌবনপ্রাপ্ত আমাদের জাতির জীবনে এক আলোকোজ্জ্বল নবযুগের উদয় শুরু হয়েছে এবং যখন সুশাসন ঐহিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শৃঙ্খলগুলি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে পড়বে আমবা আশা করছি যে, আমাদের জাতি তখন তার জাতীয় পুনরুত্থান বিশ্বের আধ্যাত্মিক উন্নয়নের কাজে নিয়োগ করতে সক্ষম হবে। হিন্দুসমাজ স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকায় অনুষ্ঠিত কর্মকাণ্ডের বিরাট সাফল্যকে এবং আপনাদের জাতি তার বিভিন্ন জ্ঞান, শক্তি ও স্বাধীনতার কেন্দ্রগুলিতে আমাদের মনীষাদীপ্ত প্রতিনিধিকে এবং তাঁর দেওয়া আমাদেব ঋষি ও অবতারপুরুষদের প্রদত্ত শিক্ষাসমূহের ব্যাখ্যা যেবকম সহৃদয়তা ও উৎসাহের সঙ্গে অভিনন্দিত করেছেন—সে সকলকে সেই আলোকেই দেখছে।"

উপর্যুক্ত প্রবন্ধটি পাঠ করে স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে লিখলেন ঃ "এইমাত্র আমি 'বোস্টন ট্রান্সক্রিপ্টে' মাদ্রাজের সভার প্রস্তাবগুলি অবলম্বন করে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দেখলাম। আমার নিকট ঐ প্রস্তাবগুলির কিছুই পৌঁছায়নি। যদি তোমরা ইতোপূর্বেই পাঠিয়ে থাকো, তবে শীঘ্রই পৌঁছবে। প্রিয় বৎস, এ পর্যন্ত তোমরা অদ্ভুত কর্ম করেছ। কখন কখন একটু ঘাবড়ে গিয়ে যা লিখি, তাতে কিছু মনে করো না। মনে করে দেখ, দেশ থেকে ১৫,০০০ মাইল দূরে একলা রয়েছি—গোঁড়া শত্রুভাবাপন্ন খ্রীস্টানদের সঙ্গে আগাগোড়া লড়াই করে চলতে হয়েছে—এতে কখন কখন একটু ঘাবড়ে যেতে হয়। হে বীরহৃদয় বৎস, এইগুলি মনে রেখে কাজ করে যাও।"[২৩*]

স্বামীজীকে লেখা ডাকের চিঠিপত্র সম্ভবত আবারও এখানে সেখানে পাঠানো হচ্ছিল, অবশেষে তা একদিন তাঁকে ধরে ফেলল এবং তিনি মাদ্রাজী ভাষণটি পেয়ে গেলেন।

সেপ্টেম্বরের ৪ তারিখে তিনি শ্রীমতী হেলকে লিখলেন—"বাণ্ডিলটি ছিল সভার রিপোর্টের। আশা করি আপনি এর কিছু কিছু শিকাগোর সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশ করতে পারবেন... এখানে কোন কোন সংবাদপত্রের

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম সং, পত্রসংখ্যা ১১১, পৃঃ ৩৭১-৭৪

কয়েকটি অংশ এবং ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকার একটি কপি আছে যা আমি পরে পাঠাব। কিছু শ্রীযুক্ত ব্যারোজকে পাঠানো হয়েছে, আশা করবেন না যে, তিনি এগুলিকে প্রচার করবেন।"[২৪] ইতোমধ্যে আমেরিকার সংবাদপত্রগুলিই তাঁকে সংবাদ সরবরাহ করে চলেছিল। আগস্টের ৩১ তারিখে শিকাগো ইন্টার ওস্যান তাঁর সরকারি সমর্থন প্রাপ্তির কাহিনী প্রচার করল :

এ বিষয়টি লক্ষ্য করে আমরা আনন্দিত যে, এই হিন্দু ধর্মশিক্ষকটি তাঁর দেশে অনাদৃত ধর্মপ্রবক্তা নন এবং সম্প্রতি মাদ্রাজে একটি জনসভায় হিন্দু সম্প্রদায় আমেরিকাতে তিনি যে-সকল প্রচেষ্টা করেছেন সেজন্য তাঁকে সমর্থন জানিয়েছে এবং আমেরিকা যেভাবে তাঁকে গ্রহণ করেছে তার জন্য তাকে ধন্যবাদ ও প্রশংসা জানিয়েছে। মাদ্রাজের হিন্দুগণ দ্য ইন্টারওস্যান-এ পাঠানো একটি সংবাদে বলেছে—"আপনাদের মহান ও শক্তিশালী জাতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাঁকে আপনারা যে সদয় আতিথ্য ও উদার বদান্যতা দেখিয়েছেন তজ্জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। যে পুণ্যাত্মা হিন্দু ঋষি ও ধর্মপ্রবক্তাদের বাণী মানব জাতির জন্য বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁকে আপনাদের মহান জাতি যে উদার আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন, তাঁর কথা শুনেছেন, তাতে প্রমাণিত হয়েছে আমেরিকার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আমরা প্রায়ই শুনে থাকি যে, এদেশ হলো নির্লজ্জ অর্থ-উপাসনার মাতৃভূমি এবং তার সন্তানেরা স্থূল জড়বাদী এবং তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক কোন বিষয়ের ওপর কোন ভালবাসা নেই—সে সকল কত মিথ্যা, কত অন্যায়!"

ধর্মমহাসভা এই সুদূর ভারতভূমিতেও তার সুফল প্রদর্শন করতে শুরু করেছে। এখানকার জনসাধারণ তাদের বিশ্বাসযোগ্য প্রতিনিধির চোখ দিয়ে দেখেছে বলে আমেরিকা সম্বন্ধে তাদের ভুল ধারণা সংশোধন করে নিচ্ছে। আমেরিকার অধিবাসিগণ যেমন হিন্দুধর্মের একজন মহান প্রবক্তার নিকট থেকে হিন্দু দর্শনের আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য বিষয়ে শিক্ষা করল, ঠিক তেমনি ভারত তার মহান হিন্দুধর্ম-শিক্ষক স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিবেদনের মাধ্যমে পাশ্চাত্য জগতকে প্রশংসার চোখে দেখতে সমর্থ হবে এবং নিজেদের ঐহিক কল্যাণের জন্য অনেক কিছু তার আমেরিকার কাছ থেকে শিক্ষা করতে পারবে। বিশ্বধর্মসভা তার মূল প্রবচন হিসাবে গ্রহণ করেছিল এই বাণী—"বস্তু নয়, মানুষ"। কিন্তু এর ফলশ্রুতিতে দেখা যাবে বস্তু জগৎ এবং মানব জীবনের ক্ষেত্রে নানা দিকে উন্নতি—এটা ঘটবে ঐ সুমহান

সম্মেলনগুলির প্রতিনিধিবর্গ যে-সকল বীজ রোপণ করেছেন তা যখন প্রাচ্য ভূখণ্ডে দৃঢ়মূল হবে তখন।

অন্ততপক্ষে নিউ ইয়র্কের দুটি কাগজ—সেপ্টেম্বরের ২ তারিখে সান এবং সেপ্টেম্বরের ৩ তারিখে ডেলী ট্রিবিউন—পূর্বোক্ত সংবাদপত্রগুলিকে অনুসরণ করল স্বামীজীর বিজয়ে এবং আমেরিকার জনসাধারণের উদ্দেশে ভারতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশে যেন আনন্দিত হয়েই। সংক্ষেপে বলতে গেলে তাই-ই ঘটল যে-কথা সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে স্বামীজী তাঁর গুরুভাইদের লিখছেন ঃ মাদ্রাজ ভাষণ "এখানকার সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে এবং বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে"।[২৫]

ইতোমধ্যে জুনাগড়ের দেওয়ান শ্রী হরিদাস বিহারীদাস দেশাই (যাঁর একটি চিঠি প্রমাণপত্র হিসাবে স্বামীজী ডঃ রাইটকে পাঠিয়েছিলেন) স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে শ্রীযুক্ত হেলকে একটি চিঠি লেখেন। তাঁর চিঠি আমেরিকায় পৌঁছয় সেপ্টেম্বরের প্রথম দিনগুলিতে। স্বামীজী তা হেলদের নিকট পাঠিয়েছিলেন ভারত হতে আগত সংবাদপত্রসমূহের প্রয়োজনীয় কর্তিত অংশসহ এবং (পরের দিন পাঠিয়েছিলেন) "ভারতের রাজন্যবর্গদের মধ্যে যিনি প্রধান সেই মহীশূরের মহারাজের স্বাক্ষরিত পত্র।"[২৬] যদিও শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী হেলের কাছে স্বামীজীর সততা বিষয়ে প্রশংসাপত্রের কোন প্রয়োজন ছিল না, তবুও তিনি নিজ অন্তরে তাঁদের পদপ্রান্তে সবকিছু রাখবার জন্য একটি বাধ্যবাধকতা অনুভব করেছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি দেওয়ানকে লেখেন, "মিঃ হেল-এর নিকট লিখিত আপনার চিঠি খুবই সন্তোষজনক হয়েছে, কারণ তাদের নিকট আমার ঐটুকুই দেনা ছিল"[২৭*] দেওয়ানের পত্রটি নিম্নোক্তরূপ ঃ

নাদীয়াদ

২ আগস্ট ১৮৯৪

মহাশয়,

আশা করি এই চিঠি লিখে আপনাকে কষ্ট দেবার জন্য ক্ষমা করবেন।

আমি দুঃখের সঙ্গে জানলাম যে, আমেরিকায় কিছু লোক বলছে যে, স্বামী শ্রীবিবেকানন্দজী জনসাধারণের সামনে যেরূপে উপস্থিত হয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি তা নন।

* বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সং, পত্রসংখ্যা ১২২, পৃঃ ১২

স্বামীর একজন বন্ধু হিসাবে আমাকে বলতে দিন যে, আমি ওঁকে কয়েক বছর ধরে জানি। আমি তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি। জনসাধারণের কল্যাণ সাধনের জন্য যে-ব্রত নিরাসক্তভাবে তিনি গ্রহণ করেছেন, তার প্রতি তিনি একান্ত নিষ্ঠ। তিনি প্রায় ১২ বৎসর পূর্বে তাঁর পরিবার ও সামাজিক-সম্পর্কসমূহ পরিত্যাগ করেছেন এবং পুরোপুরি নিজ আত্মার এবং অন্য সকলের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হয়েছেন। তিনি শিকাগোতে গিয়েছিলেন শুধুমাত্র আমেরিকান জাতিকে সত্য হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে আলোকিত করতে—যে বিষয়ে তাঁর জ্ঞান, যাঁরা ঐ বিষয়ে প্রকৃত সমাদর করতে সমর্থ, তাঁদের প্রশংসা অর্জন করবার মতো। তিনি হিন্দু জনসাধারণের একজন প্রকৃত বন্ধু এবং তাদের ধর্মের একজন দৃঢ় সমর্থক। আমি যখন গত নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে অহিফেন সংক্রান্ত রয়্যাল কমিশনে কাজ করতে কলকাতায় গিয়েছিলাম তখন সেখানে তাঁর বাড়ি, তাঁর মাতা এবং ভ্রাতাদের দেখে এসেছি। তিনি তাঁর আত্মীয়দের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন না, কারণ তিনি দীর্ঘদিন পূর্বে সংসার-বন্ধন ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছেন। আমি আপনাকে এই সঙ্গে ডাক মারফত একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাঠাচ্ছি, যেটি পাঠ করলে আপনি আমার বিষয় জানতে পারবেন।

আপনি এই চিঠিটি সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন, করলে আমি সে প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাব।

আপনার বিশ্বস্ত[২৮]

হরিদাস বিহারীদাস

স্বামীজীর আমেরিকার বন্ধুবর্গ ভারতীয় বন্ধুবর্গের চিঠির দ্বারা সন্তুষ্ট হতে পারেন, কিন্তু জনসাধারণ সন্তুষ্ট হতে পারে একমাত্র জনসাধারণ কর্তৃক অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হলে। মাদ্রাজের সভার দ্বারা ভারত অবশেষে তাদের বীরপুরুষের প্রতি আপন কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হলো এবং তারপর যথা সময়ে সারা দেশে জয়ধ্বনি এবং উৎসবের মধ্য দিয়ে অন্যান্য সব জনসভা অনুষ্ঠিত হলো। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আগস্টের ২২ তারিখে কুম্ভকোনমে, বাঙ্গালোরে আগস্টের ২৬ তারিখে, খেতড়িতে পরবর্তী বৎসরের মার্চে এরূপ জনসভা অনুষ্ঠিত হলো। কিন্তু ১৮৯৪-এর সেপ্টেম্বরের ৫ তারিখে কলকাতায় যে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়, যাতে "উৎসাহ প্রায় উন্মাদনার পর্যায়ে পৌঁছেছিল", সেটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল। কারণ কলকাতা যে শুধু স্বামীজীর জন্মস্থান, যেখানে তাঁর জীবন ও চরিত্র সকলেরই ভাল করে জানা ছিল,

তা শুধুই নয়, তাছাড়াও এ স্থানটিই ছিল মজুমদারের বিরোধিতার মূলকেন্দ্র; আরও ঐ সভায় বহু খ্যাতনামা গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের প্রতিনিধিত্বমূলক উপস্থিতি দৃষ্টি আকর্ষণীয় ছিল। এর দ্বারা একটা যে প্রচার চলছিল যে, বিবেকানন্দ নব্য-হিন্দু মতবাদের প্রতিনিধি, সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি নন—সেটি মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। প্রধানত স্বামীজীর গুরুভাইদের অন্যতম স্বামী অভেদানন্দের প্রচেষ্টার ফলেই এই বিপুল সাফল্যমণ্ডিত সভাটি অনুষ্ঠিত হতে পেরেছিল। স্বামীজীর ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, "[এই স্বামী] দিবারাত্র উন্মাদের মতো খেটেছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে তাঁর পরিচিতজনদের নিকট থেকে অর্থ-সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি সভার কার্যবিবরণী ছেপে বার করেছিলেন এবং আরও বৃহত্তর জনসমাজের নিকট প্রচারের উদ্দেশ্যে তা সংবাদপত্রেও পাঠিয়েছিলেন এবং এ কাজটি তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন।"[২৯]

সংবাদপত্রগুলিও নিজেরাই উৎসাহী হয়ে এগিয়ে এসেছিল এবং স্বামীজী সম্বন্ধে অসংখ্য প্রতিবেদন এবং সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিল। একটি জাতীয় বিজয় এবং উৎসবের মনোভাব এসে পড়েছিল। কলকাতার সভাটি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা পাওয়া যায় ইণ্ডিয়ান মির পত্রিকার সেপ্টেম্বরের ৬ এবং ১৬ তারিখে প্রকাশিত বিবরণী থেকে। দুটি বিবরণীর অংশবিশেষ পরপর নিচে দেওয়া হলো ঃ

স্বামী বিবেকানন্দকে এবং আমেরিকার অধিবাসীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য কলকাতায় অনুষ্ঠিত জনসভা

গত সন্ধ্যায় টাউন হলে অনুষ্ঠিত হিন্দুসমাজের বিশাল সমাবেশ উপস্থিত সকলের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল কারণ এটি একটি বাস্তব সত্য উপলব্ধির বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বর্তমানে নানা জাতি ও উপজাতিতে বিভক্ত হিন্দু সমাজের সকলের একই মঞ্চে উপস্থিতি, অনুভূতির ঐক্য, যা সকলকে উজ্জীবিত করেছিল, সর্বজনীন উৎসাহ বক্তার পর বক্তা যখন উঠছিলেন এবং বসছিলেন তখন করতালির ঐকতান এবং সমস্ত অনুষ্ঠানটির মধ্যে পরিপূর্ণ আন্তরিকতা—এ সকলই প্রমাণ করল যে, হিন্দুজাতির শিরায় শিরায় আর একবার প্রাণের স্পন্দন তীব্র গতিবেগে শুরু হয়েছে। কালকের এই সভা আহ্বান করা হয়েছিল একটি অসাধারণ এবং সত্যিকারের জাতীয় উদ্দেশ্য পূরণের জন্য। এই সভা এমন একজনকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের

জন্য আহূত হয়েছিল যিনি উত্তমরূপে তাঁর দেশবাসীর নিকট হতে এই কৃতজ্ঞতা অর্জন করে নিয়েছিলেন, কিন্তু যে কেউই এটাও দেখতে পেয়েছিল যে, সভার সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল এসবকে অতিক্রম করে আরও কিছু। যে কেউই দেখতে পেয়েছিল যে, কলকাতার হিন্দুরা কেবলমাত্র স্বামী বিবেকানন্দকে অভিনন্দন জানাবার জন্য মিলিত হয়নি, হয়েছে হিন্দুজাতির উদ্দেশ্যকে পাশ্চাত্য জগতে উপস্থাপিত করবার কাজকে এগিয়ে নেবার একটি উদ্যমকে অভিনন্দিত করবার জন্য...। স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র হিন্দু জাতির মর্মবাণীকে তার স্বীকৃত প্রতিনিধি হিসাবে পৌঁছে দেন আমেরিকাবাসীদের নিকট এবং তিনি তাদের নামেই তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করেন এবং তিনি নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা বলেননি, কিম্বা কোন কর্তৃত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে কোন মতবাদ প্রচার করেন নি, তিনি শুধু আধুনিক হিন্দুদের পক্ষ থেকেই নয়, কথা বলেছেন প্রাচীন ভারতের মহান ঋষিদের, ধর্মশাস্ত্র প্রণেতাদের এবং অবতারপুরুষদের পক্ষ থেকেও। আমেরিকার অধিবাসিগণ স্বামী বিবেকানন্দের ঐকান্তিকতা, নিষ্ঠা এবং নিঃস্বার্থপরতা দেখে ধর্মের এই বার্তাবহকে সমর্থন জানালেন, কিংবা স্বামীর কথা শোনবার পর তাঁরা এখন সেই বাণীকেও সমভাবে সমর্থন জানালেন—এতে আর আশ্চর্যের কি আছে? এমনকি এদেশেও স্বামীজীর আমেরিকায় এই বিস্ময়কর সাফল্যকে ছোট করবাব চেষ্টা করা হয়েছে। অনেকে এমন কি তিনি যে হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন সে কথাও অস্বীকার করবার প্রয়াস করেছেন। কিন্তু এ কথা সত্য যে, তাঁর এই প্রচার-কার্যে যাওয়ার জন্য সমস্ত খরচ মাদ্রাজের হিন্দুরা বহন করেছেন। তাঁরা পরবর্তী সময়ে একটি জনসভার অনুষ্ঠান করে তাঁদের প্রতিভাবান প্রতিনিধির কাজে উষ্ণ সমর্থন জানিয়েছেন এবং পরবর্তী কালে ভারতের বিভিন্ন অংশের হিন্দুগণ মাদ্রাজের নির্বাচনকে সমর্থন জানিয়েছেন। কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত কালকের মহতী সভা দেখাল যে, বঙ্গীয় হিন্দুরাও স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর কর্মের দ্বারা যে উচ্চ সম্মান পাবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন তা তাঁকে দিতে পিছিয়ে নেই।[৩০]

স্বামী বিবেকানন্দ

টাউন হলে অনুষ্ঠিত হিন্দুসমাজের জনসভা

কলকাতা এবং শহরতলীর অধিবাসীদের বিপুল সমাগমে পূর্ণ এবং

প্রচুর উদ্দীপনার সঙ্গে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এ মাসের ৫ তারিখে, বুধবার দিনে সন্ধ্যা ৫-৩০ মিনিটে টাউন হলে। সভার লক্ষ্য ছিল আমেরিকায় হিন্দু ধর্মের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ যে বিরাট কাজ করেছেন সেজন্য তাঁকে কিভাবে হিন্দুদের পক্ষ থেকে সবচেয়ে ভাল করে ধন্যবাদ জানানো যায় তা বিবেচনা করা। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সভাটি ছিল প্রতিনিধিত্বমূলক। হিন্দুদের প্রত্যেকটি শাখা এখানে প্রতিনিধিত্ব করেছে। ৫-৩০ মিনিটে সভাটি শুরু হবে বলে ঘোষণা করা হলেও ৫টা বাজতে না বাজতেই সভাগৃহ একেবারে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বক্তাগণ যখন সভাকক্ষে ঢুকছিলেন অত্যন্ত উদ্দীপনার সঙ্গে তাঁদের হর্ষধ্বনি করে অভিনন্দিত করা হয়। সভাটির সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক বৈশিষ্ট্য ছিল যে, এতে বহুসংখ্যক গোঁড়া পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন, সভার উদ্দেশ্যের সঙ্গে যে তাঁদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে তা জ্ঞাপন করতে। হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে, সভায় প্রায় ৪০০০ শ্রোতা উপস্থিত হয়েছিল। [এরপর উল্লেখিত হয়েছে উপস্থিত নেতৃস্থানীয় হিন্দুদের একটি তালিকা, সভাধিপতি রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়েব একটি ভাষণ এবং তিনটি প্রস্তাবের দীর্ঘ মুখবন্ধ। প্রস্তাব ৩টি ছিল :]

(১) এই সভা স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের উদ্দেশ্য চরিতার্থতার জন্য যে মহৎ কাজ করেছেন এবং তার পরবর্তী সময়েও তিনি এজন্য যা কিছু করেছেন, সেজন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করছে।

(২) এই সভা সর্বাপেক্ষা অধিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে ধর্মমহাসভার সভাপতি জে. এইচ্. ব্যারোজকে, ধর্মমহাসভার বৈজ্ঞানিক শাখার সচিব শ্রীযুক্ত মারউইন মেরী স্নেলকে এবং আমেরিকার জনসাধারণকে তাঁরা তাঁকে যে প্রীতি ও সহানুভূতিপূর্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন সেজন্য।

(৩) এই সভার সভাপতি মহাশয়কে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, স্বামী বিবেকানন্দ এবং ডঃ ব্যারোজকে পূর্বোত্থাপিত প্রস্তাবসমূহের প্রতিলিপি নিম্নলিখিত পত্রটিসহ স্বামী বিবেকানন্দের ঠিকানায় প্রেরণ করা হোক। [স্বামী বিবেকানন্দের ঠিকানায় লেখা এই চিঠিটি ইণ্ডিয়ান মিরর পুরো ছেপে বার করে এবং আমরা এই চিঠি থেকে পরে উদ্ধৃতি দেব]।[৩১]

কলকাতার এই অভিনন্দনসভা যেভাবে স্বামীজীকে স্বীকৃতি জানাল তা

আর কোন কিছুর দ্বারাই সম্ভব হয়নি, তাঁর এবং তাঁর কর্মের ওপর সরকারিভাবে অনুমোদনের এই শিলমোহরের ছাপ এমনভাবে পড়ল যা পাকাপোক্ত এবং এমন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সেটা পড়ল যা নিয়ে আর কোন সংশয় করা চলে না। এ সভার বিশদ বিবরণ যখন তাঁর নিকট পৌঁছল, স্বামীজী আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে হেল ভগিনীদের একটি চিঠি লিখলেন। এ চিঠিটা তাঁর সকল চিঠিপত্রের মধ্যে সবচেয়ে চিত্ত-আলোড়নকারী, এতে প্রকট এর আগে তিনি যে মনোকষ্ট পেয়েছেন তা মানবিক দিক থেকে কতখানি গভীর ছিল এবং ভারত থেকে পূর্ণ সরকারি সমর্থন লাভ করে তাঁর শিশুর মতো কতখানি আনন্দ লাভ হয়েছিল। সুতরাং, যদিও চিঠিখানি তাঁর রচনাবলীতে পুরোপুরি প্রকাশ করা হয়েছে এবং পাঠকদের পরিচিত তথাপি এটি এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হলো। (এ কথা এখানে উল্লেখ করা কর্তব্য যে, বিবেকানন্দের রচনাবলীতে এবং মূল চিঠিখানির একটি প্রতিলিপিতে এই চিঠির তারিখ দেওয়া হয়েছে জুলাই ৯, ১৮৯৪, যেটি নিশ্চিতরূপে ভুল, কারণ চিঠির বয়ানে স্পষ্ট লেখা আছে যে, সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেপ্টেম্বরের ৫ তারিখে। এ ছাড়া দেখা যাচ্ছে স্বামীজী এই চিঠিটার সঙ্গেই ঐ সভার সভাপতির চিঠিটাও পাঠাচ্ছেন, যে চিঠিটা তাঁর হাতে অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহের আগে পৌঁছয়নি।[৩২] সুতরাং নিচের চিঠিটির* তারিখ হওয়া উচিত অক্টোবরের কোন দিনের) :

আমার বোনেরা

জগজ্জননীর জয় হোক—আমি আশাতীত লাভবান হয়েছি এবং ঈশ্বরের বার্তাবহ ব্যক্তিটি সম্মানিত হয়েছেন নিজ দেশে এবং রীতিমত শোধ তুলে। তাঁর করুণা দেখে আমি শিশুর মতো কাঁদছি—শোন বোনেরা ঈশ্বর কখনও তাঁর সেবককে পরিত্যাগ করেন না। আমি তোমাদের এইসঙ্গে যে চিঠিগুলি পাঠালাম, সেগুলিই যা বলবার বলবে—ছাপানো জিনিসগুলি আমেরিকার অধিবাসীদের নিকট আসছে—ওতে যাদের নাম রয়েছে তারা আমাদের দেশে সবচেয়ে সমাদৃত ব্যক্তিবর্গ যারা উদ্যানের শ্রেষ্ঠ পুষ্পরাজির মতো। যিনি সভাপতি ছিলেন তিনি হলেন কলকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বপ্রধান এবং অন্য ব্যক্তিটি মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন, কলকাতার সংস্কৃত

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম সং, পত্রসংখ্যা ১০৪, পৃঃ ৩৬০

কলেজের অধ্যক্ষ এবং সারা ভারতের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে মুখ্য বলে পরিগণিত—তাঁকে তাই বলেই সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে—চিঠিটা তোমাদের যা বলার বলবে—ওঃ আমি কি দুর্জন বল তো যে, এ ধরনের করুণার প্রকাশ দেখেও মাঝে মাঝে আমার বিশ্বাস টলে যায়—আমি তাঁর হাতেই রয়েছি এ দেখা সত্ত্বেও আমার এই অবস্থা!

তবুও মনে মাঝে মাঝে হতাশার উদয় হয়। শোন বোনেরা, একজন ঈশ্বর আছেন, আছেন পিতা—আছেন মাতা—যিনি তাঁর সন্তানদের কখনও পরিত্যাগ করেন না—কখনও না, কখনও না, কখনও না—অলৌকিক ব্যাপার সরিয়ে রাখ এবং শিশুর মতো তাঁর শরণ নাও—আমি আর লিখতে পারছি না—আমি মেয়েদের মতো কাঁদছি।

আমার আত্মার অধীশ্বর, প্রভু, ঈশ্বর, তোমার জয় হোক, জয় হোক।

তোমাদের স্নেহশীল[৩৩] [*]

বিবেকানন্দ

স্বামীজী যে চিঠির উল্লেখ করেছেন সেটি সত্যিসত্যিই তাঁকে লেখা সভার সভাপতির সরকারি চিঠি এবং তৃতীয় প্রস্তাবটি অনুসারে তাঁকেই পাঠানো হয়েছিল। ভারতের হয়ে তাঁর পাশ্চাত্য বিজয়ের এটিই হলো পূর্ণ সপ্রশংস মূল্যায়ন। এটি অংশত হলো ঃ

আপনি, আমেরিকায় অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে গিয়ে যাঁদের সম্মানিত করেছেন তাঁরা সকলে গভীরভাবে আপনার প্রচেষ্টাকে প্রীতি ও উচ্চ প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেছেন। কিন্তু তাঁদের পবিত্র আর্যধর্ম প্রচারে আপনার যে-অবদান আপনার প্রদত্ত ভাষণসমূহ এবং অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের প্রতিটি প্রশ্নের তাৎক্ষণিক প্রদত্ত উত্তরের মাধ্যমে আপনি রেখেছেন, তার জন্য আপনার বিশেষ স্বীকৃতি প্রাপ্য। ১৮৯৩-এর ১৯ সেপ্টেম্বরে, মঙ্গলবার, ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহের আপনি যেরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন একটি বক্তৃতার সীমার মধ্যে তার চেয়ে নির্ভুল তার চেয়ে প্রাঞ্জল বর্ণনা আর কিছু হতে পারে না। একই বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে আপনার পরবর্তী উক্তিগুলিও সমান সুস্পষ্ট এবং নির্ভুল... আপনার স্বদেশবাসী নাগরিকবৃন্দ এবং হিন্দুধর্মাবলম্বিগণ মনে করে তাদের কর্তব্য পালনে ত্রুটি থেকে যাবে, যদি না তারা ভারতের সুপ্রাচীন ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধীয় প্রকৃত জ্ঞান প্রচারের জন্য আপনি যে পরিশ্রম করেছেন তার

---

* বাণী ও রচনা, ১ম সংস্করণ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পত্রসংখ্যা ১০৪, পৃঃ ৪৫৯-৬০

জন্য আপনাকে তাদের আন্তরিক সহানুভূতি এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানায়।"[৩৪] যে শুভ কাজের সূচনা আপনি করেছেন তা বহন করার শক্তি ও উদ্যম যেন ঈশ্বর আপনাকে দেন।

স্বামীজীর উদ্দেশ্য সাধনের পথে একটি বড় বাধা কার্যকরভাবে চুরমার হয়ে গেল। কিন্তু কলকাতার জনসভা স্বামীজীর পক্ষে কোনক্রমে থেমে যাওয়া বা ক্ষান্তি ঘটাল না। অপরপক্ষে এর সাফল্যের কথা জেনে এবং এটির সংগঠনের ব্যাপারে তার গুরুভাইদের ভূমিকার কথা জেনে তিনি তাদের আরও উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করলেন ঃ

এক্ষণে তোমরা নিজেদের শক্তির পরিচয় পেলে—গরম থাকতে থাকতে লোহার উপর ঘা মার। মহাশক্তিতে কার্যক্ষেত্রে অবতরণ কর। কুঁড়েমির কাজ নয়। ঈর্ষা অহমিকা ভাব গঙ্গার জলে জন্মের মতো বিসর্জন দাও ও মহাবলে কাজে লেগে যাও। বাকি প্রভু সব পথ দেখিয়ে দেবেন। মহাবন্যায় সমস্ত পৃথিবী ভেসে যাবে।... কিন্তু কাজ, কাজ আর কাজ—এই মূলমন্ত্র।[৩৫] *

এবং স্বামী অভেদানন্দকে লিখলেন ঃ

তোমরা সকলে প্রচণ্ড কর্মশক্তির প্রমাণ রেখেছ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের কথা কি করে মিথ্যা হবে? তোমাদের মধ্যে আশ্চর্য এক ভাব আছে... তবে 'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি'—এ হচ্ছে স্বাভাবিক। গভীর মানসিক সাম্যাবস্থা বজায় রাখো। তোমার বিরুদ্ধে নির্বোধ জীবেরা যা খুশি বলুক না কেন তুমি গ্রাহ্য করো না। ঔদাসীন্য, ঔদাসীন্য, ঔদাসীন্য আমি ইতোমধ্যে শশীকে [স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ] সব লিখেছি।

গুরু মহারাজের [শ্রীরামকৃষ্ণের]... কাজের জন্য একটু জনসমর্থন প্রদর্শনের প্রয়োজন ছিল। এটি সুসম্পন্ন হয়ে গেছে, এ পর্যন্ত খুব ভালই হয়েছে। এখন তোমরা কোন মতেই ইতর লোকেরা আমাদের সম্বন্ধে কি আজে-বাজে-বকছে তাতে আদৌ কান দেবে না... যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের কোমর বেঁধে আমার পেছনে সকলে মিলে দাঁড়াচ্ছ, ততক্ষণ পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীও যদি আমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়, জেনো আমাদের ভয়ের কিছু নেই।"[৩৬] **

* বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সং, পত্রসংখ্যা ১২৩, পৃঃ ১৩-১৪

** ঐ, ১ম সংস্করণ, ৭ম খণ্ড, পত্রসংখ্যা ১৪৬, পৃঃ ৪০-৪১

মাদ্রাজে আলাসিঙ্গাকে লিখলেন—

মিশনারিদের এখানে কে গ্রাহ্য করে? তারা আমার পেছনে অনেক ঘেউ ঘেউ করেছে, কিন্তু এখন তারা থেমে গেছে। আমি কখনও তাদের কোন উত্তর দিই নি এবং তার জন্য লোকের চোখে আমার সম্মান বেড়েছে। আর খবরের কাগজ আমাকে পাঠিও না, অনেক হয়েছে। কাজের জন্য একটু বিজ্ঞাপন প্রয়োজন ছিল। এখন তাও যথেষ্ট হয়েছে। চারদিকে চেয়ে তাদের (স্বামীজীর গুরু ভাইদের) দেখ, দেখ, তাদের পায়ের তলায় প্রায় কোন জমি ছিল না, তারা কিভাবে তা গড়ে তুলেছে। যদি এই অপূর্ব সূচনা দেখেও তোমরা কিছু না করতে পার, আমি অত্যন্ত হতাশ হব। যদি তোমরা আমার সন্তান হও, তোমরা কোন কিছুতে ভয় পাবে না, কোন কিছুতে থেমে পড়বে না, তোমরা হবে সিংহ-সদৃশ। আমাদের ঘটাতে হবে ভারতের এবং জগতের অভ্যুত্থান। আমি কোন 'না' শুনব না। তুমি কি কিছু মনে করছ? কোন কাপুরুষতা নয়... আমৃত্যু সঙ্কল্প... জগতের লোকদের মধ্যে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত কর। অর্থ সংগ্রহ কর এবং প্রচার কর। তোমার জীবনব্রতের প্রতি সত্যনিষ্ঠ হও। এ পর্যন্ত তোমরা অপূর্ব কাজ করেছ, আরও ভাল কাজ কর, আরও ভাল এ ভাবেই কাজ করে চল, কাজ করে চল।[৩৭] *

একটি গুটিয়ে নেওয়া যন্ত্রের মতো, অর্থহীনভাবে আরও কিছুকাল সমালোচনা এবং শত্রুতার কচকচানি চলল। সত্যিসত্যিই কলকাতার জনসভা, যার সংবাদ যথাসময়ে আমেরিকার সংবাদপত্রগুলির নিকট পৌঁছে গিয়েছিল, কতগুলি দিক থেকে পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে দিয়েছিল, দৃষ্টান্তস্বরূপ অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে ক্রিটিক পত্রিকা বলা যায় একটি ন্যাবারোগগ্রস্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করে, পত্রিকাটি সাধারণভাবে স্বামীজীর প্রতি অনুকূলভাবাপন্নই ছিল, কিন্তু এবার এটি স্বামীজীর দোষদর্শীদের মধ্যে একটি নতুন সুর সংযোজিত করল। ১৮৯৫-এর মে মাসের ৪ তারিখে পত্রিকাটি নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি প্রকাশিত করল—

কলকাতার হিন্দু-সমাজ তাদের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর(?) ১৮৯৪-এর সেপ্টেম্বরের ৫ তারিখে টাউন হলে মিলিত হয়ে একটি সভানুষ্ঠান করেন তাঁকে এবং আমেরিকার জন-সাধারণকে প্রকাশ্যভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবার জন্য। প্রায় ৪০০০ শ্রোতা এই সমাবেশে

---

* বাণী ও রচনা, ১ম সংস্করণ, ৭ম খণ্ড, পত্রসংখ্যা ১৪৪, পৃঃ ৩৩-৪

উপস্থিত ছিলেন, প্রভাবশালী গোঁড়া পণ্ডিতেরা প্রচুর সংখ্যায় যোগদান করেছিলেন এবং অধিকাংশ ভাষণ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল। এই ভাষণসমূহের ইংরেজী এবং বাংলা প্রতিলিপি একটি পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত হয়েছে, যা দেখে প্রাচ্য-দেশীয় এবং আমেরিকার পাঠকেরা বুঝতে পেরেছিল যে কি ঘটেছিল। আমরা ইংরেজীতে যে কয়টি ভাষণ আছে, সবকয়টি পড়েছি, সেগুলি থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, আমাদের প্রাচ্যদেশীয় ভ্রাতৃবর্গ আধুনিক আমেরিকাকে সদ্য আবিষ্কার করেছেন। এটাও সুস্পষ্ট যে, আমাদের এই সকল প্রাচ্যদেশীয় ভ্রাতৃবৃন্দ উচ্চগ্রামে স্তুতিবাদ এবং আড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় আত্মগরিমা প্রকাশ করতে ভালবাসেন ঠিক যেমন আমেরিকানরা জুলাইয়ের ৪ তারিখে বল্গাহীন উদ্দাম হয়ে উঠে করে থাকে। হিন্দুধর্মীয় মতবাদে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস এবং উল্লাস প্রকাশ ছাড়াও আমরা আমাদের সহযোগী এইসকল আর্যবংশোদ্ভূতদের মধ্যে একজনের কাছে বেদের লীলাভূমির অধিবাসীদের নিকট আমরা যে কত ঋণী সে বিষয়ে জ্ঞানলাভ করলাম। খ্রীস্টীয় জগতের প্রায় প্রতিটি উচ্চ চিন্তা এবং আকাঙ্ক্ষা, কোনও না কোন হিন্দু ভাবধারার অনুপ্রবেশের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে জানলাম। আমরা আরও জানলাম যে, আমেরিকা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সারবান খাদ্যের অভাবে উপবাসী ছিল, এখন আমাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় এবং আলোকপ্রাপ্ত নরনারী হিন্দুধর্মের দ্বারস্থ হয়েছে তাদের এই মানসিক খাদ্যের জন্য এবং আমেরিকার অধিবাসীদের হিন্দু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। এ দেশের সর্বশেষ সংবাদ পেতে হলে এখন আমাদের দেশের বাইরে যেতে হবে! পুস্তিকাটি হিসাব করে প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক সমীক্ষা করাকে যে-সকল উগ্র গোঁড়া খ্রীস্টানেরা প্রচণ্ড ঘৃণা করে, তাদের কাছে এটি লাল লঙ্কা পোড়ানোর মতো ব্যাপার হয়ে ওঠে এবং যারা খ্রীস্টধর্মকে অন্য ধর্মগুলির সমপর্যায়ে চলে যেতে দেখলে আনন্দ পায়, তাদের ভেতরের অগ্নিকুণ্ডগুলিকে উত্তপ্ত করে তোলে। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যাঁরা কোন রচনার প্রতিটি লাইন পড়তে অভ্যস্ত এবং যাঁদের কিছুমাত্র রসবোধ আছে এবং যাঁরা মানবপ্রকৃতির বিচিত্র উল্লাস উপভোগ করে থাকেন তাঁরা এটির দ্বারা যে প্রয়োজন, যে আকাঙ্ক্ষা, সিদ্ধ করতে চাওয়া হয়েছে এবং এর মধ্যে যে আত্মম্ভরিতা এবং দম্ভের প্রকাশ আছে, সেগুলি যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানবচরিত্রের সমগোত্রীয়

সে বিষয়ে প্রমাণ পেয়ে তৃপ্ত হবেন। "স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে কলকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত জনসভার কার্যবিবরণী" মাত্র ২০০০ কপি ছাপা হয়েছে (কলকাতা : নিউ ক্যালকাটা প্রেস)।

কিন্তু যদিও কোথাও কোথাও বিদ্বেষের প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল, তথাপি আর এ বিষয়ে কারুর মনে কোন সন্দেহের অবকাশ রইল না যে, স্বামী বিবেকানন্দ নিজের দেশে স্বধর্মের বার্তাবহ হিসাবে সুসমাদৃত। ইণ্ডিয়ান মিরর ১৮৯৪-এর ডিসেম্বরে সম্পাদকীয়তে সে কথা লিখল :

> *...একমাত্র চিত্তের সঙ্কীর্ণতাপ্রসূত সাম্প্রদায়িকতা অথবা ঘৃণ্য গোঁড়ামিই একজন হিন্দুকে—তা সে পৌত্তলিকই হোক আর ব্রাহ্মই হোক—স্বামীজীর প্রতি নাসিকা কুঞ্চিত করতে এবং তাঁর ত্রুটি ধরতে প্রবৃত্ত করতে পারে।*[৩৮]

স্বামীজীর দিক থেকে তিনি যেমন ছিলেন তেমনই রইলেন। "দেশবাসীর প্রশংসা পেয়ে গর্বে স্ফীত হয়ে উঠবে—ঈশ্বর তাঁর সেবককে তা হতে দেবেন না এ-কথা আমি জানি"—এ-কথা তিনি সেপ্টেম্বর ১৩ তারিখে যিনি তাঁর জনসভায় এবং ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন লাভে মাতৃসুলভ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন সেই শ্রীমতী হেলকে—লিখলেন :

> *"তারা আমাকে প্রশংসা করছে এতে আমি খুশি (আরও লিখলেন) আমার জন্যই নয়, এই জন্য যে, আমি এই দৃঢ় বিশ্বাসে এখন উপনীত হয়েছি যে, কোন মানুষকে তার নিন্দা করে উন্নত করা যায় না, প্রশংসা করে করা যায়, জাতির ক্ষেত্রেও তা সত্য। চিন্তা করে দেখুন আমার হতভাগ্য আদর্শনিষ্ঠ দেশের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনে কি পরিমাণ নিন্দাই না বর্ষিত হয়েছে। আর কি কারণে? তারা তো খ্রীস্টানদের, তাদের ধর্মের বা তার প্রচারকদের কোন ক্ষতি করেনি...। সুতরাং আপনি দেখতে পাচ্ছেন মা, একটি বিদেশী জাতি ভারতকে যে-সকল ভাল কথা বলবে, তার প্রতিটিই ভারতের-কল্যাণসাধনের পক্ষে প্রভূত শক্তিমণ্ডিত হবে। আমার সামান্য কাজ আমেরিকায় প্রশংসা পেয়েছে, এ তাদের কল্যাণের পক্ষে প্রভূত কাজের হয়েছে। ভারতের দুর্দশাগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ দরিদ্র অধিবাসীদের দিবারাত্র নিন্দামন্দ না করে তাদের জন্য ভাল কথা, একটি ভাল চিন্তা পাঠাও। আমি সকল জাতির কাছে আমার দেশের জন্য সেটুকুই প্রার্থনা করি। যদি পার তো সাহায্য কর, তা যদি না পার তো তাকে অন্ততপক্ষে নিন্দামন্দ করো না।"*[৩৯]

একাদশ অধ্যায়

১৮৯৪-এর গ্রীষ্মকাল

॥ ১ ॥

গত অধ্যায়ে আমরা বলেছি ১৮৯৪-এর গ্রীষ্মকালে স্বামীজীকে যে অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল সে-কথা। এজন্য সম্ভবত পাঠকদের মনে এরকম একটা ধারণা রয়ে গেছে যে, এ সময়টা ছিল তাঁর পক্ষে হতাশার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা তা নয়। বাস্তব তথ্যের দিক থেকে যদিও বাহ্য পরিস্থিতি ছিল তাঁর পক্ষে অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং এ অবস্থা আগস্ট মাসের শেষ অবধি অপরিবর্তিতই ছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও অন্তরের দিক থেকে তিনি আধ্যাত্মিক আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ছিলেন এবং এই অভ্যন্তরীণ দিকটিই ছিল তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ বস্তুটি সকল অবতারপুরুষদের জীবনেই বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা যায়, তার কারণ তাঁরা অবশ্যই মানবিক ও দিব্য-চেতনা—এ দুটি স্তরেই অবস্থান করে থাকেন।

হেলদের আবাসে তিনি জুন মাসটি কাটাচ্ছিলেন, সেখান থেকে লেখা একটি চিঠিতে দেখা যায় তিনি শিশুর মতো চিন্তাভাবনাহীন হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। চিঠিটি লেখা হয়েছে শ্রীমতী হেলকে, যিনি তখন স্বামী-সহ শিকাগো থেকে ১০০ মাইল দক্ষিণে ধাতুমিশ্রিত একটি প্রস্রবণের ধারে ইণ্ডিয়ানার ওয়ারেন কাউন্টিতে একটি কেতাদুরস্ত বিশ্রামক্ষেত্রে "জলোচ্ছ্বাস গ্রহণ করছিলেন।" হেল ভগিনীদ্বয় (এবং তাদের সম্পর্কিত ভগিনীগণ) বাড়িতে ছিলেন শ্রীযুক্ত হেলের ভগিনী শ্রীমতী জেম্‌স ম্যাথুসের অভিভাবকত্বে, স্বামীজী যাঁকে—"মা মন্দির" নামে ডাকতেন। শিকাগোর এই আবাস হতে লিখিত এই চিঠিটার বয়ান ঃ

প্রিয় মা,

আমরা সকলে এখানে খুব ভাল আছি। গতকাল রাত্রে বোনেরা আমাকে, শ্রীমতী নর্টনকে, কুমারী হাউকে এবং শ্রীযুক্ত ফ্রাঙ্ক লোনকে নিমন্ত্রণ করেছিল। আমাদের দারুণ নৈশভোজ হলো, নরম খোলার কাঁকড়া ছিল এবং ছিল আরও অনেক রকমের খাবার এবং খুবই সুন্দর কাটল সময়টা। কুমারী হাউ আজ সকালে চলে গেলেন।

বোনেরা এবং "মা মন্দির" আমার খুব যত্ন নিচ্ছেন। এখন আমি যাচ্ছি "আমার প্রিয়" গান্ধীর [বীরচাঁদ এ গান্ধী?] সঙ্গে দেখা করতে। নরসিম্‌হা কাল এখানে এসেছিল, সে সিনসিনাটি যেতে চাইল, যেখানে গেলে সে বলছিল যে, তার জগতের অন্য সব জায়গা থেকে সবচেয়ে বেশি সাফল্যের সম্ভাবনা। আমি তাকে যাতায়াত খরচ দিয়ে দিয়েছি, তাতে আমি আশা করছি আপাতত শ্বেতহস্তীটিকে হাতের বাইরে ঝেড়ে ফেলতে পেরেছি। পিতা পোপ এখন কেমন আছেন? আশা করি এখন তিনি পাঁকাল মাছের ব্যবসায়ে প্রচুর লাভবান হয়েছেন।

আমি নিউ ইয়র্কের কুমারী গার্নসির কাছ থেকে একটি খুব সুন্দর চিঠি পেয়েছি। তাতে তিনি আপনাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। আমি শহরে যাচ্ছি একজোড়া জুতো কিনব আর নরসিম্‌হাকে টাকাটা দেওয়ায় শূন্য হয়ে যাওয়া আমার টাকার থলিটি পূর্ণ করতে কিছু টাকা তুলে আনব।

আর কিছু লেখবার নেই—হ্যাঁ, আমরা "চার্লির মাসীমা" নাটকটি দেখতে গিয়েছিলাম, আমি এত হেসেছি যে হাসতে হাসতে প্রায় মরে যাচ্ছিলাম। "পিতা পোপ" এটা দেখলে খুবই উপভোগ করবেন। আমি জীবনে এর চেয়ে হাসির কিছু দেখিনি।

আপনার স্নেহের[১]
বিবেকানন্দ

'চার্লির মাসীমা' খুবই জনপ্রিয় প্রহসন, বেখাপ্পা পরিচয় অদল-বদল নিয়ে—এমন একটি কৌশলে জিনিসটি তুলে ধরা হয়েছে যা আমেরিকানদের পক্ষে দারুণ অট্টহাসিতে ফেটে পড়বার মতো। রসিকতাগুলি স্বতঃস্ফূর্ত এবং নির্দোষ এবং ওতে স্বামীজীও অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে নাটকের মর্মে ঢুকে পড়েছিলেন।

আবার এই শিকাগোতে নরসিম্‌হা এসে উপস্থিত, প্রবাদ বাক্যে আছে না—খারাপ মুদ্রা বারবার ফিরে আসে, সেইরকম। স্বামীজী ছেলেটির ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন, মে মাসের শেষে আলাসিঙ্গাকে লিখেছিলেন—"পুরো ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে [সে]। সকল শ্রেণীর খারাপ মেয়ে-পুরুষদের সঙ্গে মিশেছে এবং সেজন্য সকলেই তাকে এড়িয়ে চলে। সে চরম দুর্গতিতে পড়ে আমাকে সাহায্যের জন্য লিখেছিল এবং আমি আমার যথাসাধ্য তার জন্য করব। এখন তুমি তার বাড়ির লোকদের বল তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশে ফিরিয়ে নেবার জন্য কিছু টাকা পাঠাতে। সে কষ্টে পড়েছে। অবশ্য আমি দেখব যাতে তাকে উপোস না করতে হয়।"[২]

নরসিম্‌হা যাতে উপোস করে না থাকে তারজন্য যেটুকু দেখার প্রয়োজন ছিল স্বামীজী তাকে তার চেয়েও বেশি দেখেছেন। তিনি দেখেছেন যাতে সে দেশে ফিরে যেতে ব্যর্থ না হয়। [তার আত্মীয়রা না হয় তার টাকাটা দিয়ে দেবে কুক এণ্ড সন্সকে।] তিনি আলাসিঙ্গাকে নির্দেশ দিলেন ঃ "আমি কুক এ্যাণ্ড সন্সকে বলে দিয়েছি তারা তাকে একটি টিকিট দেবে, কাঁচা টাকা দেবে না। আমি মনে করি তার পক্ষে প্রশান্ত মহাসাগর হয়ে ফিরে যাওয়াই ভাল, তাতে পথের মধ্যে কোথাও নেমে পড়বার প্রলোভন থাকবে না।"[৩] ইতোমধ্যে জনৈক শ্রীমতী স্মিথ এই তরুণটিকে পাকড়াও করে ফেললেন এবং তামাশা করবার জন্য তার জন্য অন্য একটি পরিকল্পনা করলেন—সে পৌত্তলিক ভারতে একজন খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারক হয়ে যাবে। শ্রীমতী স্মিথ বেশ কয়েকটি চিঠি লিখে শ্রীমতী হেলকে ব্যাপারটা বোঝাতে চাইলেন যিনি স্বামীজীর নিকট সংবাদটি পৌঁছে দিলেন, স্বামীজী "মাদার চার্চকে" ১৮৯৪-এর আগস্ট মাসের ২৩ তারিখের চিঠিতে তাঁর মতামত লিখলেন—

"এতদিনে নরসিম্‌হা বোধহয় তার পাথেয় পেয়ে গেছে। তার পরিবার তাকে টাকাটা দিক বা না দিক সে ঠিক তা পেয়ে যাবে। আমি মাদ্রাজে আমার বন্ধুদের লিখেছি ব্যাপারটা দেখতে, তারা আমাকে লিখেছে যে, তারা দেখবে।

"আমি খুবই আনন্দিত হব যদি সে খ্রীস্টান বা মুসলমান বা যে কোন ধর্ম তার যোগ্য তা গ্রহণ করে, কিন্তু আমার মনে হয় আগামী কিছুদিনের মধ্যে এর কোনটাই আমাদের বন্ধুর পক্ষে সুবিধাজনক হবে না। যদি সে খ্রীস্টান হয়, একমাত্র তাহলে সে ভারতে গিয়ে আরও একবার বিয়ে করতে পারবে—সেখানকার খ্রীস্টানরা তাতে আপত্তি করে না। আমি জেনে খুব দুঃখিত হলাম যে, একমাত্র 'পৌত্তলিক ভারতের বন্ধনই' তার এত সব অনিষ্টের কারণ। আমরা যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি। সুতরাং আমরা সমস্তক্ষণ অজ্ঞানতাবশত এবং অন্ধের মতো আমাদের দুর্দশাগ্রস্ত, অত্যাচারিত ঋষিকল্প বন্ধু নরসিম্‌হাকে দোষ দিচ্ছিলাম। যখন সমস্ত দোষটাই ছিল 'পৌত্তলিক ভারতের বন্ধনের' দরুণ!!!

"কিন্তু শয়তানকে যদি তার প্রাপ্য দিতে হয়, তাহলে বলতে হয় যে, এই ভারতবর্ষ তাকে বারে বারে টাকা দিয়েছে স্ফূর্তি করবার জন্য। এবারও পৌত্তলিক ভারতই—খ্রীস্টান আমেরিকা নয়—আমাদের

আলোকপ্রাপ্ত নির্যাতিত বন্ধুকে নিয়ে যাবে কিংবা ইতোমধ্যেই নিয়ে গেছে তার সঙ্কটাবস্থা থেকে উদ্ধার করে!! শ্রীমতী স্মিথের পরিকল্পনাটি শেষ পর্যন্ত খারাপ নয়—নরসিম্হাকে খ্রীস্টের প্রচারক বানানো। কিন্তু জগতের দুর্ভাগ্য, বহু বহুবার খ্রীস্টের পতাকা এইরকম সব লোকদের হাতে গিয়ে পড়েছে। আমিও যোগ করতে চাই যে এ যদি ঘটে তাহলে প্রচার ঘটবে স্মিথের আমেরিকান খ্রীস্টধর্মের, খ্রীস্টের খ্রীস্ট ধর্মের নয়। একজন অতি মন্দ ব্যক্তি সে করবে প্রভু যীশুকে প্রচার!!! তাঁর পতাকা ধারণ করবার লোকের কি অভাব হয়েছে? ছিঃ, এ ভাবতে পারা যায় না, মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ভারতের ভাল করবে নরসিম্হা, সত্যি!!! আপনাকে আপনার বদান্যতার জন্য ধন্যবাদ—আপনার কুকুরকে ফিরিয়ে নিন, ভবঘুরে যেমন বলেছে। আমেরিকার জন্য এরকম ভাল ভাল কর্মীকে রেখে দিন। হিন্দুরা এসব লোকদের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করবার জন্য এদের জাতিচ্যুত করবে। আমি নরসিম্হাকে খ্রীস্টান হবার জন্য আন্তরিকভাবে পরামর্শ দিচ্ছি। আমি ক্ষমা চেয়ে বলছি তাকে আমেরিকান করে নিন—এমন সব রত্ন কেনা দরিদ্র ভারতবর্ষের সাধ্য নয়। যেখানে সে সর্বোচ্চ দাম পাবে, সেখানে সে যাক। সেখানে সে স্বাগত।”[৪]

কিন্তু নরসিম্হা খ্রীস্টধর্ম প্রচারক হবার পূর্বেই তাকে ভারতে ফেরত পাঠাবার জন্য স্বামীজীর যে পরিকল্পনা ছিল, সেটিই কার্যকর হলো। আলাসিঙ্গাকে তিনি ২১ সেপ্টেম্বর তারিখে লিখলেন—“প্রসঙ্গত বলি নরসিম্হা এখন শিকাগোতে এসেছে। যেহেতু তার হাতে কাঁচা টাকা দেওয়া হচ্ছে না, সেজন্য ভারতে ফিরে যাওয়া ছাড়া সে আর কিছু করতে পারছে না। আমার মনে হয় এতদিনে সে রওনা হয়ে গিয়েছে।”[৫] এক সপ্তাহ পরে লিখছেন : “মনে হয় নরসিম্হা মহাদেশে ফেরার জন্য রওনা হয়েছে। সে একটা অদ্ভুত লোক। সে আমাকে একটা চিঠি দিয়ে জানাল না পর্যন্ত অথচ যাতে সে ফিরে যেতে পারে এবং এখানে খেতে পায় তার জন্য আমিই তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছি।”[৬] ডিসেম্বরের শেষভাগে স্বামীজী আলাসিঙ্গার কাছ থেকে জানলেন যে, সব সময় খারাপ থাকা তরুণটি নিরাপদে দেশে পৌঁছেছে এবং খুব সম্ভব সংবাদটি পেয়ে তিনি একটি বিপুল স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তখনও তরুণ বন্ধুটি সম্পর্কে তিনি তাঁর হাত একেবারে ধুয়ে ফেলেননি। কারণ ১৮৯৫-এর ১১ জানুয়ারি তিনি তাঁর মাদ্রাজী শিষ্য জি.জি.কে লেখা একটি চিঠির অংশ বিশেষে—যা

এতাবৎ প্রকাশিত হয়নি—তাতে লিখেছেন ঃ "নরসিম্‌হা (আমেরিকান) শ্রীমতী হেলকে ভারত থেকে একটি চিঠি লিখেছে, তাতে সে হিন্দুদের বর্বর বলে দেখিয়েছে কিন্তু সে আমার বিষয়ে একটি অক্ষরও লেখেনি ঃ আমি ভয় পাচ্ছি ওর মাথায় কিছু হয়েছে। ওকে সুস্থ করে তোল। কোনকিছুই একেবারে হারিয়ে যায় না।"

১৮৯৪-এর গ্রীষ্মকালে আবার আমরা ফিরে আসছি, জুনের শেষে স্বামীজী শিকাগো ছেড়ে নিউ ইয়র্কে গেলেন। এ সময়টা ভ্রমণ করবার পক্ষে ঝুঁকিবহুল ছিল, কারণ তখন পুলম্যান কোম্পানির বিরুদ্ধে বিরাট ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ছিল, একটি প্রথম শ্রেণীর সগর্জন ক্রুদ্ধ পরিস্থিতি ব্যাপকভাবে রেলপথে যাতায়াতকে গ্রাস করছিল এবং সমগ্র জাতির ওপর প্রকাশ্য অত্যাচার চালাচ্ছিল। তথাপি শিকাগো এবং নিউ ইয়র্কের (এমন কি পুলম্যান পরিচালিত গাড়িগুলিও) ঠিক সময়মত যাতায়াত করছিল এবং জুনের ২৮ তারিখ স্বামীজীর ট্রেন বাষ্প উদ্গীরণ করতে করতে গ্রাণ্ড সেণ্ট্রাল স্টেশনে এসে পৌঁছল। এসেই তিনি সেকথা শ্রীমতী হেলকে লিখে জানালেন ঃ

প্রিয় মা,

দু ঘণ্টা আগে নিরাপদে এসে পৌঁছেছি—ল্যাণ্ডসবার্গ স্টেশনে অপেক্ষা করছিল। ডঃ গার্নসির বাড়িতে এসে উঠেছিলাম। সে-বাড়িতে একটি ভৃত্য ছাড়া আর কেউই ছিল না। আমি স্নান করে ল্যাণ্ডসবার্গের সঙ্গে একটি রেঁস্তোরায় গিয়ে ভাল খাবার খেলাম। তারপর থিওসফিকাল সোসাইটিতে ল্যাণ্ডসবার্গের ঘরে ফিরে এসে আপনাকে এই চিঠি লিখছি।

আমি আমার অন্য বন্ধুদের সঙ্গে এ পর্যন্ত দেখা করতে যাইনি। আজ সারারাত দীর্ঘ ভালমত বিশ্রাম নেবার পর কাল সকালে তাদের বেশির ভাগের দেখা পাব আশা করছি। আপনাদের সকলকে ভালবাসা জানাচ্ছি। প্রসঙ্গত বলি ট্রেনে একজন যাত্রী উঠতে গিয়ে পায়ের তলায় ফেলে আমার ছাতাটিকে মাড়িয়ে দিলে ছাতার নাসিকাটি উড়ে যায়।

আপনার স্নেহের পুত্র
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ ঃ সোজা আমার ঠিকানায় চিঠি আসবার মতো নিজস্ব আবাসে এখনও স্থিত হতে পারিনি, সেজন্য আমাকে চিঠি দিতে হলে দেবেন প্রযত্নে লিও ল্যাণ্ডসবার্গ, ১৪৪ ম্যাডিসন অ্যাভিনিউ, নিউ ইয়র্ক এই ঠিকানায়।[৭]

পরবর্তী একটি বা দুটি সপ্তাহে স্বামীজী নিঃসন্দেহে তাঁর নিউ ইয়র্কবাসী

প্রচুর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করেন এবং আমরা যেরূপ তাঁর জুলাইয়ের ১ তারিখে শ্রীমতী হেলকে লেখা নিম্নলিখিত চিঠিটা হতে জানতে পারি, তিনি তাদের কারোর না কারোর বাড়িতে একদিন দুদিন করে অদলবদল করে থাকছিলেন ঃ

প্রিয় মা,

এতদিনে আশা করছি আপনি শান্তিতে স্থিতিশীল হয়েছেন। আমি নিশ্চিত জানি যে, বাচ্চারা ম্যুডভিল্লেতে তাদের সন্ন্যাসিনীদের মঠে ভালই আছে। ['ম্যুডভিলে' সম্ভবত কেনোসার পারিবারিক নাম। তখন কেনোসা মিচিগান নদের তীরে ছোট্ট শহর উইসকনসিনের অন্তর্গত ছিল। এখানে হেল পরিবারের একটি গ্রীষ্মাবাস ছিল।] এখন এখানে খুব গরম কিন্তু মাঝে মাঝে একটি হাওয়া আসে তাতেই সব ঠাণ্ডা হয়। এখন আমি কুমারী ফিলিপসের বাড়িতে আছি। মঙ্গলবার, জুলাইয়ের ৩ তারিখে এখান থেকে অন্য কোথাও যাব।

আজ আমি কমলা রঙের কোটটি ফেরত দিতে যাচ্ছি। ফিলাডেলফিয়া থেকে যে বইগুলি এসেছে, সেগুলি কাউকে পাঠাবার যোগ্য নয়। আমি এরপর কি করব কিছুই জানি না, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করব এবং আমার নিজেকে ছেড়ে দিতে হবে সম্পূর্ণ ঈশ্বরের হাতে; তাঁর নির্দেশের অপেক্ষা করতে হবে—এই হলো সংক্ষেপে আমার নীতি যা আমি অনুসরণ করে থাকি।

আপনাদের সকলকে ভালবাসা জানাই—

আপনার স্নেহের পুত্র[৮]

চিঠির যে অংশটি বাদ দেওয়া হয়েছে তাতে মনিয়ার উইলিয়ামসের থেকে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, মনিয়ার উইলিয়ামস সাধারণত ভারতের সম্পর্কে একজন পুরো সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন। তাঁর বই থেকে স্বামীজী একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছেন। স্বামীজী যখন তাঁর মাতৃভূমির প্রতি ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা নিন্দা উদ্গীরিত হতো, তখন তার প্রতি সহৃদয়ভাবে কেউ কিছু বললে ভারী খুশি হতেন, যদিও ইতঃপূর্বে এর মধ্যে লুই রুসেলেট থেকে দুটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তবুও এটিও লিখেছিলেন। অনুচ্ছেদটি তিনি যেভাবে উদ্ধৃত করেছেন, আগে পিছে মন্তব্যসহ সেটি এখানে সেভাবেই উদ্ধৃত হলো। চিঠির এই অংশটির বয়ান হলো ঃ

এখানে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতভাষাব অধ্যাপক স্যার মনিয়র উইলিয়ামসের ভাষণ থেকে একটি উদ্ধৃতি পাঠাচ্ছি, এটি খুবই আশ্চর্যজনক

উক্তি, কারণ এটি এমন এক ব্যক্তির যিনি প্রতিদিনই আশা করেন যে, তিনি দেখবেন ভারত খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছে :

"হিন্দুদের এটি একটি লক্ষ্য করবার মত বৈশিষ্ট্য যে, এরা কখনও কাউকে ধর্মান্তরিত করার প্রয়োজন বোধ করে না কিংবা ধর্মান্তরিত করবার প্রচেষ্টাও করে না। বর্তমানে যে হিন্দুরা সংখ্যায় কমে যাচ্ছে তাও নয়। ধর্মান্তরকরণে প্রবৃত্ত দুটি বৃহৎ ধর্ম—খ্রীস্ট ধর্ম ও মুসলমান ধর্মের দ্বারা যে হিন্দুধর্ম বিতাড়িত হতে চলেছে তাও নয়। বরঞ্চ এ ধর্ম ক্রমশ দ্রুত প্রসার লাভ করছে। এর চেয়েও লক্ষণীয় হলো যে, এ ধর্ম সব কিছুকে গ্রহণ করে। সকলকে আলিঙ্গন করে এবং সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ ধর্ম বলে এ হলো মানব ধর্ম—মানুষের স্বরূপের, বিশ্বের সকল মানুষের স্বরূপের কথা। এটি খ্রীস্টধর্মের প্রসারকে বাধা দেবার কথা ভাবে না, কিংবা অন্য কোন ধর্মের প্রসারকেও গ্রাহ্য করে না। অন্য সব ধর্মকে এ ধর্ম দুহাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে চায়, এর পরিধিকে এরূপ গ্রহণ দ্বারা ক্রমাগত সম্প্রসারিত করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে সব মানুষেরই মনের উপযোগী কিছু না কিছু হিন্দুধর্মের দেবার আছে। এর শক্তি হলো এইখানে যে, এটি মানুষের বিচিত্র মন, চরিত্র এবং বিচিত্র প্রবণতার উপযোগী বস্তু দেবার সীমাহীন ক্ষমতা রাখে। উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক প্রবণতার উপযোগী বস্তু এতে আছে, আছে আধ্যাত্মিকতা এবং নৈর্ব্যক্তিক দিকও। এটির বাস্তব এবং স্থূল দিকে এটি বিষয়ী এবং সাংসারিক মানুষেরও উপযোগী। যাঁদের মনে আছে নান্দনিক এবং কবিসুলভ কল্পনার প্রবণতা তাদের উপযোগী নান্দনিক এবং আনুষ্ঠানিক দিক আছে এতে যা তাদের অনুভূতি এবং কল্পনাকে পরিতৃপ্ত করে। এর প্রশান্ত মননশীলতার দিকটি যারা শান্তি এবং নির্জনে মননশীলতার চর্চায় নিমগ্ন থাকতে চায় তাদের উপযোগী।

"প্রকৃতপক্ষে হিন্দুরা হলো স্পিনোজার জন্মের দু-হাজার বছর আগেকার স্পিনোজার মতাবলম্বী। ডারউইনের জন্মের বহু শতাব্দী পূর্বের ডারউইন পন্থী। আমাদের যুগের হাক্সলে প্রভৃতির দ্বারা ক্রমবিকাশবাদ গ্রহণের বহু শতাব্দী পূর্বের এমন কি ক্রমবিকাশবাদ শব্দটির যখন বিশ্বের ভাষার ভাণ্ডারে কোন অস্তিত্বই ছিল না, তখন থেকে এ ধর্ম ক্রমবিকাশবাদী।"

এটি খ্রীস্টধর্মের একজন অত্যন্ত দৃঢ় সমর্থকের কলম থেকে বেরিয়েছে—এ-কথা খুব আশ্চর্যের বই কি, তিনি হিন্দুধর্মের ধারণাগুলি খুব ঠিক ঠিক ধরতে পেরেছেন।[১]

মধ্য জুলাইয়ে স্বামীজীকে দেখা গেল গার্নসির গ্রীষ্মকালীন আবাস ফিসকিল ল্যাণ্ডিংংয়ে, এর অপর যে নাম তা হলো হাডসন নদী-তীরবর্তী-ফিসকিল (এখন এটি বিকন শহরের অন্তর্ভুক্ত), নিউ ইয়র্ক শহর থেকে ৫৮ মাইল উত্তরে অবস্থিত। গার্নসিদের আড়াইতলা বাড়িটি গঠনশৈলীতে ঔপনিবেশিক এবং আসবাবপত্রের দিক থেকে ভিক্টোরীয়—যার একটা হলো সুগন্ধী রক্তবর্ণ কাঠের তৈরি একটি শয্যা, যেটি বড় শয়নঘরে রাখা আছে এবং বাইরে অবস্থিত স্নানের জন্য সুবৃহৎ আধারটি—এগুলি আকারে বৃহৎ কারণ গার্নসি ছিলেন প্রকাণ্ড-দেহী, প্রচুর জায়গা না হলে তাঁর চলত না। বাড়িটিকে ঘিরে ছিল বড় বড় গাছ এবং পুষ্পিত ঝোপঝাড় সহ সবুজ ঘাসে ঢাকা জমি, এরপর ফলের বাগান, একটি ছোট পুকুর, একটি বড় বড় ঝোপে ঘেরা জায়গা এবং একটি বড় মাঠ।[১০] কাছেই হাডসন নদী, যেখানে স্বামীজী জুলাইয়ের গরম দিনগুলিতে অবগাহন স্নানের জন্য যেতেন।

কতদিন তিনি গার্নসিদের বাড়িতে ছিলেন তা ঠিক ঠিক জানা যায় না। অবশ্য তাঁর অন্যান্য জায়গা থেকে আসা আমন্ত্রণের কমতি ছিল না, ফিসকিল ল্যাণ্ডিং থেকে শ্রীমতী হেলকে একটি তারিখবিহীন চিঠিতে পুনশ্চ দিয়ে তিনি লেখেন ঃ

> *"... এখানকার তাপ আমার বেশ সহ্য হচ্ছে। সমুদ্রতীরে সোয়াম্‌স্কটে* ***(Swampscott)*** *যাবার নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন এক ধনী মহিলা; গত শীতে নিউ ইয়র্কে এঁর সঙ্গে আলাপ হয়। ধন্যবাদ-সহ প্রত্যাখ্যান জানিয়েছি। এ দেশে কারও আতিথ্যগ্রহণ বিষয়ে আমি এখন খুব সতর্ক—বিশেষ করে ধনী লোকের। খুব ধনবানদের আরও কয়েকটি নিমন্ত্রণ আসে, সেগুলিও প্রত্যাখ্যান করেছি। এতদিনে এদের কার্যকলাপ বেশ বুঝলাম। আন্তরিকতার জন্য ভগবান আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন; হায়, জগতে ইহা এতই বিরল!"*[১১] *

জুলাইয়ের ১৯ তারিখে স্বামীজী পুনরায় ফিসকিল ল্যাণ্ডিং থেকে শ্রীমতী হেলকে চিঠি লেখেন। এ চিঠিটা এখানে পুরোই দেওয়া হচ্ছে, কারণ চিঠিটা যে শুধু সেই গ্রীষ্মকালের অশান্তির মাসগুলিতে তাঁর মনের প্রশান্তির কথা উদ্‌ঘাটিত করে তাই নয়, এমন কিছু সংবাদও দেয় যা আমাদের পরে উল্লেখ করতে হবে। চিঠিটার বয়ান হলো ঃ

---

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম সং, পত্রসংখ্যা ১০৩, পৃঃ ৩৫৯

প্রিয় মা,

আপনার সহৃদয় পত্রখানি কাল সন্ধ্যায় পৌঁছেছে। বাচ্চারা আনন্দ করছে জেনে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমি 'ইন্টিরিয়ার' [একটি গোঁড়া শিকাগো সংবাদপত্র] পেয়েছি এবং তাতে আমার বন্ধু [প্রতাপচন্দ্র] মজুমদারের বইয়ের এত উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে দেখে আমি সুখী হয়েছি। মজুমদার একজন মহান এবং ভাল লোক এবং তাঁর সহযোগী মানুষদের জন্য অনেক করেছেন।

গার্নসিদের এই সেডার লন স্থানটি গ্রীষ্মকালে বসবাসের পক্ষে চমৎকার। কুমারী গার্নসি সোয়ামস্কটে বেড়াতে গিয়েছেন। সেখানে আমিও একটি নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম যে, এই শান্ত নীরব গাছপালায় ভরতি জায়গাটি—কাছেই হাডসন নদীটি পাহাড়ের ভূমিকায় বয়ে চলেছে—এখানে থাকাই ভাল।

কুমারী হাউ-এর পরামর্শের জন্য আমি কৃতজ্ঞ, আমিও বিষয়টি ভাবছিলাম। খুব সম্ভবত শীঘ্রই আমি ইংল্যাণ্ডে যাব। কিন্তু এ-কথাটি আপনার আমার মধ্যে, আমি একজন মরমী ভক্ত, আমি অন্তরের নির্দেশ না এলে নড়তে পারি না এবং সে নির্দেশ এখনও আসেনি। ব্রুকলিনের একজন তরুণ ধনী আইনজ্ঞ শ্রীযুক্ত হিগিন্স্ আমার জন্য কতকগুলি বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছেন। আমি এখনও জানি না এগুলির জন্য পথে থামব কি না।

আপনার দয়ার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। সারাজীবন ধরে আমি আপনার ঋণ কখনও শোধ করতে পারব না। আপনি মাদ্রাজের চিঠিটায় দেখবেন নরসিম্হা সম্বন্ধে একটি শব্দও নেই। আমি আর কি করতে পারি? আমি চেকটি এখনও ভাঙ্গাইনি কারণ তার দরকার হয়নি। কুমারী ফিলিপস আমার সঙ্গে খুব সদয় ব্যবহার করেছেন। তিনি একজন পঞ্চাশ বা তদূর্ধ্ব বয়সী বৃদ্ধা। আমার যত্ন নেওয়া সম্বন্ধে আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না, ঈশ্বর তাঁর সেবকদের দেখেন এবং যতদিন আমি সত্যই তাঁর সেবক থাকব, এ সংসারের নয়, আমি নিশ্চিত জানি যে, আমার ভালর জন্য যা যা দরকার সব পাব। গার্নসিরা আমাকে খুব ভালবাসেন এবং নিউ ইয়র্ক এবং ব্রুকলিনে এমন অনেক পরিবার আছেন যাঁরা আমার যতদূর সম্ভব যত্ন নেবেন।

আমি শ্রীযুক্ত [মারউইন-মেরী] স্নেলের নিকট থেকে একটি খুব

সুন্দর চিঠি পেয়েছি, তিনি জানাচ্ছেন যে, হঠাৎ তাঁর ভাগ্য ফিরেছে এবং আমার কাজের জন্য আমি তাঁকে যে টাকা ধার দিয়েছিলাম, তিনি তাঁর তিনগুণ ফেরৎ দিতে চান। তিনি ধর্মপাল এবং ভারতের অন্যান্যদের নিকট হতে সুন্দর সুন্দর চিঠি পেয়েছেন বলে লিখেছেন। কিন্তু আমি খুব বিনয়ের সঙ্গে তাঁর টাকা ফেরত দেবার প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেছি।

এ পর্যন্ত সব ভাল। ফোরামের লেখক শ্রীযুক্ত পেজের সঙ্গে এখানে দেখা হলো। তিনি মিশনারিদের ওপর লেখাটি না পেয়ে দুঃখিত হয়েছেন। আমি তাঁকে কথা দিয়েছি অন্য চিত্তাকর্ষক বিষয়ে লিখব। আশা করি আমার তা করার ধৈর্য থাকবে।

আমি গতকাল কুমারী হ্যারিয়েটের একটি চিঠিতে জানলাম যে, তাঁরা কেনোসাকে খুব উপভোগ করছে। মা গীর্জা, ঈশ্বর আপনাকে এবং আপনার প্রিয়জনদের চিরদিন ধরে আশীর্বাদ করুন। আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাই না।

আমার ব্যাপারে আপনি একটুও দুশ্চিন্তা করবেন না—আমার সারাজীবন গৃহহীন ভবঘুরের জীবন, যে কোন দেশে, যে কোন খাদ্য-পানীয় আমার যথেষ্ট।

আপনার চিরকালের স্নেহবদ্ধ এবং বিশ্বস্ত।[১২]

(উপর্যুক্ত চিঠিটির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মন্তব্য ঃ নরসিম্‌হার ভারতে ফেরার টিকিট তখনও এসে পৌঁছয়নি। কিন্তু আমরা দেখে এসেছি, শেষপর্যন্ত তা পৌঁছেছিল। শ্রীযুক্ত পেজ—যাঁর কথা স্বামীজী এখানে উল্লেখ করেছেন—হলেন ওয়ালটার হাইনস্ পেজ, ফোরাম এবং অ্যাটলান্টিক মান্থলি পত্রিকার প্রখ্যাত নির্দেশক-সম্পাদক। তিনি পরে গ্রেট ব্রিটেনে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত হন।)

যদিও স্বামীজী লীনের ঠিক উত্তরে, ম্যাসাচুসেট্‌সের উপসাগরের ওপর অবস্থিত গ্রীষ্মকালে বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান সোয়ামস্কটে যাবার কোন আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করেছিলেন এবং সেখান থেকে জুলাইয়ের ২৩ তারিখে তিনি শ্রীমতী হেলের নিকট চিঠিতে লিখেছিলেন সেখানে কোথায় ছিলেন এবং সেখানে যেসব ব্যবস্থা ভাল ছিল সে-কথা, কারণ শ্রীমতী হেল ঠিক নিজের মায়ের মতোই টাকা পয়সা বা যত্ন ইত্যাদির কথা না ভেবে সারা আমেরিকা ঘুরে বেড়ানো তাঁর এই সন্তানটির জন্য দুশ্চিন্তা ভোগ করতেন।

প্রিয় মা,

আমার মনে হয় আমি আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি এবং আশা করছি তাতে পুনরায় আপনি আপনার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ফিরে পেয়েছেন।

আমি এ জায়গাটিকে খুব উপভোগ করছি। আজ বা কাল গ্রীনএকারে যাচ্ছি, ফেরার পথে অ্যানিস্কোয়ামে শ্রীমতী ব্যাগলির ওখানে হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা আছে—আমি তাঁকে চিঠি লিখেছি। শ্রীমতী ব্রীড আমাকে বলেছেন—"আপনি খুব স্পর্শকাতর।"

আমার সৌভাগ্য যে আমি নিউ ইয়র্কে আপনার চেক ভাঙ্গাতে যাইনি। এটাকে আমি এখানে ভাঙ্গাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হায়! আপনি তাতে আপনার নাম সই করেননি। একজন হিন্দু স্বপ্নবিলাসী হতে পারে, কিন্তু যখন একজন খ্রীস্টান স্বপ্নবিলাসী হয় সে শোধ তুলে স্বপ্নবিলাসী হয়।

আপনি এর জন্য দুঃখ পাবেন না—আমাকে একজন ঘুরে বেড়াবার মতো যথেষ্ট অর্থ দিয়েছে। সমগ্র ভ্রমণকালে আমার যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হবে। আমি ঐ চেকটা এইসঙ্গে ফেরত পাঠাচ্ছি। [কিন্তু স্বামীজী চেকটি ফেরত পাঠাতে ভুলে গিয়েছিলেন।] কুমারী মেরীর কাছ থেকে আমি খুব সুন্দর একটি চিঠি পেয়েছি। তাদের আমার ভালবাসা জানাচ্ছি।

পিতা পোপ কি করছেন এখন? শিকাগোতে কি এখন খুব গরম? এদেশের গরমকে আমি অবশ্য গ্রাহ্য করি না। আমাদের ভারতের তুলনায় এ গরম কিছুই নয়। আমি চমৎকার আছি। এই সেদিন গ্রীষ্মকালীন আন্ত্রিক দর্শন দিতে এসেছিল আমায়, সঙ্গে পেট ব্যথা ও আনুষঙ্গিক উৎপাত। কয়েক ঘণ্টা আলাপ পরিচয় হলো, যন্ত্রণায় কাতরানি হলো, তারপর তারা অবশ্য বিদায় গ্রহণ করল।

মোটের ওপর খুব ভালই আছি। পাইপটি কি শিকাগোতে পৌঁছেছে? [এই পাইপটি স্বামীজী নিউ ইয়র্কে কিনেছিলেন শ্রীযুক্ত হেলকে উপহার দেবার জন্য] আমি খুব সুন্দর নৌকা চড়ে বেড়াচ্ছি; খুব চমৎকার সমুদ্রস্নান করছি এবং হাঁসের মতো জলে ডুবে উপভোগ করছি। কুমারী গার্নসি এইমাত্র বাড়ি গেলেন। আর কি লিখব জানি না। ঈশ্বর আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন।[১৩]

তিনদিন পর স্বামীজী হেল ভগিনীদের একটি হালকা মেজাজের চিঠি লেখেন, তাতে বোঝা যায় তার মন কত ঊর্ধ্বে বিরাজ করছিল। এ চিঠিটা

থেকে সোয়ামস্কটে তাঁর কার্যকলাপ সম্বন্ধেও আরও কিছু জানা যায়। একটি অংশে লেখেন—*"আমি শ্রীমতী ব্রীডের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সেখানে শ্রীমতী স্টোনও ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বাস করলে শ্রীমতী পুলম্যান এবং সমস্ত সোনার ছারপোকার দল—আমার এখানকার পুরান বন্ধুর দল। তারা যেমন সবসময় ঠিক সেই রকম এখনও সদয় ব্যবহার করছে। গ্রীনএকার থেকে ফিরবার পথে শ্রীমতী ব্যাগলির সঙ্গে কয়েকদিনের জন্য দেখা করতে অ্যানিস্কোয়ামে যাব। আমি সব ভুলে যাই, কি মুস্কিল। আমি জলে মাছের মতো ডুবে বেড়িয়েছি। আমি এর প্রতিটি মুহূর্ত দারুণ উপভোগ করেছি।"*[১৪] একই চিঠিতে আর একবার দেখা যাচ্ছে হেল ভগিনীরা তাঁর কত ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁরা তাঁর কাছে কত স্বচ্ছন্দ অনুভব করতেন—তাঁরা তাঁর সঙ্গে খুনসুটি করতে পারতেন, এমনকি তাঁকে নিয়ে মজা করতেন এবং তাঁরা নিশ্চিত জানতেন যে, তিনি একটি অট্টহাস্য করবেন। তিনি লিখছেন—"*'প্রান্তরে মাঝে'... ('dans la plainc') ইত্যাদি কি ছাইভস্ম গানটি হ্যারিয়েট আমায় শিখিয়েছিল; জাহান্নমে যাক! এক ফরাসী পণ্ডিত আমার অদ্ভুত অনুবাদ শুনে হেসে কুটিপাটি। এইরকম ক'রে তোমরা আমায় ফরাসী শিখিয়েছিলে, বেকুফের দল। তোমরা ডাঙায় তোলা মাছের মতো খাবি খাচ্ছ তো? বেশ হয়েছে, গরমে ভাজা হয়ে যাচ্ছ। আঃ এখানে কেমন সুন্দর ঠাণ্ডা! যখন ভাবি তোমরা চার জনে গরমে ভাজা পোড়া সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছ, আর আমি এখানে কি তোফা ঠাণ্ডা উপভোগ করছি, তখন আমার আনন্দ শতগুণ বেড়ে যায়। আ হা হা হা!*"[১৫]*

স্বামীজী শ্রীমতী হেলকে আগস্ট মাসের ২৮ তারিখে লেখা চিঠিতে তাঁর সোয়ামস্কট (উচ্চারণ স্যোয়ামস্কোট) ভ্রমণ প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে আরও নতুন দু-একটি কথা বলেছেন পুরো আমেরিকান রীতিতে কথার মার প্যাঁচের শ্লেষের (pun) মাধ্যমে। তিনি লিখেছেন—"*আমি কি আপনাকে বলেছিলাম যে আমি আপনার বন্ধু শ্রীমতী এইচ. ও. কোয়েরির সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম সোয়ামস্কটে? তিনি একটি ঘোড়াকে জলাজমিতে পুঁতে দেবার ক্ষমতা রাখেন, অশ্বশাবকের তো কথাই নেই এবং আমি সেই ভদ্রমহিলাকে যিনি পুলম্যানকে নাকে দড়ি দিয়ে টানেন তাঁরও সাক্ষাৎ কি পেয়েছিলাম? আর সেখানে আমি আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ গায়িকার গানও শুনলাম, তারা সকলেই বলল যে, সে দারুণ গেয়েছে—সে গেয়েছে 'বিদায় বেবী বিদায়!'* "[১৬]

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম সং, পত্রসংখ্যা ১০৬, পৃঃ ৩৬৪

(এ হতে পারে যে, স্বামীজী এখানে যে শ্রীমতী স্টোন এবং শ্রীমতী প্যুলম্যানের কথা উল্লেখ করেছেন, তাঁরা হলেন শ্রীমতী এলিনর ও স্টোন, লীনের নর্থসোর ক্লাব যেখানে স্বামীজী এপ্রিলে বক্তৃতা করেছিলেন—সেখানকার সদস্যা, আর শ্রীমতী কোরা এইচ প্যুলম্যান হলেন রেভারেণ্ড জেমস এম. প্যুলম্যান, লীনের ফার্স্ট উইনিভার্সালিস্ট সোসাইটির পুরোহিত এবং একজন স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব—তাঁর পত্নী।)

স্বামীজীর চিত্ত আলোড়নকারী স্পষ্টকথায়-পূর্ণ বক্তৃতাদির কথা পড়ে, তিনি সমানতালে পুরোহিত এবং পরিণতবয়স্কা বিবাহিত মহিলাগণকে প্রবলভাবে তিরস্কৃত করতে পারতেন তা জেনে, তিনি কিরূপ মর্যাদার সঙ্গে সকলপ্রকার কষ্ট এবং ঈর্ষাসঞ্জাত বিরোধিতার মাঝে সমস্ত আমেরিকা ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং ভারতে অগ্নিময় চিঠিগুলি লিখে নেতৃত্ব দিয়েছেন—সে কথা বিবেচনা করে, আরও তিনি প্রায়ই অতলান্ত সুগভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতে পারতেন—সে কথা জেনে, লোকে অনেক সময় ভুলে যায় যে, বয়সে তিনি কত নবীন ছিলেন, সমুদ্রে ডুব দেবার জন্য এবং যাদের তিনি ভালবাসতেন তাদের সঙ্গে হৈ চৈ করে হাসি আনন্দ করবার জন্য তাঁর কতখানি আগ্রহ ছিল। তিনি মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়স্ক ছিলেন—তাঁর তারুণ্য শুধু সেজন্য নয়। এজন্যও যে অনুভূতির জগতে যে অসীমের কিনারায় তিনি বাস করতেন, সেখানে জগজ্জননীর আনন্দ—মহোৎসব চলছে সর্বক্ষণ। সেজন্যও রহস্যময় চিরতারুণ্য ছিল তাঁর।

এটা কোন আশ্চর্যের কথা নয় যে, গ্রীষ্মকাল বলেই তাঁর স্ফূর্তি বেড়ে গিয়েছিল। ১৮৯৩-এ আমেরিকায় পদার্পণ করার মুহূর্ত থেকে তিনি শহর, নগর, ট্রেন এবং হোটেল ছাড়া আর কোন কিছুর সঙ্গে পরিচিত হন নি। সকল সময় বক্তৃতা করবার শ্রম, লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং অনুষ্ঠানাদির পূর্ব হতে ব্যবস্থাদি করা এবং তদনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্রুত এক স্থান হতে আর এক স্থানে যাওয়া এবং সুউচ্চ হিমালয় পর্বত শ্রেণী ও ভারতের সমতল ভূমির মধ্য দিয়ে চলা পরিব্রজ্যার জীবনের তুলনায় এই সম্পূর্ণ বিপরীত জীবন-যাপনের যে প্রচণ্ড চাপ, তারই মধ্যে প্রতিটি মুহূর্ত কাটাতে হয়েছে তাঁকে। প্রায় এক বছর মনকে এই মায়ার জগতে নামিয়ে রেখেছিলেন, আধ্যাত্মিক ভাব-নিমগ্নতার যে উচ্চ অবস্থায় তাঁর মন স্বাভাবিক ভাবে থাকতে অভ্যস্ত, তার থেকে জোর করে নামিয়ে রেখেছিলেন, পাছে—যে ব্যাপার তাঁর আমেরিকায় প্রথম আগমনের কালে ঘটেছিল—তিনি

তাঁর পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হন এবং পূর্ব নির্ধারিত ব্যবস্থানুযায়ী কোথাও যোগদান করবার কথা থাকলে সে-কথা ভুলে যান, এমনকি পাছে পথে বেরিয়ে একটি বিদেশী শহরের গোলকধাঁধায় পথ হারিয়ে ফেলেন। শ্রীমতী ওয়াল্ডো তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন—"পরে তিনি যেভাবে পরিণত হয়েছিলেন তার তুলনায় গোড়ায় যখন প্রথম বক্তৃতা দিতে শুরু করেন তখন সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিলেন। তখন তিনি ছিলেন স্বপ্নালু এবং ধ্যান-নিমগ্ন, অনেক সময়ই নিজের চিন্তায় এমন মগ্ন যে, পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে তাঁর কোন চেতনাই থাকত না। অবিরাম অপরিচিত চিন্তার সঙ্গে সংঘর্ষ, সীমাহীম প্রশ্নের পর প্রশ্ন, পাশ্চাত্য জগতের ঘন ঘন বুদ্ধির ক্ষেত্রে সেয়ানে সেয়ানে লড়াই একটি অন্য ভাবের জাগরণ ঘটাল এবং তিনি যে জগতে এসে পড়েছিলেন, সেখানকার মতোই তিনি সকল সময়ে সচেতন এবং সম্পূর্ণ জাগ্রত হলেন।"[১৭] এবং যেন স্বামীজীর পক্ষে একজন 'কাজের মানুষ' হওয়াটাই যথেষ্ট হলো না—তিনি একজন বক্তার জীবন যে-সকল খুঁটিনাটি বিষয় ভারাক্রান্ত করে সে-সকল যথাযথ মেনেই চলেছিলেন—তবু তাঁকে আবার প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর শত্রুদের দ্বারা অনুষ্ঠিত বিরামহীন অত্যাচারের সম্মুখীন হতে বাধ্য হতে হলো। যদিও, আমরা পূর্বেই দেখে এসেছি যে এই শেষোক্ত ব্যাপারটি ১৮৯৪-এর গ্রীষ্মকালেও ঘটে চলেছিল, তবুও এই গ্রীষ্মকালেই বক্তৃতা দেওয়ার হাত থেকে অল্প সময়ের জন্য যেই মুক্তি পেলেন, অমনি মোটেই আশ্চর্যের কথা নয় যে, তাঁর মন ছেড়ে দেওয়া স্প্রিংয়ের মতো ঊর্ধ্বগামী হলো।

এই সময়েই স্বামীজীর চিন্তাধারার একটি পরিবর্তন এল এবং অন্তত‌পক্ষে আমেরিকায় তাঁর যে কর্ম সে সম্বন্ধে একটি নতুন ধারণার সূচনা হলো। যে উদ্দীপনা নিয়ে তিনি প্রথম দিকে একস্থান থেকে আর এক স্থান ভ্রমণ করে ভারতের প্রথা, প্রতিষ্ঠানসমূহ ও ধর্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে বেড়িয়েছেন, তা কিছুটা স্তিমিত হয়ে এল এবং আমরা দেখি যে, তাঁর মধ্যে এই গ্রীষ্মের মাসগুলিতে এক নতুন দিকে কাজ করার জন্য প্রেরণা সঞ্চারিত হলো। জুলাইয়ের ২৬ তারিখে হেল ভগিনীদের নিকট লেখা চিঠিতে আমরা এর একটা ইঙ্গিত পাই। তিনি লিখছেন, "*নিউ ইয়র্ক প্রদেশের কোন স্থানে মিস ফিলিপ্‌সের পাহাড় হ্রদ নদী জঙ্গলে ঘেরা সুন্দর একটি স্থান আছে। আর কি চাই! আমি যাচ্ছি স্থানটিকে হিমালয়ে পরিণত ক'রে সেখানে একটি মঠ খুলতে—নিশ্চয়ই। তর্জন, গর্জন, লাথি ঝগড়ায় তোলপাড় এই*

আমেরিকায় ধর্মের মতভেদের আবর্তে আর একটি বিরোধের সৃষ্টি না করে এদেশ থেকে যাচ্ছি না।"[১৮]* যদিও এ কথাগুলি লেখা হয়েছে হাসি তামাশার ঢঙে, তবুও এর থেকে সুস্পষ্ট যে, স্বামীজী আমেরিকায় আশ্রম স্থাপনের কথা চিন্তা করছিলেন। এ সময় তাঁর আর একটি ইচ্ছা হচ্ছিল, সেটি হলো একটি বই লেখার, যার থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর মধ্যে নতুন চিন্তা জন্ম নিচ্ছিল এবং তা বাইরে প্রকাশ পেতে চাইছিল। মার্চের মাঝামাঝি সময়ে তিনি আমেরিকায় টাকা তোলবার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেছিলেন। এ একটা অল্প সময়ের পরে চলে যাবার মতো নৈরাশ্যের ব্যাপার নয়। যতই সময় যেতে লাগল, ততই তাঁর কাছে এ কথা নিশ্চিতরূপে প্রতিভাত হতে লাগল যে আমেরিকা থেকে প্রচুর টাকা সংগ্রহ করার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। ২০ আগস্ট তারিখের এক চিঠিতে—যার পূর্ণ বয়ান পরে উদ্ধৃত করা হবে—তিনি ইসাবেল ম্যাককিণ্ডলিকে লেখেন ঃ "*অর্থকরী সকল পরিকল্পনা আমি ত্যাগ করেছি, এখন শুধু একটুকরো খাদ্য ও মাথার উপর একটু আচ্ছাদন পেলেই সম্পূর্ণ তৃপ্ত থাকব এবং কাজ করে যাব।"*[১৯]** হয়তো তাঁর অর্থ উপার্জনের ব্যাপারে মনের এই পরিবর্তন কেবল যে বাস্তব পরিস্থিতির দরুণই হয়েছিল তাই নয়, অর্থ জিনিসটাকেই তিনি অপছন্দ করতেন এই কারণেই হয়েছিল এই পরিবর্তন—এ অপছন্দ হলো ত্যাগ-ব্রতধারী সন্ন্যাসীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং যদিও স্বামীজীর নিজের জন্য অর্থ-সংগ্রহ করছিলেন না, করছিলেন ভারতের জন্য, তথাপি অর্থ দেখা বা স্পর্শ করা তাঁর নিকট ঘৃণার ব্যাপার ছিল। আগস্টের ৩১ তারিখে তিনি আলাসিঙ্গাকে লেখেন—"*তুমি তো জানো, টাকা রাখা—এমন কি, টাকা ছোঁয়া পর্যন্ত আমার পক্ষে বড় মুশকিল। উহা আমার পক্ষে বেজায় বিরক্তিকর আর ওতে মনকে বড় নীচু করে দেয়।"*[২০]***

কিন্তু ভারতের ওপর বক্তৃতা করা এবং ভারতের কাজের জন্য অর্থ-সংগ্রহ করা—এ দুটিই ছিল আমেরিকায় স্বামীজীর থাকার বাহ্য উদ্দেশ্য। যদি তিনি এ দুটি ধারার কোনটিতেই কাজ না করেন, তাহলে তাঁর কাজের রূপটা কি হবে এবার? নিশ্চিতরূপে তাঁর মনোজগতে একটা পরিবর্তন ঘটছিল এবং মোটের ওপর এই ১৮৯৪-এর গ্রীষ্মকাল যে কেবলমাত্র তাঁর পক্ষে

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম সং, পত্রসংখ্যা ১০৬, পৃঃ ৩৬৪-৬৫
** ঐ, পত্রসংখ্যা ১০৯, পৃঃ ৩৬৯-৭০
*** ঐ, পত্রসংখ্যা ১১১, পৃঃ ৩৭৩

একটি বিশ্রান্তির সময় ছিল তা নয়—একে দুটি ঋতুর মাঝখানে একটুখানি ফাঁক—ঠিক এভাবে দেখলে চলবে না—এ ছিল তাঁর মনের একটি অবস্থান্তরের কাল যখন দৈনন্দিন চাপ সরে যাওয়ায় তাঁর মন স্বাভাবিক সৃজনশীল প্রশান্তির দিকে চলে গিয়েছিল, যে অবস্থা হতে শেষ পর্যন্ত নতুন চিন্তা ও কর্মের ধারা উদ্গত হবে। মনে হয় যেন কোন মহাজাগতিক ইচ্ছার বশে তাঁর জীবনের বাহ্য পরিস্থিতিসকল পূর্ব হতেই প্রস্তুত হয়ে ছিল। জুলাইয়ের শেষের দিকে, যখন তিনি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নূতন অভিজ্ঞতার দিগন্ত উন্মোচনে ব্যাপৃত রইলেন এবং যখন সচেতন বা অসচেতনভাবে তিনি আমেরিকার জনজীবনে পৌঁছবার জন্য এক নতুন পথের সন্ধান করছিলেন তখন তিনি গ্রীনএকারে গেলেন।

॥ ২ ॥

কুমারী সারা জে ফার্মার কর্তৃক গ্রীনএকারে নব প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়টি ছিল এক অর্থে ধর্মমহাসভার ফলশ্রুতি। এলিয়টের সন্নিকট পিসকাটাকুয়া নদী তীরবর্তী মেইনে এ স্থানটি ছিল একটি গ্রীষ্মকালীন উপনিবেশ বা বিশ্রাম নেবার স্থান। এ সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য ছিল সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করা। গ্রীনএকারের ধর্ম-সম্মেলনগুলি এ ব্যাপারে ধর্মমহাসভাকে অতিক্রম করে আরও অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। কারণ এখানে যাঁরা একত্রিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে গোঁড়ামি পরিত্যাগ যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল, মূর্ত হয়ে উঠেছিল নতুন যুগের ধর্মচিন্তাসমূহকে একত্রিত করবার ঐকান্তিক প্রয়াস। সমবেত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অপরিহার্যরূপে ছিলেন কিছু আধপাগলা বাতিকগ্রস্ত ব্যক্তি এবং খামখেয়ালের প্রতিভূ, এক রাত্রি আয়ুষ্কালের সম্প্রদায়সমূহও ছিল। আর অন্ততপক্ষে এই সম্মেলনের প্রথম গ্রীষ্মকালীন অধিবেশনে এক ধরনের বাঁধনহারা উল্লাস সমস্ত সমাবেশের মধ্যে অনুস্যূত হয়েছিল। এ সকল সত্ত্বেও, গ্রীনএকারে উপস্থিত নরনারীবৃন্দ সঙ্কীর্ণ গতানুগতিক ধর্মের চিহ্ন সকলকে পদাঘাতে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন এবং একটি নতুন ধরনের ধর্মবিশ্বাসের উদ্ভবের জন্য তাঁদের সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন আন্তরিক, প্রাণবন্ত এবং নির্ভীক। তাছাড়া, তাঁদের মধ্যে ছিলেন চিন্তাশীল, পণ্ডিত এবং এমন সব ব্যক্তিবর্গ যাঁরা কোন না কোন রকমে আধ্যাত্মিকতার পুনর্জাগরণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ছিলেন সজাগ এবং যাঁরা ঐকান্তিকভাবে জাগরণ আনবার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। অন্য কোথাও স্বামীজী এক জায়গায় এক সঙ্গে এমন একটি দল পেতেন না যারা তাঁর

ধারণাগুলি গ্রহণে সক্ষম এবং তাঁর প্রভাবে উপকৃত হবার জন্য প্রস্তুত। এই সকল অনুকূল সংঘটন এবং গ্রীনএকার যে উদার প্রান্তর, কাঁচা রাস্তার মধ্যে অবস্থিত একটি গ্রামদেশের পরিবেশ দিয়েছিল, দিয়েছিল এমন দিনগুলি যখন তাঁর মন গভীর ধ্যানমগ্ন হবার বা উচ্চ ভাবাবস্থায় উন্নীত হবার মতো মুক্ত অবস্থায় ছিল—এ সকল থেকে মনে হয় যেন তাঁর জীবনের অন্যান্য ঘটনাবালীর মতোই, ১৮৯৪-এ গ্রীনএকার সম্মেলনের প্রতিষ্ঠা—যে ঐশী পরিকল্পনা তাঁকে আমেরিকায় টেনে এনেছিল, তারই অংশ ছিল।

কুমারী সারা ফার্মারের সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়েছিল নিউ ইয়র্কে, তিনিই তাঁকে গ্রীনএকারে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সারা হলেন সেই বিখ্যাত মোজেস গ্যারিশ ফার্মারের কন্যা, যিনি এডিসন কর্তৃক বৈদ্যুতিক বাল্ব আবিষ্কারের পূর্বে "চল্লিশটি গনগনে উজ্জ্বল বাতি একাধিক তড়িৎপ্রবাহের মাধ্যমে জ্বালিয়ে কেম্ব্রিজে একটি বাড়িকে আলোকিত করেন"। শ্রীযুক্ত ফার্মার তাঁর কন্যাকে প্রায়ই বলতেন যে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মূলে আছে প্রেরণা এবং যিনি এই "প্রেরণাকে আয়ত্ত করতে পারেন এবং সাহসের সঙ্গে তা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন, সাফল্য তাঁর নিকট আসে সুনিশ্চিতভাবে—এমন মানুষকে মানুষ শ্রদ্ধা করে এবং মূল্য দেয়।"[২১] কুমারী ফার্মার সেই প্রেরণাকে আয়ত্ত করে ফেললেন গ্রীনএকারের জন্য সম্ভবত ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠান কালেই এবং সাহসভরে এগিয়ে গেলেন তাঁর পিতা তাঁকে গ্রীনএকারে যে বহুবিঘা জমি দিয়ে গিয়েছেন সেখানে এই ধর্মমহাসম্মেলনের ব্যাপারটি প্রতিষ্ঠিত করতে সেখানে এসে যে-কেউ যদি তাঁর গঠনমূলক কিছু বলার থাকে এসে বলতে পারতেন। "আমার এখানে এসে কেউ অন্যের বিশ্বাসকে সমালোচনা করতে পারবে না"—তিনি একথা বলেন বলে জানা যায়। "একমাত্র এদেরই আমি আসতে বাধা দেব, অন্যেরা এসে নিজের মত ব্যক্ত করার জন্য এখানে স্বাগত। সব মতই শ্রদ্ধার সঙ্গে ও মনোযোগের সঙ্গে শোনা হবে।"[২২]

অবশ্য ফল হয়েছিল যে এটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিভিন্ন মতপ্রকাশের একটি মঞ্চ মাত্র, যদি না সব কিছু একটি পাঁচমিশেলী জগাখিচুড়ি হয়ে থাকে। সেখানে বেদান্ত থেকে অমার্জিত প্রেততত্ত্ব পর্যন্ত সবকিছু আলোচিত হয়েছিল। অত্যন্ত রসবোধ এবং এক সর্বব্যাপী করুণাসহ স্বামীজী জুলাই মাসের ৩১ তারিখে গ্রীনএকার থেকে মেরী হেলকে একটি চিঠিতে লেখেন :

"বোস্টন থেকে মিঃ কলভিল নামে একজন ভদ্রলোক এসেছেন।

লোকে বলে, তিনি প্রত্যহ প্রেতাবিষ্ট হয়ে বক্তৃতা করে থাকেন—'ইউনিভার্সাল ট্রুথের সম্পাদিকা, যিনি 'জিমি মিল্স' প্রাসাদের উপর তলায় থাকতেন—এখানে এসে বসবাস করছেন। তিনি উপাসনা পরিচালনা করছেন আর মনঃ শক্তিবলে সব রকমের ব্যারাম ভাল করার শিক্ষা দিচ্ছেন—মনে হয়, এঁরা শীঘ্রই অন্ধকে চক্ষুদান এবং এই ধরনের নানা কর্ম সম্পাদন করবেন। মোটকথা, এই সম্মিলনটি এক অদ্ভুত রকমের। এরা সামাজিক বাঁধাবাঁধি নিয়ম বড় গ্রাহ্য করে না—সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ও বেশ আনন্দে আছে। মিসেস্ মিল্স বেশ প্রতিভাসম্পন্ন, অন্যান্য অনেক মহিলাও তদ্রূপ।... ডেট্রয়েটবাসিনী আর একজন উচ্চশিক্ষিতা মহিলা সমুদ্রতীর থেকে পনর মাইল দূরবর্তী একটি দ্বীপে আমায় নিয়ে যাবেন—আশাকরি সেখানে আমাদের পরমানন্দে সময় কাটবে। মিস্ আর্থার স্মিথ এখানে রয়েছেন। মিস্ গার্নসি সোয়ামস্কট থেকে বাড়ি গেছেন।...

এ স্থানটি সুন্দর ও মনোরম। এখানে স্নান করার ভারি সুবিধা। কোরা স্টক হ্যাম আমার জন্য একটি স্নানের পোশাক করে দিয়েছেন—আমিও ঠিক হাঁসের মতো জলে নেমে স্নান করে মজা করছি...।

বোস্টনের মিঃ উড এখানে রয়েছেন—তিনি তোমাদের সম্প্রদায়ের একজন প্রধান পাণ্ডা। তবে 'হোয়ার্লপুল' মহোদয়ার সম্প্রদায়ভুক্ত হতে তাঁর বিশেষ আপত্তি—সেই জন্য তিনি দার্শনিক-রাসায়নিক-ভৌতিক -আধ্যাত্মিক আরো কত কি বিশেষণ দিয়ে নিজেকে একজন মনঃশক্তি প্রভাবে আরোগ্যকারী বলে পরিচিত করতে চান।... মিল্স কোম্পানির মিসেস ফিগ্স্ প্রত্যহ প্রাতে একটি করে ক্লাস করে থাকেন আর মিসেস মিল্স ব্যস্তসমস্ত হয়ে সমস্ত জায়গাটা যেন লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন—ওরা সকলেই খুব আনন্দে মেতে আছে।...

তাঁবুতে ওরা যেরকম স্বাধীনভাবে রয়েছে, শুনলে তোমরা বিস্মিত হবে। তবে এরা সকলেই বড় ভাল ও শুদ্ধাত্মা। একটু খেয়ালী—এই যা।"[১২৩ *]

কিন্তু এই পাহাড়ে যারা লম্ফঝম্ফ করে বেড়াচ্ছে তাদের ধর্মের ব্যাপারে

---

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম সং, পত্রসংখ্যা ১০৭, পৃঃ ৩৬৫-৬৬

কিছু বিদঘুটে ব্যাপার স্যাপার থাকলেও তারা ছাড়াও যাঁরা আন্তরিক এবং মনের গঠনে খাঁটি মানুষ এরকম নারী পুরুষও ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় ছিলেন ডঃ এডওয়ার্ড এভারেট হেল, যিনি একজন প্রথিতযশা এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী ইউনিটেরিয়ান যাজক, সমাজ সংস্কারক এবং লেখক ছিলেন, অতীন্দ্রিয়বাদীদের মধ্যে শেষ যে কজন বর্তমান ছিলেন তাঁদেরই একজন অক্টেভিয়াস ব্রুক্স ফ্রোদিংহ্যাম, ছিলেন হেল পরিবারের বন্ধু এবং শিকাগোর সরকারী বিদ্যালয়সমূহের শিল্প শিক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক কুমারী জোসেফিন লক, প্রাচ্য শিল্পের সমঝদার এবং ঐ বিষয়ে বক্তা আর্নেষ্ট এফ ফেনেলোসা, আর ছিলেন মানবমিত্র এবং স্বামীজীর ও-দেশে প্রথম বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম ফ্রাঙ্কলিন বি. স্যানবর্ন। এ ছাড়াও ছিলেন শ্রীমতী আর্থার স্মিথ, শ্রীমতী ওলি বুল এবং বিখ্যাত গায়িকা কুমারী এমা থার্সবি। এঁদের সকলকেই বিশেষ করে শ্রীমতী ওলি বুলকে, এখানেই আমরা প্রথম দেখি এবং এরা ক্রমে স্বামীজী ও তাঁর কর্মযজ্ঞের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। এবং তারপর ছিলেন ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের অধ্যক্ষ ডঃ লুইস. জি. জেনস্ যিনি পরবর্তী কালে স্বামীজীর বিশেষ অনুরক্ত ও সাহসী ও বিশ্বস্ত বন্ধু হয়ে ওঠেন।

স্বামীজীর জীবনীর একটি গোড়ার দিকের সংস্করণ অনুসারে স্বামীজী ডঃ জেনসের সাক্ষাৎলাভ করেন গ্রীনএকারে আগমনের আগে নিউ ইয়র্কে, সম্ভবত মে মাসে। জীবনীতে বলা হয়েছে, "একজন বন্ধুর বৈঠকখানায় ভাষণ দেবার প্রাক্কালে তিনি আকস্মিকভাবে ডঃ লুইস. জি. জেনসের সাক্ষাৎ পান,... যিনি স্বামীজীর অনন্য গুণাবলী প্রত্যক্ষ করে এবং তাঁর বাণীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে তৎক্ষণাৎ ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনে হিন্দুধর্ম-বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানান"।[২৪] এই বক্তৃতাগুলির আয়োজনের কথাই নিঃসন্দেহে স্বামীজী শ্রীমতী হেলকে লেখা জুলাইয়ের ১৯ তারিখের চিঠিতে তাঁর পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে উল্লেখ করেছেন : "*শ্রীযুক্ত হিগিন্স ব্রুকলিনের একজন ধনী আইনব্যবসায়ী এবং আবিষ্কারক আমার জন্য কিছু বক্তৃতার আয়োজন করেছেন। আমি এখনও স্থির করিনি ওগুলির জন্য আমি [আমেরিকায়] থেকে যাব কি না।*"[২৫] এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনেব তুলনামূলক ধর্ম বিষয়ক সমিতির সদস্য শ্রীযুক্ত হিগিন্স স্বামীজীর সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করেন নি। তিনি তাঁর পরিকল্পনাকে কার্যকর করবার জন্য এগিয়ে গেলেন। গ্রীনএকারে স্বামীজী সেকথা জানতে পারেন এবং আমরা আগস্টের ৫ তারিখে শ্রীমতী হেলকে লেখা স্বামীজীর

চিঠি থেকে জানতে পারি যে, স্বামীজী স্থির হয়ে যাওয়া ব্যবস্থাটিতে সম্মতি দেন ঃ

প্রিয় মা,

আমি আপনার চিঠি পেয়েছি এবং খুব লজ্জিত যে আমার খারাপ স্মৃতিশক্তির জন্য চেকটির ব্যাপার বেমালুম বিস্মৃত হয়েছিলাম। বোধহয় এতদিনে আপনি আমার গ্রীনএকারে আসার কথা জানতে পেরেছেন। এখানে আমার খুব সুন্দর সময় কাটছে এবং আমি খুবই উপভোগ করছি সময়টি। এরপর আমি ব্রুকলিন নিউ ইয়র্কে বক্তৃতা করতে যাচ্ছি। গতকাল খবর পেলাম ওরা সেখানে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিয়েছে। নিউ ইয়র্কের একজন বন্ধু আজ আমাকে তাঁর সঙ্গে এই মেইন রাজ্যের উত্তরে পাহাড় অঞ্চলে যাবার আমন্ত্রণ জানালেন। জানি না আমি যাব কি না। আমি খুব ভাল আছি। বক্তৃতা দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া, চড়ুইভাতি করা এবং অন্যান্য উত্তেজনাকর ব্যাপারগুলির মধ্যে দিয়ে সময় যেন উড়ে চলে যাচ্ছে। আশা করি, আপনি ভাল আছেন এবং পিতা পোপ খুব ভাল আছেন। এই গ্রীনএকার জায়গাটি খুব সুন্দর এবং বোস্টনের লোকজনদের সংসঙ্গ পাওয়া যাচ্ছে। বোস্টনের ডঃ [এডওয়ার্ড] এভারেট হেলকে আপনারা তো চেনেন এবং কেম্‌ব্রিজের শ্রীমতী বুলকেও। আমি জানি না নিউ ইয়র্কের বন্ধুটি আমাকে যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আমি তা গ্রহণ করব কি না।

এ পর্যন্ত এটাই ঠিক যে, আমি আগামী মাসে নিউ ইয়র্কে বক্তৃতা করতে যাব। বোস্টন অবশ্য ক্ষেত্র ভাল। এখানে বেশির ভাগ লোক বোস্টন থেকে এসেছে এবং তারা সকলেই আমাকে খুব পছন্দ করে। আপনি ও পিতা পোপ কি ভাল সময় কাটাচ্ছেন? আপনার বাড়ি রঙ করা কি শেষ হয়েছে? আশা করি বাচ্চারা তাদের মুডভিল্লেতে ভাল সময় কাটাচ্ছে।

আমি অর্থের ব্যাপারে কোন অসুবিধায় নেই—আমার আহারাদির প্রচুর ব্যবস্থা আছে।

আমার সর্বশ্রেষ্ঠ ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা আপনার এবং পিতা পোপ এবং ছোটদের জন্য—

আপনাদের স্নেহের[২৬]
বিবেকানন্দ

কয়েকদিন পরে আগস্টের আট তারিখে শ্রীমতী হেলকে লেখা একটি চিঠিতে পুনরায় ব্রুকলিনের ব্যবস্থার কথা স্বামীজী লেখেন, "*আমি এখন পর্যন্ত আমার সমস্ত পরিকল্পনা স্থির করিনি, কেবলমাত্র এটি নিশ্চিত যে, [ব্রুকলিন] নিউ ইয়র্কে এ মাসে বক্তৃতা করতে যাচ্ছি। তার সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তারা তাদের খরচে এর জন্য বিজ্ঞাপন ছেপেছে এবং সবকিছু প্রস্তুতি নিয়েছে।*"[২৭] সুতরাং গ্রীনএকারে অবস্থানকালে, তিনি আমেরিকায় কিছুদিনের জন্য থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেন এবং এখানে অবস্থান পাশ্চাত্যে তাঁর জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য নিরূপণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

গ্রীনএকারে পৌঁছবার জন্য [সম্ভবত তিনি জুলাইয়ের ২৭ তারিখে পৌঁছেছিলেন] স্বামীজীকে নিউ হ্যাম্পশায়ারের পোর্টসমাউথ থেকে একটি স্টিমারে চড়তে হয়েছিল এটি পারাপারের জন্য এবং ঘণ্টাখানেকের মতো সময় লেগেছিল বন জঙ্গলে ঘেরা ছোট ছোট টিলাসহ বিশ্রামের স্থানটিতে এসে নামতে। প্রশস্ত নদী তীরবর্তী সমতলভূমিতে ছিল 'সূর্যোদয় শিবির', এটি ছিল ছোট ছোট অনেকগুলি তাঁবুর সমাবেশ, এখানে তাঁরাই ছিলেন যাদের গ্রীনএকার পান্থশালায় থাকবার মতো অবস্থা নয়। এখানে নদীর জলে স্বামীজী হাঁসের মতো অবগাহন স্নান করতেন অনেকক্ষণ ধরে।[২৮] পাহাড়ের কোল ঘেঁসে একটি বড় শিবির ছিল, যার শীর্ষে একটি শ্বেতপতাকা উড়ত। একে "আরেনিয়ন" অথবা 'শান্তিভবন' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। এখানে বক্তৃতাগুলি দেওয়া হতো এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা একসঙ্গে বসে ধ্যান করতেন। একজন প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা লিখেছেন, "এই সমস্ত সমাবেশে পরস্পরের প্রতি একটি নীরব সহানুভূতি প্রকাশ পেত, তথাপি সমবেত মানুষদের আদর্শ এক ছিল না, বিশ্বাসও এক ছিল না।"[২৯] আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে শান্তিভবনটির দৃঢ়ভিত্তি ছিল, কিন্তু সূর্যোদয় শিবিরের ছোট ছোট তাঁবুর মতোই—ঝড়ো হাওয়ায় উড়ে যাবার মতো পলকা ছিল। মেরী হেলকে স্বামীজী একটি চিঠিতে এরূপ একটি ঘটনা দারুণ মজা করে বর্ণনা করেছেন—"*কাল এখানে একটা ভয়ানক ঝড় উঠেছিল—তাতে তাঁবুগুলোর উত্তমমধ্যম 'চিকিৎসা' হয়ে গেছে। যে বড় তাঁবুর নীচে তাঁদের এইসব বক্তৃতা চলছিল, ঐ 'চিকিৎসার' চোটে সেটির আধ্যাত্মিকতা এত বেড়ে উঠেছিল যে, সেটি মর্তলোকের দৃষ্টি হতে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়েছে, আর*

প্রায় দুশ চেয়ার আধ্যাত্মিক ভাবে গদ্‌গদ হয়ে জমির চারিদিকে নৃত্য আরম্ভ করেছিল।"[১১৩০*]

সমতলভূমি থেকে সোজা খাড়া পাহাড়ের ওপরে পান্থশালাটিতে থাকতেন অপেক্ষাকৃত ধনী অতিথিরা। পান্থশালাটিকে ঘিরে কয়েকটি ছোট ছোট কুটির ছিল, যার একটিকে "নাইটিংগেলের নিবাস" নাম দেওয়া হয়েছিল কুমারী এমা থার্সবির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য। এমা এরপর একের পর এক পরপর গ্রীষ্মকালে এখানে এসেছেন। প্রচুর বন্যফুলে ভরা মাঠ ছাড়িয়ে, পাহাড়ের ওপরে নদী থেকে এক মাইল দূরত্বে একটি অরণ্য ছিল, যার মধ্যে এখানে সেখানে ছিল লাইসেকলস্টার পাইন গাছ। নরওয়েতে শ্রীমতী ওলি বুলের বাড়িতে ঠিক একই রকম লালরঙের বাকলের পাইন গাছ ছিল, তিনিই সেজন্য এখানকার গাছগুলিরও একই নামকরণ করেছেন। লাইসেকলস্টার পাইন গাছগুলি গ্রীনএকারের সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল, কারণ ধর্মীয় শিক্ষার পাঠ এই গাছগুলির তলাতেই রোজ দেওয়া হতো। আচার্য—তিনি ইহুদি বা খ্রীস্টান (উদারপন্থী) অথবা হিন্দু—যিনিই হোন না কেন নিজ নিজ গাছতলায় ভূমি-আসনে বসতেন। তাঁকে ঘিরে বসতেন শিক্ষার্থিগণ। ১৮৯৯-এর আগস্টের ১২ তারিখে লিউইস্টন স্যাটারডে নামক সংবাদপত্রের একজন প্রতিনিধি এই অরণ্যভূমির ধর্ম শিক্ষা সম্বন্ধে চমৎকার একটি চিত্র এঁকেছেন তাঁর প্রতিবেদনে—

> *"...পূর্বাহ্নের গোড়ার দিকের আলোচনাগুলি পান্থশালার নিকটবর্তী তাঁবুতেই হতো। কিন্তু পরের দিকে সকলেই হেঁটে লাইসেকলস্টার পাইন গাছগুলির তলায় চলে আসতেন। একটু দূরে দাঁড়ালে গাছগুলির তলায় লোকজন যে কেউ আছে তা বোঝা যেত না, কারণ ডালগুলি একেবারে নিচু অবধি ঝুলে এসেছে। এরূপ একটি গাছতলার চেয়ে অধিকতর নয়নমুগ্ধকর আর কোন জায়গাকে বক্তৃতা শোনার জন্য আমি ভাবতে পারি না, যা কিছু আমাদের বিরক্ত করে সে সকল থেকে বহুদূরে অবস্থিত উন্মুক্ত এই পরিবেশ, বড় রাস্তা এখান থেকে এতদূরে যে গাড়ির চাকার শব্দও এখানে পাওয়া যায় না। একমাত্র শব্দ যা শোনা যায় তা হলো পাখির কলকাকলী এবং বক্তার কোমল হয়ে আসা কণ্ঠস্বর যা বড় বড় গাছতলা থেকে ভেসে আসে।*

---

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম সং, পত্রসংখ্যা ১০৭, পৃঃ ৩৬৬

শ্রোতারা অলসভঙ্গিতে মাটিতে উপবিষ্ট থাকেন। যাঁরা বয়োবৃদ্ধ তাঁদের মধ্যে অল্প কয়েকজন বসার জন্য চেয়ার পান। মধ্যবয়স্ক এবং তরুণেরা একেবারে প্রথাবহির্ভূত আচরণ করেন। অনেকে চিৎ হয়ে শুয়ে নীল আকাশের দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে শোনেন। কেউ কেউ একটি কনুইয়ে ভর দিয়ে ধ্যানমগ্নভাবে ঝোপঝাড়ের পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে শোনেন।

জুলাইয়ের ২৮ তারিখে 'গ্রীনএকারে বিবেকানন্দ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো বোস্টনের ব্রাহ্মণ্যবাদী এবং জগদ্বিখ্যাত ইভ্নিং ট্রানসক্রিপ্ট পত্রিকায়। এটি নিশ্চিত লিখিত হয়েছিল র‍্যালফ্ ওয়াল্ডো ট্রাইনের দ্বারা, ইনি পরবর্তী কালে দার্শনিক তত্ত্বের লেখক হিসাবে সুপরিচিত হন। (ঐ সময় তিনি ছিলেন গ্রীনএকারে ট্রান্সক্রিপ্ট পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা, গ্রীনএকারে তিনি "একটি পাইন কুঞ্জের মধ্যে একটি ছোট ঘর নিজের জন্য তৈরি করে সেখানে বাস করছিলেন"।)[৩১] তাঁর লেখা প্রবন্ধটি নিম্নরূপ :

"গ্রীনএকার পান্থশালা, এলিয়ট, মি. পরবর্তী সপ্তাহে এখানে প্রচুর জনসমাগম হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। চমৎকার একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছিল।

"অর্লিংটনের কর্ণেল নর্টন এবং ফিলাডেলফিয়ার কুমারী এলেন এম. ডায়ার যাঁরা পান্থশালায় ছিলেন তাঁরা সোমবারে বক্তৃতা দিতে আহূত হয়েছেন। মঙ্গলবার দিন টাফট্স কলেজের অধ্যাপক এ.সি.ডলবেয়ার বলবেন 'মন ও শরীরের সম্বন্ধ' বিষয়ে—ইনি এ বিষয়ে জ্ঞানের জন্য একজন স্বীকৃত ব্যক্তি। বুধবার থিয়োসফির জন্য নির্দিষ্ট , ঐদিন 'ব্যবহারিক দর্শনশাস্ত্রের' গ্রন্থের লেখিকা কুমারী বার্নেট এবং বোস্টনের জর্জ ডি. আয়ার্স হচ্ছেন বক্তা। বৃহস্পতিবার রেভারেন্ড এডওয়ার্ড এভারেট হেল, ডি.ডি., 'সমাজ-তত্ত্ব' বিষয়ে বলবেন।

"শুক্রবার একটি অতিরিক্ত বক্তৃতা দেবেন ভারতের বিবেকানন্দ, যিনি গ্রীনএকারে কয়েক সপ্তাহ ধরে অতিবাহিত করছেন। তিনি এই যে বিভিন্ন ধর্ম ও মতের মধ্যে ঐক্য সাধনের কাজের এখানে সূচনা করা হয়েছে তাতে গভীরভাবে আগ্রহশীল এবং প্রতিদিন সকালে তাঁকে দেখা যায় যে, তিনি তাঁর লাল রঙের পরিচ্ছদ ও হলুদ রঙের পাগড়িতে ভূষিত হয়ে শাখা-প্রশাখায় বিস্তারিত একটি বিশাল পাইন গাছের তলায় মাটিতে আসন করে বসে একদল আগ্রহশীল শ্রোতাদের, যাঁদের মধ্যে মেয়ে-পুরুষ

দুইই আছে, তাঁদের কাছে জ্ঞান ও উপলব্ধির ভাণ্ডার মুক্ত করে দিচ্ছেন। আমাদের পক্ষে এইটি উপভোগ করার একটি সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। এবং আমাদের একমাত্র দুঃখ কত ক্ষুধার্ত আত্মা এ সুযোগ হারাচ্ছেন।

"গ্রীনএকার জনসমাগমে পূর্ণ, কাছাকাছি আধ ডজন বা তারও বেশি কুটিরগুলিও ভরতি, তথাপি স্থান আছে। শহরবাসিগণ নিজেদের বাড়ি খুলে দিচ্ছেন এই বক্তৃতাগুলি যাঁরা শুনতে এসেছেন তাঁদের জন্য, বক্তৃতা শোনবার জন্য কোন মূল্য দিতে হয় না।

"শ্রীমতী ওলি বুল আগস্টের প্রথম তিন সপ্তাহের জন্য এখানে ঘর নিয়েছেন এবং তাঁর অতিথিদের মধ্যে আছেন শ্রীমতী এডউইন পি. (পার্সি) হুইপ্‌ল (প্রখ্যাত লেখক ও সমালোচকের স্ত্রী) এবং বিশিষ্ট কণ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী কুমারী এমা থার্সবি।"

'পোর্টমাউথ ডেলী ক্রণিক্‌ল' পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতাও "গ্রীনএকারের টুকিটাকি সংবাদ" শিরোনামায় বিবেকানন্দ বিষয়ে ৩১ জুলাই তারিখে লেখেন (এইসময় অতিথির সংখ্যা "প্রতিদিন বেড়েই চলেছে") ঃ

ভারতীয় হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বিশেষ আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছেন। প্রতিদিন সকালে তিনি একদল নারী পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন অরণ্যের মধ্যে একটি বৃহৎ পাইন গাছের তলায় পা-মুড়ে বসে, কথা বলেন আত্মতত্ত্ব বিষয়ে। প্রাচ্যদেশীয় ঐ কোমলপ্রাণ, প্রেমপূর্ণ-হৃদয়ের মানুষটি তাঁর সারল্য এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠার দ্বারা প্রেমপূর্ণ-হৃদয়ের বন্ধুলাভ করেছেন। তিনি অত্যন্ত সহৃদয়। তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন সবার জন্য। শুক্রবার দিন বড় শিবিরে তিনি একটি ভাষণ দেবেন, তাঁর বিষয় হলো, "ঈশ্বরের সত্যতা"। এটি সাধারণ সভায় তাঁকে শোনবার একমাত্র সুযোগ। তিনি এদেশে এসেছিলেন শিকাগো ধর্মমহাসভায় ভাষণ দেবার জন্য এবং যেখানেই তিনি বলেছেন বহু মানুষের অভিনন্দন পেয়েছেন। তাঁর লাল রঙের পরিচ্ছদ এবং হলুদ রঙের পাগড়ির জন্য তিনি যেখানেই যান সেখানেই তাঁকে ছবির মতো সুন্দর দেখায়।

এবং তিনি এমন একটি ব্যক্তিত্ব যাঁকে কখনও ভোলা যাবে না। তখনকার এক কিশোরী এখন যিনি বৃদ্ধা তাঁর একজন বন্ধুকে সেই দিনগুলি সম্বন্ধে লিখেছেন—"আমি ('স্বামীজীর পাইনের') তলায় বসে অনেকবার স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ শুনেছি, তখন আমি একটি অল্পবয়সী মেয়ে মাত্র...। স্বামী বিবেকানন্দকে পরিষ্কার মনে আছে—তাঁর মনোরম হাসি এবং সুন্দর

চোখের কথা মনে আছে। আমি এখনও মনশ্চক্ষে দেখতে পাই তিনি তাঁর পাগড়ি ও আলখাল্লা পরে রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন এবং অনেক লোক তাঁকে অনুসরণ করছে।"[৩২]

শ্রীমতী বুল গ্রীনএকারে আগস্টের ৩ তারিখে যথাসময়ে এসে হাজির হন এবং তাঁর অননুকরণীয় শৈলীতে বক্তৃতাটি বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রতিবেদনটি লেখেন, এটি আগস্টের ১১ তারিখে ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্ট পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ঃ

স্বামী বিবেকানন্দ

একজন হিন্দু খ্রীস্টান শ্রোতাদের সামনে মহম্মদের সমর্থনে এগিয়ে এলেন, সকল অবতার পুরুষদের শিক্ষাকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতে হবে, এই সকল আচার্যদের নিকট ঈশ্বর মানুষের জন্য যে-সকল সত্য উদ্ভাসিত করেছেন—যে-সকল অমৃত-বাণী দিয়েছেন—সেগুলি সম্বন্ধে তাঁদের অনুসরণকারিগণ যেন নিজেদের ভ্রান্ত আচরণ দ্বারা কোন বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করেন। গতকাল এগুলিই ছিল গ্রীনএকারে প্রদত্ত ভাষণের বিষয়বস্তু।

সুস্পষ্ট চিন্তা এবং প্রাঞ্জল ভাষণের মাধ্যমে প্রাচ্যভূমির জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে যে-সকল স্থূল, অগভীর সমালোচনা ও মন্তব্য করা হতো ধৈর্যের সঙ্গে সে-সকলের সংশোধন করে দেওয়া হলো। তাঁর এ-সকল ব্যাখ্যা ছিল অতুলনীয়, কারণ অত্যন্ত সরল ছিল সেগুলি এবং সবকিছু বোঝানো হয়েছিল পরিচিত ও সহজলভ্য দৃষ্টান্ত সহায়ে। এর পরেই দারুণ বাগ্মিতার মাধ্যমে আবেদন রাখা হয়েছিল মহম্মদের সময়ের ইতিহাস, মহম্মদ কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মবিশ্বাস এবং ঈশ্বরের বাণীদূত হিসাবে তাঁর প্রবর্তিত ধর্মমতের দ্বারা মানবজাতির যে সেবা করা হয়েছে সে সম্বন্ধে ন্যায়বিচার করার মনোভাব জাগ্রত করার জন্য। যে-সকল নরনারীর মনে একজন মূর্তিপূজক সম্বন্ধে ভীতি ছিল, তারা সকলেই আলোড়িত হয়েছে তাঁর ভাষণের দ্বারা—তারা বলেছে ঠিক যেমন ওয়েণ্ডেল ফিলিপ্‌স্ দাসত্বরূপ পাপের প্রসঙ্গ তুলে কঠিন হৃদয়সমূহ বিগলিত করতে পারতেন—এ ঠিক যেন সেইরকম ব্যাপার।

ঘৃণা, পরিহাস-দক্ষতা এবং মেধার সমন্বয় নম্রভাবে অথচ মর্যাদার সঙ্গে একটি মহৎ কাজ সম্পন্ন করেছিল, তা হলো এই আবেদন রাখার যে, সকল ধর্মের সমস্ত ত্রুটি, ভয়াবহ দিকসমূহ একদিকে সরিয়ে রেখে

যে ভাবগুলি সব ধর্মের মধ্যে সমভাবে বর্তমান, সর্ব ধর্মমতের সার সত্য—আত্মার অমরত্ব, একেশ্বরবাদ, ঈশ্বর এবং তাঁর বাণীদূত যে পবিত্রাত্মা—এ তত্ত্ব, প্রত্যেকে একই মানব পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ এই বিশ্বাস এবং প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে যে অন্য ধর্মের মানুষের প্রয়োজন মেটাবার মতো সত্য আছে—এই মতবাদ এ-সকলকেই স্বীকৃতি দিতে হবে এবং মুক্তির জন্য প্রত্যেক ধর্মকেই শ্রদ্ধা করতে হবে।

বক্তা স্বামী বিবেকানন্দ এমন বস্তু দিলেন যা একজন বিরাট পুরুষই দিতে পারেন। এ এমন একটি ঘণ্টা সময়, যা কখনও ভোলা যাবে না। এই মানুষটি উপস্থিত সকলকে সত্যের আলোকের নিকট নিয়ে গিয়েছিলেন তা যার যা কুসংস্কার থেকে থাকুক না কেন, যার যেমন শিক্ষা হোক না কেন, ঠিক যেরকম ভাবে ফিলিপস ব্রুক ইউনিটেরিয়ান এবং এপিসকোপাল মতবাদের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন এবং যাঁরা সত্য ও শিবকে ভালবাসেন তাঁরা সকলে তাঁকে তাঁদের বিশপ হিসাবে নির্বাচন করেছিলেন—এ সেরকম ব্যাপার। এই হিন্দুটি তাঁর গঠনমূলক চিন্তাটি যখন দিতে উদ্যত হন তখন ঈশ্বরের দূতদের যে কি শক্তি তা নিজ উপস্থিতির দ্বারাই জ্ঞাত করান।

শ্রীমতী বুলের এই—"যখন তিনি দিতে উদ্যত হন"—কথাটি তিনি যে তাঁর প্রতিবেদনের শেষ বাক্যটির মধ্যে ঢুকিয়েছেন, তার অর্থ—তিনি স্বামীজীর বক্তৃতা এই প্রথম শুনছেন না। আমাদের মনে হয় যে, সম্ভবত তিনি মে মাসে বোস্টন এবং কেম্ব্রিজে তাঁর ভাষণ শুনে থাকবেন, যেখানে শ্রীমতী জন হেনরী রাইটের ভাষ্যানুসারে "তিনি অত্যন্ত সরস, তিক্ত ও তীক্ষ্ণ পাথরের মতো বাক্যসমূহের তীর ছুঁড়েছেন। সেগুলি সঙ্গত ছিল এবং সেগুলি খুব সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্যে পৌঁছেছিল।" কিন্তু স্বামীজীর স্পষ্ট কথা যতই লক্ষ্যভেদ করে থাকুক না কেন, শ্রীমতী বুল এর সঙ্গে মানিয়ে নিতে দীর্ঘ সময় নিয়েছেন।

গ্রীনএকারে ঐ গ্রীষ্মকালে 'শান্তিসদনে' বহু এবং বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি আমবা পরিশিষ্ট 'ক'-তে উদ্ধৃত করেছি সেই বার কি ধরনের কার্যক্রম গৃহীত হয়েছিল, তার মধ্যে আগ্রহের বিষয় এবং বৌদ্ধিক পটভূমিকা কিরূপ ছিল, তা বোঝাবার জন্য। কিন্তু আজ আমাদের কাছে এবং তখন সেই ১৮৯৪ তেও অনেকেরই কাছে বিবেকানন্দের শিক্ষার আসরগুলিই প্রাধান্য পায়। একটি সুদীর্ঘ লাইসেকলস্টার পাইনের তলায়—

যে পাইন গাছটি 'স্বামীজীর পাইন' + গাছ বলে আখ্যা পেয়েছিল—তিনি প্রতিদিন ধর্মশিক্ষা দিতেন। এক বছর ধরে আশা ছিল যে, এই শিক্ষা সম্বন্ধীয় আসরগুলিতে তাঁর দেওয়া ভাষণের প্রতিলিপি কেউ নিশ্চয়ই লিখেছেন এবং তা একসময় আবিষ্কৃত হবেই, কিন্তু খুব সাম্প্রতিককালের আগে তা আবিষ্কৃত হয়নি। যারা সেই অরণ্য মধ্যে ভূমিতলে স্বামীজীকে ঘিরে বসতেন এবং তাঁর কথা আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কুমারী এমা থার্সবি এবং এ তাঁর অশেষ কৃতিত্ব যে, তিনি বক্তৃতাগুলির সংক্ষিপ্তসার শুধু লিখেই রাখেননি, সেগুলি রক্ষাও করেছেন। নিউ ইয়র্ক ঐতিহাসিক সমিতিতে সংরক্ষিত তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে দীর্ঘদিন এগুলি লুক্কায়িত ছিল, বর্তমান লেখিকা সেগুলি আকস্মিকভাবেই আবিষ্কার করেন এবং সেগুলিই এখানে উপস্থাপিত করা হলো। কুমারী থার্সবির স্বীকৃতি অনুসারে স্বামীজীর বিভিন্ন বক্তৃতা থেকে বিবিধ সংগ্রহরূপে সেগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, তাহলেও সেগুলির মধ্য দিয়ে তাঁর কণ্ঠস্বর ঠিকই শুনতে পাওয়া যায় এবং গ্রীনএকারের পাইন গাছের তলায় কি ধরনের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল সে-বিষয়ে একটা ধারণা করা যায়। দু-খানি বড় বড় কাগজের এপিঠ ওপিঠ উভয়দিকের পাতা ভরতি করে সেগুলি লেখা হয়েছে এবং অসম্পাদিতভাবে পাঠ করলে সেগুলি নিম্নলিখিতরূপ ঃ

বিবিধ সংগ্রহরূপে স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক গ্রীনএকারে পাইন বৃক্ষতলে ১৮৯৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে দেওয়া ভাষণসমূহের অংশবিশেষের প্রতিলিপি ঃ

—স্বামীজীর গুরুদেবের নাম রামকৃষ্ণ পরমহংস—বিবেকানন্দের নামের অর্থ হলো বিবেকের আনন্দ—ধ্যান হলো এক ধরনের প্রার্থনা এবং প্রার্থনাই ধ্যান—ধ্যানের সর্বোচ্চ অবস্থা হলো কোন কিছুর চিন্তা না করা। মুহূর্তকালও যদি তুমি কোন কিছু চিন্তা না করে থাকতে পার, তাহলে বিপুল শক্তি লাভ করবে। জ্ঞানলাভের গোপন সূত্রটি হলো মনঃসংযোগ। সর্বান্তঃকরণে ঈশ্বরকে ভালবাসলে আত্মার সর্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি হয়। আত্মা হলো মানুষের চিন্তাশক্তির মূল ভিত্তি, মন তারই একটি প্রক্ষেপ। আত্মা হলো চৈতন্য হতে মনে যাবার পথে একটি জলধারা বহনের নালিকার মতো।

প্রত্যেক আত্মাই চেতন বা অচেতনভাবে সক্রিয়—ধর্ম হলো সচেতনভাবে ক্রিয়া করতে শেখা।

গুরু হলো তোমারই উচ্চতর সত্তা। উচ্চতমকে খোঁজ—সবসময় উচ্চতমকে—কারণ উচ্চতমতেই আছে সর্বাপেক্ষা আনন্দ। আমাকে যদি শিকার করতে হয়, আমি শিকার করব গণ্ডার। আমাকে যদি লুট করতে হয়, রাজার ভাণ্ডারই লুট করব, সেই উচ্চতমকেই খোঁজ।

আমি হয়তো বুঝেছি যে তুমি বদ্ধ—কিন্তু তুমি যদি জেনে থাক যে তুমি মুক্ত, তাহলেই তুমি মুক্ত। আমার মন ঐহিক বাসনার দ্বারা কখনও আবদ্ধ হয়নি, কারণ আকাশ যেমন চিরদিনই নীল, আমিও তেমনি মূলত সচ্চিদানন্দস্বরূপ। ভাই কেন কাঁদ? তোমার রোগ নেই, মৃত্যু নেই, কেন কাঁদ ভাই? দুঃখ অথবা দুর্ভাগ্য তোমার জন্য নয়। কেন কাঁদছ ভাই? পরিবর্তন বা মৃত্যু তোমার সম্বন্ধে বলা হয়নি, কারণ তুমি সৎস্বরূপ। [এখানে স্বামীজী অবধূত-গীতা হতে স্বচ্ছন্দ অনুবাদসকল উদ্ধৃত করেছেন।]

আমি জানি ঈশ্বর কি বস্তু, আমি তাঁর কথা তোমাকে বলতে পারি না। আমি জানি না ঈশ্বরের স্বরূপ কি, আমি কি করে তোমাকে তাঁর কথা বলব? কিন্তু ভাই তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে তুমিই তিনি, তুমিই ছিলে তিনি? কেন ঈশ্বরের খোঁজে এখানে সেখানে ঘুরছ? খুঁজো না এবং তাই-ই ঈশ্বর। তুমি তোমার যা স্বরূপ তাই হও। যাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না, যাঁকে বর্ণনা করা যায় না, কিন্তু যাঁকে হৃদয়ের অন্তস্তলে অনুভব করা যায়, যিনি অতুলনীয়, অসীম, নীল আকাশের মতো অপরিবর্তনীয় তাকে জান। সেই পবিত্রতাস্বরূপ যে বস্তু তাঁকে জান। তাঁকে ছাড়া আর কোনকিছুকেই খুঁজো না।

সেখানে প্রকৃতির পরিবর্তন পৌঁছয় না, সমস্ত চিন্তার অতীত যে চিন্তা যা অপরিবর্তনীয়, স্থাণু, যাঁর কথা শাস্ত্রসমূহ ঘোষণা করে, ঋষিগণ যাঁকে পূজা করেন, হে পবিত্রাত্মা, তাঁকে ছাড়া আর কাউকে খুঁজো না।

তুলনাহীন সেই অসীম একত্ব—সেখানে কোন তুলনাই সম্ভব নয়। ওপরে জল, নিচে জল, দক্ষিণে জল, বাঁয়ে জল, জলের ওপরে কোন তরঙ্গ নেই, ঘূর্ণি নেই, নিঃশব্দ, সমস্তটাই অনন্ত শান্তি। এই রূপ যিনি তিনিই তোমার হৃদয়-দুয়ারে আসবেন। আর কিছু খুঁজো না। তুমিই পিতা, তুমিই মাতা, তুমিই বন্ধু, তুমিই ভূভারহরণ। আমাদের এই জীবনের ভার বহন করবার শক্তি দাও তুমি। তুমি-ই আমাদের বন্ধু, প্রণয়ী, স্বামী, তুমিই আমরা।

চার রকমের লোক আমাকে উপাসনা করে। কেউ কেউ এ জগতের

আনন্দ উপভোগ করতে চায়। কেউ বা অর্থ চায়, কেউ ধর্ম চায়। কেউ কেউ আমাকে ভালবেসে পুজো করে। ভালবাসার জন্যই ভালবাসা হলো প্রকৃত ভালবাসা। আমি স্বাস্থ্য, অর্থ বা জীবন বা মুক্তি কিছুই চাই না। আমাকে হাজার নরকে পাঠাও, কিন্তু আমাকে তোমায় ভালবাসার জন্যই ভালবাসতে দাও। মহারাণী মীরাবাঈ প্রেমের জন্যই প্রেম—এই বাণী প্রচার করেছেন। একটি অসীম মনঃসমুদ্রের একাংশ হলো আমাদের বর্তমান এই চেতনা। এই চেতনাটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থেকো না। আত্মোন্নতির জন্য তিনটি বিরাট জিনিস দরকার—প্রথম, মনুষ্য জন্ম, দ্বিতীয়, উচ্চতম বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা, তৃতীয়, একজন প্রকৃত মহাত্মার সন্ধান লাভ করা, এমন একজন—যার মন, বাক্য এবং কর্ম তাঁর পবিত্রতার অমৃতে অভিসিক্ত, যাঁর একমাত্র আনন্দ হলো বিশ্বের কল্যাণ করা, যিনি সর্ষেদানার মতো ক্ষুদ্রাতীত ক্ষুদ্র বস্তুর মধ্যেও পর্বতপ্রমাণ গুণ দেখেন; এইভাবে যিনি নিজ আত্মার প্রসার ঘটান এবং অন্যদেরও প্রসার ঘটাতে সহায়তা করেন—মহাত্মারা এ-ভাবেই বিচরণ করেন।

"যোগ" শব্দটি হচ্ছে মূল শব্দ, যার থেকে আমাদের "ইয়োক" কথাটি—যার অর্থ যোগদান করা—পাওয়া গিয়েছে এবং যোগের অর্থ ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। আমার স্ব-স্বরূপের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা এখন যে-সকল ক্রিয়া আমার ইচ্ছাপ্রণোদিত নয়, স্বয়ংক্রিয়, সেগুলি একসময় ইচ্ছানিয়ন্ত্রিত ছিল এবং জ্ঞানলাভের প্রথম পদক্ষেপ হলো স্বয়ংক্রিয় কাজগুলি সম্বন্ধে সম্যক জানা; আসল ব্যাপার হলো সেগুলি পুনরুজ্জীবিত করা এবং সেগুলিকে পুনরায় স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রিত করে তোলা। সেগুলিকে অ-সচেতন থেকে সচেতনের স্তরে আনা। অনেক যোগী তাঁদের নিজ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া নিজ ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। চেতনার সেই স্তরে ফিরে যাওয়া এবং যে-সকল জিনিস আমরা ভুলে গিয়েছি সে-গুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা খুবই সাধারণ শক্তির ব্যাপার। কিন্তু সেই শক্তিকে বাড়িয়ে তোলা যায়। সকল প্রকার জ্ঞান যা অন্তর্লীন চৈতন্য হতে টেনে আনা যায় সেগুলিকে টেনে আনাই হলো যোগের কাজ। বেশির ভাগ কর্ম এবং চিন্তাই হলো স্বয়ংক্রিয় অর্থাৎ সেগুলির পশ্চাতে চেতনা কাজ করছে। স্বয়ংক্রিয় কার্যকলাপের অবস্থানকেন্দ্র হলো মজ্জা এবং শিরদাঁড়া দিয়ে নিম্নদেশে প্রবাহিত। এখন প্রশ্ন হলো কিরূপে আমাদের অভ্যন্তরীণ চেতনা ফিরে পাওয়া যায়। তার উপায় কি? পরমাত্মা থেকে উদ্ভূত আমার শরীর মন

ও আত্মা এবং এখন আমাদের শরীর থেকে পরমাত্মায় ফিরে যেতে হবে। প্রথম বায়ুকে নিয়ন্ত্রিত কর, তারপর স্নায়ুতন্ত্রকে, তারপর মনকে, তারপর যেতে হবে আত্মা অথবা পরমাত্মায়; কিন্তু এ-প্রচেষ্টায় একমাত্র উচ্চতমকেই চাইতে হবে, আকাঙ্ক্ষা করতে হবে। মনঃসংযোগ হলো সকল উপায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপায়। প্রথম সমস্ত স্নায়ুর শক্তিকে সংহত কর এবং শরীরের কোষসমূহের শক্তিকে একক একটি শক্তিতে পরিণত কর এবং ইচ্ছামত তাকে নিয়োজিত কর। তারপর মন—যা হলো অতি সূক্ষ্মপদার্থ—তাকে একটি কেন্দ্রে সংহত কর। মনের বিভিন্ন স্তর আছে। যখন সংহত স্নায়বীয় শক্তিকে শিরদাঁড়ার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা হয়, মনের একটি দ্বার উন্মুক্ত হয়। সেখান থেকে সংহত করে যখন একটি অস্থির মধ্যে (অর্থাৎ জালক বা পদ্মে) আনা হয়, তখন অন্য একটি জগৎ খুলে যায়; এভাবে একটি ভুবন থেকে অন্য ভুবনে যাতায়াত করা যায় যতক্ষণ না মস্তিষ্কে তৃতীয় নয়নের ক্ষেত্রটিকে স্পর্শ করা হয়। এটি হলো সমস্ত সংহত সুপ্ত শক্তির কেন্দ্র, যা কর্ম এবং নৈষ্কর্ম্যেরও উৎসভূমি। শুরু কর এই ধারণা থেকে যে, আমরা এ জগতে এ জন্মেই সকল উপলব্ধি লাভ করতে পারি। আমাদের লক্ষ্য হবে এ জীবনে এই মুহূর্তেই পূর্ণতা অর্জন করা। সকল মানুষের মধ্যে সেই মানুষের জীবনেই সাফল্য আসে, যে এটা এই মুহূর্তেই অর্জন করে ফেলতে চায়। সেই ব্যক্তির পক্ষেই এটা সম্ভব যে বলতে পারে "বিশ্বাস! আমি বিশ্বাস করেই যাব, ফল যাই হোক"। সুতরাং এটা জেনে রাখ যে তোমাকে এই মুহূর্তেই সবকিছু করতে হবে। কঠোর সংগ্রাম কর এবং তাতে যদি তুমি না জিততে পার, তোমাকে কেউ দোষ দেবে না। সংসার তোমাকে প্রশংসা বা নিন্দা যা প্রাণ চায় করুক। পৃথিবীর সকল ঐশ্বর্য তোমার পদমূলে অর্পিত হোক, অথবা তুমি পৃথিবীর দরিদ্রতম ব্যক্তি হও না কেন, এই মুহূর্তে আসুক বা শতবর্ষ পরেই আসুক, তুমি তোমার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ো না। পৃথিবীর সকল সৎ-চিন্তা অমর এবং সেগুলি বুদ্ধ এবং খ্রীস্টকে সৃষ্টি করে।

বিধিনিয়ম হলো প্রকাশের একটি পন্থা, তোমার মনে উত্থিত বিভিন্ন দৃশ্যমান বিষয় প্রকাশের নিয়ম হলো বস্তুজগতকে আয়ত্ত করবার এবং তাদের মধ্যে ঐক্য বিধান করবার জন্য তোমার নিজস্ব উপায়। সমস্ত নিয়মই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য দেখে। জ্ঞানের একমাত্র উপায় মনঃসংযোগ—তা বাহ্য বা মনোজগত বা আত্মিক জগতের সম্বন্ধে হোক না কেন তাতে

কিছু যায় আসে না এবং মনের শক্তিগুলিকে সংহত করে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য খুঁজে পাওয়াই হলো জ্ঞান।

যা কিছু ঐক্য-বিধায়ক তাইই নৈতিক, যা কিছু বিভেদ সৃষ্টি করে তাইই অনৈতিক। সেই অদ্বিতীয় এককে জান, এই জানার মধ্যে যেন এক মুহূর্তের জন্যও ছেদ না আসে। সেই এক যিনি বিশ্বের মধ্যে প্রকাশিত তিনিই বিশ্বের ভিত্তিমূল এবং সকল ধর্মকে, সকল জ্ঞানকে এই কেন্দ্রবিন্দুতে আসতে হবে।

কুমারী থার্সবির এই অনুলিখন হতে এটা স্পষ্ট তখন স্বামীজী উপলব্ধির উচ্চভূমিতে অবস্থান করছিলেন, আর তাঁকে ঘিরে ছিলেন গ্রহণক্ষমতাসম্পন্ন সত্যানুসন্ধানে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ, সেজন্য তিনিও আধ্যাত্মিক সাধনার কথাই তাঁর ভাষণসমূহে বলেছেন, ভারতের প্রথা-প্রতিষ্ঠান, আচার-আচরণ প্রসঙ্গে বলেননি। আমরা একথা 'গ্রীনএকার' ভয়েস নামক একটি সাময়িক পত্রিকা যা ওখান থেকে প্রকাশিত হতো—তার প্রতিবেদনের অংশবিশেষ থেকেও বুঝতে পারি। যদিও ১৮৯৪-এর সংখ্যাগুলি আর পাওয়া যায় না। কিন্তু আমি অন্যান্য কোন কোন পত্রিকায় উক্ত পত্রিকার ঐ সংখ্যাগুলির অংশবিশেষ হতে দুটি উদ্ধৃতি পেয়েছি। প্রথমটি হলো স্বামীজীকৃত শঙ্করাচার্যের "নির্বাণষটকম্"-এর কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ, "নির্বাণষটকম্" হলো, আপসহীন অদ্বৈত বেদান্ত তত্ত্বের একটি উপস্থাপনা!

গ্রীনএকারে স্বামীজীর বিখ্যাত পাইন নামক বৃক্ষতল হতে বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ

"আমি শরীরও নই, শরীরের পরিবর্তনসমূহও নই, আমি ইন্দ্রিয়ও নই, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুও নই, আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, আমিই সেই, আমিই সেই।

"আমি মৃত্যুও নই, আমার মৃত্যুভয়ও নেই, আমি কখনও জন্মগ্রহণ করিনি, আমার পিতামাতাও নেই। আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, আমিই সেই, আমিই সেই;

"আমি দুঃখও নই, আমার কোন দুঃখও নেই, আমি কারও শত্রুও নই, আমার কোন শত্রুও নেই, আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, আমিই সেই, আমিই সেই;

"আমার কোন আকার নেই, কোন সীমা নেই, আমি দেশকালের অতীত, আমি বিশ্বের মূলাধার আমি সবকিছুতেই আছি। আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, আমিই সেই, আমিই সেই।"[৩৩]

গ্রীনএকার ভয়েস পত্রিকার আর একটি উদ্ধৃতির অংশবিশেষ যা পাই তা হলো নিম্নলিখিতরূপ ঃ

বিবেকানন্দ বলছেন—"তুমি আমি এবং বিশ্বের সবকিছুই সেই নির্বিশেষ সর্বব্যাপী সত্তা, তার অংশ নই, পুরোটাই। তুমিই সেই সর্বব্যাপী সত্তা।"[৩৪]

এই সকল টুকরো উদ্ধৃতি এবং এর থেকেও সারবান কুমারী থার্সবির অনুলিখন হতে এবং স্বামীজীর চিঠিপত্র হতে জানা যায় যে, এই প্রথম আমেরিকায় অদ্বৈতবেদান্ত বিষয়ে (যদিও যতদূর জানা যায় তার নামোল্লেখ না করে) অল্পসংখ্যক শ্রোতাকে তিনি শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন। মেরী হেলকে এসময় তিনি লিখেছিলেন— "*আমি তাদের সকলকে 'শিবোঽহম্' করতে শেখাই, আর তারা তাই আবৃত্তি করতে থাকে—সকলেই কি সরল ও শুদ্ধ এবং অসীম সাহসী! সুতরাং এদের শিক্ষা দিয়ে আমিও পরম আনন্দ ও গৌরব বোধ করছি।*"[৩৫]* স্বামীজী যে তাঁর শিক্ষাদানের আসরে নির্দিষ্ট সময়েই শিক্ষা দিতেন তা নয় কারণ শুধু সেই সময়টুকুতেই যে শ্রোতারা এবং অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ তাঁর চারপাশে ঘিরে বসত তা নয় এবং যেখানেই শোনার কান আছে সেখানেই তিনি ঈশ্বর এবং পরমাত্মার কথা বলতেন, সুতরাং তিনি শিক্ষা দিতেন বিরামহীনভাবে। গ্রীনএকার পরিত্যাগ করার এক সপ্তাহ মধ্যে তিনি তাই লেখেন—"*আমি একটু নীরবতা চাই। কিন্তু বোধহয় এটা—তাঁর ইচ্ছা নয়। গ্রীনএকারে আমাকে রোজ গড়ে ৭/৮ ঘণ্টা করে কথা বলতে হতো সেটাই ছিল আমার বিশ্রাম, যদি বিশ্রাম বলে কিছু থেকে থাকে। কিন্তু সবই ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ এবং তাই প্রাণশক্তিকে উজ্জীবিত করে এবং মহিমা প্রদান করে।*"[৩৬] *যদিও এ-কথা বলা যায় না যে, গ্রীনএকারেই স্বামীজী পাশ্চাত্যে পরবর্তীকালে যে, পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতেন তা গঠন করেন। বলা যেতে পারে যে এই সময়টাতে সমাসন্নকালে যা ঘটবে তার আগাম ছায়াপাত ঘটেছিল—বলা যায় এটি ছিল একটি নতুন পদ্ধতিতে কাজের সূচনামাত্র।*

তাঁর পাইন বৃক্ষতলে স্বামীজী শুধু যে বেদান্ত শিক্ষা দিতেন তা নয়,

* *বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম সং, পত্রসংখ্যা ১০৭, পৃঃ ৩৬৭*

ও যা ছিল তাঁর অতিশয় আনন্দের ব্যাপার সেই ধ্যানেও মগ্ন হতেন আর সেখানে নিদ্রাও যেতেন। মেরী এবং হ্যারিয়েট হেলকে একটি চিঠিতে লেখেন— "সেদিন রাতে শিবিরের লোকজনেরা একটি পাইনগাছের তলায় ঘুমোতে গেল—যে গাছটার তলায় আমি প্রত্যেক দিন সকালে ভারতীয় প্রথায় বসি এবং তাদের ধর্মদর্শনের কথা বলি। অবশ্য ওদের সঙ্গে সেদিন আমিও গিয়েছিলাম ঘুমোতে এবং আমরা সকলে তারকাখচিত মুক্ত আকাশতলে পৃথিবী মায়ের কোলে সুন্দর একটি রাত্রি কাটালাম, এর প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছি। সে রাত্রির মহিমা তোমাদের আমি বলে বোঝাতে পারব না—এক বৎসর পশুর মতো যে জীবন আমি যাপন করেছি—তারপর ভূমিতলে নিদ্রা, অরণ্যমধ্যে বৃক্ষতলে ধ্যান করতে পারা—এ যে কি জিনিস!" [৩৭]

বোধহয় এরকম শান্ত উষ্ণ দিনে বৃক্ষতলে রাত্রি যাপন সম্বন্ধেই আগস্টের ১৩ তারিখে ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্ট মন্তব্য করেছিল :

> *এমার্সন ও ব্রনসন অ্যালকট এবং প্রাচীন কনকর্ডের লোকেরা গ্রীনএকারে তারকাখচিত মুক্ত আকাশতলে সেদিন রাতে হিন্দু বিবেকানন্দের মুখে বেদ হতে ভাবগম্ভীর কবিতাসমূহ প্রায় এক ঘণ্টা কাল ধরে তাঁর অপূর্ব সুন্দর সুললিত ইংরেজীতে শুনতে পেলে উপভোগ করতে পারতেন।*

স্বামীজী কি তাঁর সুরেলা কণ্ঠে মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলি উচ্চারণ করেন নি? মনে করা যেতে পারে নিশ্চিতই করেছিলেন এবং পাইনবৃক্ষ পর্যন্ত রুদ্ধশ্বাসে তা শুনেছিল। সুতরাং কিছুদিনের জন্য স্বামীজী একটি আশ্রমকে পেয়েছিলেন। ইসাবেল ম্যাককিণ্ডলিকে লিখেছিলেন—"*সম্ভবতঃ পূর্বের চিঠিতে তোমাকে বলা হয়নি যে, আমি কেমন করে গাছের নীচে ঘুমিয়েছি, থেকেছি এবং ধর্মপ্রচার করেছি এবং অন্ততঃ কয়েকদিনের জন্য আর একবার স্বর্গীয় পরিবেশের মধ্যে নিজেকে পেয়েছি।*" [৩৮*]

এমনকি জুলাই মাসের ২৯ তারিখে যে বড় ঝড় হয়েছিল, তার দু-একদিন পরেই রাত্রিটা ছিল নির্মল তারকাখচিত। ঝড়টা কিন্তু কোন ছোটখাট ব্যাপার ছিল না। ৩১ তারিখে 'গ্রীনএকার নোট্‌স' শিরোনামায় পোর্টসমাউথ ডেলী ক্রনিক্‌ল এই ঝড়ের বিষয়ে লিখেছিল :

> *রবিবারের ঝড়ের সময় আমরা এ অঞ্চলে এ-যাবৎ কালের সবচেয়ে সুন্দর বিদ্যুৎ চমকানির খেলা দেখেছি, কিন্তু ঝড় একসময় সূর্যোদয় শিবিরটিকে*

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম সং, পত্র সংখ্যা ১০৯, পৃঃ ৩৭০

একেবারে ধ্বংস করে দেবে বলে ভয় হয়েছিল— সূর্যোদয় শিবির গ্রীনএকারের এমন একটি সংযোজনা যা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। তিনটি শিবির উড়ে গিয়ে ভূমিসাৎ হয়। এমন কি যেখানে বক্তৃতাদি হয়ে থাকে সেই বড় শিবিরটিও। এই শেষোক্ত শিবিরটি খুব বিশ্রীভাবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়, কিন্তু ছিন্ন অংশগুলিকে জুড়ে দেওয়া হয় এবং এটিকে পুনরায় ব্যবহার করা হচ্ছে। ঝড়ের সময় শ্রীযুক্ত ডব্লু. জে. কোলভিলে (যিনি প্রেততত্ত্বে বিশ্বাসী) বক্তৃতা দিচ্ছিলেন পান্থশালা বক্তৃতাকক্ষে এবং যেরকম শান্তভাবে তিনি এগোচ্ছিলেন তাতে তাঁর এই কথাটির প্রমাণ পাওয়া গেল—"সব কিছুই ভাল।"

বাকি লোকেরা সকলেই শিবিরটি রক্ষার্থে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন, এবং কল্পনা করা যায় যে স্বামীজী ছিলেন ঝড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে, দেখছিলেন ঝড়ের সঙ্গে শিবিরবাসীদের সংগ্রাম এবং শিবিরটিকে ধ্বংস হতে বাঁচানোর কাজে হয়তো তিনিও হাত লাগিয়েছিলেন। অন্যদের নিকট এটি ছিল কেবলমাত্র বাতাস এবং বৃষ্টির সঙ্গে একটি প্রয়োজনীয় লড়াই, কিন্তু স্বামীজীর নিকট তা ছিল প্রকৃতির আক্রমণের বিরুদ্ধে মানুষের আত্মার গৌরবময় সংগ্রাম। হেল ভগিনীদের নিকট তিনি লিখলেন— "*ভগবানকে ধন্যবাদ যে তিনি আমাকে নিঃস্ব করেছেন; ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি এই তাঁবুবাসীদের দরিদ্র করেছেন। শৌখীন বাবুরা ও শৌখীন মেয়েরা রয়েছেন হোটেলে; কিন্তু তাঁবুবাসীদের স্নায়ুগুলি যেন লোহা দিয়ে বাঁধানো, মন তিন-পুরু ইস্পাতে তৈরী আর আত্মা অগ্নিময়। কাল যখন মুসলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল আর ঝড়ে সব উলটে পালটে ফেলছিল, তখন এই নির্ভীক বীরহৃদয় ব্যক্তিগণ আত্মার অনন্ত মহিমায় বিশ্বাস দৃঢ় রেখে ঝড়ে যাতে উড়িয়ে না নিয়ে যায়, সেজন্য তাদের তাঁবুর দড়ি ধরে কেমন ঝুলছিল, তা দেখলে তোমাদের হৃদয় প্রশস্ত ও উন্নত হত। আমি এদের জুড়ি দেখতে ৫০ ক্রোশ যেতে প্রস্তুত আছি। প্রভু তাদের আশীর্বাদ করুন।*" ৩১*

স্বামীজী যে মেজাজে তখন ছিলেন, তাতে সবকিছুই তাঁর চোখে মহিমান্বিত হয়ে দেখা দিয়েছে। তিনি কিন্তু চারপাশে যা চলছে তা দেখে একটুও প্রবঞ্চিত হন নি। যখন তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি মানুষ এবং ঘটনার অন্তর্নিহিত অধ্যাত্ম সত্তাকে দেখেছে, তখনও তিনি কোন জিনিসকে বাড়িয়ে দেখেননি, বাহ্য সত্যকে তিনি এত পরিষ্কার এবং নির্ভুল দেখেছেন অপরে যা দেখে

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম সং, পত্র সংখ্যা ১০২, পৃঃ ৩৬৭

না। সেই একই চিঠিতে, যাতে তিনি গ্রীনএকারের শিবিরবাসীদের দুর্জয় সাহস দেখে আনন্দ প্রকাশ করেছেন, তাতেই লিখেছেন—"*একটা কথা—এরা কতকটা শুষ্ক ধরনের লোক, আর সমগ্র জগতে খুব কম লোকই আছে, যারা শুষ্ক নয়। তারা 'মাধব' অর্থাৎ ভগবান যে রসস্বরূপ, তা একেবারে বোঝে না। তারা হয় জ্ঞান-চচ্চড়ি অথবা ঝাড়ফুঁক করে রোগ আরাম করা, টেবিলে ভূত নাবানো, ডাইনী বিদ্যা ইত্যাদির পিছনে ছোটে। এদেশে যত প্রেম, স্বাধীনতা তেজের কথা শোনা যায়, আর কোথাও তত শুনিনি, কিন্তু এখানকার লোকে এগুলি যত কম বোঝে, তত আর কোথাও নয়। এখানে ঈশ্বরের ধারণা—হয় 'সভয়ং বজ্রমুদ্যতং' অথবা রোগ-আরামকারী শক্তিবিশেষ অথবা কোন প্রকার স্পন্দন, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রভু এদের মঙ্গল করুন। এরা আবার দিনরাত তোতা পাখির মতো, 'প্রেম প্রেম প্রেম' করে চেঁচাচ্ছে!*"[৪০]*

একই সুরে স্বামীজী অন্য এক সময় এবং অন্য প্রসঙ্গে লেখেন—"*আমি খুব ভালভাবে সচেতন যে অতি সম্প্রতিকালে পাশ্চাত্যে যে-সকল রহস্যময় চিন্তারাশি ঝড়ের বেগে অনুপ্রবেশ করেছে তার ভেতরে হয়তো কিছু সত্য আছে। কিন্তু এগুলির বেশির ভাগের উদ্দেশ্যই মূলাহীন অথবা উন্মাদনার ব্যাপার। এই কারণে আমি কখনও ধর্মের এইসকল দিকের সঙ্গে ভারতে অথবা অন্যত্র কোন সম্বন্ধ রাখিনি এবং যারা এইসব রহস্য নিয়ে কারবার করে আমার কাছে তারা খুব প্রিয় নয়।*"[৪১]

কিন্তু যদিও গ্রীনএকারে স্বামীজী এই রহস্যবাদীদের দ্বারা পরিবৃত ছিলেন তথাপি তিনি খুব উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থার উল্লাসের মধ্যে বাস করছিলেন। "*এদের মতো চৈতন্যকে জড়ের ভূমিতে টেনে না এনে*", তিনি হেল ভগিনীদের লিখেছেন—'*জড়কে চৈতন্যে পরিণত কর, অন্তত প্রত্যহ একবার করে সেই চৈতন্যরাজ্যের—সেই অনন্ত সৌন্দর্য, শান্তি ও পবিত্রতার রাজ্যের একটু আভাস পাবার এবং দিনরাত সেই ভাবভূমিতে বাস করার চেষ্টা কর। অস্বাভাবিক অলৌকিক কিছু এখন খুঁজো না, ওগুলি পায়ের আঙুল দিয়েও যেন স্পর্শ করো না। তোমাদের আত্মা দিবারাত্র অবিচ্ছিন্ন তৈল ধারার মতো তোমাদের হৃদয়-সিংহাসনবাসী সেই প্রিয়তমের পাদপদ্মে গিয়ে সংলগ্ন হতে থাকুক। বাকি যা কিছু অর্থাৎ দেহ প্রভৃতি—তাদের যা হবার হোক গে।...*

"*ঈশ্বরে লেগে থাক দেহে বা অন্য কোথাও কি হচ্ছে, কে গ্রাহ্য করে?...*

---

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম সং, পত্র সংখ্যা ১০৭, পৃঃ ৩৬৭-৬৮

যখন মৃত্যুর ভীষণ যাতনা হতে থাকে, তখনও বল, 'হে আমার ভগবান, হে আমার প্রিয়; জগতে যত রকমের দুঃখ বিপদ আসতে পারে তা এলেও বল, 'হে ভগবান, হে আমার প্রিয়, তুমি এখানেই রয়েছ। তোমাকে আমি দেখছি, তুমি আমার সঙ্গে রয়েছ, তোমাকে আমি অনুভব করছি। আমি তোমার, আমায় টেনে নাও প্রভু; আমি এই জগতের নই, আমি তোমার—তুমি আমায় ত্যাগ করো না। হীরার খনি ছেড়ে কাচখণ্ডের অন্বেষণে যেও না। এই জীবনটা একটা মস্ত সুযোগ তোমরা কি এ সুযোগ অবহেলা করে সংসারের সুখ খুঁজতে যাবে? তিনি সকল আনন্দের প্রস্রবণ সেই পরমবস্তুর অনুসন্ধান কর, সেই পরমবস্তুই তোমাদের জীবনের লক্ষ্য হোক, তা হলে নিশ্চয়ই সেই পরম বস্তু লাভ করবে।..." [৪২*]

স্বামীজীর পাইনগাছের তলায় তোলা তাঁর গ্রীনএকারের দুটি ছবি আমাদের কাছে আছে। একটি ইসাবেল ম্যাককিণ্ডলির সংগ্রহের মধ্যে ছিল। এ ছবিটিতে তিনি বাহু দুটি আড়াআড়িভাবে আবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর চোখে সেই দৃষ্টি, যা দেখা যায় যখন দুচোখ সমস্ত জগতকে ঈশ্বরময় দেখে। অপরটিতে তিনি ভূমি আসনে উপবিষ্ট হয়ে আছেন, তাঁর আসরে উপস্থিত লোকেরা চারপাশে রয়েছে, এ ছবিটির আবিষ্কারক কুমারী এলভা নেলসন এবং এটি সেই ছবিটি হতে পারে যেটির কথা তিনি হেল ভগিনীদের লিখেছিলেন—"*কোরা স্টকহ্যাম্ গাছতলায় আমাদের দলের ছবি তুলেছিলেন, তারই একটি এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। এটা কিন্তু কাঁচা প্রতিলিপি-মাত্র, আলোতে অস্পষ্ট হয়ে যাবে। এর চেয়ে ভাল এখন কিছু পাচ্ছি না।*" [৪৩**] সম্ভবত আরও দীর্ঘস্থায়ী যে দুটি ছবি দেওয়া হয়েছে সে দুটিই সম্পূর্ণ আলোকচিত্র। সে দুটিই মূল বইতে ছাপা হয়েছে। আগস্টের ৯ তারিখের 'পোর্টসমাউথ ডেলী ক্রনিক্‌ল' থেকে জানা যায় যে, কুমারী স্টকহ্যাম্ দলের আর একটি চিত্রও তুলেছিলেন (কিন্তু সেটি এখনও আবিষ্কৃত হয়নি) যার মধ্যে স্বামীজী উপস্থিত ছিলেন। এটা তোলা হয়েছিল শিবিরে বৃহস্পতিবার আগস্টের ২ তারিখে ডঃ এডওয়ার্ড এভারেট হেলের বক্তৃতার পর। এ প্রসঙ্গের ওপর অনুচ্ছেদটির একটি অংশ :

... স্বামী বিবেকানন্দ দূর প্রাচ্যের প্রতিনিধি হিসাবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন,

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম সং পত্র সংখ্যা ১০৭, পৃঃ ৩৬৭-৬৮
** ঐ, পত্র সংখ্যা ১০৮, পৃঃ ৩৬৯

তাঁর লাল এবং সোনালী রঙের পোশাকে তাঁকে দারুণ জমকালো দেখাচ্ছিল। বক্তৃতার শেষে তাঁর, ডঃ হেলের, শ্রীযুক্ত গুলেসিয়ানের (আর্মেনিয়ার অধিবাসী) এবং কুমারী ফার্মারের একত্রে ছবি তুললেন শিকাগোর কুমারী স্টকহ্যাম্।

বুধবার আগস্টের ১৫ তারিখে ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্টে স্বামীজীর পাইন গাছের তলায় দেওয়া শেষ ভাষণটি সম্বন্ধে একটি বিবরণ ছাপা হয়—ভাষণটি তিনি দিয়েছিলেন রবিবার ১২ আগস্ট তারিখ সকালে। ট্রান্সক্রিপ্টে এই প্রবন্ধটির শিরোনামা দেওয়া হয়েছিল—"জাতীয়তার অর্থহীনতা" যে শিরোনামাটি বিভ্রান্তিকর।

এলিয়টে পাইন বৃক্ষতলে বিবেকানন্দের শেষ ভাষণের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো। ব্র্যায়ান্টের একটি লাইন অনুসরণ করে বলা যায় ভাষণটি ঈশ্বরের মন্দিরে দেওয়া হয়েছিল। ব্র্যায়ান্টের লাইনটি হলো—

"কুঞ্জবন হলো ঈশ্বরের প্রথম মন্দির"

জাতি কাকে বলে? নিয়ম কাকে বলে? আমাদের নিয়ম আছে এজন্য যাতে আমরা তাকে অতিক্রম করে যেতে পারি (নিয়মের ঊর্ধ্বে উঠে যেতে পারি)।

আত্মার স্বাধীনতা আছে, এর মাধ্যমেই নিয়মের স্বাধীনতার কথা আমরা জানতে পারি। আমি সেই জাতিভুক্ত যারা আত্মার মুক্তি কামনা করে। আমি সেই জাতিভুক্ত যারা ঈশ্বরের উপাসনা করে।

ঈশ্বরের প্রেরিত দিব্যপুরুষরা সকলেই আমার গুরু। আমি কৃষ্ণ, বুদ্ধ এবং মহম্মদের কথা জানতে গিয়ে তোমাদের খ্রীস্টের কথা শিখেছি। আমি একমাত্র ঈশ্বরেরই উপাসনা করি। "আমি সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ।" আমি কোন জাতি, রাষ্ট্র বা ধর্মের মধ্যে নিন্দার কিছুই দেখি না, কারণ আমি এ সকলের মধ্যেই ঈশ্বরকে দেখি। আমাদের উত্তরণ মন্দ থেকে ভালতে নয়, ভাল থেকে আরও ভালয় এবং ক্রমাগত অধিক ভালতে। ভাল বা মন্দ এসব কিছু হতেই আমি শিক্ষা লাভ করি। জাতিতে (নেশন) জাতিতে প্রভেদ এবং এই ধরনের অর্থহীন ব্যাপার যেখানে খুশি থাক। ভালবাসা, শুধু ভালবাসা, ঈশ্বরকে এবং আমার ভাইকে [মানবজাতিকে] ভালবাসাই অর্থপূর্ণ আমার কাছে।

কুমারী থার্সবি পাইন গাছের তলায় সেই শেষ সকালটিতে উপস্থিত ছিলেন, মাঝে মাঝে তিনি বক্তৃতার অংশ-বিশেষ টুকরো টুকরোভাবে

লিখছিলেন, কিন্তু আমরা পড়তে পারি এমন কিছু লেখা নয়, কারণ স্পষ্টত তিনি শোনার মধ্যে এমন নিমগ্ন ছিলেন যে, তাঁর গুছিয়ে লেখার অবস্থা ছিল না। এক্ষেত্রে সাধারণত যা হয় তার থেকেও টুকরো টুকরো এবং পরস্পর সম্বন্ধহীন কথা তিনি লিখে রেখেছেন, সেগুলির পাঠ নিম্নোক্তরূপ :

আমি সৎস্বরূপ আনন্দস্বরূপ — *কুণ্ডলিনী*
আমিই সেই, শিবোঽহম্ — *বৃত্ত মাতা*
আমিই সেই, শিবোঽহম্ — *কালিদাস*
তিনিই জ্ঞানী ব্যক্তি যিনি দেখেন মানুষের অর্থসম্পদ কিছুই নয়, প্রত্যেক নারীই তাঁর জননী।
শান্তি—শান্তি—
[অপর পাতায়]
আমরা মহিমা ধ্যান করি — *কলকাতা থেকে ৫০০ মাইল দূরে*
হ্রীং
মা
রামমৃগী — *ভালবাসা*
বৌদ্ধ প্রার্থনা — *তত্ত্বসমূহ*
আমি পৃথিবীর সব ঋষিকে প্রণাম করি
আমি পৃথিবীর সকল ধর্মসংস্থাপকদের উদ্দেশে প্রণাম জানাই
সমস্ত নারী-পুরুষ সাধু সন্ত
ধর্ম-প্রবক্তাগণ — *যাঁরা পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন।*
হিন্দু প্রার্থনা.
আমি বিশ্ব-স্রষ্টার মহিমার বিষয়ে ধ্যান করি, তিনি আমাদের চিত্তকে আলোকিত করুন।[৪৪]

স্বামীজী সুস্পষ্ট আনন্দের সঙ্গে মেরী হেলকে লিখেছিলেন—"*আমি তাঁদের সকলকে শেখাচ্ছি 'শিবোঽহম্', 'শিবোঽহম্'।*" এই 'শিবোঽহম্', 'শিবোঽহম্', 'আমিই সেই শিব', 'আমিই সেই শিব'—এ-কথাগুলিই তাঁর গ্রীনএকার আসরে বলা শেষ কথা—আমেরিকায় এই তাঁর প্রথম ছোট দলকে নিয়ে শেখানো যা লিপিবদ্ধ আছে, এর আগে এ-ধরনের আসরে শিক্ষা দেওয়ার কাজ আর করেন নি।

এবারে তিনি যাচ্ছিলেন ম্যাসাচুসেট্‌সের অন্তর্গত প্লাইমাউথে। আগস্টের ৮ তারিখে তিনি শ্রীমতী হেলকে লিখেছিলেন উদারপন্থী খ্রীস্টান নেতৃবর্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ সভায় বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণের কথা। তাঁর চিঠিটা অংশত হলো ঃ

প্রিয় মা,

ভারত থেকে প্রেরিত যে চিঠিটা আপনি পাঠিয়েছেন সেটা পেয়েছি।

আমি সোমবার (আগস্টের ১৩ তারিখ)-এ প্লাইমাউথে যাচ্ছি, সেখানে মুক্ত-চিন্তক ধর্মীয় সঙ্ঘ তার অধিবেশন করছে।

অবশ্য তারা আমার খরচ বহন করবে। আমি ভাল আছি, সুস্বাস্থ্য উপভোগ করছি, আর এখানকার লোকেরা আমার সঙ্গে সহৃদয় এবং সুন্দর ব্যবহার করছে। এখন পর্যন্ত আমার কোন চেক ভাঙাবার প্রয়োজন হয়নি এবং সবকিছু ভালভাবে হয়ে যাচ্ছে। আমি বাচ্চাদের কোন চিঠি পাইনি, আশা করি তারা ভালই আছে।

আপনারও লেখবার কিছু ছিল না, আশা করি আপনি ভালই আছেন। আমি আর এক জায়গায় যেতাম কিন্তু শ্রী (টমাস ওয়েন্টওয়ার্থ) হিগিনসনের আমন্ত্রণ রাখতেই হবে। আর প্লাইমাউথ হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে আপনাদের জাতির পিতৃ-পুরুষেরা এসে এদেশের মাটিতে প্রথম পা রেখেছিলেন। সেজন্যও আমি জায়গাটি দেখতে চাই। আমি ভাল আছি। আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের প্রতি আমার ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা বারবার জানানোর কোন প্রয়োজন নেই, আপনারা সবকিছুই জানেন। ঈশ্বর তাঁর শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ আপনার ও আপনাদের পরিবারের সকলের উপর বর্ষণ করুন। এই সভাটি [প্লাইমাউথে অনুষ্ঠিত)] আপনাদের দেশের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকদের নিয়ে করা হচ্ছে। অন্য লোকেরাও থাকছেন, সুতরাং আমি সেখানে যাচ্ছি এবং তারপর তারা আমাকে কিছু দেবে...।

বাচ্চাদের এবং পিতা পোপকে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ ভালবাসা দেবেন এবং আমার চিরকৃতজ্ঞতা ও ভালবাসায় বিশ্বাস রাখবেন—

আপনার পুত্র
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ ঃ

বোনেরা আমার কিছু চাই কি না জানতে চেয়েছে, এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। যাই হোক, আমার কোন অভাব নেই—আমার যা কিছু দরকার সব এসে যায়, তার থেকেও বরং বেশিই এসে যায়।

"ঈশ্বর তাঁর সন্তানকে কখনও ত্যাগ করেন না"।

বোনেরা আমার কিছু চাই কি না জানতে চেয়ে আমাকে যে সহৃদয়তা দেখিয়েছে তার জন্য চির-কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।[৪৫]

সত্যিই স্বামীজী যা কিছু প্রয়োজন সবই পেয়েছিলেন, প্রয়োজনের চেয়েও বেশি পেয়েছিলেন। অযাচিতভাবে সাহায্য আসত, এবং অবাঞ্ছিতভাবেও। আগস্টের ১১ তারিখে তিনি হেলভগিনীদের লিখলেন—"*সকলেই খুব সহৃদয়। কেনিলওয়ার্থের মিসেস প্র্যাট নাম্নী এক শিকাগোবাসিনী মহিলা আমার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে পাঁচশত ডলার দিতে চান। আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। আমায় কিন্তু কথা দিতে হয়েছে যে, অর্থের প্রয়োজন হলেই তাঁকে জানাব। আশাকরি, ভগবান আমাকে তেমন অবস্থায় ফেলবেন না। একমাত্র তাঁর (ভগবানের) সহায়তাই আমার পক্ষে পর্যাপ্ত।*"[৪৬*]

স্বামীজী প্রয়োজনের অভাব ছাড়াও সাধারণত বিন্দুমাত্র বন্ধনের সম্ভাবনা থাকলে সাহায্য প্রত্যাখ্যান করতেন। মাকড়সার জালের মতো হালকা সুতোও তখন তাঁর কাছে মোটা দড়ি হয়ে দাঁড়াত। নিম্নলিখিত কাহিনীটি যা আগস্টের ১৪ তারিখে ট্রান্সক্রিপ্টে "সংক্ষিপ্ত মন্তব্য" শিরোনামায় প্রকাশিত হয়, সেটি হয়তো এই শ্রীমতী প্র্যাটের প্রস্তাবের সঙ্গে অথবা ঐ রকম অন্য কোন অনুরূপ দানের প্রস্তাব সম্পর্কিত—ঈশ্বরের এই সেবকের সেবা করার সদিচ্ছা-প্রসূত ছিল এই সকল প্রস্তাবগুলি। কিন্তু ব্যাপারটি অত সহজ ছিল না।

> *একজন উৎসাহী মহিলা এলিয়ট [গ্রীনএকারে] বিবেকানন্দের একটি বক্তৃতাকালে তাঁকে তাঁর নিজের জন্য ৫০০ ডলার এবং একটি বই ছাপানোর জন্য চাঁদার তালিকায় প্রথম দাতা হিসেবে আরও ১০০ ডলার দিতে চেয়েছিলেন। তিনি বইটি লিখবেন এই ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছিল, বইটিতে জাতীয়তাবাদী সংগঠনসমূহের বিরুদ্ধে তাঁর মত থাকবে অর্থাৎ বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের ব্যবস্থাপনায় বাহ্যিক শক্তি অপেক্ষা আধ্যাত্মিক শক্তিই শ্রেয় এরূপ মতের উপস্থাপনা থাকবে। বিবেকানন্দ সঙ্গে সঙ্গে বইটি লেখার প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন এই কথা বলে যে, তিনি কোন কাজের বন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ করতে পারেন না। তিনি অর্থের ব্যাপারে একেবারে উদাসীন—এটা এলিয়টে প্রত্যেকে অনুধাবন করেছে। এখন তিনি প্লাইমাউথে যাচ্ছেন একটি ভাষণ দিতে।*

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম সং, পত্র সংখ্যা ১০৮, পৃঃ ৩৬৮

গ্রীনএকারের কাজ সম্বন্ধে স্বামীজীর খুব উচ্চ ধারণা ছিল। তাঁর ভারতীয় কাজকর্মের জন্য অর্থভাণ্ডারে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন শ্রীমতী বুল। ১৮৯৫ সালে সেই শ্রীমতী বুলকে তিনি লেখেন—"*তবে আমার অকপট বিশ্বাস এই যে, এ বৎসর আপনার সমুদয় সাহায্য মিস ফার্মারের গ্রীনএকারের কার্যে দেওয়া উচিত। ভারত এখন অপেক্ষা করে বসে থাকতে পারে—শত শতাব্দী ধরে তো অপেক্ষা করছেই। আর হাতের কাছে করবার যে কাজটা রয়েছে, সেটার দিকে সর্বদাই আগে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।*"[৪৭]* গ্রীনএকারে শ্রীমতী ফার্মারের কাজের মধ্যে স্বামীজী দেখেছিলেন তারই একটি শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ—সে শিক্ষাটি হলো যে, ধর্মীয় বিকাশ কখনও মন্দ থেকে ভালর দিকে যায় না, বরঞ্চ ভাল থেকে অধিকতর ভালর দিকেই তার গতি। ১৮৯৫ সালে তিনি তাঁকে লেখেন ঃ

> *"বহু চিন্তা বর্তমানে অভিব্যক্ত হবার সুযোগের জন্য সংগ্রাম করছে, আমরা এর থেকে শিখি যে, ঊর্ধ্ব অভিমুখে গতিই হচ্ছে বিশ্বের নিয়ম, ধ্বংস অভিমুখে গতি নয়। আমাদের এ বিশ্ব ভালমন্দের সমাবেশ নয়, এটি ভাল, খুব ভাল, আরও ভালর সমাবেশ। গ্রহণ ছাড়া অন্য কোন কিছুতেই এ চিন্তাদর্শ থেমে পড়ে না। এটি আমাদের শেখায় যে, কোন অবস্থাই একেবারে হতাশাব্যঞ্জক নয় এবং সেজন্য এই ভাবটি প্রত্যেক রকম মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক চিন্তাকে—সে যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন, তাকে গ্রহণ করে এবং একটিও নিন্দা-সূচক বাক্য উচ্চারণ না করে প্রত্যেককে বলে এ পর্যন্ত ভাল কাজ করা হয়েছে, এখন সময় হয়েছে আরও ভাল কাজ করবার।...সর্বোপরি এ-চিন্তাদর্শ এ শিক্ষা দেয় যে, স্বর্গের রাজ্য এখানে পূর্ব হতেই আছে, যদি আমরা তাকে পেতে চাই পেতে পারি, মানুষের মধ্যে পূর্ব হতেই পূর্ণতা রয়েছে, তাকে শুধু সেটা উপলব্ধি করতে হবে।*
>
> *বিগত গ্রীষ্মকালে গ্রীনএকারের সভাগুলি অপূর্ব হয়েছিল। তার সোজা কারণ আপনারা আপনাদের মনকে সেই চিন্তার জন্য পরিপূর্ণরূপে উন্মুক্ত করে রেখেছিলেন, আর আপনাদের মধ্যে ঐ চিন্তা বিকাশলাভ করবার মতো মাধ্যমকে পেয়েছিল এবং আরও কারণ সকল চিন্তার মধ্যে সর্বোচ্চ যে শিক্ষা—স্বর্গরাজ্য পূর্ব হতেই রয়েছে—সেই বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে ছিলেন আপনারা।*

---

* বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ৭ম সং, পত্র সংখ্যা ১৬৬, পৃঃ ৮২

আপনারা ঈশ্বরের নিকট উৎসর্গিত, তাঁর দ্বারা তাঁর চিন্তা জীবনে প্রতিফলনের জন্য নির্বাচিত এবং প্রত্যেকে যারা আপনাদের কাজে সহায়তা করছে তারা ঈশ্বরেরই সেবা করছে।

আমাদের গীতা শিক্ষা দেয়—যারা ঈশ্বরের সেবকদের সেবা করে তারাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ পূজক। আপনি একজন ঈশ্বরের সেবক এবং আমি কৃষ্ণের একজন শিষ্য হিসাবে আপনার প্রেরণাদীপ্ত জীবন-ব্রত উদ্‌যাপনে কোনরকম সহায়তা করাকে—সে আমি যেখানেই থাকি না কেন—আমি আমার সৌভাগ্য বলে মনে করব এবং ঈশ্বরের পূজা করছি বলে মনে করব।"[৪৮]

যতই বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হতে লাগল, গ্রীনএকারের অনুষ্ঠানে যোগদানকারীর সংখ্যা বাড়তে লাগল এবং তার শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল, বহু নারী পুরুষ তাদের সময় এবং অর্থ-সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসায়। কাজটির পেছনে কোন বড় অনুদান ছিল না, কুমারী ফার্মার যে কথা বলেছেন—"এটি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের সহায়তার উপর নির্ভরশীল ছিল এবং সে সহায়তা আসেনি এমন কখনও হয় নি।" ১৮৯৯-এ প্রকাশিত প্রধানত সংবাদ পরিবেশনা-মূলক একটি প্রবন্ধ অনুসারে বহু খ্যাতনামা চিন্তানায়ক গ্রীষ্মকালে ওখানে বক্তৃতাদি দিতে আসতেন এবং তাদের সময় এবং প্রচেষ্টা নিয়োগ করতেন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে "কেন না এরকম পরিবেশ—বিরাটকায় লাইসেক্লস্টার পাইন বৃক্ষতলে—দলে দলে বিভক্ত এমন ভাল শ্রোতাদের সামনে তাঁরা ভাষণ দেবার সুযোগ পাচ্ছেন।" একই সংবাদ পরিবেশনায় আরও বলা হয়েছে যে "মেইনে অবস্থিত এই ছোট শহরে এতজন খ্যাতনামা ব্যক্তি আকৃষ্ট হচ্ছেন, তারা এই কাজটিতে আগ্রহ অনুভব করেছেন এবং ভিড় করে এসেছেন এখানে বিনা পারিশ্রমিকে সেই জিনিস দিতে যার জন্য অন্যত্র আগ্রহশীল ব্যক্তিরা তাঁদের পারিশ্রমিক দিতে প্রস্তুত ছিলেন—এ একটি অসাধারণ ব্যাপার।"[৪৯]

গ্রীনএকার ধর্ম-সম্মেলনের যখন খুব শ্রীবৃদ্ধির কাল তখন যাঁরা এর সম্বন্ধে লিখেছেন তাঁরা সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন যে স্থানটিতে এলে যে শান্তি লাভ হয়, মন ঊর্ধ্বগামী হয় তাতে মনে হয় এমন প্রশান্তির উৎস এখানে আছে যা অন্যত্র পাওয়া সম্ভব নয় এবং এখানে যারা বিশ্বাসের দ্বারা রোগ-নিরাময় করতে চান এবং যাঁরা দার্শনিক—এ উভয় দলকেই আকৃষ্ট করত। কিন্তু এই আকর্ষণের মধ্যেই কি আশ্চর্যের কিছু আছে?

এখানে শাখা-প্রশাখায় সম্প্রসারিত বিশাল লাইসেক্রস্টার পাইন গাছের তলায় এ-যুগের মহান ঈশ্বরের দূত ধ্যানমগ্ন হয়ে থেকেছেন এবং তাঁর উচ্চ ভাবাবস্থা থেকে কথাবার্তা বলেছেন—তাঁর এইকালীন উচ্চ ভাবাবস্থার তুলনা পাওয়া যায় সম্ভবত পরবর্তী গ্রীষ্মে তাঁর সহস্রদ্বীপোদ্যানে অবস্থানকালে। এ সত্য সত্যই কোন অসাধারণ ব্যাপার নয় যে, পরবর্তী বহু বৎসর ধরে শত শত ব্যক্তি "মেইনে অবস্থিত এই ছোট্ট শহরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছে।" গ্রীনএকারে স্বামীজীর প্রায় দু-সপ্তাহকাল অবস্থানকালে তিনি যে কেবলমাত্র জনা কুড়ি আন্তরিকভাবে সত্যের অনুসন্ধানপ্রয়াসী ব্যক্তিবর্গের অন্তর্লোক আলোকিত করেছিলেন তাই নয়, সেস্থান পরিত্যাগ করার কালে পশ্চাতে রেখে গিয়েছিলেন এক জমাটবাঁধা গভীর আধ্যাত্মিক পরিবেশ এবং যে কথা আমরা আগেই বলেছি হয়ত ঐ কয়েক সপ্তাহকালেই তিনি নিজে তাঁর আমেরিকা আসার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নতুন এক আলোক লাভ করেন।

॥ ৩ ॥

স্বামীজী গ্রীনএকার ছাড়লেন সোমবার ১৩ আগস্ট তারিখে ওখান থেকে ষাট-সত্তর মাইল দূরত্বে অবস্থিত ম্যাসাচুসেটসের প্লাইমাউথের উদ্দেশ্যে, সেখানে ঐদিন সন্ধ্যায়ই তাঁর ভাষণ দেবার কথা ছিল। ১১ আগস্ট তারিখে হেল ভগিনীদের নিকট লেখা তাঁর পত্রে, কর্নেল হিগিনসনের ব্যবস্থাপনায় 'বিভিন্ন ধর্মের সহমর্মিতা' শীর্ষক অধিবেশনের কথা বলা হয়েছিল।[৫৩] আসলে এটা ছিল মুক্তচিন্তক ধর্মীয় সংস্থার বাৎসরিক সম্মেলন। একটি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যে-কথা আগেই বলা হয়েছে, টমাস ওয়েন্টওয়ার্থ হিগিনসন ছিলেন নিউ ইংলণ্ডের ঐতিহ্যবাহী সেই সকল সুযোগ্য ব্যক্তিদের অন্যতম যাঁদের আনুগত্য ছিল এমার্সন এবং থিয়োডোর পার্কারের সমকালের প্রতি। তাঁর জীবনের প্রথমদিকে তিনি ছিলেন ম্যাসাচুসেট্সের বিভিন্ন ইউনিটেরিয়ান গীর্জার একজন গ্রাম্য ধর্মযাজক। পরবর্তী সময়ে দাস-প্রথা বর্জনের একজন উৎসাহী সমর্থক হওয়ায় তিনি গৃহযুদ্ধের সময় যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তিনি প্রথম নিগ্রো সৈন্যদল সংগঠন করেন এবং পরিচালনা করেন। কিন্তু ১৮৬৪ সালে হিগিনসন সৈন্যদল থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং খ্যাতি অর্জন করলেন একজন সামরিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে নয়, একজন লেখক হিসাবে, যিনি অন্যান্য কেম্ব্রিজের পণ্ডিতদের মতো অতীন্দ্রিয়তার দিকে ঝুঁকেছিলেন। তাঁর মনের ধর্মীয় প্রবণতা এবং অতীন্দ্রিয়তার দিকে ঝোঁকের বিষয় ধরলে বোঝা যায়

যে, তাঁর পক্ষে মুক্তচিন্তক ধর্মীয় সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়াটা ছিল অনিবার্য। অতীন্দ্রিয়বাদী আন্দোলনের ফলস্বরূপ এই সঙ্ঘ ছিল ১৮৬৭ সালে গঠিত ইউনিটেরিয়ান গীর্জার গোঁড়া নীতির প্রতিবাদস্বরূপ। এর নামের মধ্য দিয়ে এবং এর উৎপত্তি সম্বন্ধীয় কাহিনী থেকেও বোঝা যায় যে, মুক্তচিন্তক ধর্মীয় সংস্থা প্রতিনিধিত্ব করছিল "পরস্পর বিরোধী বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় সংস্থা-সমূহের কর্তৃত্ব হতে দূরে সরে যাওয়ার প্রবণতাকে—এটি মানবতার সমার্থক একটি বিশাল ঐক্য গড়ে তুলছিল সত্যকে জানবার জন্য সব ধর্মেই যে একটি সাধারণ আকৃতি দেখা যায়, দেখা যায় পবিত্র জীবন যাপনের জন্য, মঙ্গলবর্ষী জীবন যাপনের জন্য যে সাধারণ প্রয়াস, তারই ভিত্তিতে।"[৫১] যখন টমাস ওয়েন্টওয়ার্থ হিগিনসন, যিনি ১৮৭৮ সালে ফ্যামিংহ্যামের স্থলে সভাপতি নির্বাচিত হলেন, তাঁর 'ধর্মসমূহের মধ্যে সহমর্মিতা' বিষয়ে প্রবন্ধটি সংস্থার সামনে পাঠ করলেন, তখন তার বিষয়বস্তু ওই সংস্থার একটি নির্দেশক নীতিতে পরিণত হলো। হিগিনসন ঘোষণা করলেন, সব ধর্মের উৎপত্তি একইভাবে এবং সব ধর্মই প্রকৃতিতে একই রকম, সুতরাং খ্রীস্টধর্ম একমাত্র ধর্ম না হয়ে, হয়ে দাঁড়ায় বিশ্বজনীন ধর্মের একটি অধ্যায় মাত্র। "প্রত্যেককেই (ধর্মই) এককভাবে দেখলে একদেশদর্শী, সীমাবদ্ধ, সন্তোষজনক নয়, সব ধর্মকে একত্রিত করে ধরলে—সকল যুগের আসল ধর্মকে—যা স্বাভাবিক ধর্ম—তাকে পাওয়া যায়।"

এটিরই মতো এই সংস্থার বেশির ভাগ আদর্শ সময়ের অপেক্ষা অনেক অগ্রগামী ছিল অথবা অন্ততপক্ষে সমকালীন প্রধান চিন্তাস্রোতের সমপর্যায়ে ছিল না এবং এর স্বল্পসংখ্যক সদস্য তালিকায় তদানীন্তন কালের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের নাম ঔজ্জ্বল্য এনে দিয়েছিল। মধ্য-উনিশ শতকের একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে—"মুক্তচিন্তক ধর্মীয় সংস্থা, হর্টিকালচারাল সভাকক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহ এবং র‍্যাডিকাল ক্লাব [সবই বোস্টনের] সবই ছিল একই সত্তার অংশ। নেতৃবৃন্দ ছিলেন একই ব্যক্তিসমূহ, একই নারীপুরুষেরা এগুলির সদস্য ছিলেন। নিউ ইংল্যাণ্ডের বৌদ্ধিক জীবনের ইতিহাসে এটি ছিল একটি উজ্জ্বল যুগ এবং এর চেয়ে উজ্জ্বলতর কোন যুগ আর পাওয়া যায় না। এটির আগমন ঘটেছিল অতীন্দ্রিয়তাবাদের পূর্ণবিকাশের কালে এবং এটিই এই ইতিহাসকে একটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা যুগে পরিণত করবার মাধ্যম হয়েছিল—এই বৈজ্ঞানিক যুগ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ বৎসরগুলিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছিল।"[৫২] ১৮৯৪-এ সেই বিবর্তন প্রায় সম্পূর্ণতা

লাভ করেছিল। যদিও কর্নেল হিগিনসন তখনও তাঁর "বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সহমর্মিতা" বিষয়ে প্রবন্ধাদি পাঠ করে চলেছিলেন এবং উত্তম সাড়া পাচ্ছিলেন কিন্তু সংস্থার তরুণ সদস্যগণ—যথা ডঃ লুইস জি. জেনস যিনি ১৮৯৭-এর সংস্থার সভাপতি হবেন, অধ্যাপক ফেলিক্স এ্যাডলার যিনি (১৮৭৬-এ) নৈতিক সংস্কৃতি-চর্চা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, শ্রীযুক্ত এডউইন ডি. মীড, যিনি ছিলেন একজন সংস্কারক, সম্পাদক এবং বোস্টনের বিংশ শতাব্দী ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা—ক্রমে সংস্থার নেতৃত্ব গ্রহণ করছিলেন এবং ধর্মতত্ত্বীয় আলোচনার স্থান ক্রমশ গ্রহণ করছিল ব্যবহারিক আচরণের নীতিসমূহ এবং সমাজ-সংস্কারমূলক বিষয়সমূহ। ইতোমধ্যে ইউনিটেরিয়ান গীর্জা ধীরে ধীরে আরও উদারপন্থী হয়ে উঠছিল। ১৮৯৪ সালে সরকারিভাবে গোঁড়ামি পরিত্যাগ করল এবং এমন একটি অবস্থান গ্রহণ করল যা মূলত "মুক্ত ধর্মীয়"। এইভাবে মুক্তচিন্তক সংস্থার আদিতে যে উদ্দেশ্য ছিল তা কার্যত চরিতার্থ হয়েছিল, এটি আর সংস্কার আন্দোলনের পুরোভাগ দখল করে রইল না এবং যদিও এই সংস্থা টমাস ওয়েন্টওয়ার্থ হিগিনসনের মতো তারও চরমোৎকর্ষের কালকে পশ্চাতে ফেলে এসেছিল, তথাপি তাঁরই মতো এখনও পূর্ব অবস্থানে শৈলদৃঢ় ছিল এবং তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাও ছিল সাধারণের মনে।

আকস্মিকভাবে কিম্বা আরও যেটা সম্ভবত ঠিক পরিকল্পনা অনুযায়ীই এই সঙ্ঘের দু-দিনের অধিবেশন পড়েছিল ব্যবহারিক নীতিশাস্ত্র-শিক্ষা-সংসদের গ্রীষ্মকালীন সম্মেলনের সঙ্গে একই সঙ্গে—শেষোক্ত সম্মেলনটি আগস্টের প্রথম তিন সপ্তাহ ধরে প্লাইমাউথে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল এবং এইভাবে অন্ততপক্ষে কয়েকদিনের জন্য প্লাইমাউথ হয়ে দাঁড়িয়েছিল দুই প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ্‌দের মিলনক্ষেত্র। নিঃসন্দেহে অক্টেভিয়াস বি. ফ্রদিংহ্যাম, লুইস জি. জেন্‌স এবং ফ্রাঙ্কলিন বি. স্যানবর্ন—এঁরা সকলেই মুক্তচিন্তক ধর্মীয় সংস্থার সদস্য। এঁরা স্বামীজীর সঙ্গে গ্রীনএকার থেকে এসেছিলেন। ইতোপূর্বে প্লাইমাউথে এসেছিলেন কর্নেল হিগিনসন, শ্রীমতী এডনা চেনেই, সুবিখ্যাত বক্তা ও ঔপন্যাসিক, অধ্যাপক ফেলিক্স এ্যাডলার, নীতিশাস্ত্র বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ (ডীন); এবং আরও একদল প্রধান ও নবীন অধ্যাপক, পণ্ডিত, সংস্কারক, যাঁরা সকলেই তখনকার নৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক সমস্যাদির সমাধানের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন। এই সমাবেশেই আগস্টের ১৩ তারিখে সন্ধ্যায় স্বামীজী বক্তৃতা দেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি কি বলেছিলেন সে বিষয়ে আমাদের নিকট কোন বিশদ বিবরণ নেই, তবে সভার বিষয়ে একটি প্রতিবেদন ছাপা হয় বোস্টন ইভনিং ট্রান্‌সক্রিপ্ট পত্রিকায় আগস্টের ১৪ তারিখে ঃ

ধর্মবিষয়ে মুক্তচিন্তকেরা
মুক্তচিন্তা সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে
অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ একদল
শ্রোতা প্লাইমাউথে উপস্থিত ছিলেন।

প্লাইমাউথ, ম্যাসাচুসেট্‌স, আগস্ট ১৪—গত সন্ধ্যায় মুক্তচিন্তক ধর্মীয় সংস্থার সম্মেলন এখানে শুরু হয়। ডেভিস অপেরা হাউসে ভিড় হয়ে গিয়েছিল; শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, যাঁরা যোগদান করতে এসেছিলেন ব্যবহারিক নীতিশাস্ত্র বিদ্যালয়ের সম্মেলনে (যার অধিবেশন চলছিল এই সময়ে)। নিউ ইয়র্কের ফ্যালিক্স এ্যাডলার, যিনি ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনিই স্বাগত ভাষণ দেন, তাতে তিনি দুটি সংস্থার মধ্যে যে সাদৃশ্য সে বিষয়টি উল্লেখ করেন। কর্নেল টমাস হিগিনসন, যিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন, তিনি বলেন যে 'স্বাগত' কথাটি প্লাইমাউথের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত, যেহেতু এ-কথাগুলি বলে 'তীর্থযাত্রী পিতৃবর্গ'কে এখানকার আদি অধিবাসীরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে প্লাইমাউথের আদি ইতিহাসের কথা তিনি উল্লেখ করলেন। ভারতের স্বামী বিবেকানন্দ এরপর ভাষণ দিলেন এবং সহনশীলতা এবং ধর্মগুলির মধ্যে সহমর্মিতার পক্ষে আবেদন রাখলেন। আগামী কাল সন্ধ্যায় ইংল্যাণ্ডের অক্সফোর্ডের অধ্যাপক জে. এস্টলিন কার্পেন্টার এবং বোস্টনের শ্রীমতী এডনা (ডো) চেনেই ভাষণ দেবেন।

॥ ৪ ॥

প্লাইমাউথ পরিত্যাগ করে স্বামীজী পুনর্বার ফিসকিল ল্যাণ্ডিংয়ে তাঁর বন্ধু ডঃ এবং শ্রীমতী গার্নসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। এখানে মাত্র কয়েকদিন থাকেন এবং তারপর শ্রীমতী ব্যাগলির নিকট হতে পাকাপাকি আমন্ত্রণ পেয়ে বোস্টনের ট্রেন ধরলেন এবং সেখান থেকে এলেন অ্যানিস্কোয়ামে; এখানে শ্রীমতী ব্যাগলি অধ্যাপক অ্যালফিয়াস হায়াতের বাড়িটি ভাড়া নিয়েছিলেন। এর প্রায় এক বছর আগে স্বামীজী অ্যানিস্কোয়ামে অধ্যাপক জন হেনরী রাইটের অতিথি হয়ে এসেছিলেন এবং একটি আমেরিকান গীর্জায় তাঁর প্রথম বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন। সে সময় তিনি ছিলেন অপরিচিত, তাঁর সঙ্গে কোন পরিচয়পত্র ছিল না এবং অর্থও ছিল না, সত্যসত্যই

কয়েকজন সদ্য পরিচিত বান্ধব এবং দু-একটি গেরুয়া কাপড় ছাড়া তাঁর আর কিছুই সম্বল ছিল না। সে সময় তিনি লিখেছিলেন, "*আমিও যে-কোন কাষ্ঠখণ্ড সম্মুখে পাই, তাই ধরে ভাসতে চেষ্টা করছি...।*"[৫৩*] কিন্তু এখন তিনি খ্যাতি লাভ করেছেন, সহস্র সহস্র লোক এখন তাঁকে হিন্দুধর্মের একজন মহান ব্যাখ্যাতারূপে জানে এবং একজন ঈশ্বরের বার্তাবহরূপে অসংখ্য ব্যক্তি তাঁর অনুগত এবং এখন তাঁর প্রভাবশালী বন্ধুকুল বর্তমান। এর সঙ্গে সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করে ঠিক যখন তিনি অ্যানিস্কোয়ামে রয়েছেন তখন-ই মাদ্রাজে তাঁর সাফল্যের জন্য যে অভিনন্দন-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার বিবরণ আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হলো—এই সভার ভাষণগুলির অনুলিপিটি যে সরকারি পরিচিতি লাভের জন্য তিনি আগ্রহী হয়েছিলেন, তারই কাজ করল।

সময়ের পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু ইংরেজী ভাষায় ভাষণ দানে তাঁর আরও দক্ষতা এসেছে, আমেরিকার জনজীবন সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান অর্জিত হয়েছে এবং সর্বোপরি অধিকতব আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটেছে—এই কয়েকটি-মাত্র বিষয় ছাড়া স্বামীজী আর কোনরকমে পরিবর্তিত হন নি। শ্রীমতী ব্যাগলি তাঁর সম্বন্ধে যে-কথা লিখেছেন, তিনি এখনও সেই "দৃঢ়চরিত্র, মহৎ-হৃদয় মানুষটিই আছেন, যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে হাঁটেন... এবং শিশুর মতো সারল্য এবং বিশ্বাসে ভরপুর।"[৫৪] তিনি এখনও এবং চিরকালই পবিত্রতাস্বরূপ, যাকে সমালোচনার ঘূর্ণাবর্তে ফেলে অথবা উষ্ণ-অনুরাগমণ্ডিত প্রশংসার দ্বারা কোনরকমে এই জগৎ সংসার কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে না—এবং এ উভয় বস্তুরই সিংহভাগ তিনি পেয়েছিলেন।

আগস্টের ১৭ তারিখের কাছাকাছি কোন সময়ে স্বামীজী অ্যানিস্কোয়ামে পৌঁছন এবং সেখানে (খুব শীঘ্র হলে) ৫ সেপ্টেম্বর অবধি ছিলেন। আগস্টের ৩১ তারিখে তিনি মেরী হেলকে লিখেছিলেন—"*অন্তত আগামী মঙ্গলবার (অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের ৪ তারিখ) পর্যন্ত এখানে আছি, ঐদিন এখানে বক্তৃতা দেব।*"[৫৫**] তাঁর এবারের এই আগমন সম্বন্ধে শ্রীমতী ব্যাগলি লিখেছেন—"গত গ্রীষ্মকালে অ্যানিস্কোয়ামে আমি একটা ছোট বাড়ি পেয়েছিলাম, বিবেকানন্দ তখন বোস্টনে ছিলেন, তাঁকে সেকথা লিখেছিলাম,

---

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম সং, পত্রসংখ্যা ৬৮, পৃঃ ২৯০

** ঐ ৭ম সং, পত্রসংখ্যা ১১০, পৃঃ ৩৭১

এখানে এলে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য আমন্ত্রণও জানিয়েছিলাম এবং তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন, আমাদের সঙ্গে এসে তিন সপ্তাহকাল তিনি কাটিয়েছিলেন, শুধু আমাদের প্রতিই যে অনুগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন তাই নয়, আশপাশের বাড়ির অধিবাসিবৃন্দকেও প্রভূত আনন্দ দান করেছিলেন।"[৫৬]

অ্যানিস্কোয়ামের মতো (যার অধিক পরিচিতি 'স্কোয়াম' নামে) একটি সমুদ্র তীরবর্তী ছোট্ট অনাড়ম্বর গ্রামে স্বামীজী রাইট এবং ব্যাগলি পরিবারদের জানতেন, সেখানে তিনি নিশ্চয়ই আশপাশের অন্য পরিবারদের সঙ্গেও পরিচিত হন এবং সেখানে নিশ্চিন্ত উদ্বেগহীন গ্রীষ্মের ছুটি কাটানোর জন্য তাদের সঙ্গে যোগদান করেন। পরবর্তী সময়ে এই গৃহেরই অপর একজন সঙ্গী-অতিথি ভগিনী নিবেদিতাকে লেখেন, "এটা ছিল তাঁর ছুটির সময়", এবং এই একই চিঠিতে তিনি আরও লেখেন—এ-কথাগুলি স্বামীজীর জীবনীতে উদ্ধৃত করা হয়েছে—যে, স্বামীজী তাঁর মুখে হাসির গল্প, যার রীতিমত একটি ভাণ্ডার ছিলেন তিনি, শুনতে ভালবাসতেন। তিনি লিখছেন—"আমার স্মরণে আছে তিনি একটি চীনদেশীয় ব্যক্তির গল্প শুনে খুব আমোদ পেতেন, চীনাটি শূকরমাংস চুরি করার অপরাধে গ্রেপ্তার হয় এবং বিচারক চীনারা শূকরমাংস খায় না বলে জানতেন—এই মর্মে মন্তব্য করলে চীনাটি বলতে থাকেন 'মি মেলিকান [আমি আমেরিকান], আমি মহাশয়, শূকরমাংস খাব, চুরি করেও খাব, আমি সব খাব'। আমি বারবার শুনেছি বিবেকানন্দ মজা করে স্বগতোক্তি করছেন—'মি মেলিকান'।"[৫৭] স্বামীজী বহুবার এটি উচ্চারণ করতেন মৃদুস্বরে। একদিন সন্ধ্যায় যখন স্বামীজী সমুদ্র তীরবর্তী ক্লাম নামক সামুদ্রিক চিংড়ি মাছ খাবার ভোজে যোগদান করেছিলেন, যখন একবার নৌকাচালনা করবার সময় নৌকা উল্টে তিনি সমুদ্রে পড়ে গেলে তাঁকে জল থেকে উদ্ধার করে আনা হয় (এটা ছিল তাঁর আবর্তহীন গলদা চিংড়ির গর্তে পড়ে যাওয়া) এবং যখন দীর্ঘ গ্রীষ্মকালীন অপরাহ্ণে তাঁর ছবি আঁকাবার জন্য বসে থাকতেন, তখনই তাঁকে মৃদুস্বরে বলতে শোনা গিয়েছে 'মি মেলিকান'। সমুদ্র তীরবর্তী এই ভোজ উৎসব একটি মেলিকান প্রথা। আমরা যতদূর জানি এটির আয়োজন করেছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত প্রাণিতত্ত্ববিদ অধ্যাপক আলফিয়াস হায়াৎ-এর পরিবার এবং এটির আয়োজন করা হয়েছিল ১৮৯৪-এর আগস্ট মাসে। এই অধ্যাপকের সঙ্গে স্বামীজীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল আগের বছর। এই ঘটনাটির বিষয়ে অধ্যাপক হায়াতের কন্যা সুবিখ্যাত ভাস্কর আনা ভন হায়াৎ (শ্রীমতী আর্চার এম. হান্টিংটন),

আমি এ সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিকথা জানতে চাইলে, উত্তরে লেখেন— "তিনি (স্বামীজী) এসেছিলেন একটি আদিম ধরনের সমুদ্র তীরবর্তী ভোজ উৎসবে, যেটির আয়োজন আমরা করেছিলাম এবং আমরা তাঁকে দেখিয়ে দিয়েছিলাম কি করে খোলা ভেঙ্গে সামুদ্রিক মাছটিকে আঙ্গুল দিয়ে বের করে গরম গরম খেতে হয়। এখন আমার যতদূর মনে আছে দেখা গেল স্বামীজী এ-ব্যাপারে একজন দক্ষ শিকারী এবং রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার পটভূমিকায় তাঁকে একটি বর্ণময় ব্যক্তি বলে মনে হচ্ছিল। এর ঠিক আগের কিংবা পরের দিন নৌকা চালনাকালে তিনি সমুদ্রে পড়ে গিয়েছিলেন। আমাদের পরিবারের একজন তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন। আমার যতদূর মনে আছে তিনি খুব বলিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন।" +

স্পষ্টত ১৮৯৪-এর গ্রীষ্মকালে স্বামীজী বহুবার নৌকা চড়ে বেড়িয়েছেন। ভারতে লিখিত এক চিঠিতে তিনি নিউ ইংল্যাণ্ডের অধিবাসীদের নৌকাবিহারের প্রতি আসক্তির কথা উল্লেখ করেন। *"এদেশে গরমির দিনে সকলে দরিয়ার কিনারায় যায়—আমিও গিয়েছিলাম, অবশ্য পরের স্কন্ধে। এদের নৌকো আর জাহাজ চালাবার বড়ই বাতিক! ইয়াট বলে ছোট ছোট জাহাজ ছেলে বুড়ো যার পয়সা আছে, তারই একটা আছে। তাইতে পাল তুলে দরিয়ায় আর ঘরে আসে, খায় দায়—নাচে কোঁদে—গান বাজনা তো দিবারাত্র। পিয়ানোর জ্বালায় ঘরে তিষ্ঠোবার জো নেই।"* [৫৮] * নিউ ইংল্যাণ্ডের একটি গ্রীষ্মকালীন ছুটি কাটানোর জন্য নির্দিষ্ট একটি শহরের এই বর্ণনা একেবারে সঠিক। কিন্তু আনন্দোজ্জ্বল ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্বই দশকের অহোরাত্র পিয়ানো বাজানোর শব্দ এক একসময় অসহ্য মনে হলেও স্বামীজী স্পষ্টত সমুদ্র জলতলে নিজেকে ডুবিয়ে রাখাটাকে কিছু অন্যায় বলে মনে করেননি। তিনি হেল পরিবার থেকে তাঁর ওখানে থাকার সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন অনুসন্ধানের উত্তরেও বিষয়টির উল্লেখ করেন। মেরী হেলকে তিনি লেখেন— *"আমার এখানে অনেক আলখাল্লা আছে, আমি সহজে যা বইতে পারি, তার চেয়েও অতিরিক্ত আছে। আমি যখন অ্যানিস্কোয়ামে সমুদ্রে ডুবে থাকি, আমি সেই সুন্দর কালো পোশাকটা পরি, যেটাকে তুমি খুব ভাল বলেছিলে, আমার মনে হয় না এতে এটার কোন ক্ষতি হতে পারে; পরমাত্মার গভীর ধ্যানের দ্বারা এটি অনুস্যূত...মাকে বলে দিও আমার এখন কোন কোটের প্রয়োজন নেই।"* [৫৯]

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, পত্রসংখ্যা ১১৬, পৃঃ ৬-১১৬

স্বামীজীর অ্যানিস্কোয়ামে থাকা সম্বন্ধে আমরা তাঁর একটি ইতঃপূর্বে অপ্রকাশিত চিঠির মাধ্যমে অনেক কথা জানতে পারি, চিঠিটা তিনি লিখেছিলেন ইসাবেল ম্যাক্‌কিণ্ডলিকে আগস্টের ২০ তারিখে—

প্রিয় ভগিনী,

তোমার অত্যন্ত সহৃদয় লিপিখানি অ্যানিস্কোয়ামে আমার কাছে যথাসময়ে এসে পৌঁছেছে। আমি আবার শ্রীমতী ব্যাগলিদের সঙ্গে আছি। তাঁরা যেমন বরাবর তেমনি এখনও খুব সহৃদয়। অধ্যাপক রাইট এখানে ছিলেন না। কিন্তু তিনি পরশুদিন এসে পৌঁছেছেন এবং আমরা দুজনে একসঙ্গে খুব সুন্দর সময় কাটালাম। ইভানস্টনের শ্রীযুক্ত ব্রাড্‌লি যাঁর সঙ্গে তুমি ইভানস্টনে পরিচিত হয়েছিল, তিনি এখানে এসেছিলেন। তাঁর শ্যালিকা আমাকে কয়েকদিন ধরে বসিয়ে ছবি আঁকলেন। আমি খুব সুন্দর নৌকাবিহার করলাম। একদিন সন্ধ্যায় নৌকো গেল উল্টে, কাপড়চোপড় ইত্যাদি খুব ভিজে গেল।

গ্রীনএকারেও আমার খুব সুন্দর সময় কেটেছিল। ওখানে সকলেই ছিল খুব আন্তরিক এবং সহৃদয়। ফ্যানী হার্টলি এবং শ্রীমতী মিলস এতদিনে সম্ভবত বাড়ি ফিরে গিয়েছেন।

এখান থেকে মনে হচ্ছে যেন নিউ ইয়র্কে ফিরব। অথবা বোস্টনে শ্রীমতী ওলি বুলের নিকট যেতে পারি। হয়তো তুমি এ দেশের খ্যাতনামা বেহালাবাদক শ্রীযুক্ত ওলি বুলের নাম শুনে থাকবে। ইনি তাঁরই বিধবা পত্নী। ইনি একজন আধ্যাত্মিক-ভাবাপন্ন মহিলা। ইনি থাকেন কেম্ব্রিজে, এঁর একটি চমৎকার বৈঠকখানা ঘব আছে, ঘরটি সুন্দর, ভারত থেকে আনা কারুকার্যকরা কাঠ দিয়ে তৈরি। উনি চাইছেন আমি ওখানে কোন সময় এসে ঐ ঘরটিকে বক্তৃতাদানের জন্য যেন ব্যবহার করি। বোস্টন অবশ্য সব বিষয়েই বিরাট ক্ষেত্র কিন্তু বোস্টনের অধিবাসীরা যত তাড়াতাড়ি কোন কিছু গ্রহণ করে, ঠিত তত তাড়াতাড়ি বর্জন করে। ওদিকে নিউ ইয়র্কের অধিবাসিগণ গ্রহণ করে অত্যন্ত শ্লথগতিতে কিন্তু যখন কোন কিছু গ্রহণ করে তাকে একেবারে মরণ কামড়ের মতো আঁকড়ে থাকে।

এ সময় আমার স্বাস্থ্য খুবই ভাল থেকেছে, আশা করছি ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। আমার হাতে যা অর্থ জমা আছে তা খরচ করতে হয় নি, অথচ আমার খুব ভালভাবেই চলে যাচ্ছে। আর অর্থ উপার্জনের

সমস্ত পরিকল্পনা আমি পরিত্যাগ করেছি এবং এক কামড় রুটি ও মাথার ওপর একটি আচ্ছাদন পেলেই আমি খুব খুশি হয়ে কাজ করে যাব।

আশা করি তোমরা তোমাদের গ্রীষ্মাবাসে খুব উপভোগ করছ সময়টা। দয়া করে কুমারী হাউ এবং শ্রীযুক্ত ফ্রাঙ্ক হাউকেও আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানাবে।

হয়ত এর আগের চিঠিটাতে আমি তোমাকে বলিনি আমি কিভাবে বৃক্ষতলে ঘুমিয়েছি, বাস করেছি এবং শিক্ষা দিয়েছি এবং অন্ততপক্ষে কয়েকদিনের জন্য আমি আর একবার স্বর্গের পরিবেশে বাস করেছি।

খুব সম্ভবত আমি নিউ ইয়র্ককে আমার পরবর্তী শীতকালীন কর্মকেন্দ্র করব—এবং সেটা যেই স্থির করব সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে লিখে জানাব। এদেশে আরও থেকে যাওয়া সম্বন্ধে আমি এখনও মন স্থির করে উঠতে পারিনি। আমি কোন বিষয় চট করে মন স্থির করে উঠতে পারি না, আমি কালের অপেক্ষা করি। ঈশ্বর তোমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন—এই হলো তোমাদের সতত স্নেহময় ভ্রাতার একান্ত প্রার্থনা—

বিবেকানন্দ[৬০]

স্বামীজী অ্যানিস্কোয়ামে থাকা কালে এক গোছা চিঠিপত্র পান, যেগুলি শ্রীমতী হেলের ঠিকানায় পাঠানো হয়, তিনি আবার সেগুলি এখানকার ঠিকানায় পাঠান। আগস্টের ২০ তারিখে তিনি তাঁকে লেখেন—"*আমি একটি ভারি এবং বড়সড় চিঠির প্যাকেট পেয়েছি, এতগুলো চিঠি পড়তে পড়তে মাথা ঘুরে যাচ্ছে—সেইজন্য তাড়াতাড়ি যা হয় আঁকাবাঁকা অক্ষরে এই চিঠি লিখছি।*" এর মধ্যে কিছু চিঠিপত্র এসেছিল ভারত থেকে। শ্রীমতী হেলকে তিনি ব্যাখ্যা করে (তিনি নিশ্চয়ই জানতে চেয়েছিলেন) লেখেন—"*'শ্রী' শব্দটির অর্থ সৌভাগ্যবান, ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য ইত্যাদি। 'পরমহংস' কথাটির দ্বারা বোঝায় একজন এমন সন্ন্যাসী যিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন অর্থাৎ ঈশ্বর লাভ করেছেন। আমি সেই অর্থে পুণ্যবান নই, আমি সিদ্ধিলাভ করিনি, এরা আমার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করছে—এই মাত্র।*"[৬১] এর মধ্যে খেতড়ীর মহারাজের একটি চিঠি ছিল, চিঠিটির তারিখ ছিল ৮ জুন, আর একটি ছিল আলাসিঙ্গার, সে লিখেছিল যে, অমিতব্যয়ী নরসিম্হার দেশে ফিরে যাবার জন্য টাকা শিগ্‌গিরই পৌঁছে যাবে; আর একটি চিঠি মনে হয় এই সংবাদ বহন করে এনেছিল (শ্রীমতী হেলকে যে খবরটি তিনি পুনঃপ্রেরণ

করেছিলেন) যে "খ্রীস্টধর্ম প্রচারকরা ভারতে ব্রিটিশ সরকারের নিকট আমাকে একজন অসন্তুষ্ট ব্যক্তি হিসাবে তুলে ধরতে চাইছে এবং বাংলা দেশের ছোটলাট তাঁর একটি সাম্প্রতিক ভাষণে এ-বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন যে, হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন সরকার-বিরোধী ব্যাপার। ঈশ্বর এই খ্রীস্টধর্ম প্রচারকদের আশীর্বাদ করুন। প্রেম ও (ধর্মেরও?) ক্ষেত্রে সবকিছুই ন্যায়-সঙ্গত।"[৬২]

(এ ধরনের অভিযোগ সম্বন্ধে স্বামীজী দু-একমাস পরে আলাসিঙ্গাকে লিখলেন— *"কলকাতাতে আমার বক্তৃতা এবং উক্তিসমূহের যে সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তাতে আমি একটা জিনিস দেখতে পাই। তার মধ্যে কতকগুলি এমনভাবে ছাপা হয়েছে যে, সেগুলির মধ্যে রাজনীতির গন্ধ পাওয়া যায়, অথচ আমি একজন রাজনীতিবিদ বা রাজনৈতিক আন্দোলনকারী নই। আমি একমাত্র আত্মতত্ত্ব বিষয়ে আগ্রহী—যতক্ষণ সেটি ঠিক আছে ততক্ষণ এর দ্বারাই আর যা কিছু তা ঠিক হয়ে আসবে... সুতরাং তোমরা কলকাতার লোকদের সাবধান করে দেবে যে, মিথ্যা করে আমার কোন উক্তি বা লেখার ওপর যেন কোন রাজনৈতিক তাৎপর্য আরোপ না করা হয়। কি বোকামি দেখেছ... আমি কয়েকটি কড়া কথা বলেছি ঠিকই, সেগুলি সাধারণভাবে খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদের দ্বারা গঠিত সরকার সম্বন্ধে খুবই ন্যায্য সমালোচনা, তার অর্থ এই নয় যে, আমি রাজনীতির পরোয়া করি বা ঐরকম কোনকিছুর সংস্রবে আছি। যারা মনে করে যে, ঐ ভাষণগুলি থেকে কতকগুলি কথা উদ্ধৃত করে প্রমাণ করতে পারবে যে, আমি একজন রাজনৈতিক প্রচারক, তাদের আমি বলি 'ঈশ্বর আমাকে এই প্রকার বন্ধুবর্গের হাত থেকে সতত রক্ষা করুন"।)*[৬৩]

এতসব চিঠিপত্র ভারত থেকে এলেও, এখনও পর্যন্ত এমন কিছু আসেনি যার থেকে স্বামীজী জানতে পারেন যে, মাদ্রাজের সভাটি সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তাঁর কাজকর্মের এই সরকারি স্বীকৃতির খবর আমেরিকায় এসে পৌঁছে গিয়েছে। স্বভাবতই তিনি খুবই উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, তথাপি আমরা পূর্বেও যা দেখেছি, এই সময়েই (আগস্টের ২৩ তারিখে) তিনি গীর্জা মাতাকে তাঁর নিজের যত্ন নেবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অগ্নিময় বিদ্রোহের কথা লেখেন *"যে-সকল শত শত বন্ধন আমি নিজের ওপর আরোপ করেছি, সেজন্য আমার আত্মা আর্তনাদ করছে। কার ভারত? কে গ্রাহ্য করে...একমাত্র তিনি আছেন...তিনি আমার মধ্যে আছেন, আমি তাঁর মধ্যে*

আছি। আমি বিশাল আলোর সমুদ্রে একটুকরো কাঁচের মতো। আমি নই। আমি নই। তিনি আছেন। তিনি আছেন।” [৬৪]

পরের দিন স্বামীজীকে আমরা দেখতে পাই অ্যান অন্তরীপের দক্ষিণদিকে সমুদ্র তীরবর্তী অপূর্ব সুন্দর বিশ্রামের জন্য নির্বাচিত গ্রাম ম্যাগনোলিয়াতে বক্তৃতা দিতে। এখানে ধনী ব্যক্তিরা এসে ওঠেন বিশাল বিশাল কাঠের তৈরি দীর্ঘ বারান্দাসহ হোটেলগুলিতে যেখানে উন্মুক্ত বারান্দাগুলি হতে সমুদ্র দর্শন হয়। আগস্টের ২৫ তারিখে 'কেপ অ্যান ব্রীজ' শীর্ষক পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয় ঃ

> *গত সন্ধ্যায় গ্রন্থাগার-কক্ষে, সুপণ্ডিত এবং বাগ্মী হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ একটি বড়সড় কেতাদুরস্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে বক্তৃতা দেন। তাঁর বিষয় ছিল 'ভারতের জনজীবন'।*

এছাড়া আমরা আর যা কিছু স্বামীজীর এই ম্যাগনোলিয়াতে পার্শ্ব-ভ্রমণ সম্বন্ধে এখন জানি, তা জানতে পারি অ্যানিস্কোয়ামে ফিরে এসে তাঁর শ্রীমতী হেলকে লেখা একটি দীর্ঘ চিঠি হতে। (তিনি মন্তব্য করেন যে, তিনি এটি লেখেন একটি নতুন ঝরনা-কলম দিয়ে। এ-কলমটি নিউ ইয়র্ক থেকে কোন অজ্ঞাত-পরিচয় বন্ধু তাঁকে পাঠিয়েছিলেন এবং “এটি খুব মসৃণভাবে এবং খুব সুন্দরভাবে কাজ করছে, যা লেখা দেখেই আপনি বুঝতে পারবেন।”) এই চিঠিটির মাধ্যমে স্বামীজী এই সময় কিরূপ মানসিক অবস্থায় ছিলেন, তারও একটি পরিচয় পাওয়া যায়, ডাকঘরের ছাপে দেখা যায় এটি ছাড়া হয়েছিল আগস্টের ২৮ তারিখে এবং এটির আংশিক বয়ান নিম্নোক্তরূপ ঃ

> *প্রিয় মা,*
>
> *আমি তিনদিনের জন্য ম্যাগনোলিয়ায় গিয়েছিলাম। আমেরিকার এই অংশের সবচেয়ে কেতাদুরস্ত এবং সবচেয়ে সুন্দর সমুদ্র তটবর্তী বেড়াবার জায়গা হলো এই ম্যাগনোলিয়া। আমার মনে হয় অ্যানিস্কোয়ামের থেকেও এখানকার দৃশ্য বেশি সুন্দর। এখানকার ছোট ছোট পাহাড়গুলি যেন আরও সুন্দর এবং অরণ্য যেন নেমে চলে গিয়েছে জলের কিনারা অবধি। এ অরণ্যটি হলো সুন্দর সুন্দর পাইনগাছের। শিকাগোর এক মহিলা এবং তাঁর কন্যা শ্রীমতী স্মিথ এবং শ্রীমতী সয়্যার হচ্ছেন সেই সব বন্ধু যাঁরা আমাকে ওখানে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাঁরা আমার একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছিলেন, যার জন্য আমি ৪৩ ডলার পেয়েছি। আমি অনেক*

ভাল ভাল মানুষের সাক্ষাৎ পেলাম। কনিষ্ঠ শ্রীমতী স্মিথ বললেন তিনি হ্যারিয়েটকে চেনেন এবং জ্যেষ্ঠ শ্রীমতী স্মিথ বলেন তিনি আপনাকে ভালভাবে চেনেন।

বোস্টনে সেদিন আমার একজন ইউনিটেরিয়ান গীর্জার যাজকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল যিনি বললেন যে, তিনি শিকাগোতে আপনাদের পাশের বাড়িতেই থাকেন। দুর্ভাগ্যবশত আমি তাঁর নাম ভুলে গিয়েছি। শ্রীমতী স্মিথ চমৎকার মহিলা এবং আমার সঙ্গে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করলেন। [চিঠির এই পৃষ্ঠার তলায় সম্ভবত শ্রীমতী হেলের হাতে লেখা ছিল "ইনি শ্রীমতী পার্সী স্মিথের কথা বলছেন।"] শ্রীমতী ব্যাগলি আমার প্রতি যেমন সদাসর্বদা সদয় এখনও খুবই সদয় এবং আমার মনে হচ্ছে এখানে আমাকে আরও কয়েকদিন থাকতে হবে। অধ্যাপক রাইট এবং আমি দুজনে খুব ভাল সময় কাটাচ্ছি। ইভানস্টনের অধ্যাপক ব্রাডলি নিজের বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। আপনার সঙ্গে যদি ইভানস্টনে তাঁর কখনও দেখা হয় তাঁকে আমার শ্রেষ্ঠ ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা জানাবেন। তিনি সত্য সত্যই একজন আধ্যাত্মিক মানুষ...।

...ম্যাগনোলিয়া স্থানটি স্নানের পক্ষে খুবই ভাল এবং আমি দুবার সমুদ্রে স্নান করেছি। একটি বিরাট নরনারীর মিছিল ওখানে প্রত্যেক দিনই স্নান করতে যায় অবশ্য বেশিরভাগ পুরুষেরাই যায় এবং আশ্চর্যের কথা মেয়েরা স্নানের সময়ও তাদের লৌহজালিক বর্ম-সদৃশ কোটটি খোলে না। এইভাবে এই সকল বর্ম-পরিহিত নারী সৈন্যদল আমেরিকাতে পুরুষের ওপর প্রাধান্য পেয়েছে।

আমাদের সংস্কৃত ভাষার কবিরা নারীর কোমল শরীর সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে গিয়ে একেবারে সমস্তটুকু প্রকাশক্ষমতা উজাড় করে দিয়েছেন, নারীর সংস্কৃত প্রতিশব্দ হলো "কোমলা" অর্থাৎ কোমল শরীর যার। কিন্তু এই বর্ম-পরিহিতা আমেরিকার নারীগণকে আমার মনে হয় অ্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে—শক্ত হাড়ের বর্মের মতো খোলাবৃত সেই জন্তু যা আমেরিকার গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে রাত্রিকালে দেখা যায়—'armadilla'। আপনারা জানেন না একজন বিদেশী, যে কখনও ওই ধরনের বর্ম-পরিহিতা কাউকে দেখেনি তার চোখে ব্যাপারটি কি হাস্যকর। শিব, শিব...।

[স্পষ্টত শ্রীমতী হেল কিন্তু তখনকার দিনের বিরাট স্নানের পোশাকটির মধ্যে আশ্চর্যের কিছুই দেখেন নি। পরে স্বামীজীকে ব্যাখ্যা করে বলতে

হয়েছিল—"আমি সমুদ্রতীরে স্নানের জায়গাগুলিতে অশোভন কোন কিছু দেখিনি, শুধু অসার গর্ব কারো কারো মধ্যে দেখেছি। যারা সমুদ্রের জলে শক্ত বর্মের মতো অন্তর্বাস পরে নেমেছে তাদের কথা বলা হয়েছে—এই মাত্র।]"[৬৫]

...আমি ভারতে লিখেছি যে আমাকে যেন অনবরত চিঠি দিয়ে বিরক্ত করা না হয়। কেন, আমি যখন ভারতে পরিভ্রমণ করেছি, তখন তো কেউ আমাকে চিঠি লেখেনি। কেন তারা তাদের কিছু প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপচে পড়া শক্তি আমেরিকাতে আমাকে চিঠি লিখে ক্ষয় করবে? আমার সমস্ত জীবন হচ্ছে পরিব্রাজকের—সে এখানেই হোক, সেখানেই হোক, কিম্বা অন্য কোথাও হোক। আমার কিন্তু তাড়া নেই। আমার মাথায় সন্ন্যাসীর পক্ষে অনুপযুক্ত একটি বোকার মতো পরিকল্পনা ছিল [ভারতীয় কাজের জন্য আমেরিকায় অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনা]—সেটি আমি এখন পরিত্যাগ করেছি এবং এখন জীবনকে সহজভাবে নিতে শিখেছি। কোন অশোভন ত্বরা নয়, আপনি বুঝতে পারছেন তো মা গীর্জা, আপনাকে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, আমি এমন কি উত্তর মেরুতে গিয়েও স্থির হয়ে বসে থাকতে পারি না, আমাকে ঘুরে বেড়াতেই হবে, কারণ সেটাই আমার ব্রত, আমার ধর্ম। সুতরাং ভারতেই হোক আর উত্তর মেরু বা দক্ষিণ মেরুই হোক—যেখানেই যাই না কেন কিছু আসে যায় না। গত দু-বছর ধরে আমি এমন সব জাতিদের মধ্যে ভ্রমণ করেছি, যাদের ভাষা পর্যন্ত আমি বলতে পারি না। "আমার মাতা নেই, পিতা নেই, ভ্রাতা নেই, ভগিনী নেই, বন্ধু নেই, শত্রু নেই, গৃহ নেই, দেশ নেই—আমি অনন্তের পথের অভিযাত্রী—আর কারো সহায়তা খুঁজি না। আর কারো সাহায্য নয়, একমাত্র ঈশ্বরের সাহায্য ছাড়া।"[৬৬]

আগস্টের ৩১ তারিখে আগের দিনের বোস্টন ইভনিং ট্রানস্ক্রিপ্ট পত্রিকাটি অ্যানিস্কোয়ামে পৌঁছেছিল এবং এর গুরুগম্ভীর এবং গুরুত্বপূর্ণ পাতাগুলিতে স্বামীজী প্রথম পড়লেন মাদ্রাজের সভার খবর। কয়েকদিন পরে ভারত থেকে কয়েক বাণ্ডিল প্রতিবেদন এসে পৌঁছয়, পাঠিয়েছেন আলাসিঙ্গা, সেগুলিকে অ্যানিস্কোয়ামের ঠিকানায় প্রেরণ করেছেন শ্রীমতী হেল। এইভাবে গ্রীষ্মের দিনগুলি যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন আমেরিকার জনসাধারণ জানতে

পারল যে, স্বামীজী একজন খাঁটি লোক এবং তাঁর দেশের ধর্মের একজন স্বীকৃত প্রতিনিধি। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান এইভাবেই হলো।

অ্যানিস্কোয়ামের সকল অধিবাসী নিঃসন্দেহে মাদ্রাজের সভার কথা জেনেছিল এবং সেজন্য যখন তারা জানল যে, তাদের অসাধারণ অতিথি মঙ্গলবার ৪ সেপ্টেম্বর তারিখে সন্ধ্যায় মেকানিক্স হলে (একটি দোতলা কাঠের বাড়ি যেখানে গ্রামের সকল বড় অনুষ্ঠানাদি হয়ে থাকে) একটি বক্তৃতা দিতে যাচ্ছেন তখন তারা খুব খুশি হলো। অ্যানিস্কোয়াম নিজস্ব একটি খবরের কাগজ চালানোব পক্ষে কিংবা এর চাহিদার পক্ষে খুবই একটি ছোট্ট জায়গা। সেজন্য, অল্প কয়েক মাইল দূরবর্তী গ্লসেষ্টার শহরের দুটি কাগজে এ সংবাদ ছাপা হলো। সেপ্টেম্বরের ৪ তারিখে 'কেপ অ্যান ব্রীজ' কাগজের 'স্কোয়াম থেকে টুকিটাকি', সংবাদ শিরোনামায় একটি সারিতে আগামী ঘটনা সম্বন্ধে পাঠকদের অবহিত করে লেখা হলো ঃ

> *এ সুযোগকে সামান্য বলে মনে করে তাচ্ছিল্য করা উচিত হবে না, সুযোগটি হচ্ছে প্রাচ্য দেশের জনজীবনের পরিস্থিতি এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ঘোষণায় উল্লিখিত ভাষণের মাধ্যমে জানা যাবে ঃ*
>
> *হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, যাঁর শিকাগো ধর্মমহাসভায় দেওয়া ভাষণ বিপুল মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, তিনি হায়াৎদের বাড়িতে রাজ্যপাল শ্রীমতী ব্যাগলির অতিথি হয়ে রয়েছেন। নাগরিকগণ এবং গ্রীষ্মাবকাশ যাপনে আগত অ্যানিস্কোয়ামের বহু মানুষের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি মেকানিক্স হলে একটি জনসভায় সন্ধ্যা ৮টায় 'ভারতের জনজীবন ও ধর্ম' সম্বন্ধে একটি ভাষণ দিতে সম্মত হয়েছেন। তাঁর অসাধারণ বাগ্মীতা এবং পাণ্ডিত্য তাঁর অনন্য ব্যক্তিগত উপস্থিতি এই অনুষ্ঠানটিকে শ্রোতাদের নিকট অবিস্মরণীয় ঘটনা করে তুলবে।*
>
> *এর জন্য যৎসামান্য দর্শনী ২৫ এবং ৩০ সেন্ট মাত্র নেওয়া হবে। আশা করা যাচ্ছে বহুদূরবর্তী এক অপরিচিত দেশ হতে আগত এই বিদেশী আমাদের মধ্যে তাঁর দ্বিতীয় আবির্ভাবে ভালমত দর্শক উপস্থিতির দ্বারা অভিনন্দিত হবেন।*

বক্তৃতানুষ্ঠানের শেষে সেপ্টেম্বরের ৬ তারিখে গ্লসেষ্টার ডেইলী টাইম্‌স এবং কেপ অ্যান ব্রীজ এই দুটি পত্রিকায় খুব ভালভাবে বিষয়টি নিয়ে লেখে। যথাক্রমে তাদের প্রতিবেদন দুটি নিম্নোক্তরূপ ঃ

অ্যানিস্কোয়ামের ভাষণ

মঙ্গলবার দিন সন্ধ্যায় আমাদের এখানে ভ্রমণরত বন্ধু হিন্দু সন্ন্যাসীর বক্তৃতা শোনবার জন্য মেকানিক্স সভাকক্ষ আগ্রহী শ্রোতাদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাঁকে শ্রোতাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন অধ্যাপক রাইট, তিনি তাঁর ভাষণে সময়োচিত কয়েকটি প্রারম্ভিক মন্তব্য করলেন। বক্তা তাঁর ভাষণে এই গ্রামে তাঁর গত বৎসর আগমনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বললেন যে, গতবারে তিনি যে ভাষণটি এখানকার গীর্জায় দিয়েছিলেন, সেটি ছিল তাঁর ইংরেজী বা তাঁর মাতৃভাষায় প্রদত্ত প্রথম বক্তৃতা, (ইতঃপূর্বে আর কখনও বক্তৃতা করেন নি) এবং তাঁর যে-সকল উপস্থিত বন্ধু তাঁকে এ-ব্যাপারে সেদিন সাহায্য করেছিলেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন তিনি। দার্শনিক ভিত্তিভূমি হতেই বক্তা ভারতীয় ধর্ম সম্বন্ধে দীর্ঘ ভাষণ দিলেন, তাতে তাঁর মন এবং চিন্তা কিভাবে কাজ করছে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, তাঁর ধারণাগুলি অবশ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রেও ছিল উদার এবং প্রশস্ত।

স্কোয়াম থেকে চুটকি

হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের ভাষণ শোনবার জন্য মঙ্গলবার সভাকক্ষে বেশ ভালমত শ্রোতৃ-সমাবেশ হয়। তিনি তাঁর পদ অনুযায়ী বিশিষ্ট পরিচ্ছদে ভূষিত হয়েছিলেন এবং তাঁকে তাঁর ঢেউ খেলানো আলখাল্লা এবং আলগা করে বাঁধা কোমরবন্ধনীতে এবং তাঁর কৃষ্ণবর্ণ, প্রাচ্যদেশীয় ছাঁদের মুখমণ্ডল, সুগঠিত মস্তক, মস্তকে দক্ষতার সঙ্গে পাকানো পাগড়ি—এসব কিছু মিলে ছবির মতো সুন্দর লাগছিল। তাঁর ইংরেজী একজন সংস্কৃতিসম্পন্ন বিদেশীর মতো, যাঁর প্রধানত রুচিবান এবং শিক্ষিত মানুষদের সঙ্গে যোগ আছে। যদিও তাঁর কথার অর্থ বোঝবার জন্য খুব মনোযোগ দিয়ে তাঁকে শোনা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপনা তাঁর শ্রোতাদের মনে খুবই আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল এবং আমরা যতদূর জানি তারা এই বিশিষ্ট বিদেশীর বক্তৃতা শোনবার এই সুযোগ লাভ করার জন্য নিজেরা নিজেদের অভিনন্দিত করেছে।

এই বক্তৃতাটি দেবার দু-একদিনের মধ্যে স্বামীজী অ্যানিস্কোয়াম পরিত্যাগ

করে বোস্টনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, কিন্তু তার আগে সেপ্টেম্বরের ৫ তারিখে তিনি তাঁর বঙ্গদেশীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্যকে বাংলা ভাষায় একটি সুদীর্ঘ চিঠি* লেখেন—এই মন্মথনাথ ভট্টাচার্যই তাঁকে ১৮৯২-এ মাদ্রাজ প্রদেশে সকলের সঙ্গে পরিচয় করে দিয়েছিলেন। এ-চিঠিটার অংশ বিশেষের অনুবাদ এখানে তুলে দেওয়া হচ্ছে। কারণ এতে স্বামীজীর পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং রসবোধপূর্ণ দৃষ্টি সহায়ে আমেরিকার জীবন-ধারার, রীতিনীতির এমন ছবি আঁকা হয়েছে যা না জানলে আমেরিকায় অতিবাহিত তাঁর জীবনবৃত্তান্ত অসম্পূর্ণ থেকে যায়। স্বামীজী লিখছেন—

> *"প্রিয় শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য, আমি আপনার স্নেহপূর্ণ চিঠিখানি পেয়ে খুবই খুশি হয়েছি। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি তাঁতযন্ত্রটি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেব এবং আপনাকে জানাব। এখন আমি অ্যানিস্কোয়ামে বিশ্রাম করছি—এটি সমুদ্র তীরবর্তী একটি গ্রাম, আমি শহরে গিয়ে যন্ত্রের ব্যাপারটা দেখব। গ্রীষ্মের সময় এই সকল সমুদ্র তীরবর্তী স্থান জনসমাগমে পূর্ণ হয়ে যায়, এখানে কেউ আসে সমুদ্রে স্নান করতে, কেউ বা বিশ্রাম নিতে, আবার কেউ বা বিয়ের বর ধরতে।*
>
> *"এ দেশে আদবকায়দা সম্পর্কে অত্যন্ত দৃঢ় সচেতনতা রয়েছে। আপনাকে এখানে মেয়েদের সামনে সব সময় গলা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। আপনি শারীরিক প্রক্রিয়াগুলি উল্লেখমাত্র করতে পারবেন না, কে যে কখন স্নানঘরে যায় তা কেউ জানতে পারবে না, সকলকে খুব সঙ্গোপনে থাকতে হয় এসব ব্যাপারে। এ দেশে আপনি রুমালের মধ্যে হাজারবার নাক ঝাড়তে পারবেন, কিন্তু ঢেকুর তোলা ভয়ানক অসভ্যতা। মেয়েরা অনেক সময় কোমরের উপর দিকে শরীর দেখাতে বিব্রত বোধ করে না—আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন তারা কি রকম খাটো ছাটের জামা পরে—এবং এরা বলে খালি পায়ে থাকা উলঙ্গ হয়ে থাকার সমান। আমরা যেমন সর্বদাই আত্মাতে নিবাস করি এরা ঠিক সেইরকম সর্বদা শরীরের যত্ন নেয় এবং একে পরিষ্কার করা এবং সাজানো গোছানোর যেন অন্ত নেই এবং যে এটা করতে ব্যর্থ হবে, সমাজে তার কোন স্থান নেই।*

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম সং, পত্রসংখ্যা ১১১ক, পৃঃ ৩৭৯

"আমরা ঘুঁটে পুড়িয়ে রান্না করে মাটিতে বসে খাই—একে এরা বলে শুয়োরের মতো খাওয়া; তারা বলে হিন্দুদের কোন ঘেন্নাপিত্তি নেই, তাই তারা শুয়োরের মতো গোময় ভক্ষণ করে। 'গোময়' শব্দটি ইংরেজী ভাষায় নিষিদ্ধ শব্দ। অপরদিকে একই গেলাস থেকে এরা অনেকে জল খাবে, গেলাসটি ধুয়ে নেওয়ার কথা এরা চিন্তাও করবে না এবং এরা রান্নার আগে সব কিছু যে ধুয়ে নেওয়া উচিত—সে নিয়মটি কদাচিৎ মানে। কিন্তু রাঁধুনীর কাপড়ে যদি এতটুকুও ময়লা লেগে থাকে তাহলে তাকে তৎক্ষণাৎ তাড়িয়ে দেবে। টেবিলে পাতা চাদরটি ঝকঝকে টানটান পরিষ্কার হতে হবে। এরা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ধনী জাত, এদের ভোগবিলাসিতার বর্ণনা করতে গেলে বর্ণনাশক্তি হার মানে।

"এদিকে আমাদের দেশের মেয়েদের বিয়ে দেবার জন্য যেমন মা-বাপেরা কষ্ট ভোগ করে, এখানে তেমনি মেয়েগুলি কষ্টভোগ করে—বাপ মায়েরা তাতে সামান্যই ভূমিকা গ্রহণ করে—এখানে বিয়ের জন্য স্বামী পাকড়াও মেয়েদের নিজেদেরই করতে হয়। আমি এখন এদের সকল ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত, আমি বালিকাদের মধ্যে যেন একটি বালিকা। সেজন্য আমি দেখেছি এবং এখনও দেখছি এদের সব কাণ্ডকারখানা। এরা ভোজ দেয়, নৃত্যের আয়োজন করে, গানের আসরে যায়, ঝরনার ধারে যায়—এ সবই ঠিক আ.ছ। কিন্তু সর্বত্র সমস্ত সময় তরুণী মেয়েরা ফন্দী আঁটছে কি করে স্বামী পাকড়ানো যায় এবং তারা সেজন্য ছেলেদের চারপাশে ঘোরে প্রতিদ্বন্দ্বীদের শেষ করে দেবার জন্য, ছেলেরা আবার এত সাবধানী, তারা মেয়েদের সঙ্গে মেশে এবং সবসময় তাদের নাচায়, কিন্তু যেই তাদের কাছে ধরা দেবার সময় হয়, তখুনি পালায়। ছেলেগুলি মেয়েদের নিজেদের চেয়ে উঁচুতে বসায়, তাদের সম্মান দেখায়, তাদের দাসত্ব করে, কিন্তু যে মুহূর্তে মেয়েগুলি তাদের ধরবার জন্য হাত বাড়ায়, তারা তাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে দৌড়ে পালায়। এ ধরনের বহু প্রচেষ্টার পর একটি মেয়ে একটি ছেলেকে পাকড়াও করতে সমর্থ হয়। মেয়েটির যদি টাকাপয়সা থেকে থাকে, তাহলে অনেক ছেলেই তার চারপাশে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নাচানাচি করে, কিন্তু একটি গরিব মেয়ের খুব অসুবিধা। যদি গরিব মেয়েটি অসাধারণ রূপসী হয়, তাহলে সে তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে পারে, নাহলে হয়তো সারাজীবন ধরে অপেক্ষা করতে হয়। ঠিক আমাদের দেশের মতোই হাজারটার মধ্যে একটা বিয়ে হয়তো প্রেম এবং পূর্বরাগের মধ্য

দিয়ে ঘটে। আর বাকি সব বিয়ে হয় টাকার ভিত্তিতে। তারপর হয় ঝগড়া-বিবাদ, তারপর 'বেরিয়ে যাও'—বিবাহ-বিচ্ছেদ। আমাদের দেশে এটা নেই, আমাদের একমাত্র উপায় গলায় দড়ি দেওয়া। সব দেশে একই বৃত্তান্ত। কেবল এখানে মেয়েরা নিজেরাই ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণ করে, আমাদের দেশে আমরা বাবা-মায়ের সাহায্য পাই...উভয় ক্ষেত্রে ফল একই।

"আজকাল অবশ্য আমেরিকার মেয়েরা বিয়ে করতে চাইছে না। গৃহযুদ্ধের সময় বহু পুরুষ মারা যায় এবং মেয়েরা সবরকম কাজ করতে আরম্ভ করে। তারপর থেকে তারা যে অধিকার একবার অর্জন করেছে, তা ছাড়তে রাজি হয়নি। তারা নিজেদের উপার্জনে নিজেদের ভরণপোষণ করে এবং সেজন্য তারা বলে, 'বিয়ে করে কোন লাভ নেই। যদি আমরা সত্যি সত্যিই কখনও প্রেমে পড়ি, তখনই বিয়ে করব, অন্যথায়, আমরা নিজেরা উপার্জন করে নিজেদের ব্যয়ভার বহন করব।' এমন কি বাবা যদি কোটিপতিও হন, পুত্রকে বিবাহের পূর্বে প্রচুর উপার্জন করে নিতে হয়। বাবার দেওয়া বরাদ্দের ওপর নির্ভরশীল হয়ে কেউ বিবাহ করে না। মেয়েরাও এখন তাই চাইছে। যখন একটি ছেলে বিবাহ করে তখন সে পরিবারের নিকট বাইরের লোক হয়ে যায়। কিন্তু যখন একটি মেয়ে বিয়ে করে তখন সে যেন তার স্বামীকে নিজের পিতৃগৃহে নিয়ে আসে। পুরুষেরা স্ত্রীর পিতামাতার সঙ্গে দশবার দেখা করবে, কিন্তু কদাচিৎ নিজ পিতামাতার কাছে যাবে। তথাপি তারা শাশুড়িকে নিজ কাঁধে নিতে খুবই ভীত।

"এদেশে নদীর মতো অর্থসম্পদ বয়ে চলেছে। তরঙ্গের মতো সৌন্দর্যের প্রাচুর্য, আর জ্ঞানের প্রাচুর্য সর্বত্র। এ দেশের স্বাস্থ্য খুবই ভাল, এদেশের লোকেরা এই পৃথিবীকে ভোগ করতে জানে... যখন ইউরোপের রাজবংশীয়েরা দরিদ্র হয়ে পড়ে, তারা এ-দেশে বিবাহ করতে আসে। সাধারণ আমেরিকাবাসী এটা পছন্দ করে না। কিন্তু কিছু কিছু ধনী ও সুন্দরী নারী এদের পদমর্যাদায় টলে যায়। তথাপি একজন আমেরিকাবাসী নারীর পক্ষে ইউরোপ গিয়ে বসবাস করা খুব মুশকিলের। এ-দেশের স্বামীরা স্ত্রীর দাস, কিন্তু ইউরোপের স্ত্রীরা স্বামীর দাসী—এ-ব্যাপারটি আমেরিকার মেয়েদের পছন্দ নয়। প্রত্যেক ব্যাপারে এখানে পুরুষদের বলতে হয়—'হ্যাঁ, মহাশয়া', না হলে লোকের দৃষ্টিতে স্ত্রীর সম্মান হানি হয়।

"আমেরিকার মেয়েরা অত্যন্ত ভাবপ্রবণ এবং এদের বাতিক প্রেমে

পড়া। আমি হচ্ছি একজন অদ্ভুত প্রাণী যার কোনপ্রকার রোমান্সের অনুভূতির বালাই নেই এবং সেজন্য এরা আমার প্রতি এ-ধরনের মনোভাব পোষণ করতে পারে না এবং এরা আমাকে প্রভূত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। আমি তাদের প্রত্যেককে আমাকে 'পিতা' অথবা 'ভ্রাতা' সম্বোধন করতে বাধ্য করি। আমি তাদের অন্য কোন মনোভাব নিয়ে আমার ধারে কাছে ঘেঁষতে দিই না এবং ক্রমে তারা সকলেই সোজা হয়ে গিয়েছে।

"এখানকার ধর্মোপদেষ্টাগণ...পাপীদের নরকে নিক্ষেপ করতে খুবই আগ্রহী। তাঁদের মধ্যে অবশ্য অল্প কয়েকজন খুবই ভাল লোক...। এ দেশে মেয়েদের মধ্যে আমার খুবই খ্যাতি। আমি অবিবাহিত মেয়েদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত একজনও অসতী দেখিনি। বিধবা কিংবা বিবাহিতা মেয়েরাই অসতী হয়। অবিবাহিতা মেয়েরা অসম্ভব ভাল, কারণ তাদের সামনে আছে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।...

"যদি আমরা তাদের এই দোষটি—তাদের এই প্রেমে পড়ার প্রবণতাকে—উপেক্ষা করি তাহলে দেখব আমাদের দেশের 'বানরী'গুলি এদের ধারে কাছে দাঁড়াবার যোগ্য নয়। যে-সকল শুকনো ফলের মতো শীর্ণ চেহারার পাশ্চাত্য দেশীয়া মহিলাদের ভারতে দেখা যায়, তারা সকলে ইংরেজ এবং ইংরেজরা ইউরোপীয়দের মধ্যে কু-দর্শন জাতি। আমেরিকায় ইউরোপের সর্বোত্তম রক্ত মিশ্রিত হয়েছে, সেজন্য আমেরিকার মেয়েরা দেখতে খুবই সুদর্শনা এবং তারা তাদের সৌন্দর্যের কি পরিমাণ যত্নই না করে। কোন মেয়ে যদি তার দশ বছর বয়স থেকে কেবল সন্তান প্রসব করে তাহলে কি সে তার সৌন্দর্য রক্ষা করতে পারে? কি অভিশপ্ত বোকামি! কি ভয়ানক পাপ! আমাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীকেও এদেশে কালপেঁচীর মতো মনে হবে। তবে স্বীকার করতেই হবে আমাদের দেশে পাঞ্জাবের মেয়েদের খুব চমৎকার গঠন-সৌষ্ঠব আছে। আমেরিকার বহু মেয়ে খুবই সুশিক্ষিতা এবং অনেক পণ্ডিত অধ্যাপককে লজ্জায় ফেলে দিতে পারে এবং তারা কারোর মতামতকে গ্রাহ্য করে না এবং তাদের গুণের কথা কি বলব : কি দয়ামায়া তাদের, কি উচ্চ চিন্তা ও মহৎ কাজ! একবার চিন্তা করে দেখুন এদেশের কোন পুরুষ যদি ভারত-দর্শনে যায়, তাকে কেউ স্পর্শও করবে না। কিন্তু এখানে আমি এখানকার সমাজের শীর্ষস্থানীয় পরিবারগুলিতে তাদের নিজ পুত্রের মতো। আমি যা খুশি করতে পারি, আমি এখানে একটি শিশুর মতো, এদের মেয়েরা আমার জন্য

বাজার করছে, খবরাখবর আদান-প্রদান করছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমি একটি মেয়েকে লিখেছি যন্ত্রটির বিষয়ে খবরাখবর করতে, যা সে যত্ন করে করবে এবং আমাকে জানাবে। আর একটি দৃষ্টান্ত, খেতড়ির মহারাজাকে একটি ফনোগ্রাফ পাঠানো হয়েছে, সমস্ত ব্যাপারটি মেয়েরাই করেছে। হা ঈশ্বর, ঈশ্বর! এ হলো যেন স্বর্গ-নরকের মধ্যে পার্থক্য। 'এরা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।' এ শুধু বই পড়ে হয় না। আমি বলি কি আপনারা কয়েকজন স্ত্রী পুরুষকে দুনিয়াটা দেখতে পাঠাতে পারবেন কি? তাহলেই একমাত্র দেশ জেগে উঠবে—কেবল বই পড়ে কিছু হবে না। পুরুষেরা এখানে অর্থ উপার্জনে অত্যন্ত কুশলী। যেখানে অন্য কেউ ধুলোর চিহ্নটুকুও দেখতে পায় না, তারা সেখানে সোনা দেখতে পায়।

"কাগজপত্রগুলি [মাদ্রাজের সভা সম্বন্ধীয়] যথাসময়ে এবং অটুটভাবে এসে পৌঁছেছে, সে ব্যাপারে কোন অসুবিধা হয়নি। শত্রুদের মুখ বন্ধ হয়েছে। এ-ব্যাপারটি বিবেচনা করে দেখবেন ঃ এরা আমার মতো একজন অজ্ঞাত পরিচয় তরুণ যুবককে তাদের বয়স্থা কন্যাদের সঙ্গে থাকতে দিয়েছে, দিয়েছে যখন আমারই দেশবাসী মজুমদার বলে বেড়াচ্ছে আমি একটি চরিত্রহীন লোক, তারা কিন্তু তাতে কান দেয় নি। তারা কি মহৎ এবং দয়ার্দ্রচিত্ত! আমি শত জন্মেও এদের এ ঋণ শোধ করতে পারব না। আমি আমেরিকান মহিলাদের কাছে একজন পালিত পুত্র, তারা সত্যিই আমার মা। এদের যদি উন্নতি না হয় তো, কাদের হবে?

"কিছুদিন আগে গ্রীনএকার নামক একটি জায়গায় কয়েক শত বুদ্ধিজীবী নরনারী সমবেত হয়েছিল এবং সেখানে আমি প্রায় দুমাস [সপ্তাহ] ছিলাম। প্রত্যেকদিন আমি আমাদের হিন্দু-রীতি অনুযায়ী একটি গাছের তলায় বসতাম এবং আমার অনুরাগী ও শিষ্যরা ঘাসের ওপর চারিদিকে আমাকে ঘিরে বসত। প্রত্যেকদিন সকালে আমি তাদের ধর্মোপদেশ দিতাম, আর তারা কি দারুণ আন্তরিক ছিল।

"সমগ্র এই দেশ এখন আমাকে জানে। ধর্মযাজকেরা অবশ্য খুব রেগে আছে। কিন্তু স্বভাবতই সকলে নয়। এ দেশের সুপণ্ডিত ধর্মযাজকদের মধ্যেও অনেকে আমার অনুরাগী আছেন। অজ্ঞ এবং একগুঁয়ে যারা, যারা কিছু বোঝে না, কিন্তু কেবল গণ্ডগোল পাকায়, তারা তার দ্বারা কেবল নিজেদেরই ক্ষতিসাধন করে। আমাকে গালি দিয়ে মজুমদার এ দেশে যে যৎসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, তার চারভাগের তিনভাগই

হারিয়েছে। এখানকার লোকেরা আমাকে গ্রহণ করেছে। যখন কেউ আমার নিন্দামন্দ করে, সর্বত্র এ দেশের মেয়েরা তাদের অধঃপাতে দেয়।

"আমি কবে ভারতবর্ষে ফিরব, তা আমি বলতে পারি না হয়ত পরবর্তী শীতকালে। ওখানে আমি পরিব্রাজক থাকব, এখানেও আমি তাই।

"আর কিছু বলবার নেই। এ চিঠিটা সকলকে যেন দেখাবেন না। আপনি বুঝতেই পারছেন আমি যা বলি প্রতিটি শব্দ হিসেব করে বলতে হয়—কারণ এখন আমি জনসাধারণের পরিচিত লোক। প্রত্যেকে আমাকে লক্ষ্য করছে, বিশেষ করে ধর্মযাজকেরা।"[৬৭]

একাদশ অধ্যায়ের টীকা

পৃষ্ঠা	সাঙ্কেতিক চিহ্ন	টীকা
১৫৭	+	'স্বামীজীর পাইন' গাছের তলায় ১৮৯৬ সালে স্বামী সারদানন্দ গ্রীষ্মের শেষের দিকে বক্তৃতা দেবেন এবং তার পরবর্তী গ্রীষ্মকালগুলিতে স্বামী অভেদানন্দ। ১৯৫৯ সালে লাইসেকলস্টার পাইন গাছগুলি—'স্বামীজীর পাইন'ও তার মধ্যে ছিল—কেটে ফেলা হয় এবং তক্তা বানাবার জন্য বিক্রি করা হয়, এটা করেছিল এমন একদল লোক যারা এর ঐতিহাসিক মূল্য—সত্য বলতে আধ্যাত্মিক মূল্য-বিষয়ে জ্ঞাত ছিল না। যাঁরা জ্ঞাত ছিলেন, তারা এখনও এজন্য শোক করেন। আমি যতদূর জানি "স্বামীজীর পাইন'-এর গুঁড়িটা এখনও আছে, তার ব্যাস ৪ ফুট।
১৭৯	+	স্বামীজীর ১৮৯৩ এবং ১৮৯৪-এ অ্যানিস্কোয়াম ভ্রমণ সম্বন্ধে কিছু স্মৃতিচারণা আমাদের নিকট পৌঁছেছে, সেগুলি তাঁরাই করেছেন যাঁদের প্রজন্মের তখন শৈশবকাল। কিন্তু যদি অধ্যাপক জন হেনরী রাইট এবং অধ্যাপক আলফিয়াস হায়াতের জীবিত সন্ততিগণ জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করে স্বামীজীর স্মৃতিচারণা করেন, তাহলেও তিনি তাঁদের নিকট সুস্পষ্ট প্রাণবন্ত একজন ব্যক্তিত্ব যিনি পরিবারের নিকট এক কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছেন। যে সময় এবং স্থানের পটভূমিকায় স্বামীজীর এই মানস-মূর্তিটি দাঁড়িয়ে আছে তা কিন্তু অস্পষ্ট। সমুদ্রতীরে

সামুদ্রিক মৎস্য-জাতীয় প্রাণীটির মাংস-ভোজন উৎসব কবে হয়েছিল? ১৮৯৩ না ১৮৯৪-এ? কুমারী এলডা নেলসন লিখিত "অ্যানিস্কোয়ামে স্বামী বিবেকানন্দের পাদটীকা" শীর্ষক প্রবন্ধ (প্রবুদ্ধ ভারত,) হতে আমরা জানতে পারি যে ১৮৯৩ বা ১৮৯৪-এ একটি জ্যোৎস্নালোকিত সমুদ্রতীরে একটি বনভোজন হয়েছিল যখন স্বামীজী সমুদ্রে কাগজের থালা ভাসানো শিখেছিলেন। এটাই কি সেই ভোজের দিন যেদিন সামুদ্রিক প্রাণীর মাংস আগুনে পুড়িয়ে খাওয়া হয়েছিল? আমরা জানি না। যদি ১৮৯৩-এ এটি ঘটে থাকে (যখন প্রশ্নাতীতরূপে হায়াৎরা অ্যানিস্কোয়ামে ছিলেন) তাহলে সেটা ঘটেছিল আগস্টের ২৬ তারিখ, শনিবার সন্ধ্যায় শিশুদের নাটকাভিনয়ের কেবল আগে বা পরে। যদি ১৮৯৪-এ হয়ে থাকে (যখন এটা নিশ্চিত নয় যে, হায়াৎরা ওখানে ছিলেন কি না অন্ততপক্ষে একটি সপ্তাহের অন্তভাগে), তাহলে এটা হয়েছিল আগস্ট মাসের ২১ তারিখ, কারণ এর "দু একদিন আগে বা পরে তিনি নৌকাচালনা করতে গিয়ে জলে পড়ে যান" (হায়াৎদের এক কন্যা যেরূপ লিখেছেন), সেই "ডুবে যাওয়ার" কথা স্বামীজী ১৮৯৪-এর আগস্টের ২০ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। বোধহয় আমরা কখনও এই গ্রীষ্মকালীন ঘটনাবলী সম্বন্ধে ঠিক ঠিক দিনগুলি নির্দিষ্ট করে বলতে পারব না : কিন্তু এ-বিষয়ে আমরা নিশ্চিত যে, স্বামীজী অ্যানিস্কোয়ামে একদিন সমুদ্রতীরে ভোজ-উৎসবে যোগদান করেছিলেন এবং তিনি জ্যোৎস্নালোকিত কোন এক রাতে কাগজের থালা সমুদ্র তরঙ্গ-শীর্ষে ভাসিয়েছিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

পূর্বাঞ্চল ভ্রমণ — ২

॥ ১ ॥

গ্রীষ্মকাল শেষ হয়ে গেল। বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়গুলি খুলতে আরম্ভ করল এবং লোকজন পাহাড় এবং সমুদ্রতীরবর্তী ভ্রমণস্থানগুলি হতে শহরে প্রত্যাবর্তন করতে শুরু করল। বোস্টনে স্বামীজীর বক্তৃতাদানের দ্বিতীয় বছর শুরু হলো। এখানে তিনি প্রায় পুরো সেপ্টেম্বর মাসটা কাটালেন। যদিও এবারে স্বামীজীর বোস্টনে অবস্থান দীর্ঘদিনের জন্য ঘটেছিল, কিন্তু এ-সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান জ্ঞান তাঁরই প্রকাশিত চিঠিপত্র হতে টুকরো টুকরো সংবাদ একত্র করে যা দাঁড়ায় তাতেই সীমাবদ্ধ, তার কারণ এবারে সংবাদপত্রগুলি তাঁর বক্তৃতাদি বিষয়ে আশ্চর্যজনকভাবে নীরব ছিল। আমরা অনুমান করতে পারি যে বেশিরভাগ সময় তিনি এই বক্তৃতাগুলি বেসরকারি বা আধা-বেসরকারিভাবে দিয়েছেন।

স্পষ্টত স্বামীজী তাঁর অ্যানিস্কোয়ামে অবস্থানের শেষ সপ্তাহে বা এর কাছাকাছি সময়ে বোস্টনে বক্তৃতা প্রদানের কার্যসূচী স্থির করেছিলেন, কারণ এখানে তাঁর আগমন সম্বন্ধে কোন আগাম বার্তা পাওয়া যায়নি। আগস্টের ২০ তারিখে ইসাবেল ম্যাককিণ্ডলিকে তিনি লিখছেন—"ভাবছি এখান থেকে (অ্যানিস্কোয়াম থেকে) নিউইয়র্ক ফিরে যাব, অথবা বোস্টনে (কেম্ব্রিজে) শ্রীমতী ওলি বুলের কাছেও যেতে পারি"।[১*] প্রকৃতপক্ষে তিনি এর কোনটাই করেননি। এর পরের কথা আমরা যা জানি, তাতে দেখি যে তিনি বোস্টনের হোটেল বেল ভিউ থেকে সেপ্টেম্বরের ১২ তারিখে শ্রীমতী হেলকে একটি চিঠি দিচ্ছেন। চিঠিটি একটি সংক্ষিপ্ত অনুরোধ— "ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকার যে অংশটিতে আমার ডেট্রয়েটের বক্তৃতাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি আপনাকে পাঠিয়েছিলাম, ওটি আপনি আবার আমাকে পাঠিয়ে দিন"।[২**] পরের দিন তিনি তাঁকে এবং মেরী হেলকে আর একটু বড় চিঠি লেখেন।

---

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম সং, পত্রসংখ্যা ১০৯, পৃঃ ৩৭০

** ঐ, ৮ম খণ্ড, ১ম সং, পত্রসংখ্যা ৫৪১, পৃঃ ২০৫

মেরী হেলকে লেখা চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি যে, তিনি বেল ভিউ হোটেলে "প্রায় সপ্তাহ খানেক ছিলেন" এবং "তিনি বোস্টনে আরও কিছুকাল থাকবেন"।[৩*] শ্রীমতী হেলকে তিনি ভারতের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের নিকট হতে প্রাপ্ত চিঠি এবং সংবাদপত্রের কর্তিতাংশ পাঠাবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে লিখলেন— "এ বিরক্তিকর ব্যাপারের" এখনও প্রয়োজন রয়েছে। কারণ সুনিশ্চিতভাবে কলকাতাতে অনুষ্ঠিত তাঁর প্রতি সমর্থনসূচক সভানুষ্ঠনের সংবাদ তখনও আমেরিকায় এসে পৌঁছয়নি। শ্রীমতী হেল উল্লিখিত চিঠিপত্র এবং সংবাদপত্রের কর্তিতাংশ-সমূহের সাক্ষ্যপ্রমাণ তাঁর পক্ষে দাঁড়িয়ে ভালভাবেই ব্যবহার করছিলেন। ঠিক এই রকমটি করছিলেন স্বামীজীর আরও কয়েকটি বন্ধু। শ্রীমতী হেলকে সেপ্টেম্বরের ১৩ তারিখের চিঠিতে তিনি লিখলেন— "সংবাদপত্রের কর্তিতাংশগুলি শ্রীমতী ব্যাগলির কাছে আছে, তার একটা টাইপ করা কপি মাত্র আপনাকে পাঠানো হয়েছে। কথায় কথায় বলছি যে আমি আপনার কাছে সবকিছু পাঠালে শ্রীমতী ব্যাগলি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। এ-কথাটি কিন্তু শুধু আপনার এবং আমার মধ্যে, অন্যদের জ্ঞাতব্য নয়। ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকাটি অধ্যাপক রাইটের কাছে আছে এবং তিনি এটি আপনার কাছে পাঠাবেন"।[৪]

"গত কয়েকদিন আমি সর্দি ও জ্বরে ভুগেছি, এখন ভাল আছি"—এ কথাগুলি তিনি একই চিঠিতে লিখেছিলেন। এটি এমন একটি সংবাদ যা তাঁর মা-গীর্জাকে বিচলিত করবার মতো। কয়েকদিন পরে তিনি তাঁকে আশ্বস্ত করে লিখছেন যে তাঁর নিজের কাছে যথেষ্ট জামাকাপড় রয়েছে। "আমার আর এখন জামাকাপড়ের দরকার নেই, যথেষ্ট আছে। আমি আমার জামার আস্তিনের অন্তর্ভাগ এবং কলার প্রভৃতির যথেষ্ট যত্ন নিচ্ছি। আমার প্রয়োজনের জামাকাপড় আছে, আমি শীঘ্রই তার অন্ততপক্ষে অর্ধেক পরিত্যাগ করব"।[৫]

বক্তৃতা দেবার কাল শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং স্বামীজী সেপ্টেম্বরের ১৯ তারিখে লিখেছিলেন—"এখন আমি বোস্টনের কয়েক জায়গায় বক্তৃতা দিচ্ছি"।[৬**] বক্তৃতা দেওয়ায় আত্মনিয়োগ করলেও বই লেখার যে দৃঢ় সঙ্কল্প তাঁর মনে জুলাই মাস থেকে জেগেছিল, তা এখনও বেশ দৃঢ়ই ছিল।

---

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, পত্রসংখ্যা ১১১, পৃঃ ৪৭৮

** ঐ, ৭ম সং, পত্রসংখ্যা ১১৪, পৃঃ ৩৭৬

মাদ্রাজ শিষ্য আলাসিঙ্গাকে জুলাইয়ের ১১ তারিখে তিনি লিখেছিলেন—"বছরের এ সময়টা বেশি বক্তৃতা করবার সুবিধা নেই, সুতরাং এখন আমাকে কলম ধরে বসে লিখতে হবে"।[৭*] কিন্তু ১৮৯৪-এর গ্রীষ্মের মাসগুলিতে লেখার কাজ করবার মতো সময় তিনি খুব কমই পেয়েছেন এবং সেপ্টেম্বরেও লেখার মাধ্যমে তাঁর চিন্তাধারাকে ধরে রাখবার বাসনা অপূর্ণই রয়ে গেল। "আমি ধর্ম সম্বন্ধে আমার চিন্তারাশিকে লিখে রেখে যাব এবং তার মধ্যে কোনপ্রকার ধর্মযাজকের কোন ভূমিকা থাকবে না"।[৮] এ কথা তিনি সেপ্টেম্বরের ১৩ তারিখে শ্রীমতী হেলকে লিখলেন[+] এবং একই তারিখে মেরী হেলকে লেখা একটি চিঠির একটি অনুচ্ছেদে তাঁর মনোভাবের এমন একটি দিক প্রকট হয়েছে যা সাধারণত যারা লেখার জন্য একটি অনুপ্রেরণার তাড়না অনুভব করে, তাদের মধ্যেই দেখা যায়—সেটি হলো প্রথমেই চিত্তাকর্ষক অথচ একেবারেই যে আবশ্যকীয় তা নয়, এমন লেখার সরঞ্জাম কেনার তাগিদ অনুভব করা—"আজ এই ভবঘুরে লামা [তিব্বতী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী] আঁকিজুঁকি করবার জন্য এমন প্রবল তাড়নার খপ্পরে পড়ে গেল যে হেঁটে গিয়ে এক দোকান থেকে সর্বপ্রকার লেখার সামগ্রী এবং চমৎকার একটি কাগজ পত্র রাখবার ব্যাগ যা বন্ধ হয় একটি হুকে আটকে, এমন কি একটি ছোট কাঠের দোয়াতও কিনে ফেলল। এ পর্যন্ত সব ভালই সূচনা হয়েছে। আশা করি এ ব্যাপারে অগ্রগতি ঘটবে"।[৯]

কিন্তু বোস্টনেও স্বামীজী বই লেখার জন্য যে শান্ত পরিবেশ প্রয়োজন, তা পান নি। সেপ্টেম্বরের ২১ তারিখে তিনি আলাসিঙ্গাকে লিখলেন—"আমি যে বই লেখবার সংকল্প করেছিলাম, এখনও তার এক পঙ্‌ক্তি লিখতে পারিনি। সম্ভবত পরে এ কাজ হাতে নিতে পারব"।[১০**] তথাপি অতিশয় কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি সুদীর্ঘ চিত্ত আলোড়নকারী একটি লেখা যা এখন "মাদ্রাজ সম্বর্ধনার উত্তর" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তা লেখবার সময় করে নিতে পেরেছিলেন—এটি ছিল তাঁর স্বদেশের তটভূমি পরিত্যাগ করে আসার পর এই সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে আবেগপূর্ণ ভাষায় তার উদ্দেশ্যে প্রেরণাপূর্ণ একটি প্রশস্তি নিবেদন। তাঁর এই উত্তরটি ছিল হিন্দুধর্মের উৎপত্তি বিষয়ে, তাঁর মুখ্য বাণী-বৈচিত্র্যের মধ্যে নিহিত জৈবিক ঐক্য বিষয়ে এবং তার সর্বাশ্রয়ী সর্বব্যাপী মহিমা সম্বন্ধে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাপত্র, অংশত

---

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম সং, পত্রসংখ্যা ১০৫, পৃঃ ৩৬৩

** ঐ, ৭ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সং, পত্রসংখ্যা ১১৫, পৃঃ ১

এটি ছিল খ্রীস্টীয় ধর্মযাজকদের ভারত ও হিন্দুধর্ম বিষয়ে অপপ্রচারের খণ্ডন—"যে অপপ্রচার একটি অবলুণ্ঠিত জাতির শিরে যখন তখন বর্ষিত হচ্ছিল"।[১১] অংশত এটি ছিল ভারতের সুপ্ত আধ্যাত্মিক চেতনার উদ্দেশ্যে জাগরণের জন্য উদাত্ত আহ্বান—তিনি জানতেন এই আধ্যাত্মিক প্রতিভাই ভারতের শক্তির উৎস এবং জগতের জন্য এটি তার অমূল্য অবদান। তিনি তাতে লিখলেন—"আমাদের ভিত্তিভূমি হোক আমাদের ধর্মের মধ্যে নিহিত কেন্দ্রীয় সত্যটি—যা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সকল ধর্মমতের সার কথা—মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তার স্বীকৃতি—সেই আত্মা মৃত্যুহীন, জন্মরহিত, সর্বব্যাপী—সেই চিরন্তন আত্মা, যার মহিমা বেদসমূহ প্রকাশ করতে সমর্থ হয়নি, যার মহিমার নিকট মহাবিশ্ব তার অনন্তকোটি চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজির দ্বারা গঠিত ছায়াপথের পর ছায়াপথ ও নীহারিকামণ্ডলী নিয়ে একটি বিন্দুসদৃশ...প্রথমে এস আমরা নিজেরা দেবতা হই এবং পরে অপরকে দেবতা হতে সহায়তা করি। 'হওয়া এবং তৈরি করা'—এটাই আমাদের নিকট সংক্ষিপ্ত নীতিবাক্য হোক।... তোমার মধ্যে যে দেবত্ব আছে তাকে জাগ্রত কর এবং আর সবকিছু এর সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রকাশিত হবেই।... আমি ভবিষ্যৎকে দেখতে পাই না, দেখবার জন্য আমার আগ্রহও নেই। কিন্তু আমি আমার চোখের সামনে সুস্পষ্ট জীবন্ত সত্যরূপে যা দেখতে পাচ্ছি তা হলো এই যে, আমাদের মাতৃভূমি পুনর্জাগরিত হয়েছেন এবং নতুন করে তারুণ্যলাভ করে পূর্বের চেয়ে অধিকতর মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে মহাসিংহাসনে আসীন হয়েছেন। সমগ্র পৃথিবীর নিকট তাঁকে স্বস্তি ও শান্তিবচন উচ্চারণ করে ঘোষণা কর"।[১২] এ একটি বজ্র-আহ্বান যা তাঁকে বারবার পরবর্তী বৎসরসমূহে তাঁর দেশের এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্তে ধ্বনিত করতে হয়েছে।

স্বামীজী বোস্টনে এসে ভারতে অন্যান্য ব্যক্তিগত চিঠিপত্র লেখবারও সময় করে নিলেন। তাঁর গুরুভাইদের নিকট—যাঁরা তাঁর কর্মকাণ্ডের মূল শক্তিস্বরূপ হবেন তাঁদের নিকট আবেগপূর্ণ আহ্বান পাঠালেন, এর মাধ্যমে তিনি অগ্নি ঢেলে দিলেন তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস মূলে। তিনি ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে লিখলেন*—"ওরে হতভাগারা, এ দুনিয়া ছেলেখেলা নয়—বড় লোক তাঁরা, যাঁরা আপনার বুকের রক্ত দিয়ে রাস্তা তৈরি করেন। এই হয়ে আসছে চিরকাল। একজন আপনার শরীর দিয়ে সেতু বানায়, আর হাজার লোক তার ওপর দিয়ে নদী পার হয়।... মহা হুহুঙ্কারের

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, পত্রসংখ্যা ১১৬, পৃঃ ৪৮৭ ও ৪৮৯

সঙ্গে কাজ আরম্ভ করে দাও। ভয় কি? কার সাধ্য বাধা দেয়? কুর্মস্তারক-চর্বণং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো-বলাৎ। কিং ভো ন বিজানাস্যস্মান্-রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্। ডর? কার ডর? কাদের ডর?

ক্ষীণাঃ স্ম দীনাঃ সকরুণা জল্পন্তি মূঢ়া জনাঃ
নাস্তিক্যন্ত্বিদনন্তু অহহ দেহাত্মবাদাতুরাঃ।
প্রাপ্তাঃ স্ম বীরা গতভয়া অভয়ং প্রতিষ্ঠাং যদা
আস্তিক্যন্ত্বিদন্তু চিনুমঃ রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্।।”

[তারকা চর্বণ করব, ত্রিভুবন বলপূর্বক উৎপাটন করব, আমাদের কি জানো না? আমরা রামকৃষ্ণ দাস।...

দেহকেই যারা আত্মা বলে জানে, তারা কাতর হয়ে সকরুণভাবে বলে আমরা ক্ষীণ ও দীন; ইহাই নাস্তিক্য। আমরা যখন অভয়পদে অবস্থিত তখন আমরা ভয়শূন্য এবং বীর হব। ইহাই আস্তিক্য। আমরা রামকৃষ্ণ দাস।] ১৩*

কিন্তু যে ভাষণটি এবং চিঠিগুলি তিনি এক দিব্য প্রেরণার জোয়ারে ভেসে গিয়ে লিখলেন, “লেখা” বলতে তিনি সেগুলিকে বোঝান নি। নিউইয়র্কের এক বন্ধুকে সেপ্টেম্বরের ১৯ তারিখে লিখলেন—“এখন চাই এমন একটা জায়গা, যেখানে বসে আমার ভাবরাশি লিপিবদ্ধ করতে পারি। বক্তৃতা যথেষ্ট হলো, এখন আমি লিখতে চাই। আমার বোধ হয়, তার জন্য আমাকে নিউ ইয়র্কে যেতে হবে। মিসেস গার্নসি আমার প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করেছিলেন এবং তিনি সদাই আমায় সাহায্য করতে ইচ্ছুক। আমি মনে করছি, তাঁর ওখানে গিয়ে বসে বসে বই লিখব।... অনুগ্রহ করে আমায় লিখবে, গার্নসিরা শহরে ফিরেছে, না এখনও ফিশকিলে আছে।”১৪**

বলা যায় নিশ্চিতরূপে এই চিঠিটা লেখা হয়েছিল শ্রীমতী আর্থার স্মিথকে,+ খুব সম্ভবত তিনিই এ-সংবাদটি শ্রীমতী ওলি বুলকে জানিয়েছিলেন, শ্রীমতী ওলি বুল স্বামীজীকে কেম্ব্রিজে তাঁর বাড়িতে এসে থাকবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। সেপ্টেম্বরের ২৬ তারিখে স্বামীজী উত্তরে লিখলেন—“আমি আপনার সহৃদয়তাপূর্ণ দুটি চিঠিই পেয়েছি। আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আমাকে শনিবার মেলরোজে ফিরে যেতে

---

* বাণী ও রচনা, ১ম সং ৬ষ্ঠ খণ্ড, পত্রসংখ্যা ১১৬, পৃঃ ৪৮৭ ও ৪৮৯
** ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম সং, পত্রসংখ্যা ১১৪, পৃঃ ৩৬৪

হবে এবং সেখানে সোমবার অবধি থাকতে হবে। মঙ্গলবার (২ অক্টোবর) আমি আপনার গৃহে আসব।... ঠিক এই জিনিসটাই আমি চেয়েছিলাম, লেখবার জন্য এটি নিরিবিলি স্থান। অবশ্য আপনি আমাকে যতটা জায়গা ছেড়ে দেবেন বলে লিখেছেন, আমার তার থেকে অনেক কম জায়গাই যথেষ্ট হবে। আমি নিজেকে একটুখানি জায়গায় গুটিয়ে রাখতে পারি এবং তাতেই আরাম অনুভব করি।[১৫] *

মেলরোজ বোস্টন থেকে কয়েকমাইল উত্তরে অবস্থিত একটি ছোট্ট শহর। এখানে স্বামীজী অন্ততপক্ষে দুবার বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁর দ্বিতীয় বক্তৃতাটি সম্ভবত সেপ্টেম্বরের ৩০ তারিখে দেওয়া হয়েছিল এবং ১৮৯৪-এর শেষ ভাগে বোস্টন অঞ্চলে দেওয়া এটাই তাঁর শেষ ভাষণ, কারণ অক্টোবরের ২ তারিখে তিনি শ্রীমতী ওলি বুলের কেম্ব্রিজের বাড়িতে আসেন যেখানে অবশেষে তিনি যা চেয়েছিলেন অর্থাৎ "বসে লেখার জন্য একটি নিরিবিলি স্থান", তা পেয়েছিলেন।

প্রথম যখন স্বামীজী শ্রীমতী ওলি বুলের সাক্ষাৎ পান তখন শ্রীমতী বুলের বয়স চল্লিশের গোড়ার দিকে এবং তখনই তিনি চৌদ্দ বছর ধরে বৈধব্য পালন করছেন। প্রকৃতিগতভাবে তিনি ছিলেন উষ্ণ-হৃদয়, সাহসী, স্বাধীনচেতা এবং যে কথা স্বামীজী বলেছেন "খুব আধ্যাত্মিক প্রকৃতির", এ ছাড়াও তাঁর ছিল খ্যাতনামা বেহালাবাদক স্বামীর সঙ্গে বহু দেশবিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, বহু দর্শক এবং পরিচালকদের সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান এবং জনপ্রিয়তার জীবন বলতে যা বোঝায় সে সম্বন্ধে মূল্যবান প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। যদি একজন শিল্পীর সঙ্গে তাঁর একান্ত সান্নিধ্যের প্রসঙ্গ নাও তোলা হয়, তাহলেও পূর্বোক্ত সবকিছু তাঁকে স্বামীজীর সহায়তা করবার মতো প্রচুর সম্পদ দিয়েছিল—শুধু যে আমেরিকায় তাঁর কাজকর্ম সম্বন্ধে তিনি সুপরামর্শ দেবার যোগ্যতা রাখতেন তাই নয়, তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে সহানুভূতি দেওয়া এবং তাঁকে বুঝতে পারার মতো বোধশক্তিও তাঁর ছিল। শ্রীমতী বুলের সঙ্গে প্রায় প্রথম সাক্ষাতের পর থেকে স্বামীজী তাঁর বিচারবুদ্ধির ওপর এবং তাঁর উদার হৃদয়ের ওপর আস্থা অনুভব করেছিলেন—এ আস্থা তাঁর স্বজ্ঞালব্ধ, এ বিষয়ে পরবর্তী সময়ে তাঁকে লেখেন—"শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় আমি একজন মানুষের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করা মাত্র তাকে নির্ভুলভাবে পরিমাপ করার ক্ষমতা লাভ করেছি এবং তারই ফলে আমি

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, পত্রসংখ্যা ১১৭, পৃঃ ৪৯১

স্থির করেছি যে, আপনি আমাকে যেমন খুশি পরিচালনা করুন, আমি একটি শব্দও করব না।... আপনি আমাকে সাহায্য করেছেন শুধু সেজন্যই আমার স্বরূপ মাধ্যমে [অথবা আমি যাকে বলি শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায়] আমি আপনাকে 'মা' বলে জেনেছি, সেজন্য আপনার দেওয়া যে-কোন পরামর্শ আমি গ্রহণ করতে সম্মত"—...।[১৬*]

নরওয়ের দেশীয় বেহালাবাদক শ্রীযুক্ত ওলি বুলের সঙ্গে পরিণীত হবার পূর্বে শ্রীমতী ওলি বুল ছিলেন কুমারী সারা থর্প, ধনী কাষ্ঠ ব্যবসায়ী এবং উইসকনসিনের অন্তর্গত ম্যাডিসন হতে সিনেটে নির্বাচিত রাজ্য প্রতিনিধি মাননীয় শ্রীযুক্ত যোশেফ জি. থর্পের কন্যা। শ্রীযুক্ত যোশেফ তাঁর যৌবনে একটি বিশাল প্রাসাদোপম বাড়িতে সপরিবারে বাস করতেন, বাড়িটি ছিল ম্যাডিসন শহরের সর্বাপেক্ষা সুরম্য বাড়ি, যেটি পরবর্তী কালে রাজ্যপালের আবাসে পরিণত হয়। শ্রীমতী থর্প ছিলেন লৌহদৃঢ় ইচ্ছাবিশিষ্ট প্রবল প্রতাপান্বিতা এক মহিলা যিনি শহরটির সামাজিক জীবনের উপর আধিপত্য করতেন। "তাঁর আধিপত্য ছিল ঔজ্জ্বল্যপূর্ণ এবং অবিসংবাদিত এবং সেজন্য তুলনারহিত উইসকনসিনের রাজধানীতে এরকমটি আর দেখা যায় নি"।[১৭] এই একই বর্ণনানুসারে—" 'ইয়াঙ্কি পর্বতশীর্ষে' অবস্থিত বিশাল ভবনটি সামাজিক অনুষ্ঠানাদির স্বীকৃত কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং থর্প পরিবারের উদ্যান-উৎসবে, সঙ্গীতের আসরে, অপেশাদার নাটকাভিনয়ে এবং অভিজাত রীতি অনুসারে আয়োজিত বিপুল নৈশভোজের উৎসবে আমন্ত্রণ পাওয়ার জন্য লোকেরা ব্যাকুল হয়ে উঠত"।[১৮] এটা স্বাভাবিক যে, এই থর্প পরিবার শহরে আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বগৃহে আমন্ত্রণ জানাতেন এবং এইভাবেই একদিন ইয়াঙ্কি প্রাসাদের বিশাল সভাকক্ষে ষাট বৎসর বয়স্ক বিপত্নীক ওলি বুল সদ্য কুড়ি বৎসর বয়সে উপনীত বালিকা সারা থর্পের সাক্ষাৎ লাভ করেন, পরে তাঁর প্রতি প্রণয় নিবেদন করেন। মার্টিমার স্মিথ-কৃত "ওলি বুলের জীবনী"-শীর্ষক গ্রন্থে সারাকে বর্ণনা করে বলা হয়েছে— " সারা কৃষ্ণকেশী, কিঞ্চিৎ গম্ভীর এবং বিষণ্ণ সৌন্দর্যের অধিকারিণী, গভীর বোধশক্তি-সম্পন্না এবং সঙ্গীত প্রেমে উন্মাদ এবং তাঁর মাকেই ধন্যবাদ জানাতে হয় এজন্য যে প্রধানত তাঁর জন্যই সারা কখনও তার সমবয়স্ক তরুণদের সংস্পর্শে আসতে পারেন নি।"[১৯] সারা ছিলেন আবেগ-প্রবণ, আদর্শবাদী ও সংবেদনশীল। কথিত আছে যে, সারার যখন ১৭ বৎসর বয়স তখন মায়ের

* বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১ম সং, পত্রসংখ্যা ১৭৪, পৃঃ ১০৭

সঙ্গে ওলি বুলের একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান শুনতে গিয়েছিলেন এবং তখনই তিনি মনে মনে স্থির করেন যে, কোন না কোন দিন তিনি হবেন ওলি বুলের পত্নী। যখন বিশ বৎসর বয়সে সামাজিকভাবে তিনি শ্রীযুক্ত ওলি বুলের সঙ্গে পরিচিত হলেন তখনও তাঁর সে সঙ্কল্প অটুট ছিল।

শ্রীযুক্ত ওলি বুলের দিক থেকে যাকে বলে প্রথম দর্শনে প্রেম তাই-ই ঘটেছিল। তাঁর জীবনীকার বলছেন— "কিন্তু এই যে বয়স এবং তারুণ্যের মধ্যে আবেগপূর্ণ প্রণয় ঘটল, তার কোন মিলনাত্মক পরিণতি ঘটত না যদি না সেই অনন্যসাধারণ মহিলা—সারার মা এর মধ্যে থাকতেন।"[২০] এ বিষয়ে স্বামীর সকল আপত্তি নস্যাৎ করে দিয়ে শ্রীমতী থর্প এই প্রণয় ব্যাপারকে উৎসাহিত করতে থাকলেন যতদিন না ১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তা বিবাহে পরিণতি লাভ করল। এ একটি অনন্যসাধারণ মিলন, কারণ শুধু যে বয়সের দিক থেকে স্বামী স্ত্রী-র মধ্যে চল্লিশ বৎসরের পার্থক্য ছিল তাই নয়, উভয়ের পশ্চাৎপট মনমেজাজের মধ্যেও বিরাট পার্থক্য ছিল। সারা ছিলেন মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের একটি ঐতিহ্যবাহী পরিবারের কন্যা ; আর ওলি বুল কোন ঐতিহ্যের ধার ধারতেন না, তিনি ছিলেন শিল্পীদের মুক্ত-সমাজভুক্ত মানুষ। এ সকল বিরাট বিরাট পার্থক্য সত্ত্বেও এই দম্পতি পরস্পরকে ভালবেসেছিলেন এবং সবই সুখের হতো যদি না শ্রীমতী থর্প, শ্রীযুক্ত থর্প, তাঁদের পুত্র যোশেফ এবং শ্রীমতী অ্যাবী সেপ্লে (শ্রীমতী থর্পের সঙ্গিনী) এবং তাঁর দুটি সন্তান এঁদের বিরামহীনভাবে অনুসরণ করে ফিরতেন—সে তাঁরা যেখানেই যান—আমেরিকা বা ইউরোপে। বেশ কয়েক বৎসর এই পুরো দলটি এদের সঙ্গে বসবাস করেন, ভ্রমণ করেন এবং এঁদের সঙ্গে তর্কাতর্কি এবং অবিরাম উপদেশ বর্ষণ করে চলতেন, সবসময়ই সেজন্য আশঙ্কা ছিল কখন বিস্ফোরণ ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত আবেগপ্রবণ এবং অমিতাচারী ওলি বুলকে একজন বাধ্য এবং সম্ভ্রান্ত জামাতাতে পরিণত করার অসংখ্য ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর শ্রীমতী থর্প এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, ইনি তাঁর কন্যার উপযুক্ত স্বামী নন। সিদ্ধান্তে আসার সঙ্গে সঙ্গে অতি দ্রুত তিনি দম্পতির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটালেন এবং সারা ও তার শিশু কন্যা ওলিয়াকে, যে জন্মেছিল ১৮৭১ সালে—ম্যাডিসনের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন।

কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা তাঁর মাতৃদেবীর সমকক্ষ হয়ে দাঁড়ালেন। ম্যাডিসনের বাড়িতে দু-বছর বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করবার পর একদিন সারা মাতা পিতার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ম্যাডিসনের

গৃহ পরিত্যাগ করলেন এবং নরওয়েতে এসে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হলেন। এরপর বুল পরিবার পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষা করে শান্তিতে জীবন-যাপন করতে লাগলেন—অবশ্য যদি একজন ঐকতান সঙ্গীতের বেহালাবাদকের জীবনে পারিবারিক গোপনীয়তা ও শান্তি বলে কিছু থেকে থাকে। এ অন্ততপক্ষে এমন একটি জীবনযাত্রা ছিল যার মধ্যে থর্প পরিবারের হস্তক্ষেপ ছিল না এবং শেষ পর্যন্ত থর্পরা এটি মেনে নিয়েছিলেন। তারপর থেকে সারার পরিবার এবং শ্রীযুক্ত ওলি বুলের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। শ্রীমতী বুল বৈষয়িক ব্যাপারে তাঁর বিষয়-বুদ্ধিহীন স্বামীর কাজকর্ম নিজের হাতে তুলে নিলেন এবং তাঁর সঙ্গীত অনুষ্ঠান সম্পর্কিত ভ্রমণ-সূচীর প্রকৃতপক্ষে তিনিই ব্যবস্থাপক হয়ে দাঁড়ালেন, প্রয়োজন হলে তিনি নিজ পিতার নিকট হতে অর্থ ঋণ নিয়েছেন এবং এভাবেই তিনি তাঁর বর্ষীয়ান এবং কিছুটা ভ্রান্তপথে চলা স্বামীর একজন পরিণত ও দক্ষ স্ত্রী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এবং সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপারে সর্বেসর্বা হয়েছিলেন। স্বামীকে তিনি ভালবাসতেন প্রাণ দিয়ে, সত্যই যেন তিনি পূজা করতেন তাঁকে।

ইতোমধ্যে শ্রীমতী থর্প ম্যাডিসন শহরের জীবনে একঘেয়েমী অনুভব করে তাঁর পরিবারবর্গকে কেম্ব্রিজে নিয়ে এলেন। সেখানে আসার পর তাঁর পুত্র যোশেফ কবি লংফেলোর কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করায় তিনি পরম আহ্লাদিত হলেন। বুল পরিবার আমেরিকায় এলে বসবাসের জন্য কেম্ব্রিজে একটি স্থায়ী আবাস গড়ে তোলেন—অবশ্য পৃথক সংসার ছিল তাঁদের এবং ১৮৮০ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর হতে শ্রীমতী বুল এখানেই বসবাস করতে থাকেন। শ্রীযুক্ত ওলি বুলের জীবনীতে বলা হয়েছে— "শ্রীমতী বুল কেম্ব্রিজে একজন খ্যাতনামা মহিলা, এখানে ব্র্যাটল স্ট্রীটের এই সুবৃহৎ বাড়িতে ১৯১১ সালে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত বাস করেন। এখানে থাকতে থাকতে তিনি সমাজে একজন অতি সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন এবং বাড়িটি হয়ে ওঠে 'বুদ্ধিজীবী' এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মিলনক্ষেত্র। তিনি তাঁর বিশাল অতিথি-আপ্যায়ন-কক্ষে এই সকল সামাজিক সমাবেশে পৌরোহিত্য করতেন নম্র বিনয়ের সঙ্গে এবং এঁকপ্রকার বিষণ্ন সৌন্দর্য তাঁকে ঘিরে থাকত। এখানে তাঁকে দেখা যেত হয়তো স্বামী বিবেকানন্দকে ও তাঁর বেদান্ত-দর্শনকে তাঁর সাবধানী ও অস্পষ্টভাবে সংশয়ী কেম্ব্রিজের বন্ধুদের নিকট পরিচিত করে দিচ্ছেন অথবা উইলিয়াম জেম্‌সের সঙ্গে 'ধর্ম' বিষয়ে

আলোচনা করছেন, কিংবা উদ্যমশীল উচ্চগ্রামের কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী জন ফিস্কের সঙ্গীতের সঙ্গে যন্ত্রে সহযোগিতা করছেন। দুবছর তিনি তাঁর গৃহে 'কেম্ব্রিজ সম্মেলন' নামে অভিহিত সম্মেলনটির পরিচালনা করেন। এখানে শ্রীযুক্ত ওলি বুলের একটি আবক্ষমূর্তি ও অসংখ্য চিত্র-শোভিত একটি ভারতীয় সেগুন কাঠে আগাগোড়া মোড়া বসার ঘরে উপবেশন করে শ্রোতাদের সৌভাগ্য হতো বিতর্কিত সামাজিক সমস্যাদি নিয়ে অধ্যাপক জেম্‌স, টমাস ওয়েন্টওয়ার্থ হিগিন্‌সন্‌, জোসিয়া রইস এবং জেন এডামসের মতো ব্যক্তিবর্গের মুখ থেকে আলোচনা শোনার। শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বসে থাকতেন অভিজাত কুলোদ্ভব কুমারী এলিস লংফেলো, আর্ভিং ব্যাবিট, অধ্যাপক মুনস্টার বার্গ, তখনও কর্মঠ জুলিয়া ওয়ার্ড হাউ, এমন কি গার্ট্রুড স্টেইন নামক একজন তরুণী র‍্যাডক্লিফের ছাত্রী"।[২১]

শ্রীমতী বুল যেমন এইসকল আসরের জন্য সুসজ্জিত বসার ঘরের ব্যবস্থা করতে পারতেন, তেমনি বিশুদ্ধ ও নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থলও যোগান দিতে পারতেন এবং এখানেই ১৮৯৪-এর অক্টোবর মাসে তিনি স্বামীজীকে নির্ঝঞ্ঝাটে লেখার কাজ সম্পন্ন করবার জন্য একটি নিরিবিলি স্থান দিয়েছিলেন। অবশ্য এ কিছু অসম্ভব নয় যে তিনি হয়তো এই সুযোগে স্বামীজীকে তাঁর সুবৃহৎ বসার ঘরেও দুটি একটি ঘরোয়া ভাষণ দিতে সম্মত করেছিলেন এবং সম্ভবত শ্রীমতী বুলের গৃহে বাস করার কালেই স্বামীজী উইলিয়াম জেম্‌সের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পান এবং সম্ভবত এই সময়েই, আমাদের যেরূপ বলা হয়েছে, তিনি সমাধিমগ্ন হয়ে প্রখ্যাত এই দার্শনিককে ঈশ্বরের সঙ্গে দিব্য মিলনের রহস্য সম্বন্ধে বাস্তব পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। যদিও শ্রীমতী বুল স্বামীজীকে তাঁর অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি তাঁকে অধিক পরিমাণে দিয়েছিলেন বিশ্রামের এবং তাঁর চিন্তাধারাকে লিখে ফেলবার সুযোগ। কারণ শ্রীমতী বুলের বোধশক্তি যত গভীর ছিল তত ছিল তাঁর একটি সত্যকারের দরদী মন, তিনি নিশ্চিতরূপে বুঝেছিলেন যে, স্বামীজীর কয়েকটা দিন শান্তিতে কাটানোর বড় প্রয়োজন।

সেপ্টেম্বরের ২১ তারিখে স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে লেখেন—

"আশা করি, শীঘ্রই ভারতে ফিরব। এদেশ তো যথেষ্ট ঘাঁটা হলো, বিশেষত অতিরিক্ত পরিশ্রম আমাকে দুর্বল করে ফেলেছে সাধারণের সমক্ষে বিস্তর বক্তৃতা করায় এবং একস্থানে স্থিরভাবে না থেকে ক্রমাগত তাড়াতাড়ি

এখানে থেকে সেখান ঘোরার দরুণ এই দুর্বলতা এসেছে।... সুতরাং বুঝছ আমি শীঘ্রই ফিরছি।"[২২]* পুনরায় সেপ্টেম্বরের ২৭ তারিখে লিখলেন—"আর এই জনপ্রিয়তার জীবনের এবং সংবাদপত্রের উপজীব্য হওয়ার অসারতা আমাকে বিরক্ত করে তুলেছে। আমি এখন হিমালয়ের নির্জনতার মধ্যে ফিরে যেতে চাই।"[২৩]** তথাপি তাঁর এরকম প্রচণ্ড শ্রান্তি সত্ত্বেও ১৮৯৪-এর শেষভাগেও তিনি যেখানেই সুযোগ এসেছে বক্তৃতা করেছেন। বোঝা যাচ্ছে—একথা পূর্বেও বলা হয়েছে—যে কোন এক স্থানে স্থিতিস্থাপক হয়ে বসার আগে তাঁর ভাগ্যবিধাতার নির্দেশ ছিল যে তিনি তাঁর প্রভাব আমেরিকায় চারিদিকে ছড়িয়ে দেবেন। তাঁর আশীর্বাদ পাঠাবেন দিকে দিকে এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিকাশের সম্ভাবনাপূর্ণ আধ্যাত্মিকতার বীজ বপন করবেন এবং এজন্য হাজার হাজার লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এবং শুধু যে তাদের মনকেই নাড়া দেবেন তা নয়, তাদের অন্তরের গভীরতম দেশে যেখানে তাঁর মতো দিব্যপুরুষ ব্যতীত কেউই পৌঁছতে পারেন না—সেখানে পৌঁছবেন এবং জাগরণ আনবেন। সুতরাং শ্রীমতী বুলের গৃহে তাঁর থাকা দীর্ঘসময়ের জন্য হয়নি বটে, কিন্তু তা তাঁকে তাঁর পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় বিশ্রামের অবকাশ দিয়েছিল।

অক্টোবরের ১০ তারিখে তিনি শ্রীমতী হেলকে লিখলেন— "আমি কাল এখান থেকে বাল্টিমোর যাচ্ছি" এবং তাতে আরও লিখলেন ঃ

এখানে সব খরচ দেবার মতো সঙ্গতি ছিল আমার, কিন্তু যেহেতু আমি শ্রীমতী বুলের অতিথি হয়ে আছি, সেজন্য আমার কোন খরচ লাগেনি। তিনি একজন বিরাট ধনী ও সু-সংস্কৃত ব্যক্তি। তিনি আমাকে আমার কাজের জন্য অথবা যেমন খুশি ব্যয়ের জন্য পাঁচশত ডলার দিয়েছেন। যেহেতু আমি পশ্চিমাঞ্চলে শিগ্‌গিরই যাচ্ছি না, সেজন্য বোস্টনে একটি ব্যাঙ্কে টাকাটা রাখার ব্যবস্থা করছি। ফিলাডেলফিয়া হতে আমি ওয়াশিংটনে যাব, তারপর আমি নিউ ইয়র্ক ও বোস্টনের মধ্যে যাতায়াত করতে থাকব। সুতরাং মনে হয় না যে এর মধ্যে আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারব, একমাত্র ভগিনী মেরী হবে ব্যতিক্রম [মেরীর বোস্টনে আসার কথা ছিল]—আমি বিশেষভাবে চাইছি যে মেরী শ্রীমতী বুল ও আমার

* বাণী ও রচনা, ১ম সং ৬ষ্ঠ খণ্ড, পত্রসংখ্যা ১১৪, পৃঃ ৪৮০
** ঐ, পত্রসংখ্যা ১১৮, পৃঃ ৪৯৩

এখানকার অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুক। আমি যেমনটি অন্যত্র করে থাকি, এখানকার শক্তিকে ব্যবহার করতে পেরেছি এবং এখানে ও ভারতে আমার কাজকর্ম ভালভাবেই অগ্রসর হচ্ছে। এ কথা সকলকে বলবেন না মা, কথাগুলি কেবল আপনার, আমার ও বাচ্চাদের মধ্যেকার—এবং কোন কিছু নিয়ে আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। যে অপেক্ষা করতে জানে তার কাছে সব কিছুই আসে। আমি যে টাকাকড়ি পেয়েছি, তা শিগ্‌গিরই ভারতে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তাহলে আরও তাড়াতাড়ি টাকা আসবে। এ আমি সবসময় দেখেছি যে, আমি যত তাড়াতাড়ি খরচ করি, তত তাড়াতাড়ি টাকা আসে। প্রকৃতি শূন্যতাকে ঘৃণা করে। আমি খুব মনের আনন্দে আছি, কেবলমাত্র আপনি মাঝে মাঝে আপনার, বাচ্চাদের এবং পিতা পোপের সংবাদ আমাকে জানাবেন।

আপনার বোধহয় মনে আছে মহীশূর থেকে যে দুটি চিঠির খাম এসেছিল—তার মধ্যে একটা আমার দরকার—যেটার ওপরে মহীশূরের রাজার শিলমোহর ছিল—সেটা পাঠাতে হবে নিউ ইয়র্কে ১৯ ওয়েস্ট থার্টি-এইট স্ট্রীটস্থ বাড়িতে কুমারী ফিলিপসকে।

এখনই আমি নিউ ইয়র্কে বা শিকাগোতে যেতে পারছি না—যদিও দুটো জায়গা থেকেই বেশ কিছু নিমন্ত্রণ ও বক্তৃতার জন্য আহ্বান ছিল। এখন আমি রাজধানী ও অন্যান্য অদেখা শহরগুলো দেখতে যাব। আমি তাঁর হাতে রয়েছি। যদি কুমারী মেরী কোন সময়ে বোস্টনে এসে পড়ে তাহলে আশা করছি যে তার সঙ্গে দেখা হতে পারে।..."

ভারত থেকে অবিরাম সকলে লিখছে—"চলে এস—এস—এস"। তারা গোপন রহস্যটি জানে না। আমি ওখানে থেকে যা কাজ করতে পারব, তার থেকে ঢের বেশি পারব এখান থেকে।

দয়া করে আমার চিঠিগুলি এই ঠিকানায় পাঠাবেন এবং সেগুলি নির্বিঘ্নে আমার কাছে পৌঁছবে, সে আমি যেখানেই থাকি না কেন। আমি যখন বোস্টনে থাকব, তখন এটাই আমার বাড়ি।

প্রিয় মা, ঈশ্বর আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন—

আপনার স্নেহাস্পদ[২৪]

এখন স্বামীজী তাঁকে যে ৫০০ ডলার দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, সেটা দেবার সময় শ্রীমতী বুল সঙ্গে একটি চিঠি দিয়েছিলেন, সেটির একটি খসড়া, তাঁর নিজের হাতে করা, আমাদের হস্তগত হয়েছে। সেটির পাঠ হলো ঃ

প্রিয় শ্রীযুক্ত বিবে কানন্দ

আপনি আমাদের এই গৃহে আপনার উপস্থিতির দ্বারা একে উচ্চতর উদ্দেশ্যে ব্যবহারে লাগিয়ে পুণ্যময় করে তুলেছেন। সেদিক দিয়ে আপনি আমাদের এক মহা মূল্যবান সম্পদ দান করেছেন। যদি এমন কেউ থেকে থাকে—ছিলও তারা—যারা আপনাকে বহিষ্কার করেছে এবং মর্মান্তিক আঘাত দিয়েছে—তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে তারা অজ্ঞানতাবশতই এরূপ করেছে। জলের গতিরোধ করার জন্য তাবা যে পাথরগুলি নিক্ষেপ করেছে, সেগুলিকে তা করতে দেবেন না, আপনি কোমল স্পর্শদ্বারা মহিমার সঙ্গে সেগুলিকেই তাদের জন্য রুটিতে পরিণত করুন—কারণ সত্যিই তারা জানে না যে তারা কি করেছে। তাদের জীবনের পরিস্থিতি ঠিক এখানে আপনার থেকে অন্য ধরনের, সেজন্যই তারা এভাবে স্বীকৃতি দিল তাদের সেই প্রয়োজনগুলিকে যা অমূল্য, এদের এসব কাজ আপনাকে কোন অসুবিধায় ফেলতে পারে না। আমার স্বামী এখানে পঞ্চাশ বছর ধরে কাজ করেছেন এবং তাঁর যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ দেবার ছিল তা দিয়েছেন। তিনি থাকলে আপনাকে ও আপনার আদর্শকে সাদরে গ্রহণ করতেন। আমার পরম সৌভাগ্য যে, যখন তাঁর শত্রুমিত্র সমভাবে তাঁর অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক ভাবের ওপর আঘাত করত, তখন আমি তাঁকে সেই আঘাত থেকে বাঁচাতে শিখেছিলাম, তাঁকে তাঁর বার্ধক্যে আশ্রয় দিতে শিখেছিলাম। যেহেতু আমি বিশ্বাস করি যে, সব কর্মের লক্ষ্য একই, সেজন্য আমাকে ভাবতে দিন যে, আপনি তাঁরই পুত্র এবং দয়া করে এই পত্রের সঙ্গে যা আছে তা গ্রহণ করবেন। আপনি যখনই আমাদের কাছে আসবেন এ বাড়িটাকে এবারের মতোই ব্যবহারে ও সেবাকার্যে লাগাবেন এবং আগামী বৎসরসমূহেও আমি সমপরিমাণ অর্থই আপনার হাতে তুলে দিতে পারব বলে আশা করছি, যা দিয়ে প্রয়োজনমত আপনার ও আপনার দেশবাসীর সেবা হবে—আপনার দেশবাসীরাও তো আমার স্বজন। আমি এই চেকটিকে এমন একটি নির্দেশনামায় পরিণত করে দিতে চাই যাতে আপনি যেখানেই থাকুন না কেন এটি সহজেই ভাঙাতে পারেন এবং প্রয়োজনমত অল্প অল্প করে তুলতে পারেন, যদি তাতেই আপনার সুবিধা হয়। এটিতে আপনার স্বাক্ষর প্রয়োজন হবে সেজন্য টাকা নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে এটা কাছে রাখলে এই অর্থ সুরক্ষিত থাকবে।

আমি এই ব্যবস্থাটি আপনি বাল্টিমোরে যাবার আগেই করে দিতে চাই। আমাকে আপনার কৃতজ্ঞ বন্ধু হিসাবে বিশ্বাস করবেন—

সারা বুল[২৫]

এটাই ছিল স্বামীজীর কাজে শ্রীমতী বুলের দীর্ঘকালীন এবং উদার হস্তে দান পর্বের সূচনা। তিনি যে শুধু আর্থিক দান দ্বারা তাঁর সেবা করেছেন তা নয়, আরও নানাভাবে করেছেন—তাঁর বাড়িতে স্বামীজীর শিক্ষাদানের আসরগুলির ব্যবস্থা করেছেন, তাঁর শিষ্যদের আংশিক ভরণপোষণ করেছেন, পরবর্তী দুবছর নিউ ইয়র্কের কাজেও সাহায্য করেছেন। মা যেমন ছেলেকে দিয়ে থাকেন সেরকম ছোটখাট উপহারও তিনি তাঁকে দিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যখন স্বামীজী বাল্টিমোরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন, তখন তিনি সুন্দর একটি বাদামী রঙের জিনিসপত্র রাখবার জন্য ব্যাগ দিলেন, দিলেন সৌভাগ্যের চিহ্নস্বরূপ টাকা রাখবার একটি বাদামী রঙের ছোট থলিও। এই শেষ উপহারটি দেবার সময় একটি কার্ডে লিখে দিলেন—

আমার প্রিয় সন্তান,

এই উপহারটি গদ্যময়, কিন্তু বাদামী রঙের দস্তানা জোড়ার সঙ্গে শুভেচ্ছার চিহ্নস্বরূপ এই বাদামী রঙের থলিটি পূর্ণতা এনে বাদামী পোশাকের ঔজ্জ্বল্য বাড়াবে। বহুদিন ধরে অনেক সুখের দিনে এটি ব্যবহার করতে থাক—এই প্রার্থনা।

ভালবাসা—

এম আই এল

[ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত মা][২৬]

এরপর আমরা স্বামীজীর সম্বন্ধে যে সংবাদ পাই, তা হলো অক্টোবরের ১২ তারিখের সন্ধ্যায় তাঁর মেরীল্যাণ্ডের অন্তর্গত বাল্টিমোরে আগমন বিষয়ে। এই পুরান শহরটি আমেরিকার সুবিখ্যাত সামুদ্রিক বন্দরগুলির অন্যতম। তখন তার জনসংখ্যা ছিল বোস্টনের জনসংখ্যার চেয়ে কম (বর্তমান জনসংখ্যা অনেক বেশি)। মৃদুমন্দ দক্ষিণ হাওয়া এর ওপর দিয়ে বয়ে যেত। এখানকার বাড়িগুলি—"আনন্দদায়ক লাল রঙের ইঁটের" তৈরি ছিল এবং সাধারণের জন্য ব্যবহারের উদ্যানগুলি ছিল "পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর"।[২৭] কিন্তু বাল্টিমোরের সংবাদপত্রগুলি ছিল অন্যান্য শহরের সংবাদপত্রগুলির মতো একেবারে একই ধরনের। আমেরিকান পত্রিকার প্রতিবেদক স্বামীজীর

সাক্ষাৎকার নিতে একটুও সময় নষ্ট করেন নি এবং তাঁর আগমনের পরের দিন-ই নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি নানাবিধ ভ্রমপ্রমাদসহ প্রকাশিত হয় ঃ

একজন উচ্চ পদাধিকারি ভারতীয় ধর্মযাজক

স্বামী বিবেকানন্দের বাল্টিমোরে আগমন

ধর্মসংক্রান্ত তাঁর মতামত

ভারতের একজন উচ্চ পদাধিকারি ব্রাহ্মণ ধর্মযাজক স্বামী বিবেকানন্দ গতকাল রাত্রে বাল্টিমোরে এসেছেন এবং তিনি রেভারেণ্ড ওয়ালটার ক্রম্যানের অতিথি হয়ে আছেন। প্রায় বৎসরাধিক কাল পূর্বে তিনি আমেরিকায় এসেছিলেন শিকাগো বিশ্বমেলার সঙ্গে সংযুক্ত ধর্মমহাসভায় যোগদান করতে এবং সেখানে প্রদত্ত তাঁর ভাষণ তাঁকে সেখানকার একজন জনপ্রিয় প্রতিনিধি করে তুলেছিল। আকৃতিতে স্বামী বিবেকানন্দ ছবির মতো সুদর্শন। তাঁর উচ্চতা প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট, গড়ন ভারি ধরনের, প্রায় দু-শ-পঁচিশ পাউণ্ডের মতো হবে তাঁর ওজন। গায়ের রঙ ঘোর, তবে সে রঙে এশিয়ার জাতিসমূহের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মুখমণ্ডল গোলাকার এবং ভারি ধরনের এবং একরাশ ঘন কুঞ্চিত কেশ শোভিত তাঁর মস্তক, দু এক গাছি কুঞ্চিত কেশ তাঁর কপালের ওপর এসে পড়ে ভ্রূ স্পর্শ করেছে। তাঁর চক্ষুদ্বয় তাঁর কেশরাশির মতোই ঘন কৃষ্ণবর্ণের এবং চক্ষুদুটি উজ্জ্বল এবং জ্যোতিচ্ছটাপূর্ণ। যখন তিনি হাসেন, (এবং তিনি প্রায়ই হেসে ওঠেন) তখন তাঁর খাঁটি মুক্তোর মতো শুভ্র দন্তরাজি বিকশিত হয়ে পড়ে। তাঁর মুখশ্রী সুন্দর এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো এবং তাঁর স্বভাব যারপরনাই মধুর এবং প্রফুল্ল। যে পোশাক তিনি গতরাত্রে পরেছিলেন তার ছাঁট ধর্মযাজকদের পোশাকের মতো। তবে তাঁর দেশবাসীর সম্মুখে যে পোশাক তিনি পরেন, তা তিনি এদেশেও সচরাচর পরে থাকেন। পোশাকটি হলো লাল এবং হলুদ রঙের সমাবেশে বেশ উজ্জ্বল। যদিও তিনি মাত্র তেত্রিশ বৎসর বয়স্ক, তাঁর পাণ্ডিত্য সুগভীর এবং তিনি সাতটি ভাষা স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন এবং পড়তে পারেন আরও অধিক সংখ্যক ভাষা। তাঁর ইংরেজী সর্বপ্রকার সমালোচনার ঊর্ধ্বে।

গত রাত্রে স্বামী বিবেকানন্দ একজন আমেরিকাবাসী সাংবাদিককে বলেন—"এ দেশে থেকে আমেরিকার যে-সকল প্রথা প্রতিষ্ঠানসমূহ দেখেছি,

সেগুলি আমার ভাল লেগেছে। আমি এখানে যতদিন থেকেছি, তা কেটেছে চারটি শহরে—শিকাগো, নিউ ইয়র্ক, বোস্টন এবং ডেট্রয়েটে। দেশে থাকাকালে আমি শিকাগোর নাম কখনও না শুনলেও বাল্টিমোরের নাম বহুবার শুনেছি। আমেরিকা সম্বন্ধে আমার মুখ্য অভিযোগ যে, এখানে ধর্মের প্রভাব খুব কম, ভারতে তা অত্যন্ত বেশি। আমার মনে হয় ভারতের যেটুকু উদ্বৃত্ত ধর্ম তা যদি এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাতে জগতের কল্যাণ হবে, আর ভারতের কল্যাণ হবে যদি আমেরিকার শিল্পোন্নয়ন ও সভ্যতা সেখানকার অধিবাসীরা কিছু কিছু লাভ করে। আমি সব ধর্মে বিশ্বাস করি। আমি মনে করি আমার ধর্মে সত্য আছে, আমি মনে করি তোমাদের ধর্মেও সত্য আছে। সব ধর্মের মধ্য দিয়ে একই সত্য বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে একই লক্ষ্য অভিমুখে ধাবিত। আমি মনে করি জগতের আজ প্রয়োজন কিছু কম আইন-কানুন এবং কিছু দিব্য চরিত্রের নরনারী।"

'স্বামী' শব্দটির অর্থ উচ্চপদস্থ ধর্মযাজক অথবা ধর্মক্ষেত্রে 'প্রবীণ' ব্যক্তি, এর দ্বারা তাঁর পদমর্যাদা অভিব্যক্ত, তাঁর নামের দ্বিতীয় অংশটি তাঁর পারিবারিক নাম। তাঁর পরিবারের কথা ২০০০ বছর আগে লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়। তিনি ভারতের উচ্চতম বর্ণভুক্ত এবং স্বদেশে তিনি দেবদেবীর সমপর্যায়ভুক্ত বলে পরিগণিত, সাধারণের নিকট তিনি পূজ্য বলে বিবেচিত। তাঁর ধর্ম হিন্দুধর্ম। গতবৎসর শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর ভাষণ গভীর প্রেরণা-সঞ্জাত এবং যারাই সেটি শুনেছে বা পড়েছে সকলেই গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

আমেরিকায় বসবাস-কালে স্বামীজী আমেরিকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ করে আমেরিকার শাসনব্যবস্থা জানবার প্রয়াস করেছিলেন। তিনি এখানে একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষে, যেখানে বিশ্বের সকল ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষাদান করা হবে, কারণ তিনি মনে করেন আমেরিকায় ভারতের ধর্মপ্রচারক আসার চেয়ে আমেরিকা থেকে ভারতে ধর্মপ্রচারক যাওয়ার প্রয়োজন যে বেশি তা নয়।

স্বামী বিবেকানন্দের আলাপচারিতা মনোমুগ্ধকর। প্রায় বারোটি ভাষার সুপ্রসিদ্ধ লেখকদের লেখার সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে এবং তিনি স্পেন্সার, ডারউইন, মিল এবং অন্যান্য মহান দার্শনিকদের রচনা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতিসকল যে সাবলীলতার সঙ্গে দেন, তা বিস্ময়কর। আগামী কাল সন্ধ্যায় তিনি লাইসিয়াম রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত থাকবেন, তাঁর সঙ্গে থাকবেন ক্রুম্যান ভ্রাতৃত্রয়।

সেখানে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেবেন। সেইসময় তিনি তাঁর দেশীয় পরিচ্ছদে ভূষিত থাকবেন।

স্বামীজী যখন বাল্টিমোর দর্শনে আসেন তখন ক্রম্যান ভ্রাতৃত্রয়ের বয়স বিশের কোঠার গোড়ার দিকে; কিন্তু তখনই তাদের উপজীবিকা ছিল বিচিত্র ধরনের। তিনজন—ওয়াল্টার, হিরম এবং কার্ল—একটি প্রাণশক্তিতে ভরপুর পাঁচ বালক সদস্যের পরিবারভুক্ত, এরা প্রত্যেকেই ছিল ধর্মপ্রচারক। তিনজন ছিল কংগ্রিগেশনালিস্ট সম্প্রদায়ভুক্ত, একজন ব্যাপটিস্ট, অবশিষ্ট জন হিরম প্রথমে ছিল কংগ্রিগেশনালিস্ট পরে হয় 'সুইডেনবর্গিয়ান' সম্প্রদায়ভুক্ত।

হিরম এবং তার চেয়ে বয়সে বড় এক ভাইয়ের—সম্ভবত সে ওয়াল্টার—সম্বন্ধে একটি কাহিনী আছে, যেটি তাদের উদ্যমশীলতার পরিচায়ক। তাদের বয়স যখন যথাক্রমে বারো এবং চোদ্দ, হিরম এবং তার ভাইয়ের স্বাস্থ্য দুর্বল বিবেচিত হওয়ায় তাদের কানসাসের বাড়ি থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় পশ্চিমাঞ্চলে একটি ঝরনা অঞ্চলে—যে জায়গাটিকে তখন আবালবৃদ্ধবণিতার সর্বরোগহর বলে মনে করা হতো। কিন্তু দেখা গেল যে এরা দুভাই ঝরনাকে বিশেষ ব্যবহার করল না। এখানে তারা এমন একজন সাবান-বিক্রেতার সাক্ষাৎ পায় যার সাবান জামাকাপড়ের সব কলঙ্কচিহ্ন দূর করতে পারত। দুভাই তাদের নিকট চিকিৎসাবাবদ যে অর্থ ছিল তাই দিয়ে সাবান বিক্রেতার সব সাবান কিনে নিল এবং সাবান প্রস্তুতের প্রণালীটিও তার কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে শিখে নিয়ে নিজেরাই সাবান প্রস্তুত করে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করে বেড়াতে লাগল। এইভাবে বিশেষ উদ্যমশীলতার পরিচয় রেখে সারা পথে "ঝটিতি পরিষ্কার"—এই আখ্যায় আখ্যাত সাবান বিক্রি করতে করতে তারা নিজেদের উপার্জন সহায়ে একদা এসে পৌঁছল কলোরাডোর অন্তর্গত ডেনভারে। তখন তারা সাবান বিক্রি করার ব্যাপারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ডেনভারে তখন একটি মেলা চলছিল। সেখানে সমস্ত উপার্জিত অর্থ বিনিয়োগ করে চীনাবাদাম বিক্রির একটি ছোট্ট দোকান খুলে বসল। চীনাবাদামের ব্যবসায়েও দ্রুত উন্নতি হয়। ফলে দুই ভাই বাড়ি ছেড়ে আসা থেকে যা কিছু ব্যয় হয়েছে তা এবং আরও অতিরিক্ত ২০০ ডলার—তখনকার দিনে বেশ মোটা অঙ্কের অর্থ—বাবা মাকে পাঠিয়ে দেয়। বাবা মা তো এদিকে ওদের খবর না পেয়ে চরম উদ্বিগ্ন হয়ে ভেবে পাচ্ছিলেন না যে কি করবেন। এখানেই তাদের রোমাঞ্চকর অভিযানের সমাপ্তি ঘটল না। যখন তারা ডেনভার ত্যাগ করল, ততদিনে তাদের যা কিছু রোগ-পীড়া

ছিল তা নিরাময় হয়ে গিয়েছে। তারা তখন একটি বক্তৃতা-সফর শুরু করল। বড়টি তখন পনের, সে করোটিতত্ত্বের উপর বক্তৃতা দিত, আর ছোটটি হিরম— তার বয়স তখন তের—আগাম লেনদেনের দালাল হিসাবে কাজ করত।

এ কাহিনী আমেরিকায় প্রচলিত দুঃসাহসিক অভিযান কাহিনীরই মতো। অবশ্য এটা ঠিক যে এ ধরনের ঘটনা উনবিংশ শতাব্দীতেই ঘটা সম্ভব ছিল। যখন সমস্ত দেশটাতেই সকলের জন্য সুযোগ ছিল উন্মুক্ত এবং সেখানে ছোট ছেলেদের জন্যও সাফল্য অপেক্ষা করত। কিন্তু ভ্রুম্যান ভ্রাতৃবৃন্দের জন্য দুঃসাহসিক অভিযানের কখনও ইতি ঘটেনি। অবশ্য এ-কথা সত্য যে বক্তৃতা-অভিযানের শেষে উভয় ভ্রাতা কানসাসে বাড়িতে ফিরে আসে এবং শান্তভাবে বিদ্যালয়ে যেতে আরম্ভ করে। হিরম তারপর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করে সাংবাদিকতার পেশায় যোগদান করে, নিউ ইয়র্কের একটি দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং প্রতিবেদক হিসাবে কর্ম স্বীকার করে নেয়। কিছুদিন পরেই সে এ কাজ পরিত্যাগ করে এবং তা করে এবার ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনা করবার উদ্দেশ্যে এবং অল্পদিনের মধ্যে ম্যাসাচুসেটসের অন্তর্গত ওরশেস্টারে কংগ্রিগেশনাল সম্প্রদায়ের গীর্জায় সে ধর্মযাজক হিসাবে যোগদান করে। এ কর্মও তার দীর্ঘস্থায়ী হলো না। অচিরেই সে সুইডেনবর্গিয়ান সম্প্রদায়ের মতবাদ নিয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করে এবং ১৮৯৩ সালে যখন অ্যাসোসিয়েট রিফর্মড গীর্জায় অস্থায়ী পদে যোগদান করবার জন্য বাল্টিমোরে এসে উপস্থিত হয়, তখন সে নিউ জেরুজালেম অথবা সুইডেনবর্গিয়ানদের গির্জায় আচার্যপদে যোগদান করবার আমন্ত্রণ পায়। এ পদটি সে গ্রহণ করে এবং যখন ভ্রুম্যান ভ্রাতৃবর্গ স্বামী বিবেকানন্দকে তাদের আতিথ্য গ্রহণ করবার জন্য আহ্বান জানায় তখন সে উক্ত পদটিতেই অধিষ্ঠিত।

যদি না ওয়াল্টার ভ্রুম্যান সেই দুই দুঃসাহসী অভিযাত্রী ভ্রাতৃদ্বয়—যারা সাবান ফেরি করে বেড়াত—তাদের মধ্যে বড়টি হয়ে থাকে তাহলে স্বামীজীর বাল্টিমোরে আগমনের পূর্বে সে যে কি করত সে বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না। অবশ্য এ-কথা জানা যায় যে ১৮৮৬ সালে—তখনও তার বয়স কুড়ির নিচে—হেনরী জর্জ নিউ ইয়র্কের মেয়র পদপ্রার্থী হলে, সে তার পক্ষে একজন রাজনৈতিক বক্তা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিল। ১৮৯৪ সালে সে এ্যারিনা নামক সাময়িকপত্রের সাংবাদিকের পদে অধিষ্ঠিত ছিল,

আবার বাল্টিমোরে কংগ্রিগেশন সম্প্রদায়ের যাজক পদও অধিকার করেছিল। এই প্রতিষ্ঠানটির সাপ্তাহিক অধিবেশন বসত লাইসিয়াম রঙ্গমঞ্চে।

স্বামীজী যখন ওখানে আগমন করেন তখন ভ্রুম্যান ভ্রাতৃগণের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ কার্ল ভ্রুম্যানের বয়স একুশ। সে তখন যাজকপদের জন্য শিক্ষা লাভ করছে। অত্যন্ত বুদ্ধি-সমুজ্জ্বল বালক, আমেরিকার বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে বিতর্কের জন্য যে-সকল পুরস্কার ও সম্মান ছিল, সে সবগুলিই তখন লাভ করেছে এবং আমেরিকার আন্তঃকলেজ বিতর্ক সমিতির সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে।

যদিও ভ্রুম্যান ভ্রাতৃবৃন্দের বৃত্তি ছিল ধর্মকেন্দ্রিক, তাদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কিন্তু রাজনীতি। তিন তরুণ পীপলস্ পার্টির জন্য উৎসাহের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এ দলের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল নানাবিধ সমাজ-সংস্কার-মূলক কর্মকাণ্ড, যথা—"শিশু শ্রমিক প্রথা বর্জন", "যুক্ত রাষ্ট্রীয় আইনে 'শ্রম প্রথার' সংস্কার সাধন", "প্রাকৃতিক এবং অ-প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের সরকারি একচেটিয়া স্বত্বাধিকার"-প্রথার সংস্কার। ভ্রুম্যান ভ্রাতৃবর্গের "গতিময় ধর্মের" নামে যে-সকল সভা-সমাবেশ আহূত হতো, সেগুলি কার্যত রাজনৈতিক কার্যকলাপের সমার্থক ছিল। তাদের উদ্যমশীল মানাসিকতার পক্ষে এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল যে তারা স্বামীজীর মতো একজন অব্যর্থ জন-আকর্ষণী সুবক্তাকে তাদের সঙ্গে একই মঞ্চে বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রণ জানাবে। যিনি একজন "গতিময়" হিন্দু সন্ন্যাসী হিসেবে ছিলেন প্রসিদ্ধ। অবশ্য বর্তমানে আমরা জানি না কোন্ কারণে স্বামীজীকে এদের আমন্ত্রণ স্বীকার করতে প্রবৃত্ত করেছিল এবং সেজন্য এও জানি না ভ্রুম্যান ভ্রাতৃবৃন্দ কি করে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগও করেছিল। এটুকু বোঝা যায় যে স্বামীজী যখন শ্রীমতী বুলের গৃহে অতিথি হয়ে রয়েছেন, তখন এরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। কারণ অক্টোবরের পাঁচ তারিখে তিনি শ্রীমতী হেলকে লেখেন—"আমি শ্রীমতী ওলি বুলের বাড়িতে আর মাত্র কয়েকটা দিন আছি এবং তারপর নিউ ইয়র্কে শ্রীমতী গার্নসির বাড়ি যাব।"[২৮] সম্ভবত ভ্রুম্যান ভ্রাতৃবৃন্দ কেম্ব্রিজে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনার কথা বলে বাল্টিমোরের প্রতি আকর্ষণ করে—বিষয়টি স্বামীজীর খুব প্রিয় ছিল। ভ্রুম্যানের প্রাণবন্ত এবং খোলামেলা হাবভাবও তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, কারণ খুব কম করে বললেও বলতে হয় এই ভ্রাতৃবৃন্দ ছিল সত্যই সাহসী। আরও হয়তো তিনি

আমেরিকার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলি দর্শনেরও এই সুযোগকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনা যাই হোক না কেন, অন্তরের দিব্য-নির্দেশ না পেলে অন্য কোন কিছুই স্বামীজীকে কোথাও যেতে প্রবৃত্ত করত না—এ দিব্য নির্দেশ তিনি নিজ অন্তরে সতত অনুভব করতেন। সে কথাই তিনি শ্রীমতী হেলকে এই যাত্রার প্রসঙ্গে লিখেছেন–"আমি তাঁরই হাতে"।[২৯]

কিন্তু ক্রুম্যানদের আতিথ্যের মধ্যে আরও অনেক কিছু থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। এই ভ্রাতৃবৃন্দ শুধু যে স্বামীজীকে একটি হোটেলে রেখেছিল, তাই নয়—আপ্যায়নে এ ত্রুটি হয়তো কোন কারণে অনিবার্য ছিল, কিন্তু তারা তাঁর জন্য আগাম কোন ব্যবস্থা করে রাখে নি। যদিও তারা বয়সে ছিল তরুণ, তথাপি ক্রুম্যান ভ্রাতৃবর্গের অভিজ্ঞতার কোন অভাব ছিল না এবং তারা নিশ্চয়ই জানত যে বাল্টিমোরে জাতিগত কুসংস্কার বর্তমান এবং তারা এও নিশ্চয়ই জানত যে তাদের অতিথির গায়ের রঙ কালো এবং সেজন্য হোটেলের করণিকরা কোন পার্থক্য বিচার না করে তাঁকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখবে এবং তাঁর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করবে। তথাপি স্বামীজী বাল্টিমোরে পৌঁছলে রেভারেন্ড ওয়াল্টার ক্রুম্যান তাঁকে একটার পর একটা তৃতীয় শ্রেণীর হোটেলে নিয়ে যায় কেবলমাত্র প্রত্যাখ্যাত হবার জন্য। এই ঘটনা সম্পর্কে স্বামীজী শ্রীমতী বুলকে লিখলেন—"বাল্টিমোরে নিম্নশ্রেণীর হোটেল মালিকদের নিকট থেকে আমি যে মন্দ ব্যবহার পেয়েছি, তার জন্য আপনার দুঃখিত হবার প্রয়োজন নেই। সমস্তটাই ক্রুম্যান ভ্রাতৃবৃন্দের দোষ। তারা আমাকে এইরকম নিম্নশ্রেণীর হোটেলে নিয়ে গেল কেন?"[৩০] মনে হয় অবশেষে স্টেশনের নিকটে একটি পান্থশালায় তিনি জায়গা পান এবং সেখানে এক রাত্রি অতিবাহিত করেন। পরদিন প্রাতে রেভারেন্ড হিরম ক্রুম্যান অবশেষে স্বামীজীকে বাল্টিমোরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হোটেল—হোটেল রেনার্টে—নিয়ে যান এবং সেখানে আর কোন অনাবশ্যক হৈ-চৈ না করে তার জন্য একটি ঘর ভাড়া করেন। 'বাল্টিমোর নিউজ' পত্রিকার একজন রহস্যপ্রিয় প্রতিবেদক, যে নিশ্চয়ই স্বামীজীর এক হোটেল থেকে অপর হোটেলে ঘুরে বেড়াবার সময় পেছনে পেছনে আসছিল, সে একটি নিবন্ধ লিখে ফেলে যাতে সে—যা কিছু আসুক না কেন তাকেই স্বামীজী প্রফুল্লবদনে গ্রহণ করেন এবং এমনকি একজন প্রতিবেদককেও—সে কথা উল্লেখ করে। নিম্নলিখিত সাক্ষাৎকারটি—যদি অবশ্য এটিকে একটি সাক্ষাৎকার বলা যায়—অক্টোবরের ১৩ তারিখ সন্ধ্যায় 'নিউজ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

শহরে ধর্মযাজক স্বামী

একজন উচ্চবর্ণের হিন্দুর বাল্টিমোরে আগমন

তাঁর জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক রেনার্টে সাধারণ বসার ঘরে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—তিনি শিস্ দিয়ে থাকেন এবং প্রাচ্য ভারতীয় ধাঁচের হাস্যকৌতুক প্রায়শই করেন—এ দেশে ভ্রমণের জন্য এসে তিনি বাল্টিমোরে এসেছেন এবং লাইসিয়ামে আগামীকাল রাত্রে বক্তৃতা করবেন।

আজ পূর্বাহ্নে রেনার্টের দালানে হিন্দুজাতির একজন উচ্চতম পদাধিকারি ধর্মযাজক স্বামী বিবেকানন্দ প্রবেশ করলেন। তাঁর পরনে ছিল আগুনের মতো লাল রঙের আলখাল্লা এবং ক্যাটকেঁটে হলুদ রঙের পাগড়ি, যার জন্য তিনি সকলের দৃষ্টির কেন্দ্রীভূত হয়েছিলেন।

স্বামী সদ্য সদ্য বাল্টিমোরে এসেছেন। তিনি গত রাত্রে পৌঁছেছেন এবং স্টেশনের কাছে একটি পান্থশালায় রাত্রি অতিবাহিত করেছেন, সেখানে তারা তাঁকে তাদের আতিথ্য গ্রহণে আমন্ত্রণ জানায়। তাঁর শরীর বেশ মাংসল, তাঁর গাত্রবর্ণ এশিয়াবাসীদের মতো শ্যাম, তাঁর চুলের রঙ উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণের। তাঁর দন্তরাজি শুভ্র, যা তাঁর ঘন ঘন হাসির সময়ে উন্মুক্ত হয়ে শোভা পাচ্ছিল।

আগামীকাল রাত্রে ক্রম্যান ভ্রাতৃবর্গের সঙ্গে তিনি লাইসিয়াম রঙ্গমঞ্চে বক্তৃতা করবেন—ক্রম্যান ভ্রাতৃবর্গ প্রতি রবিবার রাত্রে এখানে "গতিময় ধর্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছেন।

উচ্চ পদাধিকারি হিন্দু ধর্মযাজকটি রেভারেন্ড হিরম ক্রম্যানের সঙ্গে রেনার্টে গেলেন, তক্ষুণি তাঁকে ওখানকার করণিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো, তাকে তিনি বিনম্র নমস্কার জানালেন এবং করণিকটি তাঁকে একটি কলম হাতে ধরিয়ে দিল। যদিও স্বামী সংস্কৃত ভাষা লিখতেই সিদ্ধহস্ত, কিন্তু যেহেতু রেনার্টের করণিক সংস্কৃত সমাসবদ্ধ শব্দ পড়তে অনভ্যস্ত তিনি নিজের নাম পাঠযোগ্য ইংরেজী অক্ষরে লিখলেন। তাঁকে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ঘরে নিয়ে গেল সমবেত মুগ্ধ দ্বাররক্ষককদের মধ্যে একজন। তিনি তখন তাঁর আগুনের মতো লাল রঙের পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে 'দ্য নিউজ' পত্রিকার প্রতিবেদককে একটি সাক্ষাৎকার দিলেন।

সহজেই যাঁর সান্নিধ্য পাওয়া যায়

উচ্চপদস্থ ধর্মযাজকটির সান্নিধ্যলাভ খুবই সহজ ব্যাপার। তাঁর পিঠে

চাপড় মেরে কথা বলার মতো নিকটস্থ হতে পারা যায় ঠিক যেমন রাজ্যপাল ব্রাউনের ক্ষেত্রেও পারা যায়—এবং প্রশ্ন করা যায় ভারতের হালচাল কি রকম। অবশ্য তাঁর দেশে কেউ তাঁর পিঠে চাপড় মারে না, সেখানে তিনি উচ্চবর্ণের ও একজন অতি উচ্চস্তরের মানুষ, বোম্বাইয়ের রঙ্গমঞ্চে তাঁকে সর্বদা সম্মানসূচক বিনামূল্যের প্রবেশপত্র দেওয়া হয় এবং বোম্বাইয়ের জনপ্রিয় সামাজিক সব অনুষ্ঠানে তাঁর নাম পৃষ্ঠপোষক হিসাবে ব্যবহার করার জন্য এবং পার্বত্য দেশে যতপ্রকার গ্রাম্য-মেলা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে পরিচালক সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করবার জন্য সকলে অনুরোধ উপরোধ করে থাকে। স্বামী একজন বিরাট ব্যক্তিত্ব।

তিনি এমন এক ধর্মযাজক শ্রেণীভুক্ত যাদের জনসাধারণ অত্যন্ত সম্মান ও সমাদর করে থাকে। ভারতে তাঁর শ্রেণীভুক্ত ১০০,০০০ যাজক আছেন। কিন্তু যেখানে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষের সংখ্যা ৩০০,০০০,০০০ সেখানে এই পূর্বোক্ত সংখ্যাটি এমন কিছু বেশি নয়। এ-কথা বলা নির্ভুল হবে যে স্বামী যখন বাল্টিমোরে আসেন তখন তাঁর নিজের গাড়িভাড়া নিজেকেই দিতে হয়েছে। কিন্তু স্বদেশে তাঁকে তা কখনও দিতে হয় না। তিনি রেলস্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা করেন। শীঘ্রই তিনি এমন কোন ভক্তের দৃষ্টিপথে পড়ে যান, যার চোখ খোঁজে তাঁকেই যিনি দেবতাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন। সে তখন তাঁকে একটি টিকিট কিনে দেয়। তখন স্বামীজী তাঁর ভ্রমণকার্য সমাধা করেন। যদি অধ্যক্ষ মেয়ার এবং শিল্পপতি পুলম্যান হিন্দুদের দেবদেবীর কাছ থেকে ভালমতো কিছু পেতে চান, তাহলে এই হলো তাদের সুবর্ণ সুযোগ।

তাঁর হাস্যকৌতুক ও রসবোধ

স্বামী বিবেকানন্দের নিজের সম্বন্ধেও কৌতুকের মনোভাব আছে! আজ সকালে তিনি যে খাদ্যসামগ্রীর প্রদর্শনীটি দেখতে ইচ্ছুক সেটির প্রসঙ্গে কথা বলছিলেন। তিনি বলেন যে খাদ্যের ব্যাপারে খাদ্য গলাধঃকরণ করা ছাড়া তিনি আর কিছুই বোঝেন না। এটি অরম্যাজ তীরবর্তী প্রাচীন ইরানের [মহাপ্রাচোর] ও ভারতীয় হাস্যকৌতুকের উদাহরণ স্বরূপ বলে বিবেচিত হতে পারে।

অন্য এক সময় তিনি নারীর অধিকার প্রসঙ্গে কথা বলছিলেন। এ প্রসঙ্গে হাসতে হাসতে মন্তব্য করেন যে নারীরা সারা পৃথিবীতে যত অধিকার ভোগ করেছে, ততটা তারা ভোগ করতে পারে বলে স্বীকৃত

নয়। যখন তিনি রেনার্টে যাবার আগে তাঁর ঘরে পৌঁছে কালো কোর্ট বদলে তাঁর লাল রঙের পরিচ্ছদটি ও পাগড়ি পরে এলেন, হাসতে হাসতে এসে বললেন—"এ হলো রূপান্তর"।

উচ্চপদস্থ ধর্মযাজকটি শিস্ দিতে পারেন এবং তাঁর হৃদয়ে যথেষ্ট সঙ্গীত আছে যার দ্বারা তিনি যদি হিন্দু না হয়ে মেথডিষ্ট হতেন তাহলে পাঠের আসরে প্রারম্ভিক সঙ্গীত পরিবেশন করতে পারতেন। নিউজ পত্রিকার একজন সাংবাদিককে শোনাবার জন্য তিনি আজ সকালে তাঁর ঘরে বসে দু-এক চরণ গানের কলি সুর করে গাইছিলেন। এটা "ডেইজী বেল" গানটি নয় "সুইট মেরী"ও নয়, নিশ্চয়ই সেটি তাঁর পৌত্তলিক হিন্দুধর্মের কোন গানের সুর।

তাঁর চিন্তার দার্শনিক দিক

এদিক দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বড় মজার মানুষ। কিন্তু তাঁর মধ্যে গভীর মননশীলতার দিকও আছ—যে দিকটি দিয়ে তিনি দার্শনিক এবং সমাজতাত্ত্বিক বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করেন যথা ঃ অস্তিত্বের রহস্য, "অনন্ত অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ", "আত্মার স্বরূপ" এবং ভাগোধ উদ্ভাসন, পুরাকাহিনী এবং প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রসঙ্গসমূহ। স্বামী এ-সকল বিষয় আলোচনা করে প্রচণ্ড আনন্দ অনুভব করেন এবং এ-সকল বিষয়ে গভীর ধ্যানে বহুসময় কাটান। ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় তিনি উচ্চশিক্ষিত এবং তাঁব ইংরেজী বলায় উচ্চারণগত সামান্য ত্রুটি আছে। অবশ্য কলকাতার বদলে যদি তিনি কার্কের লোক হতেন তাহলে উচ্চারণ যতটা খারাপ হতো, ততটা নয়। কিন্তু তিনি হলেন তত্ত্বের মধ্যে বাস করা মানুষ, বাস্তবের সঙ্গে পরিচয়ের নির্দশন কিছু দেখাতে পারেন না। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি পাঠে এবং ধ্যানে মগ্ন হয়ে কাটিয়েছেন, প্রতিবেশীরা তাঁর জন্য খাদ্যদ্রব্য বহন করে আনবেন এজন্য অপেক্ষা করে থেকেছেন এবং হিন্দুদের কুসংস্কারকে ধন্যবাদ যে তাঁকে কখনও রাতে ক্ষুধার্ত অবস্থায় শয্যা গ্রহণ করতে হয়নি।

বিশ্বমেলার সময় থেকে স্বামী এদেশে আছেন, বিশ্বমেলার ধর্মমহাসভায় তিনি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। কার্ডিনাল গিবন্স্ যিনি ধর্মমহাসভার উদ্বোধন করেছিলেন—তাঁর স্মরণে আছেন এবং বাল্টিমোর পরিত্যাগের পূর্বে তিনি গিবন্সের উদ্দেশে সম্ভবত শ্রদ্ধাজ্ঞাপনও করবেন।

বর্তমানের প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত

স্বামী এ দেশের চারিদিকে ভ্রমণ করেছেন, তিনি ভ্রমণ করেছেন বক্তৃতা দানের উদ্দেশ্যে এবং আমেরিকার প্রথাপ্রতিষ্ঠানসমূহ সম্বন্ধে জ্ঞান-আহরণের জন্য, তবে মনে হয় না যে তিনি আমেরিকার সমাজ-তত্ত্বের সারমর্মের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছেন। কারণ ইউরোপীয়দের এ-দেশে অনুপ্রবেশ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, বর্ণ-সমস্যা ইত্যাদি যে-সকল প্রশ্ন এ-দেশের অর্থনীতিবিদ্‌দের ভাবিয়ে তুলেছে, সে-সকল বিষয় তিনি কিছুই জানেন না।

কিন্তু তিনি প্রাচ্যদেশীয়দের এ-দেশে অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে তাঁর দৃঢ়মত ঘোষণা করেছেন, বলেছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের কোন অধিকার নেই চীনাদের আগমনের পথ রুদ্ধ করবার। তিনি বলেন ভালবাসার আইন-ই থাকা উচিত এবং বলপ্রয়োগ বন্ধ করা কর্তব্য। বলপ্রয়োগকারী জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে আমেরিকার উচিত সারা বিশ্বের সম্মুখে সকল দরজা খুলে দেওয়া। তিনি মনে করেন যে এ-মহাদেশের দক্ষিণাংশ হিন্দু এবং চীনাদের দ্বারা অধ্যুষিত হওয়া উচিত।

তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে আরও বলেন—"ভারতে বিবাহ-বিচ্ছেদ বলে কিছু নেই, কারণ আমাদের আইনে এর অনুমোদন নেই। আমাদের নারীগণ আমেরিকার নারীগণের তুলনায় সঙ্কীর্ণ পরিসীমায় আবদ্ধ। কেউ কেউ অবশ্য এদেরই মতো উচ্চশিক্ষিতা। তারা এখন অবশ্য চিকিৎসাবিদ্যার পেশায় কিছু কিছু প্রবেশ করছে। আমেরিকায় নারীগণ কেন ভোটাধিকার পাবে না—আমি তার কোন কারণই দেখি না।"

তিনি হিন্দু নারীগণের প্রতি পরিবারের মধ্যে কিরূপ ব্যবহার করা হয় এবং তাদের স্বামীরা তাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করে—এ-প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গেলেন। হতে পারে যে এ-বিষয়ে বিশেষ কিছুই জানেন না, কারণ তিনি বিবাহিত নন। তাঁদের দেশে উচ্চজাতির ধর্মযাজকেরা বিবাহ করে না।

আমেরিকার দুটি জিনিস তাঁকে বিশেষ আকৃষ্ট করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন—একটি হলো দেশের জনসাধারণের মধ্যে দারিদ্র্যের অনুপস্থিতি এবং অপরটি হলো দক্ষিণাঞ্চলে অস্বাভাবিক রকমের অজ্ঞতার প্রাদুর্ভাব।

তিনি লিফ্‌ট পছন্দ করলেন

রেনার্টে যখন তিনি লিফ্‌টের নিকটে পৌঁছলেন তখন বললেন

—"আমেরিকায় প্রচলিত এই ব্যবস্থাটির কথা ভারতে কোনভাবেই জানা নেই, এটিকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে।"

তখন একজন মহিলা লিফ্‌টে নেমে আসছিলেন। তিনি এই যাজকের লাল-হলুদ পরিচ্ছদ দেখে চমকিত হলেন, কিন্তু স্বামীজীর নিরুদ্বিগ্ন মুখে তিনি যে দৃষ্টিপাত করছেন তার কোন ছায়াপাত ঘটল না।

আগামীকাল রাতে লাইসিয়ামে তিনি যে বক্তৃতা দেবেন তা হবে মুখ্যত তাঁর নিজের পরিচিতি-মূলক এবং হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যামূলক। কাল তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেবেন, কিন্তু বাল্টিমোরে তিনি থেকে যাবেন এবং সপ্তাহ খানেক পরে আবার দীর্ঘ বক্তৃতা করবেন।

(সম্ভবত এই প্রবন্ধটির প্রসঙ্গেই স্বামীজী ১৮৯৫-এর জানুয়ারির ১১ তারিখে "জি জি"কে লেখেন ঃ

সংবাদপত্রের প্রতিবেদন সম্বন্ধে বলি, সেগুলি খুব সাবধানে গ্রহণ করবে। কারণ যদি কোন প্রতিবেদককে সাক্ষাৎকার না দেওয়া হয়, তাহলে সে গিয়ে বানানো যা তা কথা লেখে। বাল্টিমোরে এইরকম যা লেখা হয়েছে, আমি জানি না ঐসব লোকেরা ঐসব কথা কোথা থেকে পেল। আমেরিকার সংবাদপত্রগুলি যে-কোন লোক সম্বন্ধে যা খুশি লেখে!!)[৩১] *

এরপরে আমরা জানতে পারি যে সানডে হেরাল্ড পত্রিকার এক প্রতিবেদক হোটেলের দালানে তাঁকে "মহিমান্বিত প্রশান্তি"র সঙ্গে বসে থাকতে দেখে। ১৮৯৪-এর অক্টোবরের ১৪ তারিখে সানডে হেরাল্ডে প্রকাশিত নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি হতে জানা যায় যে, অতিথি-আপ্যায়ক হিসাবে অযোগ্যতা সত্ত্বেও এবং যদিও হিবম ক্রম্যান স্বামীজীকে বৌদ্ধ ধর্মযাজক বলে মনে করেছিলেন—তথাপি ক্রম্যান ভ্রাতৃবৃন্দ তাঁদের অতিথি সম্বন্ধে উচ্চধারণা পোষণ করতেন।

আমাদের মধ্যে একজন জ্ঞানী

একজন বিশিষ্ট হিন্দু-যাজকের শহরে আগমন

ইনি ক্রম্যান ভ্রাতৃবর্গের অতিথি এবং ইনি ধর্মীয় আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী—তাঁর পোশাক জাঁকজমকপূর্ণ

হোটেল রেনার্টের দালানে গতকাল অপরাহ্ণে এক ব্যক্তি মেরুন রঙের আলখাল্লাতে লাল কোমরবন্ধনীসহ সজ্জিত হয়ে বসেছিলেন।তাঁর মুখমণ্ডল

---

* বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৭ম খণ্ড, পত্রসংখ্যা ১৫৪, পৃঃ ৬৮

ঘোরবর্ণের এবং রহস্যজনকভাবে মহিমান্বিত, মুখমণ্ডলের রেখাগুলিতে বুদ্ধিমত্তা এবং ভাবাবেগ উদ্ভাসিত। তাঁর গায়ের রঙ ঘোর জলপাই-এর মতো, চোখদুটি বিশাল, কালো এবং উজ্জ্বল, তাঁর চুলগুলি মধ্যরাত্রির মতো কালো রঙের, তাঁর কপাল শারীর-লক্ষ্মণ বিশেষজ্ঞদের অনুশীলনের বস্তু। সব দিক ধরলে তাঁর মস্তক এমন যা করোটিতত্ত্বে বিশ্বাসীদের আনন্দ-বর্ধন করবে।

এ মানুষটি হলেন ব্রাহ্মণবংশীয় উচ্চপদস্থ ধর্মযাজক স্বামী বিবেকানন্দ, যাঁর আগমন স্থানীয় ধর্মজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সকল মানুষের লক্ষ্যের কেন্দ্র হয়েছেন তিনি। তাঁর হাতে ছিল আমাদের একটি প্রথম সারির পত্রিকা, যেটি তিনি সাগ্রহে পাঠ করছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ সানডে হেবাল্ড-এর প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলছিলেন, সাবলীল ভঙ্গিতে ইংরেজী বলছিলেন। উচ্চারণ একজন শিক্ষিত ইতালিয়ের মতো। তিনি তাঁর আলোচনায় এদেশীয় ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক—সর্বপ্রকার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সাক্ষ্য রাখছিলেন।

শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ বাল্টিমোরে এসেছেন ভ্রুম্যান ভ্রাতৃবর্গের—রেভারেণ্ড হিরম ভ্রুম্যান, কার্ল এবং ওয়াল্টারের আমন্ত্রণে এবং তাঁদের আতিথিরূপে অবস্থান করছেন। রেভারেণ্ড হিরম ভ্রুম্যানের সঙ্গে তাঁর ১১২২ নং নর্থ কালভার্ট স্ট্রীটের আবাসে গতকাল সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি তাঁর বিশিষ্ট অতিথির আগমন সম্পর্কে খোলাখুলি অনেক কথাই বলেন।

তিনি বলেন—"শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ হলেন আমার দেখা শ্রেষ্ঠ ধীমান ব্যক্তিদের অন্যতম। ইনি আমাদের আমন্ত্রণেই এই শহরে এসেছেন, এবং এখানে আমাদের সঙ্গে একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা সম্পর্কে আলোচনায় যোগদান করবেন, বিশ্বধর্মমহাসভার একটি ফলশ্রুতি হিসাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছে। ধর্মমহাসভা বিশ্বমেলার একটি আকর্ষণীয় অঙ্গ ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন বিবেকানন্দের অতি প্রিয় পরিকল্পনা, আমার এবং আমার ভ্রাতাদের এ-পরিকল্পনায় পূর্ণ সমর্থন আছে এবং তাতে আরও কয়েকজন ধনাঢ্য ও পদস্থ ব্যক্তিসহ কয়েকটি ধর্মসঙ্ঘেরও সহসমর্থন আছে। যাঁরা এটির প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবেন তাঁদের মধ্যে রোম্যান ক্যাথলিক এবং ইহুদিধর্মের লোকেরা আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়টি সকল প্রকার ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানেব উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত হয়েছে।

"যখন এটি প্রতিষ্ঠিত হবে তখন এর সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের পদে থাকবেন

এদেশের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং এর অধ্যাপকমণ্ডলী নির্বাচিত হবেন সব ধর্মের মধ্য হতে। বৌদ্ধধর্মের যাজকবৃন্দের মধ্যে কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দকে এদেশে পাঠিয়েছেন আমাদের দেশের ধর্ম ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করবার জন্য। তাঁরাই তাঁর ব্যয়ভার বহন করছেন। তিনি ধর্মমহাসভায় ঐ ধর্মেরই প্রতিনিধি ছিলেন। শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যের পশ্চাতে একটি ধারণা হলো এই যে, তার ফলে ভারতে প্রচারকার্যের জন্য উন্নত ধরনের প্রচারক পাওয়া যাবে। তিনি নিজে নিজ ধর্ম-বিশ্বাসের উপর দৃঢ়স্থাপিত, তিনি চান যে, বর্তমানে যেরূপ অজ্ঞ লোকদের ভারতে প্রচারকার্যের জন্য প্রেরণ করা হয় তা বন্ধ করা হোক এবং ভবিষ্যতে যাঁরা সেখানে প্রেরিত হবেন তাঁরা যেন উচ্চতর ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে খ্রীস্টধর্ম শিক্ষা দিতে সমর্থ হন। এই ইচ্ছার পশ্চাতের প্রেরণা হলো সাধারণভাবে ধর্মের প্রতি কল্যাণ-ইচ্ছা।

"ধর্ম বিষয়ে প্রাজ্ঞ এরকম আমার জানা লোকদের মধ্যে তিনি হলেন সর্বাধিক তথ্যবিদ্ ব্যক্তি। রোম্যান ক্যাথলিকদের একথা জানতে আগ্রহ হতে পারে যে তিনি হলেন প্রথম বিদেশাগত ব্যক্তি যিনি তাঁদের ধর্মসম্বন্ধে মহান তত্ত্ববিদ্ এবং পোপ লিওর সর্বাপেক্ষা প্রিয় দার্শনিক টমাস অ্যা ক্যাম্পিসের রচনাবলী সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করেছেন। তিনি সবসময়ে সেন্ট টমাসের গ্রন্থাবলীর এক এক খণ্ড সঙ্গে রাখেন।

"শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ আমাকে বলেছেন যে তাঁর পিতা ভগবান যীশুতে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন এবং যখন তিনি একজন বালকমাত্র তখনই তিনি সেন্ট জন বর্ণিত মুক্তিদাতার ক্রুশবিদ্ধ হবার কাহিনী পাঠ করে অশ্রুপাত করেছিলেন। এ-শহরে তিনি কয়েক সপ্তাহ থাকবেন, আগামীকাল সন্ধ্যায় লাইসিয়ামে আমাদের সভায় তিনি একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেবেন এবং পরের সপ্তাহে রবিবার দিন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আহূত দ্বিতীয় সভায় একটি বিস্তারিত ভাষণ দেবেন।

"এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমি যে-কথা বলতে পারি তা হলো এই যে, এটির অবস্থান হবে বোস্টনের নিকটে এবং একে সুনির্দিষ্ট রূপ দেবার জন্য একটি সভা শীঘ্রই আহূত হবে। শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ এটি স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত এ-দেশ পরিত্যাগ করে চলে যাবেন না। তিনি কারও কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করেন না, কিংবা মাংস খান না—এ-দুটি

তাঁর সম্প্রদায়ের রীতিবিরুদ্ধ। ধর্মযাজক হবার পূর্বে ভারতে তিনি ইংরেজী আইনশাস্ত্র পাঠ করেছেন।"

যে-কথা পূর্বে বলা হয়েছে, ক্রুম্যান ভ্রাতৃবৃন্দ আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনাটি ব্যবহার করেছেন স্বামীজীকে বাল্টিমোরে আসার জন্য আগ্রহী করবার জন্য, কিন্তু যতদূর পর্যন্ত সংবাদপত্রগুলির পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন মাধ্যমে জানা যায় তা হলো এই যে, রবিবারের সভার সঙ্গে "বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা"র লেশমাত্র সম্বন্ধও ছিল না।

স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে লিখেছেন—আলাসিঙ্গাকে নিশ্চয়ই সংবাদপত্রের কর্তিতাংশগুলিও পাঠিয়েছেন—"টমাস অ্যা কেম্পিসের ব্যাপারটি আমার পক্ষেও নূতন সংবাদ বটে।"[৩২*] (অবশ্য একথা সত্য যে, ১৮৮৯ সালে তিনি 'ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট' গ্রন্থের ছটি অধ্যায় বঙ্গানুবাদ করেছিলেন এবং ভারত ভ্রমণের সময় কখনও কখনও উক্ত গ্রন্থখানি সঙ্গে রেখেছেন।)

অক্টোবরের ১৪ তারিখে রবিবার দিন স্বামীজী তাঁদের প্রথম সভায় বক্তৃতা করলেন—অথবা যে কথা বলা হয়—তিনি ক্রুম্যান ভ্রাতৃবৃন্দের সহায়তা করলেন। 'বাল্টিমোর আমেরিকান' এবং 'বাল্টিমোর সান্' নামক দুটি পত্রিকা অক্টোবরের ১৫ তারিখে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশ করল যার বয়ান যথাক্রমে নিম্নোক্তরূপ ঃ

কম ধর্মমত, বেশি খাদ্য

ভারতের উচ্চপদস্থ ধর্মযাজকের বাণী

লাইসিয়ামে অনুষ্ঠিত জনসভা

গতরাত্রে লাইসিয়াম প্রেক্ষাগৃহে ক্রুম্যান ভ্রাতৃবৃন্দের একটি বক্তৃতামালার প্রথম বক্তৃতানুষ্ঠান সভায় শ্রোতৃবৃন্দ ভিড় করে এসেছিলেন। আলোচ্য বিষয় ছিল—"গতিময় ধর্ম।" রেভারেণ্ড হিরম ক্রুম্যান, কার্ল এবং ওয়াল্টার ক্রুম্যান ডেভিড এবং গালিয়াথের কাহিনী আলোচনা করলেন। মন্তব্য করতে গিয়ে রেভারেণ্ড হিরম ক্রুম্যান বললেন—আজকের জনপ্রিয় আচার্যগণ হলেন সাধারণত তাঁরাই যাঁরা উদ্ভাবনীশক্তি সহায়ে স্বর্গে আলো জ্বালার ব্যবস্থা করতে পারেন, কিন্তু গির্জায় ঘেরাটোপ আসনগুলির মাথায় এবং শহরের ওপর যে অন্ধকার ঘনিয়ে আছে তাকে বিন্দুমাত্র অপসৃত

---

* বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১ম সং, পত্রসংখ্যা ১০৮, পৃঃ ২১

করতে পারেন না।" তিনি আরও বলেন—"আমরা বর্তমানে বিশ্ব-ইতিহাসের এক সঙ্কটময় মুহূর্তে এসে উপনীত হয়েছি। যদি গোলাগুলির শব্দ আকাশ বাতাস ভেদ করে ধ্বনিত হয় এবং তুরি ভেরিতে রণসঙ্গীত বেজে উঠে, তাহলেও প্রতিদিন কি ঘটছে না ঘটছে তাতে আমি বিন্দুমাত্রও আগ্রহী না হয়ে বরং এই আপাত শান্তির সময়ে যে বিরাট সম্ভাবনাময় আন্দোলনগুলি যাদের এখনও বেঁচে থাকতে হবে তাদের জীবনে আশীর্বাদ বা অভিশাপস্বরূপ হয়ে সংগঠিত হচ্ছে—সে আন্দোলনগুলিতেই আমি বেশি আগ্রহান্বিত হব।"

তারপর বক্তৃতা করলেন কার্ল ফ্রম্যান। তাঁর বক্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বললেন—"নম্রতার নামে যে ভীরুতা আছে এবং যে ঈশ্বর বিশ্বাস পুণ্যের বিলাসিতার ওপর নির্ভরশীল তাতে আজ আমাদের প্রয়োজন কম কারণ আজ দীনদরিদ্র ল্যাজারাস এবং তার লক্ষ লক্ষ ভ্রাতৃবৃন্দ অনাহারে ক্লিষ্ট এবং পাপাচারে মগ্ন অবস্থায়, বিশ্বাস করে চলেছে যে নিজের সময় হলে এবং আপন উপায়ে ঈশ্বর তাদের অন্ন যোগাবেন।"

রেভারেণ্ড ওয়াল্টার ফ্রম্যান বলেন—"গতিময় ধর্মের অর্থ যে ধর্ম এগিয়ে চলে এবং যে ধর্ম সেই স্থিতিশীল ধর্মের বিরোধী যা সারা সপ্তাহে আমাদের শহরগুলির ইতস্তত ছড়ানো প্রস্তর-নির্মিত বিরাট বিরাট ইমারতগুলির মধ্যে বদ্ধ হয়ে থাকে কেবল মাত্র দু-এক ঘণ্টা ছাড়া, যখন লোকজন সেগুলির অভ্যন্তরে প্রবেশের এবং তাদের গায়ে ঠোকরাবার অনুমতি পায় যেন তার একটি ওষধিমূল্য আছে বিবেকের দংশনজাত ব্যথা উপশমের ব্যাপারে।"

ভারতের উচ্চপদস্থ ধর্মযাজক স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সভার শেষ বক্তা। তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন এবং তিনিই লক্ষণীয়ভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। তাঁর ইংরেজী ভাষা এবং তাঁর প্রকাশভঙ্গি অনবদ্য। তাঁর স্বরপ্রক্ষেপ বিদেশীয়। কিন্তু তা এত বেশি বিদেশীয় নয় যে, তাঁর কথা বুঝতে কোন অসুবিধা ঘটবে। তিনি তাঁর স্বদেশীয় পরিচ্ছদে ভূষিত ছিলেন এবং তা অবশ্যই ছবির মতো সুন্দর। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন যে, তাঁর পূর্বে যে বাগ্মীতা প্রদর্শিত হয়েছে তার পরে তিনি যা বলবেন তা সংক্ষেপেই বলা চলে। কিন্তু পূর্ববর্তী বক্তারা যে-সকল কথা বলেছেন, তিনি সে-সকল অনুমোদন করেন। তিনি প্রচুর ভ্রমণ করেছেন এবং সর্বপ্রকার জনসমক্ষে বক্তৃতা করেছেন। তিনি দেখেছেন যে, বিশেষ কোন ধরনের মতবাদ প্রচার বিশেষ কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে না। যা প্রয়োজন তা

হলো বাস্তবে কাজ করা। যদি চিন্তাগুলি কার্যকর করা না যায়, তাহলে তিনি মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবেন। সারা পৃথিবীর মানুষই আজ চাইছে "মতবাদ কম হোক, রুটি বেশি চাই।" তিনি মনে করেন, ভারতে প্রচারক প্রেরণ করা সঙ্গত। তাতে তাঁর আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু তিনি মনে করেন যে, কম সংখ্যক লোক এবং অধিক পরিমাণ অর্থ প্রেরণ করা উচিত। ভারতের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে, ভারতে ধর্ম প্রচুর উদ্বৃত্ত আছে, যা অপরকেও দেওয়া যায়। আর মতবাদের চেয়ে প্রয়োজন বাস্তব জীবনে তত্ত্বের প্রয়োগ। ভারত তথা সারা বিশ্বের মানুষ শিখেছে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করতে। কিন্তু প্রার্থনাটি শুধু মুখে উচ্চারিত হলেই চলবে না, তা হৃদয়ের অভ্যন্তর হতে উৎসারিত হওয়া চাই। তিনি আরও বললেন—"জগতে খুব অল্প লোকই ভাল কাজ করতে চায়। অন্যেরা তাকিয়ে থাকে, হাততালি দেয় এবং তাতেই তারা মনে করে যে তারা অনেক বড় বড় কাজ করেছে। ভালবাসাই জীবন এবং যখন একজন মানুষ অন্যের ভাল করা থেকে বিরত হয় তখন তার আত্মিক মৃত্যু ঘটে।"

পরবর্তী রবিবার সন্ধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ লাইসিয়ামে সান্ধ্য-ভাষণটি দেবেন।

ড্রুম্যান ভ্রাতৃবর্গ

কর্মে পরিণত ধর্মের কথা বললেন লাইসিয়াম রঙ্গমঞ্চে

তাঁদের সহায়তা করলেন স্বামী বিবেকানন্দ

শেষোক্ত ব্যক্তি একজন হিন্দু উচ্চপদস্থ যাজক যিনি সারা আমেরিকা ভ্রমণ করছেন—নিউ ইয়র্কে ডঃ পার্কহার্স্টের কাজকর্মের অনুমোদনে ভাষণ।

গতরাতে লাইসিয়াম রঙ্গমঞ্চে রেভারেণ্ড হিরম ড্রুম্যান, রেভারেণ্ড ওয়াল্টার ড্রুম্যান এবং শ্রীযুক্ত কার্ল ড্রুম্যানের প্রদত্ত ভাষণ মাধ্যমে গতিময় ধর্ম অথবা কর্মযোগের ধর্ম ব্যাখ্যাত হয়েছে।

এই তিনজন হলেন সহোদর ভ্রাতা। রেভারেণ্ড হিরম ড্রুম্যান হলেন বাল্টিমোরের নিউ জেরুজালেম গির্জার যাজক, রেভারেণ্ড ওয়াল্টার ড্রুম্যান হলেন এ্যারিনা পত্রিকার কর্মীগোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য। শ্রীযুক্ত কার্ল ড্রুম্যান হলেন আন্তঃকলেজ বিতর্ক সমিতির সভাপতি এবং গত বৎসর হার্ভার্ড এবং ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যে বিতর্ক প্রতিযোগিতা হয়েছিল তাতে বিজয়ী প্রতিযোগী।

স্বামী বিবেকানন্দ একজন উচ্চপদস্থ হিন্দু ধর্ম যাজক, তিনি অন্যান্য বক্তাদের সমর্থনে তাঁর বক্তব্য যুক্ত করেন ধর্মপ্রচার অপেক্ষা ধর্মানুশীলনের উপর সঠিক গুরুত্ব আরোপ করে। তাঁর মতে তার দ্বারাই অকল্যাণকে প্রতিহত করা যাবে।

প্রেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ দর্শকেরা এই ভাষণই যে তাঁদের ভাল লেগেছে তা জানিয়ে দেন তাঁদের সাগ্রহ মনোযোগ প্রদর্শন করে এবং করতালি দিয়ে তাঁরা তাঁর উদ্দেশ্যের প্রতি সুস্পষ্টরূপে সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন।

বিবেকানন্দ গতবৎসর শিকাগোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধর্মমহাসভার অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি তদবধি যুক্তরাষ্ট্রে পরিভ্রমণ করছেন ও আমেরিকার আচার-ব্যবহার ও প্রথা-প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করছেন। তিনি একটি উজ্জ্বল লাল রঙের আলখাল্লা পরেছিলেন এবং হলুদ রঙের পাগড়িটির একটি দিক তাঁর পিঠের উপরে ঝুলে ছিল। তিনি ইংরেজী বলেন সাবলীলভাবে।

গায়ের রঙ ব্রোঞ্জের মতো হওয়ায় বিবেকানন্দকে হোটেলে স্থান পেতে কিঞ্চিৎ অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। তিনি যখন শনিবার বাল্টিমোরে এসে পৌঁছলেন তখন ওয়াল্টার ক্রম্যান তাঁকে সঙ্গে নিয়ে চার চারটে হোটেলে ঘুরেছিলেন, তারপরে তিনি রেনার্টে স্থান পান।

মতবাদ যথেষ্ট আছে

বিবেকানন্দ গতকাল রাতে যতক্ষণ না তাঁর বলার সময় এসেছে ততক্ষণ অবিচলিত ভাবলেশহীন মুখে বসেছিলেন। তারপর তাঁর হাবভাব পরিবর্তিত হয় এবং তিনি জোরের সঙ্গে এবং আবেগের সঙ্গে তাঁর বক্তব্য রাখলেন। ইনি ক্রম্যান ভ্রাতৃবৃন্দের পরে বলতে উঠে বল্লেন যে, তাঁর পূর্বে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে সামান্যই যোগ করার আছে শুধু "তিনি যে ভূ-গোলকের সম্পূর্ণ বিপরীত দিকের মানুষ" সে-বিষয়ে প্রমাণ রাখা ছাড়া।

তিনি আরও বললেন—"মতবাদ আমাদের যথেষ্ট আছে। আমরা এখন চাই বাস্তবে কাজ—যে কথা পূর্ববর্তী বক্তৃতাগুলিতে তুলে ধরা হয়েছে। যখন আমাকে ভারতে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, আমি বলি—ঠিক আছে। কিন্তু আমরা চাই বেশি অর্থ, প্রচারক কম। ভারতে বস্তা বস্তা মতবাদ আছে যার থেকে অন্যদেরও দেওয়া যায়। আমাদের যা প্রয়োজন তা হলো সেগুলিকে কার্যে পরিণত করবার জন্য অর্থ।

"প্রার্থনা বিভিন্নভাবে করা যায়। হাতের দ্বারা [অর্থাৎ কাজ করে] প্রার্থনা নিবেদন করা, মুখ দিয়ে করার চেয়ে উত্তম এবং এতে শক্তির অপচয় কম হয়।

"সব ধর্মই আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দের জন্য কল্যাণকর কাজ করতে বলে। কল্যাণ কর্ম করা কোন অসাধারণ কিছু করা নয়—এটাই হলো বাঁচার পথ। প্রকৃতির প্রবণতা অনুসারে বিস্তারই জীবন, সঙ্কোচনই মৃত্যু। ধর্মের ক্ষেত্রেও তাই। কোনপ্রকার মতলব ছাড়াই অন্যদের সহায়তার জন্য ভাল কাজ কর। যে মুহূর্তে এটি বন্ধ হয়ে যাবে, সেই মুহূর্তে সঙ্কোচন প্রক্রিয়া ঘটতে শুরু করবে এবং আধ্যাত্মিক মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে।"

বাল্টিমোরে গলিয়াথ

ডেভিড ও গলিয়াথের কাহিনীটি পাঠ করে রেভারেণ্ড হিরম ক্রুম্যান সভার উদ্বোধন করেন।

তিনি বলেন, "এ কাহিনীতে যে ধরনের সৈন্যদলের কথা বলা হয়েছে ঠিক সেই ধরনের সৈন্যদলই বাল্টিমোরের পর্বতশীর্ষে শিবির স্থাপন করে আছে। প্রতিদিন গলিয়াথ প্যালেস্টাইনের শত্রু-শিবিরের বাইরে এসে যীশুর পরার্থপরতামূলক সদুপদেশসমূহকে উপহাস করে। এরুশ শত সুসজ্জিত কক্ষ, তার সঙ্গে অগণিত ধ্বংসপ্রাপ্ত গৃহ এবং বিধ্বস্ত জীবনের সারি তার দেঁতো হাসির মুখমণ্ডলকে প্রকটিত করে, আর তার অসুদপায়ে অর্জিত স্বর্ণরাশি, যা প্রবঞ্চনার সঞ্চয়, তা তার বর্মস্বরূপ...।

রেভারেণ্ড হিরম ক্রুম্যান এবং পরে ওয়াল্টার ও কার্ল ক্রুম্যান, এই একই ভঙ্গিতে দীর্ঘ সময় ধরে তাঁদের বক্তৃতা চালালেন এবং যদিও স্বামীজী "অবিচালিত ভাবলেশহীন মুখে" শুনলেন, কিন্তু বর্তমান পাঠকবৃন্দের ক্রুম্যানদের দ্বারা বর্ণিত ১৮৯৪ সালের বাল্টিমোরেতে রাজনীতির কি কি ভ্রষ্টাচার ঘটেছিল তা জেনে ভারাক্রান্ত হবার কোন প্রয়োজন নেই।

পরবর্তী সপ্তাহের কোন একসময়ে স্বামীজী কলকাতার জনসভার সংবাদ প্রাপ্ত হন, সেগুলি ভারত থেকে একগোছা চিঠির সঙ্গে এসেছিল এবং শ্রীমতী হেল পাঠিয়েছিলেন কেম্ব্রিজের ঠিকানায়, আর শ্রীমতী বুল পুনর্বার পাঠিয়েছেন বাল্টিমোরে। প্রথমোক্তজনকে তিনি তারিখবিহীন একটি সংক্ষিপ্ত চিঠিতে লেখেন—

১১২৩ সেন্ট পল স্ট্রিট
বাল্টিমোর
অক্টোবর, ১৮৯৪

মা,

দেখুন, আমি কোথায় এসে পড়েছি। 'চিকাগো ট্রিবিউনে' ভারতের একটি টেলিগ্রাফ লক্ষ্য করেছেন কি? তারা কি তাতে কলকাতার ঠিকানাটি ছেপেছে? এখান থেকে যাব ওয়াশিংটন; সেখান থেকে ফিলাডেলফিয়া। তারপর নিউইয়র্ক। ফিলাডেলফিয়ায় আমাকে মিস্ মেরীর ঠিকানা পাঠাবেন। নিউইয়র্কে যাবার পথে তার সঙ্গে দেখা করে যাব। আশাকরি এতদিনে আপনি নিরুদ্বেগ হয়েছেন।

আপনার স্নেহের
*বিবেকানন্দ**

একই ঠিকানা (ঠিকানাটি কার তা আমরা আজও জানি না) থেকে স্বামীজী শ্রীমতী বুলকে অক্টোবরের ১৭ তারিখে লিখলেন ঃ

প্রিয় শ্রীমতী বুল,

আমাকে এত অনবরত ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে যে, আমি এর আগে আপনাকে চিঠি লেখার সময় পাইনি। বাল্টিমোরে গত রবিবারে খুব সুন্দর একটি সভা করলাম এবং আগামী রবিবারে আর একটি সভা হবে। অবশ্য আর্থিক দিক থেকে সভাগুলি আমাকে বিন্দুমাত্রও সহায়তা করছে না, কিন্তু যেহেতু আমি তাদের কথা দিয়েছিলাম এবং যে-বিষয়টি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে তাদের সহায়তা করছি, সেটি আমার একটি প্রিয় বিষয়—সেজন্যই আমি এখানে বক্তৃতা করছি।

ভারত থেকে প্রেরিত যে চিঠিগুলি আপনি পাঠিয়েছেন তা হলো কলকাতার, আমার সহ-নাগরিকবৃন্দ আমাকে—আমার কাজের জন্য যে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন সে-সম্পর্কিত এবং তার সঙ্গে আছে কিছু বিভিন্ন সংবাদপত্রে এ-প্রসঙ্গে প্রকাশিত রচনাসমূহের কর্তিতাংশ। আমি পরে ওগুলি আপনাকে পাঠিয়ে দেব।

গতকাল আমি ওয়াশিংটন শহর দর্শনে গিয়েছিলাম এবং সেখানে

---

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, পত্রসংখ্যা ১২৩, পৃঃ ৫০০

শ্রীমতী কোলভিল এবং শ্রীমতী ইয়ং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, তাঁরা আমার সঙ্গে খুব সদয় ব্যবহার করলেন।

আমি ওয়াশিংটনে বক্তৃতা করবার জন্য পুনরায় যাচ্ছি এবং তারপর ফিলাডেলফিয়ায় যাব, তারপর সেখান থেকে নিউ ইয়র্কে।

আপনার স্নেহভাজন পুত্র[৩৪]

বিবেকানন্দ

বর্তমানে আমরা যতদূর জানি ১৬ অক্টোবর তারিখে স্বামীজী ওয়াশিংটনে সংক্ষিপ্ত ভ্রমণে যান নিছক শহরটি দেখবার জন্য (ট্রেনে এক ঘণ্টার রাস্তা ওয়াশিংটন)। উদ্দেশ্য শহরটি দেখা, সেখানে তিনি পূর্ব-ব্যবস্থিত কোন বক্তৃতা দেবার জন্য যাননি। তিনি নিশ্চয়ই তাহলে ক্যাপিটাল দেখেছেন, দেখেছেন হোয়াইট হাউস এবং ওয়াশিংটনের স্মৃতিসৌধ এবং অন্যান্য ইতিহাস-বিজড়িত দ্রষ্টব্যস্থানগুলি। তিনি কোথাও বলেননি তাঁর এ-স্থানটি কেমন লেগেছিল। তবে আমাদের মনে হয় তাঁর শহরটিকে ভালই লেগেছিল। কারণ তখনকার অশ্বচালিত গাড়ির মন্থর দিনগুলিতে এবং শহুরের অব্যাহত জাঁকজমকের দিনে শহরটি সত্যই মনে প্রভাব সৃষ্টি করার মতো এবং শিক্ষাপ্রদ ছিল। সমসাময়িক-কালের একজন পর্যটক, যিনি সাধারণের মতকেই অভিব্যক্ত করেছেন, বলেছেন, "যুক্তরাষ্ট্রে এর চেয়ে সুন্দর শহর আর নেই, এর রাস্তা এবং উদ্যানগুলির জন্য এটি সুন্দর আর এখানকার বৃহৎ সরকারি ইমারতগুলির স্থাপত্যের জন্যও এবং বহু মূর্তি ও শত শত পর্যটকের মন আকর্ষণ করার মতো নানাবিধ বস্তুগুলির জন্যও সুন্দর"।[৩৫] আমরা জানি না স্বামীজী শহরটিতে রাত্রি যাপন করেছিলেন কি না। কিন্তু সে যাই হোক, তিনি এ শহরে শিগ্‌গিরই এর চেয়ে দীর্ঘসময় অতিবাহিত করবার জন্য ফিরবেন।

ইতোমধ্যে রবিবার ২১ অক্টোবর তারিখে বাল্টিমোরে ভ্রুম্যান ভ্রাতৃবৃন্দের দ্বিতীয় সভাটি অনুষ্ঠিত হলো। এবারে স্বামীজীই ছিলেন মুখ্য বক্তা এবং হয়তো এটা স্বাভাবিক যে যেহেতু ভ্রুম্যান ভ্রাতৃবৃন্দ গলিয়াথের প্রসঙ্গ নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন, সেহেতু তিনি বুদ্ধের প্রসঙ্গে বলবেন, যিনি অমঙ্গল এবং দুঃখের মূল অবধি আবিষ্কার করেছিলেন। নিম্নলিখিত প্রতিবেদনটি (যাতে ভ্রুম্যানদের ভাষণগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে) অক্টোবরের ২২ তারিখে 'মর্নিং হেরাল্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ঃ

ভগবান বুদ্ধের সঙ্ঘের উচ্চপদস্থ যাজক
লাইসিয়ামে-উপস্থিত ৩০০০ শ্রোতার কাছে প্রদত্ত ভাষণ
ক্রুম্যান ভ্রাতৃবৃন্দের "গতিময় ধর্ম"-এর প্রয়োজনে
দ্বিতীয় জনসভা—ন্যায়বিচারালয় ও তার সংরক্ষণ।

লাইসিয়াম প্রেক্ষাগৃহে ভূতল থেকে ভবন-শীর্ষ অবধি পরিপূর্ণ দর্শক ভিড় করে এসেছিলেন ক্রুম্যান ভ্রাতৃবৃন্দের "গতিময় ধর্ম" আলোচনার জন্য আহূত জনসভাগুলির মধ্যে এই দ্বিতীয় সভাটিতে। পুরোপুরি তিন হাজার শ্রোতা উপস্থিত ছিল।

সমাবেশে যোগদানকারীদের অর্ধেক ছিল মহিলা। আগাগোড়া ব্যাপারটি চিত্তাকর্ষক ছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে বক্তাদের মন্তব্যসমূহ শ্রোতৃবৃন্দ হাততালি দিয়ে স্বাগত করেন। রেভারেণ্ড হিরম ক্রুম্যান, রেভারেণ্ড ওয়াল্টার ক্রুম্যান এবং উচ্চপদস্থ ব্রাহ্মণ যাজক স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি শহর দর্শনে এসেছেন—সকলে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন এবং শ্রোতাদের বিশেষ মনোযোগের কেন্দ্র ছিলেন রেভাঃ বিবেকানন্দ।

তিনি একটি হলুদবর্ণের পাগড়ি এবং লাল রঙের কোমর-বন্ধনী দিয়ে আটকানো একই রঙের পরিচ্ছদে ভূষিত ছিলেন, এজন্য তাঁর প্রাচ্যদেশীয় আকৃতি, শরীর-লক্ষণসমূহ একটি বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল। তাঁর ব্যক্তিত্ব মনে হচ্ছিল সেদিনের সন্ধ্যার আকর্ষণের কেন্দ্র। তাঁর ভাষণ সাবলীল, প্রকাশ-ভঙ্গি স্বচ্ছন্দ, তাঁর-শব্দ-নির্বাচন ত্রুটিহীন এবং তাঁর উচ্চারণ-ভঙ্গি ইংরেজী ভাষার সঙ্গে সুপরিচিত ল্যাটিন ভাষাভাষী জাতির সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির অনুরূপ। তাঁর ভাষণের অংশবিশেষ ঃ

উচ্চপদস্থ এই ধর্মযাজক বক্তৃতা করলেন

"বুদ্ধ খ্রীস্ট জন্মের ছয়শত বৎসর পূর্বে ভারতীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হন। বুদ্ধ ভারতের ধর্ম প্রতিষ্ঠা করলেন সেইসময়ে যখন সেখানে বিরামহীনভাবে আলোচনা হচ্ছিল মানবাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে। ধর্মীয় অমঙ্গলাদি দূরীকরণের জন্য তখনকার চিন্তাধারা অনুযায়ী পশুবলি, যজ্ঞবেদীতে আহুতি প্রদান এবং অনুরূপ ব্যাপারসমূহ ছাড়া অন্য কিছু বিধান বর্তমান ছিল না।

"এই সকল প্রথার মাঝখানে একজন ধর্মপ্রচারক তখনকার নেতৃস্থানীয় একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনিই বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা করলেন।

প্রথমত কোন নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন ধর্মের সংস্কারের উদ্দেশ্যে আন্দোলনের প্রবর্তন করা। তিনি সকলের মঙ্গল চাইতেন। তিনি যেভাবে তাঁর ধর্মমত সূত্রায়িত করেছিলেন তদনুসারে তাঁর আবিষ্কৃত সত্য হলো তিনটি—'প্রথমটি হলো অমঙ্গল আছে' 'দ্বিতীয়, এই অমঙ্গলের নিদান কি?' সেটি তিনি আরোপ করেন—অপরের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে মানুষের বাসনার ওপর, যার নিবৃত্তি নিঃস্বার্থপরায়ণতার দ্বারাই সম্ভব। তাঁর আবিষ্কৃত তৃতীয় সত্যটি হলো—'এই অমঙ্গলের কারণ নিঃস্বার্থপর হলে দূরীভূত হয়'। বলপ্রয়োগ দ্বারা একে দূর করা যায় না, কাদার দ্বারা কাদা পরিষ্কৃত করা যায় না, ঘৃণার দ্বারা ঘৃণা দূর করা যায় না।

"তাঁর ধর্মের এটাই হলো ভিত্তি। যতদিন সমাজ মানুষের স্বার্থপরতা আইন বা প্রাতিষ্ঠানিক অনুশাসন প্রভৃতির দ্বারা দূর করবার চেষ্টা করবে, যার উদ্দেশ্য হলো বলপ্রয়োগের দ্বারা মানুষকে তার প্রতিবেশীদের মঙ্গলসাধন করতে বাধ্য করা, ততদিন পর্যন্ত কিছুই করা যাবে না। প্রতিকার কৌশলের দ্বারা কৌশল প্রতিহত করা নয়, বলপ্রয়োগ দ্বারা বলপ্রয়োগ দূর করা নয়। একমাত্র প্রতিকার নিঃস্বার্থপর নরনারী তৈরি করার মধ্যে নিহিত। বর্তমানকালের দোষত্রুটিগুলি দূর করতে নতুন আইন করা যায়, কিন্তু তাতে কোন ফল হবে না।

"বুদ্ধ দেখলেন ভারতে ঈশ্বর ও তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে কেবল কথা বলা হয়, কিন্তু কাজে কিছুই করা হয় না। তিনি সবসময় এই মৌলিক সত্যের ওপরই জোর দিয়েছেন যে আমাদের পবিত্র হতে হবে, পুণ্যবান হতে হবে এবং পুণ্য অর্জনের জন্য অপরের কল্যাণসাধনও করতে হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষকে কাজে নেমে পড়তে হবে, অন্যকে সাহায্য করতে হবে, অপরের মধ্যে নিজের আত্মাকে প্রত্যক্ষ করতে হবে, অন্যের জীবনের মধ্যে নিজের জীবনকে দেখতে হবে। সকলে মিলিত হয়ে অপরের কল্যাণসাধনের মাধ্যমে আমরা আমাদের নিজেদের কল্যাণসাধন করি—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। তিনি বিশ্বাস করতেন জগতে তত্ত্ব বেশি পরিমাণে আছে, বাস্তব অনুশীলন আছে কম। ভারতে এখন এক ডজন বুদ্ধের আগমন ঘটলে তার কল্যাণ হবে এবং এদেশেও একজন বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটলেই তার হিতসাধিত হবে।

"যখন অতিরিক্ত মতবাদ এসে যায়, পিতৃপিতামহের ধর্মে মাত্রাতিরিক্ত

আস্থা বর্তমান থাকে, অতিরিক্ত যুক্তি-সহ কুসংস্কার বর্তমান থাকে, তখন একটা পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। এইরূপ মতবাদ অকল্যাণ আনে এবং এর সংস্কার প্রয়োজন।”

বিবেকানন্দের ভাষণ শেষ হলে একটি আন্তরিকতাপূর্ণ করতালিধ্বনিতে সভাস্থল পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

অক্টোবরের ২২ তারিখের ‘বল্টিমোর নিউজ’ পত্রিকাও এই সভার বিবরণ প্রকাশ করল, তাতে প্রচুর জায়গা দেওয়া হলো দীর্ঘ-ভাষণ প্রদানে পটু এবং ভোট-ভিক্ষা বিশারদ ক্রম্যান ভ্রাতৃবৃন্দকেও। ‘বাল্টিমোর আমেরিকান’ পত্রিকার প্রতিবেদন অধিক পরিমাণে আমাদের উদ্দেশ্য-সাধক, বোঝা যায় এর রাজনৈতিক আনুগত্য ক্রম্যান ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে এক নয়, সেজন্য এতে তাঁদের কোন জায়গাই দেওয়া হয় নি। বরঞ্চ স্বামীজীর ভাষণ সম্বন্ধে এতে ‘নিউজ’-এর তুলনায় আরও সুস্পষ্ট ও বোধগম্য ভাবে লেখা হয়েছে ঃ

বুদ্ধের ধর্ম

লাইসিয়াম রঙ্গমঞ্চে স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ

গতরাত্রে লাইসিয়াম রঙ্গমঞ্চের প্রবেশদ্বার অবধি শ্রোতাদের ভিড় হয়েছিল ‘গতিময় ধর্ম’ বিষয়ে ক্রম্যান ভ্রাতৃবৃন্দের পরিচালনায় আয়োজিত বক্তৃতামালার দ্বিতীয় বক্তৃতানুষ্ঠানে। ভারতের স্বামী বিবেকানন্দ মুখ্য ভাষণটি দেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে ভাষণ দেন এবং বুদ্ধের জন্মের কালে ভারতের জনজীবনের মধ্যে যে-সকল দোষত্রুটি দেখা দিয়েছিল, সেগুলি উল্লেখ করেন। ভারতে সামাজিক বৈষম্য তখন পৃথিবীর যে কোন স্থানের তুলনায় সহস্রগুণ অধিক ছিল বলে তিনি বলেন। তিনি বলেন, “খ্রীস্টজন্মের ছয়শত বৎসর পূর্বে পুরোহিত-তন্ত্র ভারতের জনসাধারণের মনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল, উচ্চবর্ণের ও নিম্নবর্ণের মধ্যবর্তী বুদ্ধিজীবী পণ্ডিতের যাঁতাকলে পড়ে চূর্ণিত হয়ে চলেছিল সাধারণ মানুষেরা। বৌদ্ধধর্ম, যা হলো সমগ্র মানব পরিবারের দুই-তৃতীয়াংশের অনুসৃত ধর্ম, সম্পূর্ণ একটি নতুন ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নি, হয়েছিল তদানীন্তন দুর্নীতির কালিমামুক্ত একটি সংস্কার হিসাবে। মনে হয় বুদ্ধই হচ্ছেন এমন একজন দিব্যপুরুষ যিনি যা কিছু করেছেন সব পরের জন্য, নিজের জন্য কিছুই নয়। তিনি তাঁর পরিবার, সর্বপ্রকার ভোগবিলাস পরিত্যাগ করেন মানুষের দুঃখরূপ

ভয়ঙ্কর রোগের ঔষধির সন্ধানে তাঁর দিনগুলি নিয়োজিত করবার জন্য। যে যুগে জনগণ ও পুরোহিতরা ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে তত্ত্বালোচনায় মত্ত ছিল, তিনি সে যুগে আবিষ্কার করলেন যা মানুষ খুঁজে পাচ্ছিল না—তা হলো এই সত্য যে, দুঃখ আছে। এর কারণ অপরকে পশ্চাতে ফেলে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার বাসনা এবং আমাদের স্বার্থপরতা। যে মুহূর্তে বিশ্ব নিঃস্বার্থ হবে, সেই মুহূর্তে সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। যতদিন পর্যন্ত সমাজ আইন ও প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বারা দোষত্রুটি দূর করতে প্রচেষ্টা করবে, ততদিন পর্যন্ত তার দোষত্রুটি দূর করা যাবে না। সহস্রাধিক বৎসর ধরে বিশ্ব সে চেষ্টা করে দেখেছে, কিন্তু সাফল্য আসে নি। বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ-এর দ্বারা কোন মন্দ দূর করা যায় না, এর একমাত্র প্রতিকার হলো নিঃস্বার্থপরতা। আমাদের প্রয়োজন আরও আইন পাস না করে, আইনগুলি সবাইকে মানতে বলা। বৌদ্ধধর্ম বিশ্বের প্রথম প্রচারব্রতী ধর্ম, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের এটিও হলো অন্যতম একটি শিক্ষা যে, অন্যধর্মের বিরোধিতা করবে না। বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নিজেদের দুর্বল করে ফেলে।"

রেভারেণ্ড হিরম ও ওয়াল্টার ক্রম্যানও ভাষণ প্রদান করেন।

॥ ৩ ॥

অক্টোবর ২২ কিংবা ২৩ তারিখে স্বামীজী বাল্টিমোর পরিত্যাগ করে ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, সেখানে তিনি শ্রীমতী এনক টটেনের অতিথি হয়েছিলেন। এঁর সম্বন্ধে তিনি শ্রীমতী বুলের নিকট একটি চিঠিতে লেখেন—"ইনি এখানকার একজন প্রতিপত্তিশালী মহিলা এবং একজন দর্শনতত্ত্ববিদ।"[৩৬] শ্রীমতী টটেন হেলদের বান্ধবী কুমারী হাউ-এর ভাইঝি। ওয়াশিংটনে স্বামীজী কুমারী এমা থার্সবির মাধ্যমে বহুলোকের সঙ্গে পরিচিত হন। এমা এই শহরে বহুবার সঙ্গীত অনুষ্ঠান করেছেন এবং সেখানে তাঁর অনেক বন্ধুবান্ধব ছিল। যাঁদের নিকট এমা স্বামীজীর সম্পর্কে পরিচয়পত্র দেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন খনি-ব্যবসায়ে দুর্দান্ত সফল এবং অগ্রণী ব্যক্তিত্ব সিনেট-সদস্য জর্জ হার্স্টের বিধবা পত্নী এবং তখন যিনি সান ফ্রান্সিসকোর একজন স্বল্প পরিচিত তরুণ সাংবাদিকমাত্র, সেই শ্রীযুক্ত উইলিয়াম র‍্যানডল্‌ফ হার্স্টের মাতা শ্রীমতী ফোবে হার্স্ট। স্বামীজী এর কয়েক বৎসর পর কালিফোর্নিয়ায় পুনরায় শ্রীমতী হার্স্টের সাক্ষাৎলাভ করেন। ইনি একজন মানবদরদী হিসাবে

নিজ অধিকারে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, বহু কল্যাণকর উদ্দেশ্যসাধনের জন্য এবং বহুবিধ প্রতিষ্ঠানে তিনি মুক্তহস্তে অর্থদান করেছিলেন, যার মধ্যে একটি ছিল গ্রীনএকার। ১৮৯৪-এর অক্টোবরের ২৩ তারিখে শ্রীমতী হার্স্ট ওয়াশিংটন থেকে কুমারী থার্সবিকে লেখেন ঃ

স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎলাভ করলে আমি সত্যই খুবই সুখী হব—বস্তুত তুমি যাদের প্রতি আগ্রহশীল এমন যে-কোন ব্যক্তিরই সাক্ষাৎলাভে আমি সুখী হব। কিন্তু ওয়াশিংটনে এত অল্প সময়ের জন্য অবস্থান করার দরুন আমি সঠিক বলতে পারছি না যে এখন এখানে তিনি কতটা সাফল্য লাভ করতে পারবেন।

যে-সকল ব্যক্তি তাঁর কাজে আগ্রহান্বিত হতে পারেন, তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই এখন শহরের বাইরে, তাঁরা শহরে ফিরে আসেন বোস্টন কিংবা নিউ ইয়র্কের লোকজনদের তুলনায় আরও দেরি করে। যাই হোক, যদি তিনি এ-সময় ওয়াশিংটনে আসেনই, তুমি নিশ্চয়ই তাঁর হাতে আমাকে লেখা একটি কার্ড দিতে ভুলবে না। আমি তাঁর সাক্ষাৎ পেলে খুবই খুশি হব, তবে দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি তাঁর ওয়াশিংটনের অধিবাসীদের নিকট বক্তৃতা দেবার পক্ষে সময়টা সবচেয়ে প্রতিকূল।[৩৭]

কুমারী থার্সবি স্বামীজীকে শ্রীমতী হার্স্টের নিকট তাঁর পরিচয়পত্র দিতে ভোলেন নি, ভোলেন নি তাঁর অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের নিকটেও পরিচয়পত্র দিতে। স্বামীজীর কুমারী থার্সাবিকে লেখা ছোট্ট চিঠি শ্রীমতী হার্স্টের উপর্যুক্ত চিঠিটি সহ কুমারী থার্সবির কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে, চিঠিটি তারিখবিহীন কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে ওয়াশিংটন থেকেই লেখা এবং যে-সকল মহিলার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে অবশ্যই শ্রীমতী হার্স্ট আছেন।

প্রিয় কুমারী থার্সবি,

আমি আপনার সহৃদয় পত্র এবং পরিচয়পত্রগুলি পেয়েছি। আমি দেখব যাতে মহিলাগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারি। এর দ্বারা উপকৃত হব আশা করছি।

আমি শ্রীযুক্ত ফ্লাগের খুব সুন্দর একটি চিঠি পেয়েছি। আমি শিগ্‌গিরই নিউ ইয়র্কে আসছি এবং সেখানে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে আশা করছি।

গভীরতম ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা সহ[৩৮]

আপনাদের বন্ধু

বিবেকানন্দ

শ্রীমতী হার্স্টের নৈরাশ্যব্যঞ্জক দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও মনে হয় স্বামীজী তাঁর ওয়াশিংটন ভ্রমণ উপভোগ করেছিলেন। শ্রীমতী বুলকে অক্টোবরের ২৭ তারিখে স্বামীজী লিখলেন—"যেমন সর্বত্রই হয়েছে এখানেও তেমনি—আমেরিকার নারীগণ আমাকে এই বিপদ হতে উদ্ধার করেছিলেন"।[৩৯*] চিঠিটা তিনি বিশেষভাবে লিখেছিলেন দক্ষিণাঞ্চলের শহরে যেরূপ বর্ণ-বিদ্বেষের সম্মুখীন হয়েছিলেন সেই সম্পর্কে। কিন্তু সকল ব্যাপারেই আমেরিকার মহিলারাই জানতেন কিভাবে তাঁর যত্ন নিতে হয়। তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে তাঁর গুরুভাইদের লিখলেন—"এ-দেশের মেয়েদের দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম। তারাই আমাকে দোকানে বাজারে সর্বত্র নিয়ে যায় যেন আমি একটি বাচ্চা ছেলে।"[৪০] এবং যে শহরেই তিনি থেকেছেন সেখানেই একজন মাতৃসমা দক্ষ মহিলা তাঁকে যত্ন করতে এগিয়ে এসেছেন। ওয়াশিংটনে ছিলেন শ্রীমতী টটেন। ওয়েস্ট ওয়ান স্ট্রীটের ১৭০৮ নম্বর বাড়ি থেকে স্বামীজী ইসাবেলকে তারিখবিহীন একটি চিঠি লেখেন, চিঠিটায় ডাকঘরের ছাপ ছিল অক্টোবর ২৬ ঃ

প্রিয় ভগিনী,

আমার দীর্ঘ নীরবতার জন্য ক্ষমা করো। 'মাদার চার্চ'কে কিন্তু আমি নিয়মিত চিঠি লিখে যাচ্ছি। তোমরা সকলে নিশ্চয়ই সুন্দর শীতল আবহাওয়া উপভোগ করছ। আমিও বাল্টিমোর ও ওয়াশিংটনকে খুব উপভোগ করছি। এখান থেকে ফিলাডেলফিয়া যাব। আমার ধারণা ছিল মিস মেরী ফিলাডেলফিয়ায় আছে; সুতরাং আমি তার ঠিকানা চেয়েছিলাম। কিন্তু সে ফিলাডেলফিয়ার কাছাকাছি অন্য কোন জায়গায় আছে। তাই মাদার চার্চের কথা মতো সে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসার কষ্ট স্বীকার করুক এ আমি চাই না।

যে মহিলাটির কাছে আমি আছি তাঁর নাম মিস টটেন, মিস হাউ-এর এক ভাইঝি। এখন এক সপ্তাহ তাঁর অতিথি হয়ে থাকব। সুতরাং তুমি তাঁর ঠিকানায় চিঠি লিখতে পারো।

এই শীতে জানুয়ারী ফেব্রুয়ারীর কোন এক সময়ে আমার ইংলণ্ডে যাবার ইচ্ছা। লণ্ডনের এক মহিলার কাছে আমার এক বন্ধু আছেন। মহিলাটি তাঁর আতিথ্য গ্রহণের জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ওদিকে ফিরে যাবার জন্য ভারত থেকে প্রতিদিন আমাকে তাগাদা দিচ্ছে।

---

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, পত্রসংখ্যা ১২৬, পৃঃ ৫০২

কার্টুনে পিটুকে কেমন লাগল? কাউকে কিন্তু দেখিও না। পিটুকে নিয়ে এভাবে তামাশা করা কিন্তু আমাদের দেশের লোকের অন্যায়। তোমার কাছ থেকে চিঠি পেতে সব সময় আমার কত না আগ্রহ; দয়া করে যদি লেখাকে আর একটু স্পষ্ট করার পরিশ্রম করো। দোহাই, এই প্রস্তাবে চটে যেও না যেন।

তোমার সদা স্নেহময় ভ্রাতা
বিবেকানন্দ[৪১] *

যে মহিলাটি লণ্ডন থেকে স্বামীজীকে তাঁর অতিথি হবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তিনি হলেন ধর্মমহাসম্মেলনে থিওসফিক্যাল সমিতির অন্যতম প্রতিনিধি কুমারী হেনরিয়েটা মূলার। স্বামীজীর যে তরুণ বন্ধুটি কুমারী মূলারের অতিথি হয়েছিলেন, তিনি হলেন এক হিন্দু যুবক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ, বৎসরকাল পূর্বে কুমারী মূলার তাঁকে দত্তক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তখন তিনি অক্ষয়কে কেম্ব্রিজে আইন পড়বার জন্য পাঠাবার বন্দোবস্ত করছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই অক্ষয়কুমার ঘোষই কুমারী মূলারের হয়ে স্বামীজীকে আসবার জন্য চিঠি লিখেছিলেন। অক্টোবরের ২৭ তারিখে স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে লেখেন—"অক্ষয় (অক্ষয় কুমার ঘোষ) এখন লণ্ডনে আছে—সে লণ্ডনে মিস মূলারের নিকট যাবার জন্য আমাকে একখানি সুন্দর নিমন্ত্রণপত্র লিখেছে। বোধ হয়, আগামী জানুয়ারী বা ফেব্রুয়ারী লণ্ডনে যাব।"[৪২] **—এটি এসময়ে মোটামুটি একটি সুনিশ্চিত পরিকল্পনা ছিল। স্বামীজী তখন পুনরায় আমেরিকায় এবং প্রচারের জন্য বক্তৃতা দেওয়ার ব্যাপারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। ঐ একই দিনে শ্রীমতী হেলকে লেখেন—"আমি কি নিদারুণভাবে চাইছি এই ক্লান্ত জীবন-ধারাকে পরিত্যাগ করি, পরিত্যাগ করি এই দিন-রাত প্রচারের জীবনকে।" আমি এখান থেকে নিউ ইয়র্ক হয়ে এসে আপনার সঙ্গে শিকাগোয় দেখা করে ইংল্যাণ্ড যাত্রা করব।[৪৩] কিন্তু এসব সিদ্ধান্তই তাঁকে পরিবর্তন করতে হয়েছিল। স্বামীজী জানতেন যে ১৮৯৪-এর শেষভাগে করা এই পরিকল্পনা নেহাতই অস্থায়ী। এমন কি আলাসিঙ্গাকে ২৭ অক্টোবরের চিঠিতে তিনি লেখেন—"ভারতেও যা করতাম, এখানে ঠিক তাই করছি। ভগবান যেখানে নিয়ে যাচ্ছেন, সেখানেই যাচ্ছি—আগে থেকে সঙ্কল্প করে আমার কোন কাজ হয় না।"[৪৪] **

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, পত্রসংখ্যা ১২৫, পৃঃ ৫০১-০২
** ঐ, ৭ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সং, পত্রসংখ্যা ১২৯, পৃঃ ১৮

এ চিঠিটার অপ্রকাশিত একটি অংশে তিনি আরও লিখেছেন—*এতদিনে তুমি আমার অন্য চিঠিগুলিও পেয়ে থাকবে। তাতে কোথাও কোথাও একটু রূঢ়তার আভাস পাওয়া যেতে পারে। কিছু মনে করো না। তুমি তো ভাল করে জান যে, আমি তোমাদের ভালবাসি।* এ-চিঠির উত্তরে স্বামীজীর মাদ্রাজী শিষ্যবৃন্দ নভেম্বরের ২৯ তারিখে একটি যৌথ উত্তর লিখলেন। তার থেকে নিম্নলিখিত উদ্ধৃত অংশগুলি প্রমাণ করছে তাদের অনুপস্থিত গুরুর জন্য তাদের ভালবাসা কত গভীর এবং কত মর্মস্পর্শী ছিল। জি. জি. নরসিমহাচারিয়া—যার সম্পর্কে স্বামীজী একবার লিখেছিলেন—"ওর প্রকৃতি একটু আবেগপ্রবণ"— সে প্রথমাংশ লিখেছে, দ্বিতীয় অংশ লিখেছে আলাসিঙ্গা, তৃতীয় অংশটি লিখেছে কিডি (সিঙ্গেরাভেলু মুদালিয়র, মাদ্রাজের একজন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক) ঃ

পরমপ্রিয় স্বামীজী,

ওয়াশিংটন থেকে লেখা আপনার শেষ চিঠিটি আমাদের হাতে এসেছে। আমরা আশা করছি আপনার বাল্টিমোর ভ্রমণ অধিকতর সফল হবে এবং ভ্রুম্যানদের সন্তোষ উৎপাদন করবে। কতকগুলি সাধারণ হোটেল প্রথমে হয়তো একটু শীতল ব্যবহার করতেই পারে, কিন্তু আমরা মনে করি সে সবই মঙ্গলের জন্য। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে বাল্টিমোর আরও উত্তমরূপে আপনাকে গ্রহণ করতে পারবে।

আপনার শেষ চিঠিটা মনে হয় আপনার স্বাভাবিক মনের অবস্থায় লেখা হয় নি। এতে আমরা আপনার অতিশয় শ্রান্তির অভিব্যক্তি দেখতে পাচ্ছি। আমাদের কথা বলতে গেলে আমরা আমেরিকায় আপনার দীর্ঘ অবস্থানের জন্য খুব একটা অভিযোগ করছি না, কারণ আমরা আন্তরিকভাবে অনুভব করছি যে, ঐ দেশ আপনাকে ঈশ্বরের বাণী প্রচারের জন্য প্রশস্ত এবং উপযুক্ত ক্ষেত্র দিয়েছে। ও-দেশেই বিভিন্ন ধর্মের প্রবক্তাগণ ঈশ্বরের বাণী প্রথম শুনেছেন এবং সেখানেই সে বাণী গৃহীত হয়েছে এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে।

আপনি আমাদের উপদেশ দিয়েছেন আমরা যেন কারও ওপর নির্ভরশীল না হই, আমরা যেন আমাদের নিজেদের ওপর বিশ্বাস রাখি, কিন্তু তা আমাদের আপনাকে ভালবাসতে বাধা দিতে পারে না। কারণ আপনিই আমাদের সত্যিকারের আধ্যাত্মিকভাবে ভালবেসে আমাদের মনকে উদার করে তুলে ভালবাসার কি অসীম শক্তি তা প্রথমে শিখিয়েছেন। আপনার

নিকট থেকে আসা কোন কিছুই রূঢ় হতে পারে না, আপনার কাছ থেকে কোন পাওয়াই বাহুল্য নয়। এতদিন পর্যন্ত যা আমাদের কয়েকজনকে একত্রে আবদ্ধ করেছিল তা হলো ঐহিক মাধ্যাকর্ষণ, তা ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু এখন আমরা অনুভব করি একটি সম্প্রসারণশীল বন্ধনসূত্র যা সমগ্র বিশ্বকে একত্রে বাঁধতে পারে তার মধুর এবং আনন্দময় দৃঢ় নাগালের মধ্যে অথচ যা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। অন্তত আমাদের কয়েকজনের নিকট সে সূত্রটি হলেন বিবেকানন্দ। আপনি পার্থিব কোন কিছুই কামনা করেন না। আপনি এখন আমেরিকার লোকজনদের বোঝেন এবং আপনি তাদের ভালবাসেন। কিন্তু আমরা এখনও এদিককার জগতের লোক, আমরা বহির্বিশ্বকে আদৌ জানি না, সেজন্য আমরা হয়তো আপনার জন্য অতিরিক্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে চিঠি লিখি বা বোকার মতো কিছু করে বসি, কিন্তু আমরা যে চিন্তার দ্বারা নিজেদের সান্ত্বনা দিই, তাহলো কিডির ভাষায় "যা আছে সবই ঠিক আছে।"

আমাদের সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এবং আমরা যা আপনার জন্য করতে পারি বলে ভাবি সে-সকল সত্ত্বেও এক এক সময় মনে একটা ভাব আসে যাকে কিছুতেই ঠেকাতে পারি না—মনে হয় আমরা যেন গভীর অরণ্যে প্রবিষ্ট এক একজন অন্ধ ব্যক্তি, উত্তাল সমুদ্রে একটি শূন্য জাহাজ, যেন সুতো ছাড়া একটি ঘুড়ি। তখন আমরা মাঝে মাঝে আপনার শরণ নিয়ে আমাদের প্রার্থনা জানাই। না, আপনি তাড়িয়ে দিলেও আমরা অন্য কোথাও যেতে পারি না—আমরা আপনার সঙ্গে আঠার মতো লেগে না থেকে কোনমতেই পারি না। আপনি কি আমাদের ভালবাসেন না? আমরা কি এখনও অজ্ঞান শিশুমাত্র নই, যাদের একজন পথপ্রদর্শক প্রয়োজন? ঈশ্বরের দর্শন না পাওয়া পর্যন্ত আমরা কি করে নিশ্চেষ্ট হতে পারি? ভয় হচ্ছে আমি বড় বোকা এবং কষ্টদায়ক হয়ে উঠছি।

আমি ইতঃপূর্বে আমাদের শেষ চিঠিগুলিতে উল্লেখ করেছি যে-কথা, সে-কথাই লিখছি যে, ওখানে আপনি যা কিছু করছেন, তা ভারতে আরও জোরের সঙ্গে ফিরে আসছে। এখানে প্রত্যেকে এখন আকাশে বাতাসে ধর্মকে অনুভব করে। এখানে কিছু ধর্মযাজক যারা নিজেদের অধঃপতিত মূর্তিপূজকদের বন্ধু মনে করে তারা যেন এখন সদ্য স্বপ্নোত্থিতের মতো নিদ্রা হতে জাগরিত হয়ে উঠে দেখল যে, ওখানে এখন সব

কিছু আপনার অনুকূলে, তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের এ পার হতে আপনাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করল। আলাসিঙ্গা হাডসন নামে এক ধর্মযাজকের খ্রিয়ান কলেজ পত্রিকায় লেখা একটি প্রবন্ধের আলোচনা আপনাকে শেষ ডাকে পাঠিয়েছে। খ্রীস্টের সমর্থক ঐ একই ব্যক্তি কলকাতার স্টেট্‌সম্যান পত্রিকায় একটি পত্র লিখেছে, যার বক্তব্য—আমেরিকায় বিবেকানন্দের প্রতি জনচিত্ত আকর্ষণের হেতু তার লুটিয়ে পড়া আলখাল্লা এবং কমলা রঙের পাগড়ি। মাদ্রাজ টাইমস পত্রিকায় ইউরোপীয় সম্পাদক এর ওপর আব একটি প্রবন্ধ লিখেছেন সেটি এই সঙ্গে পাঠানো হলো।

মাদ্রাজের সকল বন্ধুগণ স্বামীজীর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করছে—

আপনার স্নেহধন্য

জি. জি. নরসিমহাচারিয়া

প্রিয় স্বামীজী,

কলেজের কাজে ডুবে থাকাই এ-সপ্তাহে আপনাকে আমার দীর্ঘ চিঠি না লেখার কারণ। সুযোগ নিয়েছি আমি এ-ব্যাপারে কারণ এবারে এ-কাজটি আরও ভালভাবে সম্পন্ন করছে জি. জি.। আমাকে এজন্য আশা করছি মার্জনা করবেন। আমরা যতই এ-কথায় বিশ্বাস করবার চেষ্টা করি না কেন যে বর্তমানে ধর্মের পুনরুজ্জীবনে আমাদের কিছু হাত আছে। পূর্ণবিশ্বাস কিন্তু কিছুতেই জন্মাচ্ছে না। আমরা কিছুই করিনি। যা কিছু ঘটেছে তা ঘটছে আপনার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার যে অগ্নি জ্বলছে তারই জন্য। আপনি চান আমরা যেন এগিয়ে চলি। যদিও আমরা খুবই বুঝি আপনি কি ভয়ানক পরিশ্রমসাধ্য কাজ করে চলেছেন, তবুও আমরা যে আপনাকে এ-কাজে একবারের জন্যও বিরাম দেবার ব্যাপারে কত অসহায় তা অনুভব করি। আপনার ভারতে প্রত্যাবর্তন দুটি উদ্দেশ্য সাধন করবে। হয়তো আপনাকে কিছু বিশ্রাম এনে দেবে এবং আপনার মাতৃভূমিতে আপনার আরব্ধ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। এই সঙ্গে আমি আপনাকে পাঠাচ্ছি ইউরোপীয়ান ডেইলী পত্রিকায় প্রকাশিত মুখ্য সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি যাতে একজন ধর্মযাজক দ্বারা আপনার কৃত হিন্দু ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যার সমালোচনার পর্যালোচনা করা হয়েছে। এটির কথা জি. জি.ও আপনাকে লিখেছে। আপনি আমেরিকা পরিত্যাগ করে ইংল্যাণ্ডে যাত্রার পূর্বে আমাদের সংবাদ দিতে ভুলবেন না এবং তাতে আপনাকে ইংল্যাণ্ডে কোথায় চিঠিপত্র

দেব সে বিষয়ে নির্দেশ দেবেন। সময় সংক্ষেপ, তাই আর কিছু লিখতে পারলাম না। ডক্টর, কিডি এবং অন্যান্য বন্ধুরা আপনাকে প্রণাম জানাচ্ছে—

আপনার একান্ত স্নেহভাজন

এম. সি. আলাসিঙ্গা

আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এখানে একটি গুজব রটেছে যে ভট্টাচার্যিকে (শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য, যাঁর নিকট স্বামীজী অ্যানিস্কোয়াম থেকে চিঠি লিখেছিলেন) কলকাতায় বদলি করা হয়েছে। মাদ্রাজ সমাজে সৃষ্ট এই শূন্যতা কখনই আর পরিপূরিত হবে না। হয়তো তাঁর মাদ্রাজে যে-কাজ করার ছিল, অর্থাৎ আপনাকে মাদ্রাজবাসীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, তা সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। এম. সি. এ.

আপনার ভালবাসার প্রতি আমার সমাদর গ্রহণ করুন।[৪৫] কিডি

(এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, স্বামীজীর সন্ন্যাসী গুরু-ভ্রাতাগণও তাঁকে "জনৈক হাডসন"-এর কাণ্ডকারখানার কথা লিখেছিলেন যার উত্তরে স্বামীজী লেখেন— *"কে একজন হাডসন আমার বিরুদ্ধে কি বলেছে আমার তার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রথম কথা, এ অপ্রয়োজনীয়, এবং দ্বিতীযত, এতে আমি শ্রীযুক্ত হাডসনের মতো লোকদের স্তরে নেমে যাব। তোমরা কি উন্মাদ হয়ে গিয়েছ? এখান থেকে আমি কোথাকার কে এক হাডসনের সঙ্গে লড়াই করব? ঈশ্বরের কৃপায় শ্রীযুক্ত হাডসনের অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরের লোক আমার কথা ভক্তিভরে শোনে।"*)

স্বামীজী ওয়াশিংটনে পৌঁছবার পর সপ্তাহ খানেক না কাটিয়ে ওখানে বক্তৃতা করতে ইচ্ছা করেন নি। তাঁর প্রথম দুটি নির্ধারিত বক্তৃতা—যা মেজেরফ্ মিউজিক হলে দেবার কথা হয়েছিল, সে বিষয়টি অক্টোবরের ২৭ তারিখে ইভনিং স্টার পত্রিকায় ঘোষিত হয় ঃ

স্বামী বিবেকানন্দ,

ভারতের মহান উচ্চপদস্থ ধর্মযাজক।

দুটি বিখ্যাত ভাষণঃ

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ১— "করমন্ত্র!"

মঙ্গলবার, নভেম্বর ৬— "সকলজাতির দেবদেবী (ঈশ্বর)।"

কিন্তু যা ঘটল তা হলো স্বামীজী তাঁর "করমন্ত্র!", (ওয়াশিংটন টাইম-এ বলা হয়েছে "ক্যান ম্যান্ত্র"!) এর সম্বন্ধে আলোচনা, যা শেষ পর্যন্ত

দেখা গেল "পূনর্জন্ম-তত্ত্ব" -এর ওপর তাঁর একটি বক্তৃতা, তা দেবার পূর্বে রবিবার, ২৮ অক্টোবর তারিখে দুবার বক্তৃতা করলেন। রবিবার সকালের বক্তৃতা বিষয়ে "ওয়াশিংটন ইভনিং পোস্ট" মন্তব্য করল :

ধর্ম অন্তরে

পীপ্‌ল্‌স চার্চে গতকাল প্রাতে ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী বিবে কানন্দ একটি বক্তৃতা দেন, যাতে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ধর্ম গ্রন্থে নেই, বিগ্রহে নেই, সম্প্রদায়ের মধ্যে নেই, ধর্মের অবস্থান মানুষের অন্তরে।

রবিবার সকালে দেওয়া বক্তৃতার বিষয়ে আরও দীর্ঘতর এবং সন্তোষজনক প্রতিবেদন ওয়াশিংটন টাইম্‌স-এ অক্টোবর ২৯ তারিখে (পরিশিষ্ট-খ দ্রষ্টব্য) প্রকাশিত হলো এবং একই দিনে ওয়াশিংটন পোস্ট নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি প্রকাশ করল :

কেবলমাত্র একজন হিন্দু সন্ন্যাসী

বিবে কানন্দ যোগীদের ভেলকিবাজিতে বিশ্বাস করেন না।

একজন হিন্দু যিনি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত নন, যিনি নিজেকে কোন বিশেষ জ্ঞান বা যোগ-বিভূতির অধিকারি বলেও দাবি করেন না, যিনি কখনও দালাই লামাকে দেখেন নি এবং যিনি তাঁর নিজের এবং ভারতীয় অদ্ভুতকর্মা যোগীদের সম্বন্ধে সেখানকার প্রত্যন্তপ্রদেশে কর্মরত খ্রীস্টান ধর্মযাজকদের অপেক্ষা অধিকতর আগ্রহশীল নন, অথচ যিনি বিশ্বমানবের শিক্ষক হয়েও নিজেকে ধর্মীয় শিক্ষার্থী বলেই মনে করেন, এমন ব্যক্তিত্ব নিশ্চয়ই খুব বিরল।

এই হিন্দু সন্ন্যাসী অথবা "স্বামী" হলেন শ্রীযুক্ত বিবে কানন্দ, ইনি এখন এই শহরে কর্নেল এনক টটেনের অতিথি। শ্রীযুক্ত কানন্দ ওয়াশিংটনে আগামী দেড় সপ্তাহের মধ্যে দুটি বক্তৃতা করবার প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছেন। কিন্তু পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই তিনি গতকাল দুবার বক্তৃতা করেছেন—টাইপোগ্রাফিকাল টেম্পলে এবং পীপলস্‌ চার্চের ধর্মসভায়। তিনি বিশ্বমেলার সময় শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান করেছিলেন এবং এখন এখানে সারা দেশ ভ্রমণ করছেন আর নানা শহরে বক্তৃতা ও ধর্মোপদেশ দিয়ে বেড়াচ্ছেন। যদিও তিনি ধর্মমহাসভার একজন সদস্য ছিলেন, তথাপি শ্রীযুক্ত কানন্দ কোন সম্প্রদায় মানেন না, তিনি নিজেকে শুধু একজন হিন্দু বলেই অভিহিত করে থাকেন, যে শব্দটি তিনি তাঁর জাতি এবং ধর্ম দুই-ই বোঝানোর জন্য ব্যবহার করে থাকেন। তাঁর

দেশে ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাঁর স্থান ঠিক এ-দেশের ইউনিটেরিয়ানের মতো। ব্রাহ্মসমাজ নিজেদেরকে হিন্দু ইউনিটেরিয়ান বলে দাবি করেও, কানন্দ, যিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই কাজ করেন, তাঁকে তারা তাদের ধর্মের চৌহদ্দীর বাহিরে রেখে দিয়েছে।

সব ধর্মই উত্তম

শ্রীযুক্ত কানন্দ গতকাল পীপ্‌লস্‌ চার্চে উক্ত গির্জার আচার্য শ্রীযুক্ত কেন্টের আমন্ত্রণে ভাষণ দেন। তাঁর সকালবেলার ভাষণটি রীতিমত উপদেশমূলক। ধর্মের আধ্যাত্মিক দিক নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করে গোঁড়া সম্প্রদায়গুলির সামনে মৌলিক এই সিদ্ধান্ত উপস্থিত করা হয় যে, সব ধর্মের ভিত্তিতেই সত্য রয়েছে, প্রতিটি ধর্মই বিভিন্ন ভাষার মতো একই উৎস হতে উদ্ভূত এবং প্রতিটি ধর্মেই তার বাহ্য এবং আধ্যাত্মিক দিকগুলি ভালই থাকে যতক্ষণ না তা মতবাদে এবং জড়তায় পরিণত হয়। অপরাহ্নের ভাষণটি প্রধানত আর্যজাতির ওপরে ছিল এবং এতে আর্যজাতির বিভিন্ন শাখাপ্রশাখার উৎস নির্ধারণ করেছেন। তাদের ভাষা, ধর্ম, প্রথাসমূহ সংস্কৃত ভাষার সাধারণ ভাণ্ডার হতে পাওয়া এটা দেখিয়ে তা থেকে ঐ নির্ধারণের প্রয়াস পান।

সভার শেষে পোস্ট পত্রিকার প্রতিবেদককে শ্রীকানন্দ বলেন—"আমি নিজেকে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নয় বলে দাবি করি, আমি একজন দর্শক মাত্র এবং আমার সাধ্যানুসারে আমি যে কাজ করি তার জন্য আমাকে মানব জাতির একজন শিক্ষক বলে মনে করা যেতে পারে। আমার নিকট সব ধর্মই উত্তম। জীবন ও অস্তিত্বের উচ্চতর রহস্য সম্বন্ধে আমি অন্যদের মতোই কিছু অনুমান করতে পারি। আমার নিকট পুনর্জন্ম আধ্যাত্মিক জগতে আমাদের যে-সকল রহস্যের সম্মুখীন হতে হয় সেরকম বহু বিষয়ের পশ্চাতে অবস্থিত সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা স্বরূপ। কিন্তু এ-সকলকে আমি মতবাদরূপে উপস্থাপিত করি না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া এর আর কোন প্রমাণ নেই এবং যার সে অভিজ্ঞতা হয়েছে একমাত্র তার কাছেই তা প্রমাণস্বরূপ। আপনার অভিজ্ঞতা আমার নিকট কিছুই নয়, আমারটাও আপনার কাছে তথৈবচ। আমি কোন অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস করি না—ধর্মের ব্যাপারে আমি এগুলিকে ঘৃণ্যবস্তু বলে মনে করি। আপনি আমার সামনে সমগ্র পৃথিবীকে চুরমার করে নামাতে পারেন, কিন্তু তা আমার কাছে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নয়, কিংবা আপনি যে ঈশ্বরের দূত—যদি সেরকম কেউ থেকে থাকেন—সেটা তারও কোন প্রমাণ নয়।

ইনি পুনর্জন্মে অন্ধবিশ্বাসী।

"বর্তমানের অস্তিত্বের জন্য অবশ্যই আমার অতীত এবং ভবিষ্যতে বিশ্বাস আবশ্যিক বলে মনে হয়। আমরা বর্তমানে যে রূপ পরিগ্রহ করেছি তা যদি ত্যাগ করে যেতে হয়, তাহলে আমাদের অন্যান্য রূপ পরিগ্রহও অনিবার্য এবং এভাবেই আমার পুনর্জন্মে বিশ্বাস গড়ে উঠেছে। কিন্তু কিছুই আমি প্রমাণ করতে পারব না। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি আমার পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস কেড়ে নিতে পারে, আমি তাকে স্বাগত জানাব, যদি তার পরিবর্তে সে যে-তত্ত্বটি আমায় দেবে তা অধিকতর সন্তোষজনক হয়। এখন পর্যন্ত এর চেয়ে সন্তোষজনক কোন তত্ত্ব আমি পাই নি।"

শ্রীকানন্দ কলকাতার অধিবাসী এবং ওখানকার এক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। তিনি ভারতীয়দের ন্যায় ইংরেজী বলেন। তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ এই ভাষাতেই ঘটে। তাঁর নিজ দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে ইংরেজদের যোগাযোগ লক্ষ্য করবার উত্তম সুযোগ তিনি পেয়েছেন এবং তিনি যেরূপ নিরুদ্বিগ্নভাবে নিজ দেশীয়দের খ্রীস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া সম্বন্ধে কথা বলেন, তা শুনে বিদেশী প্রচারকগণ নিরাশ বোধ করবেন। এ-সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়—প্রাচ্য চিন্তাধারার ওপর পাশ্চাত্য শিক্ষা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে?

এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—"অবশ্য কোন চিন্তাধারা একটি দেশে আসবে অথচ তার কোন প্রভাব তার ওপর পড়বে না—এ তো আর হতে পারে না। কিন্তু প্রাচ্য চিন্তাধারার ওপর খ্রীস্টধর্মীয় শিক্ষা যদি কোন প্রভাব ফেলেও থাকে, তা এতই যৎসামান্য যে তা প্রায় চোখেই পড়ে না। পাশ্চাত্য মতবাদসমূহ ততটুকুই প্রভাব বিস্তার করেছে যতটা প্রাচ্য চিন্তাধারা পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার ওপর করেছে। হয়তো ততটাও নয়। অর্থাৎ দেশের অধিবাসীদের মধ্যে উচ্চস্তরে চিন্তা যারা করে প্রভাবটা তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু জনগণের ওপর ধর্ম প্রচারকদের প্রভাব চোখে না পড়বার মতো। অবশ্য যখন কেউ ধর্মান্তরিত হয় তখন তৎক্ষণাৎ দেশীয় সমাজ থেকে চ্যুত হয়, কিন্তু জনগণ এত বিপুলসংখ্যক এবং ধর্মপ্রচারকদের দ্বারা ধর্মান্তরিত ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা এতই নগণ্য যে, তা প্রায় নজরেই পড়ে না।"

যোগীরা হলো জাদুকর

শ্রীযুক্ত কানন্দকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো যে যোগীদের অলৌকিক ক্ষমতা বিষয়ে তিনি কিছু জানেন কিনা। উত্তরে তিনি বললেন যে, অলৌকিক ব্যাপারে তাঁর কোন আগ্রহ নেই। যদিও তাঁর দেশে চতুর জাদুকর অনেক

আছে। তাদের সবটাই কলাকৌশলমাত্র। তিনি বলেন, তিনি একবার মাত্র আম নিয়ে একটি কারসাজি দেখেছেন এবং তারপর একজন ফকিরের দ্বারা অনুষ্ঠিত আরও ছোট আকারের একটি খেলা দেখেছেন। তিনি লামাদের ক্ষমতাসম্বন্ধেও একই মত পোষণ করে থাকেন। তিনি বলেন "এ-ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে সত্যিকারের সুশিক্ষিত বৈজ্ঞানিক চেতনাসম্পন্ন এবং কুসংস্কারমুক্ত দর্শক খুব কমই আছে যারা কোন্‌টা মিথ্যা কোন্‌টা সত্য তা নির্ণয় করতে পারে।"

শ্রীযুক্ত কানন্দ ওয়াশিংটনে বৃহস্পতিবার অবধি থাকবেন। এর মধ্যে তিনি মেজেরোট সভাগৃহে "জন্মান্তর" সম্বন্ধে ভাষণ দেবেন এবং নিউ ইয়র্কে স্বল্প সময়ের ভ্রমণ সেরে ফিরবেন তার পরের মঙ্গলবার "সকল জাতির দেবদেবী" সম্বন্ধে একটি ভাষণ দেবার জন্য। [আসলে "সকল জাতির একই ঈশ্বর" বিষয়ে]

ওয়াশিংটন টাইমস্-এর ২ নভেম্বর তারিখের সংবাদ অনুযায়ী স্বামীজী হয়তো "পুনর্জন্ম" বিষয়ে বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন কিন্তু "সকল জাতির একই ঈশ্বর" শীর্ষক বক্তৃতাটির ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হয় এবং পূর্বোক্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদানুসারে তিনি নিউ ইয়র্কে সংক্ষিপ্ত ভ্রমণের জন্যও যাননি। বরঞ্চ আমরা তাঁর মেরী হেলকে লেখা প্রকাশিত একটি চিঠি থেকে এ-সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, তাঁর পরিকল্পনা ছিল বাল্টিমোরে নভেম্বরের ২ এবং ৪ তারিখে বক্তৃতা করে নভেম্বরের ৬ তারিখে ওয়াশিংটনে ফিরে আসা এবং তারপর অধ্যাপক রাইটের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে অল্প কয়েক দিনের জন্য ফিলাডেলফিয়া যাওয়া। অধ্যাপক রাইট তখন ওখানে শীত ঋতু যাপন করছিলেন। বাল্টিমোরের সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে স্বামীজীর নভেম্বরের ২ ও ৫ তারিখের বক্তৃতার বিষয় ছিল যথাক্রমে "ভারত ও তার ধর্ম" এবং "ভারত ও তার জনজীবন"। এ উভয় বক্তৃতাই পরিকল্পিত "আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়" স্থাপনের উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য প্রদত্ত হওয়ার কথা।

স্বামীজী প্রথম যে বক্তৃতাটি দেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণী "বাল্টিমোর নিউজ" পত্রিকায় নভেম্বরের ৩ তারিখে নিম্নলিখিতরূপে প্রকাশিত হয় :

বিবেকানন্দের ভাষণ

স্বামী বিবেকানন্দ, হিন্দুদের উচ্চপদস্থ ধর্মযাজক, গত রাতে হ্যারিস অ্যাকাডেমির মিউজিক কনসার্ট কক্ষে ভাষণ দেন। তাঁর বিষয়বস্তু ছিল "ভারত ও তার ধর্ম"। তিনি বিভিন্ন প্রাচ্য ধর্মমত সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

তার মধ্যে তাঁর নিজের ধর্মও অন্তর্ভুক্ত ছিল—সেটি হলো ব্রাহ্মণ্যধর্ম। সেই মূর্তিপূজক দেশে বিভিন্ন ধর্মের এতজন ধর্মপ্রচারক প্রেরণের চিন্তাকে তিনি উপহাস করেন এবং বলেন যে, বিভিন্ন ধর্মপ্রচারের কাজের মধ্যে একটি ঐক্যসাধন করা কর্তব্য। শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ ব্যাখ্যা করে বলেন যে, হিন্দুধর্ম নৈরাশ্যবাদী নয়, আশাবাদী। তাঁর আলোচনার মুখ্য বিষয় হলো "জন্মান্তরবাদ", যার অর্থ হলো সকলেই অতীতে ছিল, এখনও আছে আবার অন্যরূপে ভবিষ্যতেও থাকবে। বক্তৃতার দ্বারা সংগৃহীত অর্থ একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হবে।

এটাই ছিল স্বামীজীর বাল্টিমোরে দেওয়া শেষ বক্তৃতা। অকস্মাৎ—এর কারণ আজও অজ্ঞাত—তাঁর পরিকল্পনা পরিবর্তিত হয় এবং তিনি নিউ ইয়র্কে ফিরে আসেন। এ খবর আমরা ক্রুম্যান ভ্রাতৃবৃন্দের মাধ্যমে জানতে পারি। নভেম্বরের ৪ তারিখে লাইসিয়াম রঙ্গমঞ্চে প্রদত্ত ঘোষণায় বলা হয় যে—"উচ্চপদস্থ ধর্মযাজক রেভাঃ স্বামী বিবেকানন্দ অকস্মাৎ নিউ ইয়র্কে যাবার জন্য আহূত হয়েছেন এবং সেজন্য তিনি আর অ্যাকাডেমি অব মিউজিক কনসার্ট প্রেক্ষাগৃহে বক্তৃতা করতে পারবেন না।" সুতরাং যে দিনটি যাত্রার জন্য স্থির হয়েছিল তার দু-তিনদিন আগেই স্বামীজীর বাল্টিমোর এবং ওয়াশিংটন ভ্রমণে সমাপ্তি ঘটে।

যেহেতু স্বামীজী অকস্মাৎ নিউ ইয়র্কে আহূত হন, এটা সম্ভব নয় যে তিনি পথে ফিলাডেলফিয়ায় অধ্যাপক রাইটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য থেমেছেন। বস্তুত নভেম্বরে তাঁর কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমরা যে খুব কিছু জানি, তা নয়। আমরা শুধু অনুমান করতে পারি যে প্রায় পুরো মাসটা তিনি নিউ ইয়র্ক শহরে অতিবাহিত করেন, কিন্তু তিনি সেখানে কোন বক্তৃতা করেছিলেন কিনা তা জানা যায় না। এ-সময় স্বামীজীর পরিকল্পনাটি সবটাই অনিশ্চিত ছিল এবং সেটাই ছিল হয়তো স্বাভাবিক, কারণ এ ছিল ১৮৯৪-এর শেষভাগ। এই সময় পাশ্চাত্যে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে একজন আচার্যরূপে কাজ করার চিন্তা তাঁর মনে নিশ্চিতভাবে রূপ পরিগ্রহ করছিল এবং এটা কার্যকর হবার পথও উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছিল। প্রতিটি ঘটনা যা ঘটছিল তা যেখানে যা প্রয়োজন ঠিক তদনুসারেই ঘটছিল। তাঁর ইংল্যাণ্ডে আগমনের এবং ভারতে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাবিত পরিকল্পনা স্থগিত হলো, যদি একসময় এর সম্ভাবনা সুনিশ্চিত হয়েও থাকে, এখন তা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তাঁর গ্রীনএকারে থাকাকালে ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনে

বক্তৃতা করার কথা হয়েছিল এখন বছরের শেষে তা স্থিরনিশ্চিত হয়ে গেল। ডিসেম্বর মাসের প্রসঙ্গে বলতে হয় শ্রীমতী বুল এমন পরিকল্পনা করছিলেন যাতে স্বামীজীর "পূর্ব পরিকল্পনা" সফল হবার আশা নতুন করে জাগ্রত হয়। নভেম্বরের ১৮ তারিখে স্বামীজী শ্রীমতী হেলকে যে চিঠি লেখেন, তার থেকে এ-সকল বিষয় কিছু কিছু জানা যায়। চিঠির পুরো বয়ান হলো ঃ

প্রিয় মা,

এবারে আপনাকে চিঠি লিখতে আমার সত্যিই খুবই দেরি হয়ে গেল। তার কারণ অবশ্য কুমারী মেরী নিশ্চয়ই এতদিনে আপনাকে আমার খবর জানিয়ে থাকবে।

কাপড়জামাগুলি নিরাপদে এসে পৌঁছেছে। আমি গ্রীষ্মের পোশাক এবং আরও কিছু অন্য কাপড় চোপড় যা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো এখন অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে, সেগুলি আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।

এই ডিসেম্বর মাসে ইউরোপে যাবার নিশ্চয়তা এখন আর রইল না—এখন কবে যে সেখানে যাব তা অনিশ্চিত।

ভগিনী মেরীর স্বাস্থ্য আগে যা দেখেছিলাম তার চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে। সে এখন একদল অশ্বারোহী শৃগাল-শিকারি গ্রাম্য জমিদারের সঙ্গে সুখে বাস করছে। আমি আশা করি ওদের মধ্যেই কোন অর্থবান জমিদারকে সে বিবাহ করবে। আমি আগামীকালই শ্রীমতী স্পলডিং-এর গৃহে পুনরায় তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি। আমি গতকাল অপরাহ্ণেও সেখানে গিয়েছিলাম। এ মাসেই আমি নিউ ইয়র্কে যাচ্ছি, তারপর যাব বোস্টন এবং হয়ত সেখানে সারা ডিসেম্বর মাসই থাকব। গত বছর বসন্তকালে আমি যখন বোস্টনে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম তখন আমি শিকাগো গিয়েছিলাম। সে সময়ে কিন্তু শ্রীমতী ব্যাগলি আশা করেছিলেন আমি ডেট্রয়েটেই যাব। সুতরাং এবারে আমি আগে ডেট্রয়েটে যাব, পরে শিকাগোতে আসব—যদি অবশ্য তা সম্ভব হয়। আর তা না হলে শিগ্‌গিরই পশ্চিমে যাবার পরিকল্পনা একেবারেই বাতিল করব।

এখন মনে হচ্ছে আমার পরিকল্পনা পশ্চিমের চেয়ে পূর্বেই ভালভাবে সফল হবার সম্ভাবনা।

আমি ফনোগ্রাফের সংবাদ পেয়েছি, এটি নিরাপদে এসে পৌঁছেছে এবং রাজা (খেতড়ীর) এটির বিষয়ে আমাকে খুব সুন্দর একটি চিঠি

দিয়েছেন। আমি ভারত থেকে অনেকগুলি অভিনন্দনপত্র এবং অনুরূপ আজেবাজে জিনিস আরও কিছু পেয়েছি। আমি দেশে তাদের লিখেছি আর যেন আমাকে সংবাদপত্রের কর্তিত অংশ না পাঠানো হয়। বাড়িতে খুকীদের আমি আমার প্রীতি জানাচ্ছি এবং যে খুকীটি দূরে আছে তার সঙ্গে শিগ্‌গিরই দেখা করতে যাচ্ছি।

শ্রীমতী গার্নসি মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হয়েছিলেন। তিনি এখন ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন। আমি এখনও তাঁকে দেখতে পাইনি। তিনি এখনও কারও সঙ্গে দেখা করবার মতো অবস্থা লাভ করেন নি। আশা করি তিনি শীঘ্রই পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে পাবেন।

পিতা পোপকে এবং প্রত্যেককে আমার ভালবাসা
আপনার চিরদিনের স্নেহের পুত্র[৪৬]
বিবেকানন্দ

খেতড়ীর রাজার এই ফনোগ্রাফ যেটির কথা স্বামীজী তাঁর উপর্যুক্ত চিঠিতে উল্লেখ করেছেন সেটি আমেরিকা থেকে খেতড়ীতে যাওয়ার পথে দীর্ঘসময় কাটিয়েছে। এটি সম্ভবত সর্বাধুনিক যেটি তখন পাওয়া যাচ্ছিল, সেরূপই ছিল, কারণ ১৮৯৪-এ জানুয়ারিতে স্বামীজী তাঁর মাদ্রাজী শিষ্যদের লেখেন—"ভট্টাচার্য মহাশয়কে অনুগ্রহপূর্বক বলবে, আমি তাঁর ফনোগ্রাফের কথা বিস্মৃত হইনি। তবে এডিসন সম্প্রতি এর উন্নতি সাধন করেছেন। যতদিন না তা বের হচ্ছে, ততদিন আমি তা ক্রয় করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না।"[৪৭]* স্বামীজী কিম্বা হেল ভগিনীগণ যাঁরা ব্যাপারটি দেখছিলেন নিশ্চয়ই সর্বাধুনিক আদলের যন্ত্রটিই মহারাজার জন্য কিনেছিলেন। তাঁর চিঠিগুলিতে বারংবার সেই অ্যানিস্কোয়ামে থাকার সময়—আগস্ট মাসের ২০ তারিখ থেকে শুরু করে স্বামীজী শ্রীমতী হেলকে বারংবার আশ্বাস দিয়ে এসেছেন যে, ফনোগ্রাফটি খেতড়ীতে পৌঁছবার সময় হয়নি। পরে তিনি নিজেই ওটি পৌঁছচ্ছে না বলে চিন্তিত হয়ে পড়েন। নভেম্বরের ৩ তারিখে বাল্টিমোর থেকে লেখেন—

"আমি জানি না এই ফনোগ্রাফ ব্যাপারটির কি হলো। ভারতে পৌঁছতে এটির ছ-মাস সময় লাগছে!! আর ছ-মাসে কোম্পানি এর অনুসন্ধান করে উঠতে পারল না!! এর নাম মার্কিনী দ্রুতগতি!! যাই হোক তাদের উচিত আমার টাকা ফেরত দিয়ে ক্ষতিপূরণ করা। মা আপনি এক্সপ্রেস কোম্পানির রসিদটি হারাবেন না।"[৪৮]

---

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, পত্রসংখ্যা ৭৭, পৃঃ ৩৯২

তারপর মধ্য-নভেম্বরে ফনোগ্রাফটি তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছনোর সংবাদ এল। খেতড়ীর মহারাজা এই লক্ষণীয় হাত ঘোরানো যন্ত্রটি পেয়েছেন যার মধ্যে তাঁর গুরুর কণ্ঠস্বর মোমের নলে আবদ্ধ হয়ে আছে।[+]

স্বামীজী ১৮৯৪-এর নভেম্বর মাসে নিউ ইয়র্কে বক্তৃতা দিয়েই থাকুন বা নাই থাকুন, তিনি একটি কাজ করেছিলেন যার তাৎপর্য ঐতিহাসিক। সারাবছর ধরে তিনি তাঁর গুরুদেবের বাণীর বীজ সর্বত্র ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। এখন তিনি এমন একটি আধার তৈরি করলেন যা সেগুলিকে ধরে রাখবে এবং লালন-পালন করবে। নভেম্বরের ৩০ তারিখে তিনি আলাসিঙ্গাকে লিখলেন—*আমি ইতোমধ্যেই নিউ ইয়র্কে একটি সমিতি স্থাপন করেছি তার সহকারী সভাপতি শীঘ্রই তোমাকে পত্র লিখবেন। তুমিও যত শীঘ্র পার তাঁদের সঙ্গে পত্রালাপ করতে আরম্ভ কর। আশাকরি, আমি আরও কয়েক জায়গায় সমিতি স্থাপন করতে সমর্থ হব।*[৪৯ *] *যদিও আমরা এখন পর্যন্ত এ-সংস্থাটির নাম বা প্রকৃতি কিছুই জানতে পারিনি, এটি নিশ্চয়ই একটি মিশ্র উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল। জুলাইয়ের ১১ তারিখে—অর্থাৎ বেশ আগেই স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে চিঠিতে লিখেছিলেন—"তারপর শীতকাল এলে লোকে যখন বাড়ি ফিরবে, তখন আবার বক্তৃতাদি শুরু করে এবার সভাসমিতি স্থাপন করতে থাকব।"*[৫০ **] এ-সময়ে এ-সংস্থাগুলির যে উদ্দেশ্য স্বামীজীর মনে উদয় হয়েছিল তা যতখানি অর্থ সংক্রান্ত ততখানি দার্শনিক এবং ধর্মীয়, কারণ সেই একই শিষ্যকে আগস্ট মাসের ৩১ তারিখে লিখতে দেখি—*এখানে আমার যে সব বন্ধু আছেন, তারাই আমার সব টাকাকড়ির বন্দোবস্ত করে থাকেন... এই ভয়ানক টাকাকড়ির হাঙ্গামা থেকে রেহাই পেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচব। সুতরাং যত শীঘ্র তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে পার এবং তুমি সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হয়ে আমার বন্ধু ও সহায়কদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পত্রাদি ব্যবহার করতে পার ততই তোমাদের এবং আমার উভয়পক্ষের মঙ্গল।*[৫১ ***] নভেম্বরে যে নিউইয়র্ক সমিতি স্বামীজী গঠন করলেন তা অনেকটা এই পরিকল্পনা অনুযায়ী। কিন্তু আমরা পরবর্তী একটি অধ্যায়ে দেখব যে, ১৮৯৪-এর শেষের দিকে তিনি ক্রমশ সচেতন হলেন আমেরিকার পক্ষে ভারতের ধর্ম কতখানি প্রয়োজন সে ব্যাপারে। সুতরাং যে সংস্থা স্থাপিত হলো তা

---

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ সং, ৭ম খণ্ড, পত্রসংখ্যা ১৩৪, পৃঃ ২৮

** ঐ, ১ম সং, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পত্রসংখ্যা ১০৫, পৃঃ ৪৬৪

*** ঐ, পত্রসংখ্যা ১১০, পৃঃ ৪৭৫

নিঃসন্দেহে তাঁর কাজের ধর্মীয় এবং দার্শনিক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত ছিল।

॥ ৪ ॥

যদি স্বামীজীর নিজের নিকট পাশ্চাত্যের একজন লোকশিক্ষক হিসাবে নিজ ভূমিকাটি ইতঃপূর্বে সুস্পষ্ট নাও হয়ে থাকে, তা এবার ডিসেম্বর মাসে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন তিনি অধিকাংশ সময় কেম্ব্রিজে ছোট ছোট আসরে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। একটি ছোট পুস্তিকায় বলা হয়েছে—"গ্রীনএকারে অতিবাহিত তিনটি সপ্তাহ যেন শ্রীমতী বুল আয়োজিত ভাষণ ও শিক্ষাদানের আসরে ফিরে এল।" ঠিক এই মনোভাব নিয়েই শ্রীমতী বুল "প্রাতঃকালীন আলোচনার আসরে" যোগদানের জন্য সকলকে আমন্ত্রণ জানালেন, সেগুলি দেওয়া হবে তাঁর নিজ আবাসে নয়, নিকটস্থিত শ্রীমতী রিচার্ডসের ১৮১ নং ব্রাট্‌ল স্ট্রীটস্থ আবাসে "ডিসেম্বরের ৬, ৮, ১০, ১২, ১৪ এবং ১৭ তারিখে সকাল ১১টায় এবং ডিসেম্বরের রবিবার ১৬ তারিখ অপরাহ্ণ তিনটায়।"[৫২] কার্যসূচীতে বলা হলো বক্তাগণ হবেন লেডী হেনরী সমারসেট, শ্রীমতী মিলওয়ার্ড এডামস, শ্রীআর্নেস্ট এফ. ফেনোলোসা এবং স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রীযুক্ত ফেনোলোসা ছিলেন প্রাচ্য শিল্প ও সাহিত্য বিশারদ। স্থির হয়েছিল তিনি রবিবারের ভাষণটি দেবেন। তিনি ছাড়া অন্যরা প্রত্যেকে প্রতিদিন দুটি করে ভাষণ দেবেন। লেডী সমারসেটের প্রারম্ভিক ভাষণের পর একটি ঘরোয়া আলোচনার পরিচালনা টমাস ওয়েন্টওয়ার্থ হিগিনসন করবেন এবং প্রত্যেক অধিবেশনে সঙ্গীত পরিবেশনের আয়োজনও ছিল। যদি সঙ্গীত পরিবেশন অপরিহার্য বিবেচিত হয়েই থাকে তো তা অন্ততপক্ষে ছিল অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত। কার্যসূচীতে বলা হয়েছিল—"প্রতিটি ভাষণের উদ্বোধন এবং সমাপ্তি হবে এমা থার্সবির পরিচালনায় গুচ্ছসঙ্গীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে। এছাড়া বীণা বাজাবেন শ্রীযুক্ত আলফ্ ফ্রাইস।" কুমারী থার্সবি ছিলেন তদানীন্তনকালের একজন শ্রেষ্ঠ কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী এবং তাঁর সঙ্গে শ্রীযুক্ত আলফ ফ্রাইসের বীণাসঙ্গত একই কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত থাকার অর্থ হলো যে, তিনিও নিশ্চয়ই দক্ষ শিল্পী ছিলেন আর শ্রীমতী বুল একজন অতি পেশাদারি স্তরের পিয়ানোবাদক হওয়ায় সম্ভবত তিনিও নিশ্চয়ই কুমারী থার্সবি এবং শ্রীযুক্ত ফ্রাইস উভয়ের সঙ্গেই পিয়ানো বাজিয়েছেন। সুতরাং সঙ্গীতের আয়োজন এত উঁচুদরের ছিল যে, শুধু তাই শোনবার জন্যই শ্রোতারা আসতে পারেন। অবশ্য ডিসেম্বরে প্রত্যেক দিনই শ্রীমতী বুলের গৃহে সঙ্গীত

শোনা যেত। তাঁর আমন্ত্রণলিপিসহ কার্যসূচীর পেছনে কুমারী থার্সবির উদ্দেশ্যে লেখা তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত চিঠি পাওয়া যায়। সেটি নিম্নলিখিতরূপ ঃ

নভেম্বর ২৬, ১৮৯৪

প্রিয়,

তুমি কি গাইবে তা সঙ্গে করে নিয়ে এস, তার সঙ্গে তুমি কি বিষয়ে অনুশীলন করবে তাও এন। আমি নিয়মিত কাজের জন্য কয়েকঘণ্টা সময় দেব, তুমি একটি রৌদ্রালোকিত ঘর পাবে, নিজের জন্য একটি পিয়ানো পাবে আর তোমার একটি শয়নঘর পাবে।

তুমি ৩ তারিখে কোন্ গাড়িতে আসছ জানিও। আমি অনুমান করছি শ্রীযুক্ত কানন্দ তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই কথা বলবেন যাতে একসঙ্গে তোমরা আসতে পার। প্রত্যেকদিন বক্তৃতার আসরে তুমি একই পোশাক পরে আসতে পারবে—এ তুমি ভাল করেই জান। ইনা (কুমারী থার্সবির কনিষ্ঠা ভগিনী) কি তোমার সঙ্গে আসছে?

তোমাদের দুজনকেই আমার ভালবাসা—

চিরদিনের প্রীতিভাজন
সারা সি বুল

বাবা ভাল হয়ে উঠছেন।[৫৩]

শ্রীযুক্ত কানন্দ কেম্ব্রিজে আসার ব্যাপারে হয়ত কুমারী থার্সবির সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন, কিন্তু ডিসেম্বরের ৩ তারিখে তিনি আসেন নি, এসেছেন ৫ তারিখে। পরের দিন গীর্জা-মাতাকে তিনি লেখেন ঃ

প্রিয় মা,

আমি দীর্ঘদিন আপনার চিঠিপত্র পাইনি। আপনার কি হয়েছে? আমি কেম্ব্রিজে এসেছি এবং আগামী তিন সপ্তাহ এখানে থাকব, এখানে বক্তৃতা দিতে হবে এবং ছোট আসরে শিক্ষাদান করতে হবে। এখানে একজন শিকাগো অধিবাসিনী মহিলা [মিলওয়ার্ড] এডাম্‌স এসেছেন, তিনি কণ্ঠস্বর তৈরির ব্যাপারে ভাষণ দিয়ে থাকেন।

আজ আমরা লেডী হেনরী সমারসেটের নিকট হতে নারীর ভোটাধিকার বিষয়ে একটি ভাষণ শুনেছি। কুমারী [ফ্রান্সেস] উইলার্ড [বিশ্ব খ্রীস্টধর্মাবলম্বী মাদক পরিহার মহিলা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী এবং নারী ভোটাধিকার আন্দোলনের একজন নেত্রী] শিকাগো হতে এসেছেন, এসেছেন জুলিয়া ওয়ার্ড হাউ।

কর্ণেল হিগিনসন, ইংলণ্ডের ডঃ [জে এস্টলিন] কার্পেন্টার এবং আরও অনেক বন্ধু এসেছেন। মোটের ওপর এ একটি দারুণ ব্যাপার! আমি ভারত থেকে এই মর্মে চিঠি পেয়েছি যে ফনোগ্রাফটি ওখানে যথাযথভাবে পৌঁছেছে।

আমি আমার অর্থের একাংশ ভারতে পাঠিয়ে দিয়েছি এবং খুব শিগ্‌গিরই পুরোটাই পাঠিয়ে দিতে চাই। আমি শুধু ফিরে যাবার মতো অর্থ হাতে রাখতে চাই। নিউ ইয়র্কে মা-মন্দিরের [শ্রীযুক্ত হেলের ভগিনী] সঙ্গে কয়েকবার সাক্ষাৎ করেছি, তিনি বরাবরের মতোই সহৃদয় ব্যবহার করেছেন। শ্রীমতী স্পলডিংও সেরূপ।

ভগিনী মেরী আমাকে ব্রুকলীন [বোস্টনের একটি ফ্যাশন-দুরস্ত অঞ্চল] থেকে একটি চিঠি লিখেছে। আমি জানি যে সে থাকলে লেডী সমারসেটের ভাষণটি খুব উপভোগ করত। আমি তাকে এ-কথা জানিয়ে চিঠি লিখেছি কিন্তু কোন উত্তর পাইনি।

আমি প্রথম যেদিন সময় পাব, সেদিনই তার সঙ্গে দেখা করতে যাব। আমি এখন খুবই ব্যস্ত। আমি আশা করি বাড়িতে অন্য বোনেরা আনন্দে আছে। আমি যদি পারি কয়েকদিনের জন্য শিকাগোতে যাবার চেষ্টা করব।

আপনি সময় পেলেই আপনাদের শুদ্ধাচারী পরিবারটির সব খবর দেবেন।

শ্রীমতী গার্নসি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং এখনও এত দুর্বল যে তিনি ঘরের বাইরে আসতে পারেন না।

কুমারী হেলেন ব্যাগলি নিউ ইয়র্কে ডিপ্‌থিরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন, খুব ভুগলেন। এখন অবশ্য তিনি রোগমুক্ত হয়েছেন এবং ব্যাগলিরা ডেট্রয়েটের বাড়িতে ফিরে গিয়েছেন—

সকলের প্রতি আমার ভালবাসা[৫৪]

আপনার স্নেহভাজন

যে তিন সপ্তাহ স্বামীজী শ্রীমতী বুলের বাড়িতে অতিবাহিত করেন তা ছিল কাজে ঠাসা এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাতঃকালীন ভাষণের কর্মসূচী অনুযায়ী তিনি ডিসেম্বরের ১০ তারিখ সোমবারে "বেদান্ত-দর্শন" সম্বন্ধে এবং পরবর্তী সোমবার (ডিসেম্বরের ১৭ তারিখে) "রাজপুত নারী ও ভারতে মাতৃত্বের আদর্শ" সম্বন্ধে ভাষণ দেন। এছাড়া তিনি একটি সাধারণের জন্য

ভাষণ দেন সম্ভবত রবিবার ডিসেম্বরের ২৩ তারিখে। কিন্তু এই তিনটি বক্তৃতা ছিল স্বামীজীর কেম্ব্রিজের কার্যক্রমের সামান্যতম অংশ মাত্র। তিনি পৌঁছানো মাত্র প্রায় প্রতিদিন দুবার করে ছোট আসরে অনর্গল ধারায় ভাষণ দান করতে মগ্ন হয়ে গেলেন—এই ভাষণগুলির মাধ্যমে তিনি পুনরায় গ্রীনএকারের মতো গভীরভাবে বেদান্ত শিক্ষা দিতে লাগলেন। শ্রোতৃবৃন্দ ছিলেন আগ্রহী।

এই তিন সপ্তাহ শেষে শ্রীমতী বুল স্বামীজীর এই শিক্ষাদানের আসরের বিষয়ে এবং শ্রোতাদের ওপর এগুলির প্রভাব সম্বন্ধে ডঃ লুইস জি. জেন্‌সকে চিঠি লেখেন। সেটি হলো নিম্নলিখিত চিঠিটি, যা কেম্ব্রিজে ঐ কয়েকটি সপ্তাহ সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত সর্বোত্তম সংবাদসূত্র, যা ডঃ জেন্‌সের কাগজপত্রের মধ্যে পেয়ে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন তাঁর কন্যা শ্রীমতী মার্সিয়া লাইট্‌ল ঃ

কেম্ব্রিজ
ডিসেম্বর ২৭, ১৮৯৪
রিভার ভিউ
১৬৮ ব্রাট্‌ল স্ট্রীট

প্রিয় ডঃ জেন্‌স,

আমার ইচ্ছা হচ্ছিল গত রবিবার স্বামী বিবেকানন্দ এখানে যে বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন তা আপনাদের ব্যবস্থাপনায় [ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসন] অনুষ্ঠিত সভায় শুনি। আমরা তাঁকে আমাদের মধ্যে তিন সপ্তাহ ধরে পেয়েছি, তিনি প্রতিদিন দুটি শিক্ষাদানের আসরে এবং আরও তিনটি বড় সাধারণ সভায় বক্তৃতা দিয়েছেন। শিক্ষার বিষয় ছিল ৮টি উপনিষদের ওপর ও গীতার ওপর কয়েকটি এবং শঙ্করের আত্মোপলব্ধি বিষয়ক গ্রন্থ সম্বন্ধে। এগুলিতে যে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল তা অসাধারণ এবং অনেকের ওপর গভীর এবং স্থায়ী প্রভাব পড়েছে। তাঁকে যে বিষয়ই দেওয়া হোক না কেন আমরা তাঁকে বলেছিলাম যেন বেদান্তের ইতিবাচক দিকটির ওপর বলেন, কারণ তিনি সবসময়ই তা পারেন এবং তাঁর প্রকৃতিগত মহিমা, সৌন্দর্য এবং শক্তি সব উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যখন তিনি এ-বিষয়ে আলোচনা করেন। একজন বন্ধু তাঁর মহিলা সমিতিতে এ-বিষয়ে বলতে বলেন। তিনি ফিরে আসার পর তাঁকে এ-বিষয়েই বক্তৃতা চালিয়ে যেতে বলা হয়।

একশ সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেল আরো দেড়শ অতিথির দ্বারা এবং

এজন্য একটি সভাঘর ভাড়া নেওয়া হয়। রোমান ক্যাথলিক, সুইডেনবর্গিয়ান, অজ্ঞেয়বাদী এবং এপিস্‌কোপেলিয়ান—সকলে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন এই বলে যে, তিনি তাঁদের মধ্যে উচ্চতম ধ্যানধারণাকে জাগ্রত করেছেন এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের পাঠ্যক্রমে বিভ্রান্ত ছাত্ররাও উপকৃত হয়েছে।

আমি এসব উল্লেখ করছি যাতে আপনি বুঝতে পারেন যে, যদি তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর বিষয়বস্তুটি আলোচনা করেন তাহলে তিনি আপনারও সাহায্যে আসতে পারেন। আমরা এখানে আমাদের যেন গ্রীনএকারেরই একটি শাখা পেয়েছিলাম—৭টি বক্তৃতা এবং শিক্ষার আসর অনুষ্ঠিত হয়—লেডী সমারসেট ছিলেন, কুমারী উইল্যার্ড (যিনি এক দিন প্রাভাতিক আসরে লেডী সমারসেটের সহ-বক্তা হিসাবে কাজ করেন), ছিলেন শিকাগোর শ্রীমতী মিলওয়ার্ড এডাম্‌স (যিনি আমার জানা সব মহিলাগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রতিভাবান), অধ্যাপক ফেনালোসা এবং বিবেকানন্দ। প্রতিদিন কুমারী থার্সবি আমাদের তাঁর কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। গ্রীনএকারেব পরিবেশ যেন এখানে বিরাজ করছিল। আমরা খুব খুশি হতাম এবং সহায়ক হতো যদি আপনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারতেন। আপনার চিঠি পাওয়া আমাদের নিকট খুব আনন্দের ব্যাপার। আমাদের পুনর্মিলন খুব সফল হয়েছে।

কুমারী ফার্মার অতিথি আপ্যায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। বক্তারা আমাদের অতিথি হয়েছিলেন এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে বসে ভাব বিনিময় করেছেন। শ্রীযুক্ত বিবে কানন্দ অতিথি এবং বন্ধু হিসাবে সকলের প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর ব্যবহার মানবিকতাপূর্ণ এবং তাঁর মধ্যে একটি বালসুলভ মনোভাব বিরাজিত।

আপনার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাসহ[৫৫]

সারা সি বুল

নিশ্চয় করে বলা না গেলেও এটা সম্ভব যে স্বামীজী ডিসেম্বরে শিক্ষার আসরে যে-সকল বিষয়ে বক্তৃতা দেন (যতগুলি প্রথমে স্থির হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি-সংখ্যক) তার মধ্যে কয়েকটি পরে ছোট একটি পুস্তিকাকারে "রাজযোগের ছয়টি পাঠ" শিরোনামে প্রকাশিত হয় এবং তাঁর ইংরাজী রচনাবলীর অষ্টম খণ্ডে* ঐ নামেই যুক্ত হয়। শ্রীমতী ক্লিনটন ফ্রেঞ্চের

---

* বাণী বচনার ১ম খণ্ড

অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা হতে জানা যায় যে, পুস্তিকাটি ১৯১৩ সালে স্যানফ্রানসিস্কো থেকে প্রকাশিত হয় এবং "এটি শ্রীমতী ওলি বুলের গৃহে স্বামীজীর শিক্ষার আসরে প্রদত্ত ভাষণের টাইপ করা অনুলিপি থেকে সঙ্কলিত।"[৫৬] কিন্তু যদিও আমরা জানতে পারি স্বামীজী বক্তৃতাগুলি কোথায় দিয়েছিলেন কিন্তু আমরা সুনিশ্চিতভাবে একথা জানি না কোন্ সময়ে এগুলি প্রদত্ত হয় এবং আপাতত এখনকার মতো এটুকু অনুমান করে সন্তুষ্ট থাকতে হবে যে, এগুলি কেম্ব্রিজে শীতকালীন সপ্তাহগুলিতে দেওয়া হয়েছিল যখন তিনি গ্রীষ্মকালে গ্রীনএকারে যেমন করেছিলেন তেমনিভাবে তাঁর কাজকর্মকে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ দিচ্ছিলেন।[+] (গ্রীনএকারে স্বামীজী রাজযোগ এবং অদ্বৈত বেদান্ততত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং আমরা দেখলাম যে, শ্রীমতী বুল ভাবছেন যে, কেম্ব্রিজে তিনি যে কার্যসূচী অনুষ্ঠান করলেন তা "গ্রীনএকারেরই একটি সংযোজনা"।) যদি স্বামীজী রাজযোগের এ ছয়টি পাঠ ডিসেম্বরে দিয়ে থাকেন (কিংবা যদি অন্য সময়েও দিয়ে থাকেন), তিনি সম্ভবত এগুলি খুব ছোট দল যাতে ছিলেন জনকয়েক বিশেষ আগ্রহী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি যাঁরা ঐ বাড়িতে অতিথিরূপে ছিলেন, তাঁদের মধ্যেই দিয়েছেন। শিক্ষার আসর ছিল সুনিশ্চিতভাবে রাজযোগের প্রতিটি ধাপ বাস্তবে কিভাবে অনুশীলন করতে হবে সে সম্বন্ধে। প্রকৃতপক্ষে এই ছয়টি পাঠ স্বামীজীর পাশ্চাত্যে ঘরোয়াভাবে অল্প-সংখ্যক একদল ব্যক্তির বাস্তব অনুশীলনের জন্য দেওয়া বিস্তারিত উপদেশ এবং এ সম্পর্কে এটিই পূর্ণাঙ্গ তথ্য যা আমরা জ্ঞাত আছি। কিন্তু ১৮৯৪-এর ডিসেম্বরে এ-বক্তৃতাগুলি দিয়ে থাকুন আর না থাকুন এটা সুস্পষ্ট, গ্রীনএকারের ফলশ্রুতি হিসাবে এই যে আসরগুলিতে তিনি শিক্ষা দিচ্ছিলেন সেগুলির ধরন একই রকমের এবং পরবর্তী সময়ে তিনি যে ধরনের গভীর শিক্ষা দিতে ব্যাপৃত হবেন এগুলি ছিল তারই সূচনা।

সত্যই তিনি ডিসেম্বরের এ-সপ্তাহগুলিতে খুব দারুণভাবে ব্যস্ত ছিলেন। দুটি আসরে প্রতিদিন শিক্ষাদানমূলক ভাষণ দেওয়া, সপ্তাহে একটি সর্বসাধারণের জন্য বক্তৃতা করা এবং হয়তো এই শিক্ষার আসরগুলিতে তাঁর সহ-অতিথিবর্গের দ্বারা প্রদত্ত বক্তৃতাগুলিতে যোগদান করার প্রয়োজনীয়তা এবং সম্ভবত সেজন্য আনন্দলাভ—এ-সকলই তাঁকে পূর্ণ করে রেখেছিল। মেরী হেল তখন বোস্টনে ছিলেন, কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক তিনি কেম্ব্রিজে আসতে অনিচ্ছুক ছিলেন, মেরীকে তিনি লিখলেন— "*(এ-সব কার্যসূচীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার আগে) সময় পেলে... চট করে শহরে গিয়ে তোমার সঙ্গে একবার দেখা*

করে আসতাম। সারাদিনই বেশ ব্যস্ত থাকতে হয়। তারপর ভয়। গিয়েও যদি দেখা না হয়।

তোমার যদি অবসর থাকে লিখো; আমি সুযোগ পাওয়া মাত্রই তোমার সঙ্গে দেখা করে আসব। অপরাহ্ণের দিকে আমার অবকাশ। সকাল থেকে বেলা ১২টা-১টা পর্যন্ত খুব ব্যস্ত থাকতে হয়। এইভাবে চলবে, যে পর্যন্ত এখানে আছি অর্থাৎ এই মাসের ২৭ বা ২৮ তারিখ পর্যন্ত।"[৫৭*]

যদি স্বামীজী বোস্টনে মেরী হেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে থাকেন তো তা ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহের আগে সম্ভব হয় নি, ডিসেম্বরের শেষদিনগুলিতে কাজ কিছুটা কমে এসেছিল। এসময়ে কুমারী হেল দূরে দূরেই থাকেন। ডিসেম্বরের ২১ তারিখে স্বামীজী তাঁকে লিখলেন—"ইতোমধ্যে তুমি মিসেস বুলের পত্র অবশ্য পেয়ে থাকবে। আমি যে-কোন দিন সানন্দে তোমার কাছে যাব। বক্তৃতা শেষ হওয়ায় আমার এখন অবকাশ আছে আগামী রবিবার ছাড়া।"[৫৮**]

মেরী হেল শ্রীমতী বুলের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নি বা করতে পারেন নি এবং ক্রমাগত দূরত্ব বজায় রাখার দরুন নিশ্চিতরূপে তাঁকে খুব ভাল সময় কাটানোর সুযোগ হারাতে হয়েছে। শ্রীমতী বুল অতিথি-আপ্যায়নে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও সুদক্ষ বলে খ্যাত ছিলেন, ইচ্ছে করলেই বাড়িতে তিনি অতিথিদের জন্য একটি মনোরম উৎসবের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারতেন এবং বিশেষ করে স্বামীজীর উপস্থিতির জন্য তাঁর অতিথিবর্গের একটি মুহূর্ত একঘেয়ে বা অস্বস্তিকর বলে মনে হয়নি। শ্রীমতী বুল ঠিক কতজন অতিথিকে আপ্যায়ন করেছিলেন তা বর্তমানে বলা শক্ত। আমরা জানি যে বক্তারা এবং গায়কেরা অতিথিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, কুমারী সারা জে ফার্মার ছিলেন এবং একটি সংবাদপত্রের বিবরণ অনুসারে ছিলেন জনৈক মাদাম ম্যাগনুস্যান। সম্ভবত আরও অন্যরা ছিলেন, কারণ বাড়িটি ছিল বড় এবং অতিরিক্ত একটি অতিথি-ভবনও ছিল, তার নাম ছিল "স্টুডিও গৃহ," সেখানে অনেক লোক থাকতে পারত। উপলক্ষটি ছিল নিশ্চিতরূপেই "গ্রীনএকারের কাজের সম্প্রসারণ," এমন কি কুমারী ফার্মারের নিকট এগুলি পুরোপুরিভাবে তাই-ই ছিল, তিনি শ্রীমতী বুলের সঙ্গে বিনম্রচিত্তে তাঁর ধূসর অবগুণ্ঠনে এ অধিবেশনগুলিতে অধ্যক্ষতা করতেন।

* বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১ম সং, পত্রসংখ্যা ১৩৫, পৃঃ ১৯
** ঐ, পত্রসংখ্যা ১৩৭, পৃঃ ২০

কুমারী ফার্মার ছাড়াও বাড়িতে সমাগতদের মধ্যে যাঁরা স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে যান এবং যাঁরা যতরকমে পারেন তাঁকে তাঁর আমেরিকা ভ্রমণের বাকি দিনগুলিতে প্রাণপণ সহায়তা করেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কুমারী এমা থার্সবি এবং শ্রীমতী ফ্লোরেন্স অ্যাডাম্‌স। কুমারী থার্সবি তখন পঞ্চাশতম জন্মদিনের অভিমুখে এগিয়ে চলেছেন, ঐকতান সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাফল্য অর্জন করে তিনি তখন তাঁর পেশা থেকে অবসর গ্রহণের মুখে, ইতোমধ্যে যশের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন, সারা আমেরিকায় জাঁকজমকের সঙ্গে সম্বর্ধিত হয়েছেন এবং ভাবাবেগপ্রবণ ইউরোপে প্রায় পূজা পেয়েছেন। তথাপি, মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা পাওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর পেশায় যোগদান করবার সময়ে যেমন তখনও তেমনই সেই একইরকম সরল ও ঐহিকতা-মুক্ত ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে তিনি রেভারেন্ড ওয়ার্ড বীচারের ব্রুকলিন-অন্তর্গত প্লাইমাউথ গির্জায় একক কণ্ঠশিল্পী হিসাবে কাজ করতেন। তিনি এই জনপ্রিয়তার জীবন থেকে অবসর নিতে উদ্যত হয়েছিলেন এজন্য নয় যে, তিনি তাঁর কণ্ঠস্বরের শক্তি বা মাধুর্য হারিয়ে ফেলেছেন, এর কারণ তিনি সুস্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন যে, একজন ঐকতান সঙ্গীতজ্ঞের সদাব্যস্ত এবং জনতার দাবিপূরণের যে জীবন তা তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনে কোন প্রাপ্তি বহন করে আনে নি। তিনি জীবনের গভীরতর অর্থ ও অধিকতর ঐশ্বর্যময় উদ্দেশ্যের অনুসন্ধানী ছিলেন এবং তাঁর জীবনীকার প্রয়াত রিচার্ড ম্যাকক্যাণ্ডলেস গিপসনের মতে জীবনের এই অন্তর্মুখী অবস্থায় উপনীত হবার মুহূর্তে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে—সাক্ষাৎ ঘটে ধর্মমহাসভায়—আর তাঁর বাণীর প্রতি তিনি সঙ্গে সঙ্গেই আকৃষ্ট হন। আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি কুমারী থার্সবি নিউ ইয়র্কে স্বামীজীর প্রথম দেওয়া ভাষণসমূহ শুনতে গিয়েছিলেন এবং হতে পারে তিনিই স্বামীজীর সঙ্গে শ্রীমতী বুলের পরিচয় করিয়ে দেন। শ্রীমতী বুলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় দীর্ঘদিনের, অনেকসময় তিনি সবার প্রিয় বেহালা বাদক ওলি বুলের সঙ্গে সহ-শিল্পী হিসাবে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন।

শ্রীমতী ফ্লোরেন্স জেম্‌স অ্যাডাম্‌স ছিলেন একজন স্বনিযুক্ত পেশায় প্রতিষ্ঠিত মহিলা, যাঁর মধ্যে কুমারী থার্সবি একজন আশ্রয়দাতাকে খুঁজে পেয়েছিলেন। যতদূর বোঝা যাচ্ছে, তিনি ভাব প্রকাশ কি করে করতে হয়—এ-বিষয়ে একজন শিক্ষক ছিলেন। স্বামীজী তাঁর পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন—"শরীর-চর্চা বিষয়ের একজন শিক্ষিকা, অবশ্য এ-কথাটিতে

মহিলাটি হয়ত বা আপত্তি করতেন কারণ শরীর-চর্চা তাঁর হাতে পড়ে পাখা মেলে ঊর্ধ্বে অরোহণ করত, নিঃসঙ্কোচে পৌঁছত দার্শনিক স্তরের উচ্চতায়। মোটের ওপর তিরিশের গোড়ার দিকে বয়সের শ্রীমতী এ্যাডাম্‌স ছিলেন বিপুল চিত্ত-আকর্ষণকারী মহিলা এবং দৃঢ় প্রত্যয় সৃজক-বক্তা এবং সর্বক্ষেত্রে সঠিক প্রকাশভঙ্গি প্রদর্শনে সর্বশ্রেষ্ঠ কুশলী। এটা স্পষ্ট যে, স্বামীজী এই মহিলাকে পছন্দ করতেন, যেহেতু তাঁর চিঠিপত্রে এঁর নামোল্লেখ দেখা যায়। পাঠক একটি সংবাদপত্রের কর্তিত অংশে কোন সংবাদপত্র তা চেনা যায়নি, এঁর সম্পর্কে প্রকাশিত এই অংশটি পাঠ করতে আগ্রহী হতে পারেন, কারণ এ-বিবরণ থেকে এঁর সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জানা যায় ঃ

শ্রীযুক্ত ফার্ড পেক্‌সের জন্য নির্দিষ্ট যে পৃথক আসনগুলি ছিল তারই একটিতে একজন ক্ষুদ্রকায়া মহিলা উপবিষ্ট ছিলেন, যাঁর মুখের অপূর্ব সুমিষ্ট অভিব্যক্তি এবং আশ্চর্য প্রাণময়তা আমাকে আকর্ষণ করল। শ্রীমতী মিলওয়ার্ড অ্যাডামস হলেন 'প্রেক্ষাগৃহে'র কার্যাধ্যক্ষ সুদর্শন মিলওয়ার্ড অ্যাডাম্‌সের রূপবতী পত্নী। তাঁকে দেখে মনে হলো বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য আর সংস্কৃতির অভিব্যক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মনে হলো শিকাগোর উচ্চস্তরের সামাজিক জীবনে যে-সকল মহিলার অবস্থান, তাদের মধ্যে এঁকেই সকলে সর্বাধিক পছন্দ করে। তাঁর কর্মব্যস্ত জীবন। তিনি সপ্তাহের বহু ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করেন সদ্য বিদ্যালয় হতে বহির্গত তরুণীদের মধ্য হতে যাঁরা আরও অধিকতর কেতাদুরস্ত হতে চান এবং আরও কমনীয় দেহভঙ্গিমা আয়ত্ত করতে চান তাদের সেইসকল বিষয়ে শিক্ষাদান করতে। তিনি ডেলসার্ট প্রবর্তিত চিন্তাধারার একজন প্রবক্তা এবং তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেক ধর্মযাজক, প্রচারক ও অভিনেতা আছেন। তিনি যখন পশ্চিমাঞ্চলে [অর্থাৎ শিকাগোতে] আগমন করে ব্যক্তিগতভাবে অধ্যাপক টম্‌লিনের বিদ্যালয়ে শিশুদের শক্তি ও সৌন্দর্যবৃদ্ধিকর ব্যায়ামাদি শিক্ষা দিতেন, তখন তিনি ছিলেন বোস্টনের জনৈক কুমারী ফ্লোরেন্স জেম্‌স এবং অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন বাগ্মী। আমার বিশ্বাস প্রায় সাত বৎসর পূর্বে তিনি তদানীন্তন সেন্ট্রাল মিউজিক হলের কার্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মিলওয়ার্ড অ্যাডাম্‌সের সাক্ষাৎলাভ করেন এবং তাঁর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। আমেরিকার দ্বিতীয় শহরে [শিকাগোতে] বিশাল নির্মীয়মান "প্রেক্ষাগৃহ" সম্পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে শ্রীমতী অ্যাডামস অপেক্ষা আর কেউই অধিক আগ্রহী ছিলেন না। ব্যক্তিগত আকৃতিতে ক্ষুদ্রাকায়া কিন্তু আকর্ষণীয় এবং উন্নত দেহভঙ্গিমার দরুন তাঁকে

তাঁর দেহের প্রকৃত মাপের তুলনায় আরও কয়েক ইঞ্চি দীর্ঘতর মনে হতো। তাঁর চালচলন আন্তরিকতাপূর্ণ, সহৃদয় ও কৃত্রিমতাবর্জিত আর একটি সূক্ষ্ম চুম্বকের মতো আকর্ষণী শক্তি তাঁর মধ্যে ছিল যা প্রচুর অনুরাগীকে আকর্ষণ করত এবং পরিচিত সকলের নিকট তাঁকে প্রিয় করে তুলত।

শ্রীমতী বুলের ডিসেম্বর মাসের সম্মেলনগুলিতে অনেকে যোগদান করেছিল। সেগুলি সম্বন্ধে বোস্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্ট পত্রিকায় স্বামীজীর ভাষণ দানের দু-দিন পূর্বে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। এতে প্রধানত চিত্তাকর্ষক লাবণ্যময়ী শ্রীমতী অ্যাডামসের প্রসঙ্গেই লেখা হয়েছিল। এটি অংশত নিম্নোক্তরূপ ঃ

কেম্ব্রিজে ব্রাট্‌ল স্ট্রীট এবং ফেয়ারভিউ এ্যাভিনিউয়ের সংযোগস্থলে একটি বিশাল প্রাসাদোপম অট্টালিকা আছে যেখানে শ্রীমতী ওলি বুল, কুমারী সারা জে. ফার্মার এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের ব্যবস্থাপনায় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সম্মেলন, শিক্ষার আসর, আলোচনার আসর প্রভৃতি শুরু হয়েছে। এইসকল "যুক্তির ভোজসভায়" প্রাতঃকালীন ভাষণগুলি যা গত বৃহস্পতিবার শুরু হয়েছে তা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। প্রথমদিন লেডি হেনরী সমারসেট এবং কর্ণেল টি. ডব্লু. হিগিনসন "নারীর ভোটাধিকার" সম্বন্ধে মুখ্য বক্তা ছিলেন । আজ সকালে শ্রীমতী মিলওয়ার্ড অ্যাডাম্‌সের পরিচয় দান করেন শ্রীমতী বুল, যিনি তাঁর ভাষণে প্রথম বললেন "জীবন-চর্যার শিল্প" সম্বন্ধে এবং তারপর প্রাতঃকালীন বক্তাকে অতি শোভনসুন্দর বাক্যে সম্মান জানালেন, বললেন বক্তার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অমূল্য বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা।

শ্রীমতী অ্যাডাম্‌স তাঁর ভাষণে সারা দেশে শরীর চর্চাকে কেন্দ্র করে যে প্রকার উন্মত্ততা চলেছে তা উল্লেখ করলেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, এখন এর প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে ফলে এক্ষেত্রে কিছুটা সংযম ও মিতাচার আসবে। তিনি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করার, নিজের চিন্তা ও অনুভূতিসমূহকে ব্যক্ত করার যে অন্তর্নিহিত প্রবণতা আছে তা বর্ণনা করলেন। তিনি আরও বললেন যে, মানুষ ভাষারূপ মনের ভাবপ্রকাশের প্রতীককে আয়ত্ত করতে পারায় স্বভাবতই তার কণ্ঠস্বরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। অত্যধিক প্রাণোচ্ছলতা আমেরিকাবাসিগণের বৈশিষ্ট্য কিন্তু তা অনেকসময় ভারসাম্য রক্ষা করে চলে না।

যা প্রয়োজন তা হলো প্রশান্ত, আত্মস্থ এবং সুশৃঙ্খল চিন্তা যার

ফলে আমাদের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে বাঞ্ছিত লক্ষ্যের দিকে গতি লাভ করতে পারে। একটি ত্রিকোণের মধ্যে বৃহৎ চক্ষু একটি সুপ্রাচীন প্রতীক—যার তাৎপর্য হলো আমাদের প্রকৃতিগত মানসিক, শারীরিক ও আবেগের দিক্‌গুলির মধ্যে বিশেষ করে পরিপূর্ণ ঐক্যের প্রকাশ ঘটেছে। শ্রীমতী অ্যাডাম্‌সের বক্তৃতার পূর্বে কুমারী এমা থার্সবি কোবান চ্যাডউইক এবং ট্যুবার্ট রচিত একগুচ্ছ সঙ্গীত পরিবেশন করে অধিবেশনটিকে অধিকতর আনন্দময় করে তোলেন।

সোমবার 'বেদান্ত-দর্শন' সম্বন্ধে ভাষণ দেবেন স্বামী বিবেকানন্দ।

এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, কেম্ব্রিজে থাকাকালে স্বামীজী অতিথিদের সঙ্গে যে শুধু ওপর ওপর পরিচিত হয়েছিলেন তা নয়, পরিচয় আরও গভীরতর হয়েছিল, শুধু এদের ক্ষেত্রেই নয়, শ্রীমতী বুলের বন্ধুবর্গের মধ্যে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপকও ছিলেন, তাঁদের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল গভীরভাবেই। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনবিভাগ এইসময় তার সুবর্ণজয়ন্তী বছরে পৌঁছেছিল। এর অধ্যাপকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন—জর্জ পামার, উইলিয়াম জেম্‌স, জেসিয়া রয়েস্, হুগো মুনস্টারবার্গ, এবং তরুণ জর্জ সান্তায়ন। এঁদের প্রত্যেকেই ১৮৯৪ সালে আবাসিক হয়ে ছিলেন এবং প্রত্যেকের সঙ্গে অন্যের মতভেদ ছিল প্রবল এবং গুণবর্ধক। এছাড়া কেম্ব্রিজে আরও বাস করতেন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারি চার্লস স্যাণ্ডার্স পিয়ার্স, তিনি হার্ভার্ডের অধ্যাপক নন এবং বিবাহ বিচ্ছেদের দরুন সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন না, কিন্তু এ সব সত্ত্বেও দার্শনিকতার ক্ষেত্রে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। শ্রীমতী বুল যে তাঁর বিবাহজনিত দুর্ভাগ্যের দরুন সামাজিকভাবে তাঁকে বর্জন করেন নি তার প্রমাণ পরের বছর ইনি কয়েকটি শিক্ষার আসরে শিক্ষাদান করেন। সুতরাং সম্ভবত তিনি ও স্বামীজী পরস্পরের সাক্ষাৎলাভ করেছিলেন।

নৈতিকতার ব্যাপারে সাবধানী হওয়া সত্ত্বেও, কেম্ব্রিজের সমাজ ছিল বোস্টনের তুলনায় ঘরোয়া প্রকৃতির আর এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আর এর ভিত্তি ছিল প্রধানত মেধা, পারিবারিক ঐতিহ্য নয়। হার্ভার্ডের অধ্যাপকমণ্ডলী এবং তাঁদের পত্নীগণ (যাঁরা স্বেচ্ছায় সুন্দর দেখতে একই পোশাক ঋতুর পর ঋতুতে পরতেন) পরস্পরকে আনন্দ দিতেন সহজ সরল প্রসন্নতার দ্বারা এবং তাঁরা বিশেষ চমকিত না হয়ে স্বামীজীকে নিজেদের মধ্যে স্বাগত জানিয়েছিলেন আর সত্যসত্যই এ সম্ভব যে অধ্যাপকমণ্ডলীর সঙ্গে এই

পরিচয়ের ফলে এবং এ সপ্তাহগুলিতে তাঁর বেদান্ত-দর্শনে শিক্ষাদানের ফলেই তাঁর ১৮৯৬-এর মার্চ মাসে হার্ভার্ডের গ্রাজুয়েট ফিলোসফিক্যাল স্কুলে বক্তৃতা দানের আমন্ত্রণ আসে। এটি স্বামীজীকে আমেরিকার দেওয়া সর্বোচ্চ বৌদ্ধিক সম্মান এবং এই কারণে এর পরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যদর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণেরও প্রস্তাব আসে, অবশ্য এ-প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

অবশ্য কেম্ব্রিজে প্রদত্ত সব ভাষণই বেদান্ত দর্শন বিষয়ক ছিল না। আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি তাঁর ১৭ ডিসেম্বর তারিখের প্রভাতকালীন ভাষণ ছিল "ভারতে মাতৃত্বের আদর্শ"-বিষয়ক। তাঁর জীবনীতে এ-কথা বলা হয়েছে যে, এই ভাষণটি শ্রীমতী বুলের "বিশেষ অনুরোধক্রমে" প্রদত্ত হয়েছিল এবং এটি ছিল "গভীর ভাবোদ্দীপক, অন্তর-আলোড়নকারী এবং স্বদেশপ্রেমব্যঞ্জক।... আরও অসচেতনভাবে হলেও এটি ছিল 'ভারতের নারীগণের দুর্দশা'-প্রসঙ্গে অজ্ঞ এবং স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিবর্গের অপপ্রচারের উত্তর।"[৫৯] স্বামীজীর উত্তরটি হয়ত পুরোপুরি 'অসচেতন' ছিল না, কারণ ভারতীয় নারীদের অবস্থা সম্বন্ধে কি রটনা প্রচলিত ছিল, তা তিনি ভাল করেই জানতেন। এ-বিষয়ে এটি লক্ষ্য করবার মতো ঘটনা যে, বোস্টনে তাঁর ভাষণ যেদিন দেওয়া হয় তার আগের দিন সন্ধ্যায় জনৈক কুমারী আর্মস্ট্রং ভারতীয় নারীদের মাতৃত্বের বিষয়ে একটি সম্পূর্ণ পৃথক চিত্র দেন। ডিসেম্বরের ১৭ তারিখে বোস্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্ট খুব আন্তরিকতার সঙ্গে নিম্নোক্ত সংবাদটি ছাপে ঃ

ভারতের অদ্ভুত প্রথাসমূহ

কুমারী আর্মস্ট্রং হলেন ভারতে কর্মরত একজন ধর্মপ্রচারক, তিনি গত রাত্রে ওয়ারেন অ্যাভিনিউস্থ ব্যাপটিস্ট সম্প্রদায়ের গির্জায় ওদেশের প্রথাসকল সম্বন্ধে একটি কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা দেন। বক্তা বলেন, প্রতি বৎসর সহস্র শিশুকে বলি দেওয়া হয় পৌত্তলিকদের জন্য নির্দিষ্ট স্বর্গে গতিলাভের জন্য এবং খরার সময় যাতে বৃষ্টিপাত ঘটে তজ্জন্যও দেবতার উদ্দেশ্যে তাদের বলিপ্রদান করা হয়। কুমারী আর্মস্ট্রং এদেশে এখন এসেছেন তাঁর চিকিৎসাবিদ্যায় পাঠ সমাপ্ত করতে, তারপর তিনি পুনর্বার ভারতে ফিরে যাবেন সেখানে জাতিচ্যুত নারীদের জন্য একটি আবাস স্থাপনের জন্য। আজ সন্ধ্যায় ওয়ারেন অ্যাভিনিউস্থ গির্জার অভ্যন্তরভাগে পোশাকের ঘরে কেবলমাত্র নারীদের জন্য একটি ভাষণ দান করবেন।

স্বামীজী হিন্দু মহিলাগণের যে চিত্রটি দেন তাতে তাঁদের চারিত্রিক সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের বিষয়টি তুলে ধরেন এবং তাঁদের যে উচ্চ সম্মান দেখানো হয় সে কথাও বলেন। আমার পরম এবং বিরাট সৌভাগ্য যে, ইতঃপূর্বে অপ্রকাশিত এই ভাষণটির একটি অনুলিপি আমি শ্রীমতী ওলি বুলের কাগজপত্রের মধ্যে পেয়েছি, সেটি আমার নিকট পৌঁছেছে শ্রীমতী সিলভিয়া বুল কুর্টিসের সহৃদয়তায়। পুরো ভাষণটি স্বামীজী যখন দেন তখন কুমারী ফ্রানসেস উইলার্ডের সাঙ্কেতিক লিপিকার লিপিবদ্ধ করেন, এটি তৃতীয় সংযোজনায় দেওয়া হলো। এখানে আমি এর ক্ষুদ্র একটি অংশ উদ্ধৃত করব। ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে ভারতীয় নারীগণের বীরত্ব এবং মহত্ত্ব সম্বন্ধে বহুবিধ দৃষ্টান্ত উল্লেখপূর্বক তিনি বলেন ঃ

রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে, রাজ্য পরিচালনায়,দেশ শাসনে, এমন কি যুদ্ধ পরিচালনায়ও পুরুষের তুল্য এমন কি অনেকক্ষেত্রে অধিকতর দক্ষতার সাক্ষ্য রেখেছে ভারতীয় নারী। ভারতে এ-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। যখনই সুযোগ এসেছে তারা দেখিয়েছে তাদের দক্ষতা পুরুষের সমতুল বরঞ্চ তাদের ক্ষেত্রে আরও একটি বড় কথা আছে। তারা অধঃপতনের পথে কম চলে, তারা ন্যায়ের মানদণ্ড রক্ষা করে চলে কারণ এটি তাদের চরিত্রগত গুণ এবং সেজন্য রাজ্য-পরিচালক ও শাসক-রূপে তারা অন্ততপক্ষে ভারতে পুরুষের অপেক্ষা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। জন স্টুয়ার্ট মিল এ-কথা উল্লেখ করেছেন এবং বর্তমানকালেও আমরা দেখি নারীগণ বিশাল জমিদারি অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করছেন।...

প্রত্যেক জাতি, মানবজাতির যা সাধারণ গুণ, তাকে অতিক্রম করে কতকগুলি চারিত্র-বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়, ধর্মের ক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে এবং চরিত্রের ক্ষেত্রে— এ বৈশিষ্ট্যের ছাপ পরিলক্ষিত হয়। একটি জাতি যদি একটি চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্য প্রকট করে, অপর একটি জাতি অপর একটি বৈশিষ্ট্য। বিগত কয়েকবৎসরের মধ্যে বিশ্ব এ-কথা স্বীকার করতে আরম্ভ করেছে। হিন্দু নারীগণের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য বিকশিত হতে দেখা যায় এবং যা তাদের জীবনের আদর্শ তা হলো মাতৃত্ব। তুমি যদি একটি হিন্দুগৃহে প্রবেশ কর তাহলে স্ত্রীকে স্বামীর সমকক্ষরূপে যা পাশ্চাত্যে দেখতে পাওয়া যায়, তা দেখতে পাবে না। কিন্তু যখন তুমি মায়ের দেখা পাবে, তখন তুমি দেখবে যে এই মা-ই হলেন হিন্দু-গৃহের ভিত্তিস্তম্ভস্বরূপ। ...মা-কে আমরা পরিবারের ঈশ্বরের মতো দেখি। এর পশ্চাতের কারণ হলো যে,

বিশ্বে একমাত্র নিঃস্বার্থ ভালবাসা হলো মায়ের ভালবাসা। মা সকল সময় দুঃখবরণ করেন, সকল সময় ভালবাসেন এবং মায়ের মধ্যে যে ভালবাসা আমরা দেখি তার চেয়ে অধিক কোন ভালবাসা কি ঈশ্বরও দেখাতে পারেন? সুতরাং মা হচ্ছেন হিন্দুর নিকট মর্তে ঈশ্বরের অবতারের মতো, মা-ই হচ্ছেন তাঁর প্রতিভূ। ...আমার মা আমাকে যে ভালবাসা দিয়েছেন, তারই জন্য আমি আজ যা, তা হতে পেরেছি এবং তাঁর কাছে আমার যা ঋণ তা কখনও শোধ করা যাবে না।...

একজন আর্য বলতে কি বোঝায়? সে এমন একজন মানুষ যার জন্ম হয়েছে ধর্মের মধ্যে। তোমরা যদি আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রগুলি দেখ, দেখবে তাতে, অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বেই মা কিভাবে সন্তানের জীবনকে প্রভাবিত করেন। আমি জানি আমার মা আমার জন্মের পূর্বে কিভাবে উপবাস এবং প্রার্থনা করেছেন, কিভাবে শত শত কৃচ্ছ্র সাধন করেছেন যা আমি পাঁচমিনিটের জন্যও করতে পারব না। তিনি তা দু-বছর ধরে পালন করেছেন এবং আমি বিশ্বাস করি আমি যেটুকু ধর্মীয় সংস্কার পেয়েছি তা সেইজন্যই। আমার মা সচেতনভাবে প্রয়াস করেছেন আমি যা হতে পেরেছি তা যেন হতে পারি—সেইভাবেই তিনি আমাকে পৃথিবীতে এনেছেন। আমার মধ্যে যা কিছু সৎ ও মহৎ তা আমার মা আমাকে সচেতন-প্রয়াসের দ্বারা অসচেতন ভাবে নয়—দান করেছেন।...এই বিশ্বে প্রত্যেক জাতির অবস্থান বিশেষ বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে এবং প্রত্যেক জাতির একটি বিশেষ ধাঁচ আছে। সেইদিন আসছে যখন এ-সবগুলি বিশেষ ধাঁচ মিলে মিশে এক হয়ে যাবে। এখন আমাদের কার্যক্ষেত্রে অবতরণ করতে হবে এবং সব জাতিগুলিকে মিশ্রিত করতে হবে এবং তার থেকে নতুন একটি জাতির অভ্যুদয় ঘটাতে হবে। তোমরা আমাকে এ-বিষয়ে আমার যা বিশ্বাস তা প্রকাশ করবার অনুমতি যদি দাও তো বলি—আমাদের পৃথিবীর সকল সভ্যতা সেই একটি আশ্চর্য মানবকুল হতে জাত হয়েছে—অর্থাৎ আর্যজাতি হতে উদ্ভূত হয়েছে। এ-পর্যন্ত সভ্যতার তিনটি ধরন দেখা গিয়েছে—রোমীয়, গ্রীসীয় এবং হিন্দু। রোমীয় ধরনে দেখি সংগঠন-প্রতিভা, রাজ্যজয় দৃঢ়তা, কিন্তু তাতে আবেগের অভাব, সৌন্দর্য এবং উচ্চতর অনুভূতির অভাব। এর ত্রুটি নিষ্ঠুরতা। গ্রীকসভ্যতা মূলত সৌন্দর্যের ব্যাপারে মহোৎসাহী, কিন্তু লঘুচিত্ত এবং অনৈতিকতার দিকে প্রবণতা-বিশিষ্ট। হিন্দুর ধরন মুখ্যত বিশ্বতত্ত্ব সন্ধানের ও ধর্মবোধের প্রবণতা-বিশিষ্ট কিন্তু তার মধ্যে সংগঠন এবং কর্মপ্রতিভার অভাব আছে।

রোমীয় ধরনটিকে আজকের দিনে আংলো স্যাক্সনরা প্রতিনিধিত্ব করছে, গ্রীক-ধরনটির অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ফরাসীরাই সর্বাধিক প্রতিনিধিত্ব করছে এবং পুরান হিন্দু সভ্যতা আজও মরে নি। প্রত্যেকটি সভ্যতারই এই নতুন সম্ভাবনাপূর্ণ দেশে কিছু কিছু সুযোগ আছে। তারা [আমেরিকানরা] রোমানদের সংগঠন-প্রতিভা, গ্রীকদের অনন্য সৌন্দর্য-প্রীতি এবং হিন্দুর মেরুদণ্ডস্বরূপ ধর্ম ও ঈশ্বরানুরাগ পেয়েছে। এগুলি মিশ্রিত করে এক নতুন সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটাতে হবে এবং এ-কাজটি নারীদেরই করতে হবে।

স্বামীজী হিন্দু নারীগণের যে-চিত্র অঙ্কন করেছিলেন তা ছিল খ্রীস্ট ধর্মপ্রচারকেরা এবং অন্যান্যরা যেরূপ অঙ্কিত করেছেন তা থেকে এত ভিন্ন প্রকৃতির যে, এটি কেম্ব্রিজ এবং বোস্টনে মহিলাদের মধ্যে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করল। তাঁকে না জানিয়ে তাঁরা তাঁর মাতাকে কুমারী মেরী মাতা ও তাঁর দেবশিশুর একটি চিত্র এবং তার সঙ্গে গভীর শ্রদ্ধা ও প্রণতি-জ্ঞাপক একখানি পত্র প্রেরণ করলেন। এ সহজেই অনুমেয় যে, তাঁর মায়ের প্রতি নিবেদিত এই শ্রদ্ধা তাঁর প্রতি নিবেদিত শ্রদ্ধারাশি অপেক্ষা তাঁকে অধিকতর গভীর আনন্দ দিয়েছিল।

স্বামীজী ধর্মীয় এবং বৌদ্ধিক ব্যাপারে সাধারণত নৈষ্ঠিক আর রক্ষণশীল মধ্য পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে উদার নীতিতে বিশ্বাসী ও রাজনৈতিক এবং সামাজিক চাঞ্চল্যপূর্ণ পূর্ব-উপকূলের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য দেখতে পেয়েছিলেন, তিনি সত্যই দেখলেন যে, নিউইয়র্ক ও বোস্টনে যে-দুটি ছিল তাঁর কেন্দ্রীয় কর্মস্থল—সকলে তাঁর ধারণাগুলি আগ্রহের সঙ্গে শোনে, কেউ কেউ হয়ত কেবলমাত্র বৌদ্ধিক কৌতূহলবশত শোনে—কিন্তু অন্যরা তাঁর প্রদত্ত অমূল্য ভাবধারা আত্মস্থ করার এবং অনুধাবন করবার গভীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। শ্রীমতী হেলের নিকট সম্ভবত ডিসেম্বরের একুশ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে দেখা যায় তাঁর পূর্বের হতাশা অপসারিত হচ্ছে এবং তাঁর নিজস্ব সঙ্কল্পের দৃঢ়তা যেন অগ্রাধিকার অর্জন করছে। এই চিঠিটি নিম্নোক্তরূপ ঃ

প্রিয় মা,

আমি শুনে খুব খুশি হলাম যে, হরিদাস বিহারীদাস কম্বলগুলি পাঠিয়েছে। আমার ভয় ঐগুলি এখানে পৌঁছতে দীর্ঘ সময় নেবে। রাজা ফনোগ্রাফটি পেয়ে খুব খুশি হয়েছেন বলে লিখেছেন এবং আমার কণ্ঠস্বর বেশ কয়েকবার শুনেছেন। আশা করি তিনি এটিকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলবেন।

আমি এখনও ভগিনী মেরীর সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। আশা করছি এ-সপ্তাহেই দেখা করব, কারণ পরবর্তী বৃহস্পতিবার আমি নিউ ইয়র্কের

উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি। এখন কোনক্রমেই শিকাগোয় আসতে পারছি না কারণ আমি আশা করছি নিউ ইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটনে যাব এবং আশা করছি যে নিউ ইয়র্কে খুবই ব্যস্ততার মধ্যে সময় কাটবে।

৩০ তারিখে ব্রুকলীনে বক্তৃতা এবং নিউ ইয়র্কে যে একগুচ্ছ নতুন বক্তৃতা দিতে হবে তার মাঝখানে যদি কিছুটা সময় বার করতে পারি তাহলে শিকাগোতে কয়েকটা দিনের জন্য যাব। যদি ঠিক এই মুহূর্তে সময় পাওয়া যেত তাহলে আমার পক্ষে খুব ভাল হতো, কারণ অর্ধেক দামের-টিকিটের সময়-সীমা এ-মাসেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।

এ-মাসে এখানে আমাকে খুব ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল যার জন্য একটা দিনের জন্যও বোস্টনে যেতে পারিনি। এখন আমি সময় পেয়েছি এবং তাই ভগিনী মেরীর সঙ্গে দেখা করব আশা করছি।

বাড়িতে বাচ্চারা কেমন আছে? শ্রীমতী এম. এডাম্‌স শিকাগোর লোক, তিনি কণ্ঠস্বর তৈরি এবং সঠিক পদ্ধতিতে হাঁটা প্রভৃতির ওপর ভাষণ দেন, তিনি এখানে সবসময় বক্তৃতা দিচ্ছেন। তিনি সব বিষয়েই বড় মাপের একজন মহিলা এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। তিনি আপনাদেব সকলকে চেনেন এবং "হেল বালিকাদের" খুব পছন্দ করেন। ভগিনী ইসাবেল ওঁকে মনে হয় বিশেষভাবে চেনে।

মা, আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না—আমি আমার পরিকল্পনাকে কার্যকর করতে কত দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ। আমাকে আলো দেখতেই হবে। ভারত হর্ষ প্রকাশ করে উৎসাহ দিতে পারে, কিন্তু তার তো অর্থ নেই। ধীরে ধীবে পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চলে আমি এমন বন্ধুদের পাচ্ছি যারা আমাকে আমার কাজে সাহায্য করবে। এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত, কারণ ইতোমধ্যেই তাবা সাহায্য করেছে। তারা আমাকে ক্রমে আরও আরও বেশি পছন্দ করছে।

আপনি জেনে সুখী হবেন যে আমি লেডী সমারসেট এবং কুমারী উইলার্ডের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পেরেছি। তবে দেখুন মা আপনি শিকাগোতে একমাত্র আকর্ষণ এবং আমি এদেশে যতদিন আছি আপনি যেখানে থাকবেন সেটাই আমার বাড়ি। যেই সময় পাব আমি ছুটে যাব আপনাকে আর বোনেদের দেখতে। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে আমার আশা করবার মতো আর কিছু নেই এবং আপনি নিশ্চয়ই চান না যে, এই অঞ্চলগুলিতে আমার যে-সাফল্য হয়েছে তা নষ্ট করে ফেলে শিকাগোতে গিয়ে দিনের পর দিন শুধু বসে বসে দিন কাটাই।

শ্রীমতী বুল এবং অপর কয়েকজন মহিলা যাঁরা আমাকে সাহায্য করছেন, তাঁরা যে কেবলমাত্র আন্তরিক এবং আমাকে ভালবাসেন তাই নয়, তাঁদের সমাজ-নেত্রী হিসাবে কিছু করবার ক্ষমতাও আছে। এরকম লক্ষ লক্ষ মহিলা যদি আপনাদের থাকতেন!

আপনাদের সকলকে ভালবাসা জানিয়ে
আপনার চিরদিনের স্নেহের পুত্র[৬০]
বিবেকানন্দ

ডিসেম্বরের একুশ তারিখে স্বামীজী মেরী হেলকেও জানালেন যে, তিনি বড়দিনের দিনটিতে নিউ ইয়র্ক যাত্রা করছেন, তার আগে ২৩ তারিখে রবিবারে কেম্ব্রিজে একটি অনির্ধারিত বক্তৃতা দিচ্ছেন। অবশ্য বাস্তবে যা ঘটল তা হলো যে, তিনি আরও কয়েকদিন ওখানে রয়ে গেলেন এবং বড়দিনের রাতে আমরা তাঁকে দেখি শ্রীমতী বুলের ঘনিষ্ঠজনদের নিয়ে একটি মনোমুগ্ধকর ভোজসভায় উপস্থিত থাকতে, যার বিবরণ শিকাগো ইন্টার ওসান পত্রিকায় ডিসেম্বরের ২৯ তারিখে প্রকাশিত হয় ঃ

বোস্টনের জীবন

শ্রীমতী ওলি বুলের সঙ্গে খ্রীস্ট জন্মদিবসের সন্ধ্যায়

বোস্টন, ম্যাস, ডিসেম্বর ২৬—বিশেষ সংবাদদাতা—গত সন্ধ্যায় খ্রীস্ট জন্মদিবসের সন্ধ্যা শ্রীমতী ওলি বুলের কেম্ব্রিজের সুন্দর গৃহে আগত অতিথিবর্গের নিকট একটি মনোরম সন্ধ্যায় পরিণত হয়েছিল। বিশাল অতিথি-আপ্যায়নকক্ষে একটি পাদপীঠের ওপর স্থাপিত শ্রীযুক্ত ওলি বুলের আবক্ষ মূর্তিটি যেন সেখানে আধিপত্য করছিল, শ্রীমতী বুলের অপূর্ব মনোহর স্পর্শে যে-সুরজাল বিস্তারলাভ করছিল তা যেন এ-পৃথিবীর নয়, নরওয়ে দেশের ধরনের ঘরটি অনন্য-আশ্চর্য সুন্দর বসার ঘর। নিভৃত বসার আসনগুলি এবং অলিন্দটি উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল সুবৃহৎ জনমণ্ডলীর জন্য নয় কিন্তু অল্পসংখ্যক সমভাবাপন্ন বন্ধুবর্গের জন্য যাঁরা অনুভব করতে পারবেন অনুষ্ঠানটির মনোহারিত্ব ও সৌন্দর্য। শ্রীমতী বুলের বন্ধু এবং অতিথি কুমারী ফার্মার তাঁর সঙ্গে ছিলেন, যিনি থাকায় সকলের নিকট এটি অধিকতর উপভোগ্য হয়েছিল, আর ছিলেন শিকাগোর শ্রীমতী মিলওয়ার্ড এ্যাডাম্‌স। মাদাম ম্যাগনুস্যান, যিনি বিশ্বমেলার স্মৃতি স্মরণে এনে দিচ্ছিলেন, আর স্বামী বিবেকানন্দও ছিলেন গৃহের অতিথি।

[প্রবন্ধটিতে এখানে প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে শ্রীমতী ওলি বুলের ওপর কয়েকটি অনুচ্ছেদ লেখা হয় এবং তারপর আছে ঃ]

আমি কি গতরাত্রে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীমতী ওলি বুলের গৃহে যে-সকল গভীর প্রভাব সৃষ্টিকারী কথাগুলি বলেছিলেন তা উল্লেখ করেছি? তাঁর রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ, পাগড়িশোভিত মস্তক এবং অপরূপ তাঁর সঙ্গীতময় কণ্ঠে সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ, যখন উন্মুক্ত অগ্নি আধারে অগ্নিশিখা বিস্তার করছিল, মোমবাতিগুলি মৃদু আলোক ছড়াচ্ছিল এবং ক্ষুদ্র মিত্র-গোষ্ঠী নীরবে ও শ্রদ্ধানত হয়ে বসে ছিল, দৃশ্যটি শিল্পীর অঙ্কনের বিষয় হবার যোগ্য এবং আমাদের অনুরোধে তিনি সংস্কৃতে একটি স্বস্তি-বচন উপহার দিলেন, যার তাৎপর্য হলো এই প্রার্থনা যে, এই খ্রীস্টদিবসের সাহস ও শক্তি আমাদের জীবনে সঞ্চিত হয়ে থাকুক এবং শান্তির রাজা আমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করতে থাকুন।

এইভাবে স্বামীজীর কেম্ব্রিজের ভ্রমণ সমাপ্ত হলো। তিনদিন পরে তিনি নিউ ইয়র্কে যাত্রা করলেন সেখানে ব্রুকলীন এ্যথিক্যাল এসোসিয়েসনের কার্যাধ্যক্ষদের সঙ্গে পূর্ব-নির্ধারিত সাক্ষাতের ব্যবস্থানুযায়ী সাক্ষাৎ করতে।

দ্বাদশ অধ্যায়ের টীকাসমূহ

পৃষ্ঠা	সাঙ্কেতিক চিহ্ন	টীকা
১৯৭	+	১৮৯৪ সালের আগস্টের ৩১ তারিখে আলাসিঙ্গাকে লিখিত স্বামীজীর একটি চিঠি বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম সং পত্র সংখ্যা ১১১, পৃঃ ৩৭৩ হতে তাঁর সম্পূর্ণ প্রদত্ত একটি উদ্ধৃতি অনুসারে স্বামীজী লেখেন—"আমি আমার স্মৃতিচারণা এইবারে একটি পুস্তকাকারে লিখতে চলেছি।" বেলুড় মঠে রক্ষিত মূল চিঠিটা সম্প্রতি পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে নিচে দাগ দেওয়া যে-শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন, সেটি "স্মৃতিচারণা" নয়, শব্দটি "ধারণাসমূহ" বলে মনে হয় এবং সত্য সত্যই এ-সময়ে যা তিনি লিখে রাখতে চেয়েছিলেন তা ধর্মসম্বন্ধে তাঁর চিন্তাসমূহ, কখনই তাঁর স্মৃতিকথা নয়।
১৯৯	+	এই চিঠিটির তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪। চিঠিতে সম্বোধন করা হয়েছে—"প্রিয় মা সারা"কে এবং বলা হয়েছে চিঠিটা

শ্রীমতী ওলি বুলকে লেখা। এটা হতে পারে যে, "মা সারা" কথাটি ভুল, এটা হবে মা স্মিথ, কারণ স্বামীজী নিউ ইয়র্কের শ্রীমতী আর্থার স্মিথকে এ-ভাবেই সম্বোধন করতেন। চিঠির বিষয়বস্তু দেখে মনে হয় শ্রীমতী স্মিথকেই লেখা, শ্রীমতী বুলের উদ্দেশে এটি ঠিক প্রযোজ্য নয় এবং এত তাড়াতাড়ি স্বামীজী শ্রীমতী বুলকে "মা সারা" লিখবেন (যদি কোনদিন এরূপ লিখেও থাকেন) তা সম্ভবপর মনে হয় না (মূল চিঠিটি এখন আর পাওয়া যায় না)।

২৪৭ + ১৮৯৬-এর পূর্বে এডিসন তাঁর প্রথম স্বয়ংক্রিয় তার চালিত ফনোগ্রাফ বাজারে বার করেন নি, তার আগে পর্যন্ত সমস্ত যান্ত্রিক ব্যবস্থাটি ছিল হস্তচালিত। ১৮৯৪-এ স্বামীজী খেতড়ীর মহারাজাকে যে ফনোগ্রাফ বার্তাটি পাঠিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে নিবেদিতার লেখা "স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি" গ্রন্থে [ইংরেজী, The Master as I Saw Him ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ২৮৭] কি একটি উল্লেখ পাই ? নিবেদিতা লিখছেন —"আমাদের আচার্যদেব তাঁর সঙ্ঘকে মনে করতেন সর্বদা নারী ও জনগণের স্বার্থসংরক্ষণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁর কণ্ঠে এই-বাণীই উদ্গত হয়েছিল যখন আমেরিকা থেকে খেতড়ীর রাজাকে তিনি ফনোগ্রাফে ধবে রাখা বাণীটি পাঠালেন।"

২৫৩ + যতদূর পর্যন্ত আজ আমরা জ্ঞাত আছি স্বামীজী শ্রীমতী ওলি বুলের কেম্ব্রিজের বাড়িতে মাত্র তিনবার এসেছিলেন ঃ ১৮৯৪-এর অক্টোবর মাসে, যখন তিনি কোন শিক্ষার আসর করেন নি, ১৮৯৪-এর ডিসেম্বর মাসে তিনসপ্তাহের মতো সময়ের জন্য যখন, আমরা যতদূর জানি, অনেকগুলি শিক্ষার আসরে ভাষণ দিয়েছিলেন। আর মার্চ ১৮৯৪-এ সপ্তাহখানেকের জন্য যখন দুটিমাত্র শিক্ষার আসরে ভাষণ দিয়েছিলেন। সুতরাং রাজযোগের ওপর শিক্ষামূলক ভাষণগুলি ১৮৯৪-এর ডিসেম্বর মাসেই দিয়ে থাকবার সম্ভাবনা বেশি।

চতুর্দশ অধ্যায়

বিশ্ববাণীর উদয়

॥ ১ ॥

যেহেতু যাকে রমাবাঈ-বিতর্ক বলে অভিহিত করা যেতে পারে, তা স্বামীজীর আমেরিকায় অনুষ্ঠিত কর্মকাণ্ডের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সক্রিয়ভাবে বিরোধী গোষ্ঠীদের মোকাবিলা করার জন্য তিনি যে-পন্থা অবলম্বন করতেন তার দৃষ্টান্তস্বরূপ, সেজন্য আমরা এর ওপর বহু পৃষ্ঠা ব্যয় করেছি। এ বিরোধ অবশ্য স্বামীজীর সময় এবং শক্তির খুব কম পরিমাণ অংশ নিয়েছিল। বর্তমানে যতদূর জানা যায়, ১৮৯৪-এর ডিসেম্বরের ৩০ তারিখ থেকে ১৮৯৫-এর এপ্রিলের ৮ তারিখ পর্যন্ত তিনি ব্রুকলিনে মাত্র ছটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং যদিও এর শেষেরটিতে তিনি একটি ভীতি-উৎপাদক মহাশক্তিসম্পন্ন বজ্রাঘাতে আমেরিকার সভা-সমিতি করা মহিলাদের পুরো শ্রেণীটিকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন, ১৮৯৫-এর প্রথমদিকের মাসগুলিতে তাঁর আগ্রহের কেন্দ্রটি ছিল নিউ ইয়র্ক শহরে, যেখানে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তিসংগ্রহ করে তাঁর পাশ্চাত্য কর্মকাণ্ডের একটি নতুন চরম গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় শুরু করতে উদ্যত হয়েছিলেন।

সুতরাং স্বামীজী পাশ্চাত্যের কল্যাণের জন্য যে ব্রত সাধন করতে এসেছিলেন, তার প্রথমাংশের সমাপ্তির পর্যায়ে এসে আমরা পৌঁছেছি। আমেরিকা এবং তিনি—উভয়েই দেড়-বছরের মধ্যে পরস্পরের সংস্পর্শের ফলে পরিবর্তিত হয়েছিলেন। এ-দেশের দৃষ্টি এক নতুন দিগন্তের অভিমুখে উন্মোচিত হয়েছিল এবং আধ্যাত্মিকতার জীবন্ত বীজ দৃঢ়ভাবে জনমানসে রোপিত হয়েছিল, সেখানে তা অনিবার্য-রূপেই বৃদ্ধি পাবে। স্বামীজীর অনেক ধারণাই এ-সময় পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছিল। তিনি জেনেছিলেন পাশ্চাত্যে বেদান্তদর্শনের কোন্ প্রয়োজন রয়েছে এবং তিনি দেখেছিলেন কিভাবে ঐ দর্শন আধুনিক মানুষের প্রতিটি সমস্যা সমাধানে নিযুক্ত হতে পারে। সত্য সত্যই পাশ্চাত্যের উদ্দেশ্যে তাঁর যে বাণী তা এই দেড়-বছরে একটা রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং এইরূপে যদিও ঐ মাসগুলির কাহিনী বর্ণনা করা

অনুষ্ঠানের জন্য, শ্রীমতী বুল তাঁর স্বগৃহে যার সূচনা করেছিলেন। জেন্‌স গ্রীনএকারের "মনস্যালভ্যাট তুলনামূলক ধর্মবিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির"ও নির্দেশক হন এবং কর্নেল টমাস ওয়েন্টওয়ার্থ হিগিনসন ১৮৯৭ সালে অবসর গ্রহণ করার পর "মুক্ত ধর্মীয় সংগঠনের"ও সভাপতি নির্বাচিত হন; তাঁর স্থলাভিষিক্ত এই ব্যক্তিটির উদ্দেশে হিগিনসন বলেন—"আমার জানা সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের মানুষ"।[২] স্বামীজী গ্রীনএকার থেকে লিখেছিলেন—"[জেন্‌স] এবং আমি এতো সহমত", কিন্তু জেন্‌স স্বামীজীর দর্শনতত্ত্ব সম্বন্ধে একেবারে একমত ছিলেন কিনা সে বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ থাকতে পারে, কারণ স্বামীজীর দর্শনতত্ত্ব স্পেন্সারের ক্রমবিকাশবাদকে পশ্চাতে ফেলে বহুদূর এগিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য তাঁর মন ছিল উদার এবং যার মধ্যে ঐকান্তিকতা আছে, যুক্তি আছে এ-ধরনের প্রত্যেকটি মতকে বিচার করে দেখবার মতো তাঁর মনের নমনীয়তাও ছিল এবং যখন স্বামীজীর প্রয়োজন হলো তাঁর সমর্থন পাবার তখন তিনি তাঁর সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত এবং সোচ্চার সমর্থক হয়েছেন। সত্যসত্যই জেন্‌স ছিলেন সেই স্বল্পসংখ্যক আমেরিকানদের মধ্যে একজন, যাঁরা খোলাখুলিভাবে এবং নিঃশর্তে স্বামীজীর ওপর আঘাত এলে তাঁকে সমর্থন করতে এগিয়ে এসেছেন।

কলমের কালি এবং আঠা প্রস্তুতকারী সুবিদিত চার্লস্ এম. হিগিন্‌স এ্যান্ড কোম্পানি শীর্ষক সংস্থাভুক্ত শ্রীযুক্ত চার্লস এম. হিগিন্‌স ছিলেন ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের অন্তর্গত তুলনামূলক ধর্ম-পরিষদের সদস্য। ১৮৯৪-এর নভেম্বর মাসে তিনি স্বামীজীর সম্পর্কে একটি দশ পাতার পুস্তিকা ছেপে বিতরণ করেছিলেন। পুস্তিকাটির শিরোনামাযুক্ত পৃষ্ঠায় যা বলা হয়েছে তদনুসারে এটি বিতরণ করা হয় "প্রাচ্যধর্মসম্বন্ধে অনুসন্ধানে যারা আগ্রহী তাদেরই মধ্যে।"[৩] পুস্তিকাটি সুগ্রথিত এবং স্বামীজী সম্বন্ধে আমেরিকা ও ভারতের সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত প্রবন্ধ হতে সঙ্কলিত রচনাসমূহ দ্বারা সমৃদ্ধ। যার থেকে কিছু কিছু এই কাহিনী বর্ণনাকালে ইতোমধ্যেই উদ্ধৃত করা হয়েছে। কি পরিস্থিতিতে শ্রীযুক্ত হিগিন্‌স এটি ছেপেছিলেন তা ঠিক জানা যায় নি। কারণ ১৮৯৪-এর নভেম্বর মাসে স্বামীজীর জীবনের কথা কিছুই আমরা তখনও পর্যন্ত জানতে পারিনি। হয়ত হিগিন্‌স একজন বাস্তব দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি হওয়ায় স্বামীজীর ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনে ভাষণ দানের পূর্বে পুস্তিকাটি বিতরণ করেছিলেন আগাম প্রচারের উদ্দেশ্যে।

হয়ত এজন্য তিনি ব্রুকলিন ডেইলী ঈগল পত্রিকার একজন সংবাদদাতাকে

স্বামীজীর অভ্যর্থনা সভায়ও ডেকেছিলেন। যে করেই হোক, ডিসেম্বরের ৩০ তারিখে উক্ত সংবাদপত্রে (২৯ ডিসেম্বর তারিখে লিখিত) নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি স্বামীজীর পাগড়ি-শোভিত একটি রেখাচিত্রসহ প্রকাশিত হয় ঃ

একজন হিন্দু-সন্ন্যাসীর আগমন

আগামীকাল বেদ-বর্ণিত দর্শন সম্বন্ধে ভাষণ দানের জন্য

তিনি এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের আমন্ত্রণে ব্রুকলিনে এসেছেন এবং গতরাত্রে চার্লস এম. হিগিন্‌সের গৃহে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বিশ্বমেলার সময় থেকে এ-দেশে সুপরিচিত, বিশ্বমেলার অঙ্গ হিসাবে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসভায় যোগদান করেছিলেন তিনি, সম্প্রতি গত শুক্রবার বোস্টন থেকে এ-শহরে এসেছেন। তিনি ৪৯৯ নং ফোর্থ স্ট্রীটের চার্লস এম. হিগিন্‌সের আহ্বানে ব্রুকলিন এথিক্যাল সোসাইটিতে বক্তৃতা দিতে এসেছেন। এই বক্তৃতা-অনুষ্ঠানে কোন প্রবেশমূল্য নেই, এতে সকলেই যোগদান করতে পারেন। যাতে তিনি যাদের সম্মুখে বক্তৃতা করবেন সেইসকল ব্রুকলিনের অধিবাসী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ও এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের সদস্যবৃন্দের সঙ্গে আগাম পরিচিত হতে পারেন সেজন্য শুক্রবার রাত্রে তাঁর ফোর্থ স্ট্রীটের গৃহে শ্রীযুক্ত হিগিন্‌স একটি ঘরোয়া অভ্যর্থনার আয়োজন করেছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন উইলিয়াম সি. বার্লিং, আব্রাম এইচ. ডেইলী, ডেলমোর এলওয়েল, ডঃ লুইস জি. জেন্‌স, ডঃ চার্লস এইচ. সেপার্ড, শ্রীমতী চার্লস এইচ. সেপার্ড, কুমারী সেপার্ড, জেম্‌স এ. স্কিলটন, কুমারী মেরী ফিলিপস, এইচ. ডব্লু. ফিলিপস এবং নিউ ইয়র্কের অধ্যাপক ল্যাণ্ডসবেরি [ল্যাণ্ডস্‌বার্গ]। অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ ঘরোয়া ধরনের ছিল। যাঁরা এসেছিলেন এ-অনুষ্ঠানে তাঁরা নানাবিধ বিষয়ে কথাবার্তা বলেন, তার মধ্যে মুখ্য ছিল সন্ন্যাসীর পক্ষে গভীর আগ্রহের বিষয়টি—'বৈদিক ধর্মের দর্শনতত্ত্ব'। তিনি তাঁর শ্রোতাদের এমন কিছু কিছু বিষয় ব্যাখ্যা করে বোঝালেন যা পূর্বে তাঁদের কাছে রহস্যের মতো মনে হতো এবং এই আলোচনার মধ্য দিয়ে উপস্থিত সকলে পরের দিন সন্ধ্যায় পাউচ-সভাগৃহে যা তাঁর বক্তৃতার বিষয় হবে সে-সম্বন্ধেও আগাম কিছু স্বাদ লাভ করলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তাঁর একজন ভারতীয় অনুরাগী [মাদ্রাজের জি. জি. নরসিমহাচারিয়া] বলেন ঃ "তাঁর প্রশান্ত প্রফুল্ল মুখের দিকে

তাকালেই যা আপনাকে তৎক্ষণাৎ আকর্ষণ করে তা হলো তাঁর বিশাল ও বুদ্ধি-সমুজ্জ্বল চক্ষু দুটি এবং যখনই তিনি কোন বিষয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। তাঁর চক্ষু দুটিও চঞ্চল হয়ে উঠে আশ্চর্য এক জ্যোতি বিকিরণ করতে থাকে। তিনি তাঁর নিজের সম্বন্ধে কিছুই বলেন না এবং যতটুকু তাঁর পূর্বজীবন সম্বন্ধে আপনাদের বলতে পারি তা আমি সংগ্রহ করেছি সেই সকল শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণের নিকট থেকে যাঁরা তাঁকে শিশুকাল হতে জানেন। তিনি ৩২ বা ৩৩ বৎসর বয়স্ক, বঙ্গদেশের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্নাতক। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম—নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর পূর্ব জীবনে দেখা যায় এক প্রবল আধ্যাত্মিক প্রবণতা, যা সচরাচর তাঁর বয়সী যুবকদের মধ্যে দেখা যায় না। তিনি কলকাতার পথে খ্রীস্টীয় মুক্তি ফৌজের লোকদের শোভাযাত্রা দেখলে বা ব্রাহ্মসমাজীদের সমাবেশ দেখলে তাতে যোগদান না করে ছাড়তেন না এবং তাদের সঙ্গে সমবেত সঙ্গীতে কণ্ঠদান করতেন। পুণ্য তীর্থস্থানগুলিতে যেতে এবং সাধুসন্তদের সঙ্গে কথা বলতে খুব ভালবাসতেন। তাঁর জীবনে বিংশতিবর্ষ বয়সটি জীবনের এক নতুন পর্বের সূচক হয়ে আছে, যখন পিতার মৃত্যুর পর তিনি সুপ্রসিদ্ধ রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। তিনি কিছুকাল পরমহংসদেবের সঙ্গে বাস করেন এবং তাঁর দেহান্তের পর পরিব্রজ্যায় বহির্গত হন। তখন তিনি কিছুদিন হিমালয় অঞ্চলে বাস করেন এবং পদব্রজে তিব্বতে এবং অন্যান্যস্থানে যান, পরে ভারতে ফিরে আসেন। তিনি কখনও কখনও হিমালয়ের যে মহান দৃশ্যসমূহ এবং চিরতুষারাবৃত অঞ্চল দর্শন করেছেন সে-সম্বন্ধে কথা বলেছেন এবং এ-প্রসঙ্গে এ-কথাও বলেছেন যে, সেখানেই তিনি প্রথম চিত্তের শান্তি লাভ করেন। দশ-বারো (?) বৎসর এরূপ জীবন কাটাবার পর, তিনি সারা ভারত-পরিক্রমার ব্রত গ্রহণ করেন এবং ধাতু জাতীয় দ্রব্য (মুদ্রা) স্পর্শ করবেন না এই প্রতিজ্ঞা করেন। তাঁর এই পরিব্রজ্যার সময়েই আমরা তাঁর সঙ্গে পরিচিত হই। আমরা আকস্মিক ঘটনাবলীর যোগাযোগে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করি। আমরা তাঁর সাক্ষাৎলাভ করলাম এমন একটি সময়ে যখন মাদ্রাজে আমাদের মধ্যে অনেক তরুণ তখনকার যুগের হালচাল-অনুসারে চিন্তাভাবনা করত এবং কারুরই নিজেদের সম্বন্ধে এবং জগতে তারা কেন এসেছে এ-বিষয়ে কোন চেতনা ছিল না। এ একেবারে ঈশ্বরের দয়ার দান যে, তারা তাঁর মতো এমন আধ্যাত্মিক

ভাবনায় পরিপূর্ণ একজনকে পেল যাঁর সঙ্গে স্বল্পকালের সংসর্গেও এক নতুন জীবনের অভ্যুদয় ঘটে গেল তাদের মধ্যে। তারা তাঁর মধ্যে ধর্মীয় নিষ্ঠা এবং সামাজিক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক চিন্তার আশ্চর্য সমন্বয় প্রত্যক্ষ করল। তিনি পণ্ডিত ও অধ্যাপক সমাজের সমকক্ষ ছিলেন। যে-কোন বিষয়েই তাঁর আলোচনা ছিল চিত্তাকর্ষক কিন্তু ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা ছিল অতুলনীয়। শ্রী পরমহংস রামকৃষ্ণ একবার নাকি বলেছিলেন যে, নরেন্দ্রনাথ নিজের মধ্যে দিব্যজ্ঞান এবং দিব্যপ্রেম দুটিতেই চরম উৎকর্ষ অর্জন করেছেন। কোন ব্যক্তি তাঁর সংস্পর্শে এসে তাঁর হৃদয়ের আশ্চর্য জাদু প্রভাব এড়াতে পারেননি। তাঁর সংস্পর্শে এসে লোকে যে সুখ অনুভব করে তা শুধু মস্তিষ্কের পরিতৃপ্তির জন্য নয়, হৃদয়ের সমস্ত আবেগ অতিক্রম করে যাওয়ার জন্য। ভদ্রমহোদয়গণ, তাঁর জ্ঞানের পরিমাপ করবার যোগ্যতা আমার নেই। কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি যে, কৃষ্ণের শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা অনেককে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। তিনি এক অপূর্ব সমন্বয় ধর্মের কথা বলেন। তিনি বলেন যে, বেদকে ক্রমবিকাশতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে, দেখতে হবে যে, তার মধ্যে ধর্মের ক্রমবিকাশ পুরোপুরি বিধৃত হয়ে আছে যতক্ষণ না সে-বিকাশ একত্বে গিয়ে পৌঁছেছে বা অদ্বৈততত্ত্বে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং এই কথাও বলেন যে, বেদে নেই এরূপ নতুন কোন অধ্যাত্ম চিন্তা নেই, যে-বেদ অগ্নিমিড় [অগ্নিমীড়ে] থেকে তৎস [তৎসৎ] পর্যন্ত শিক্ষা দেয়। তাঁর নিকট বেদের আপাতবিরোধী এবং পরস্পরবিরোধী শিক্ষাসমূহ সবই সত্য, যেহেতু অনন্ত সত্যের এক একটি অংশ তাতে প্রতিভাত এবং হিন্দুধর্ম সত্য হতে সত্যে উপনীত হয়, অন্য ধর্মের মতো ভ্রম হতে সত্যে নয়—সেজন্য সব ধর্মমতের মধ্যে অন্তর্নিহিত যে-ধর্ম তাই হলো হিন্দু ধর্ম। ত্রিভুজ আকারের এই বিশ্ব সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বর হলেন শীর্ষ বিন্দু এবং তিনি এইভাবে ঈশ্বর এবং ব্রহ্মের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট সীমারেখা টানেন।"

[জি.জি. নরসিমহাচারিয়ার উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে স্বামীজীকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্য বাঙ্গালোরে যে-সভা আহূত হয়েছিল তারই প্রারম্ভিক ভাষণ হতে। এই সভার বিবরণ সর্বপ্রথম ১৮৯৪-এর আগস্টের ২৭ তারিখে বাঙ্গালোরে স্পেকটেটর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, পরে তা সেপ্টেম্বরের ৬ তারিখে ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় পুনঃ প্রকাশিত হয়, সেখান থেকেই শ্রীযুক্ত হিগিন্‌সের পুস্তিকায় এটি পুনর্মুদ্রিত হয়।]

এথিক্যাল সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত স্বামীজীর প্রথম ভাষণ তখন যাকে পাউচ ম্যানসন বলা হতো সেখানে দেওয়া হয়। ব্রুকলিনের বসতবাটিগুলি যে-অঞ্চলে অবস্থিত সেখানে সারি সারি বৃক্ষশোভিত একটি প্রশস্ত পথের ওপর অবস্থিত ছিল এ-বাড়িটি। যেখানে পাউচ ম্যানসন একসময় দাঁড়িয়েছিল সেই স্থানটিতে আমি গিয়েছি, আশা করেছিলাম যে, এটিকে দেখতে পাব, কিন্তু না তৎস্থলে দেখলাম একটি লাল ইঁটের বহুতল ফ্ল্যাট বাড়ি। একই রাস্তার ওপরে এখানে সেখানে ছিল প্রশস্ত বাগান ও উন্মুক্ত সবুজ মাঠসহ বিশাল বড় বড় বসত বাড়ি। যে বাড়িগুলির মধ্যে স্বামীজীর যুগ রয়ে গিয়েছে, কিন্তু এ-বাড়িগুলিও দ্রুত, যা সর্বত্র দেখা যায়, বৈশিষ্ট্যহীন লাল ইঁটের বহুতল ফ্ল্যাট বাড়িগুলিকে স্থান করে দিচ্ছে। আমি এই স্মৃতিজাগানো তথ্যটি উল্লেখ করলাম, পরিবর্তনকে নিন্দা করবার জন্য নয় কেবলমাত্র পাঠকের মনে এইটি গভীরভাবে বোঝানোর জন্য যে, আজ আমরা যে-দৃশ্য দেখছি তার থেকে স্বামীজীর সমসাময়িক কালের দৃশ্য অনেক পৃথক ছিল। তখন যে-বিশ্ব ছিল তখন ঘোড়ার পদক্ষেপের চেয়ে দ্রুতগতিতে কোন কিছু নড়ত না, যে বিদ্যুৎবাহী ট্রলিগুলি তখন ব্রুকলিনের গর্বের বস্তু ছিল—তারই একটির চালক মৃত্যুকে তুচ্ছ করে ঘণ্টায় সাড়ে বারো মাইল বেগে তার গাড়ি চালানোয় পুলিসের হাতে বন্দি হয়েছিল—আরো এ হলো সেই সময় যখন একটি বাদানুবাদ চলেছিল রিভলবার না তরবারি—কোন্‌টা অশ্বারোহী সৈনিকের পক্ষে অধিক কাজের হতে পারে।

স্বামীজীর ব্রুকলিনে দেওয়া প্রথম বক্তৃতা কেবলমাত্র যে ব্রুকলিনেরই সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হয়েছিল তা নয়, ডিসেম্বরের ৩১ তারিখে নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউনেও প্রকাশিত হয়েছিল। নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউনে প্রকাশিত নিম্নলিখিত অংশটি তখনকার দিনে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে কি পরিমাণ বিভ্রান্তি বিরাজ করছিল তারই নমুনাস্বরূপ ঃ

ব্রুকলিনে স্বামী বিবেকানন্দ

ব্রুকলিনের পাউচ ম্যানসনে গতরাত্রে দর্শকেরা ভিড় করে এসেছিল বোম্বাইয়ের স্বামী বিবেকানন্দের "ভারতীয় ধর্মসমূহ" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা শোনবার জন্য। বক্তৃতাটি দেওয়া হয়েছিল ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের আমন্ত্রণে। ডঃ লিউস্ জে. জেন্স পৌরোহিত্য করেন। বক্তা একজন হিন্দু সন্ন্যাসী যিনি গত বৎসর শিকাগোয় ধর্মমহাসভায় হিন্দুগণের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। হলুদ রঙের পাগড়ি এবং আলখাল্লাসহ তিনি

তাঁর স্বদেশীয় পরিচ্ছদে ভূষিত ছিলেন। তাঁর বক্তৃতায় তিনি প্রসঙ্গক্রমে বেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত জরথুস্ট্রীয় দর্শনতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, হিন্দুদের ধর্ম যা কিছু প্রচার করে তা সব ইতিবাচক এবং নেতিবাচক কোনকিছু প্রচার করে না।

বক্তৃতার পর এ. ডব্লু. টেন্নি, ডঃ আর. জি. এক্লেস, ডেলমোর এলওয়েল এবং আরও অনেকে প্রশ্ন করলে বিবেকানন্দ সে-সকলের উত্তর দেন। বক্তৃতার পূর্বে তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।

স্বামীজীর সম্পূর্ণ রচনাবলীর পাঠকদের নিকট "ভারতের ধর্মসমূহ" শীর্ষক বক্তৃতাটি অপরিচিত নয়। তার কারণ ডিসেম্বরের ৩১ তারিখে ব্রুকলিন স্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিয়ন পত্রিকায় যে-প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছিল সেটি স্বামীজীর (ইংরাজী রচনাবলীর) প্রথম খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে 'হিন্দুধর্ম' শিরোনামায়।* সম্পূর্ণ রচনাবলীর গোড়ার দিককার সংস্করণসমূহে স্টান্ডার্ড ইউনিয়নের প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হয়, কিন্তু পরবর্তী সংস্করণসমূহে বর্ণনামূলক অংশগুলি বর্জিত হয়েছে দেখা যায়। এই অংশগুলি স্বামীজীর জীবনী গ্রন্থের সাম্প্রতিক সংস্করণসমূহেও বর্জিত বা বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়েছে। যেহেতু স্টাণ্ডার্ড ইউনিয়ন পত্রিকার প্রতিবেদকটি স্বামীজীর যে-চিত্রটি অঙ্কিত করেছে তা ছাপার অক্ষরে আর পাওয়া যায় না, সেজন্য আমি সেই বর্ণনামূলক অংশগুলি পুরো এখানে উদ্ধৃত করছি, বক্তৃতার অংশগুলি বাদ দিয়ে। [এ-কথা এখানে হয়ত উল্লেখ করা চলতে পারে যে, এ-বক্তৃতাটি কেবলমাত্র (ইংরাজী) সম্পূর্ণ রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে দেখা যাবে তা নয়, চতুর্থ খণ্ডেও "ভারতীয় ধর্মচিন্তা" ** শিরোনামায় পাওয়া যাবে। এর পরবর্তী বক্তৃতাটি নেওয়া হয়েছে রাদারফোর্ড আমেরিকান (নিউ জার্সি) পত্রিকাটি হতে এবং আক্ষরিক দিক থেকে এটি ভিন্ন হলেও সারাংশে এক।]

ঋষি-কণ্ঠ

প্রাচীন বেদসমূহের সমর্থনে স্বামী বিবেকানন্দ
এক প্রাচীন প্রেম-ধর্ম
আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের দৃষ্টিতে—আত্মার পুনর্জন্মবাদ ও মানুষের দেবত্ব
"সর্বপ্রকার ধর্মই সুনিশ্চিতভাবে সত্য"

গতকাল সন্ধ্যায় ক্লিন্টন অ্যাভিনিউয়ের ওপর অবস্থিত পাউচ মঞ্চে

* বাণী ও রচনার ১০ম খণ্ডে, "হিন্দু জীবন দর্শন" শীর্ষক বক্তৃতা দ্রষ্টব্য
** ঐ, ৩য় খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ২৮৭-৯০ দ্রষ্টব্য

দর্শকে ঠাসা সভাগৃহ ও পার্শ্বস্থ কক্ষসমূহে উপচে পড়া ভিড়ে যাঁরা এসেছিলেন ব্রুকলিন এথিক্যাল সোসাইটির আমন্ত্রণে তাঁরা স্বামী বিবেকানন্দের প্রেম ও সহনশীলতার বাণী উচ্চারণের মধ্যে প্রাচীন ঋষিকণ্ঠ শুনতে পেয়ে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

যিনি প্রতীচ্যে এসেছিলেন প্রাচীনতম ধর্মীয় উপাসনা ও দর্শনতত্ত্বের অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের বাণীদূত ও প্রতিনিধি-হিসাবে সেই প্রাচ্যদেশীয় তপস্বীর খ্যাতি তিনি স্বয়ং এখানে আগমন করার পূর্বেই পৌঁছে গিয়েছিল বলে সকল বৃত্তি এবং কর্মে ব্যাপৃত মানুষেরা—চিকিৎসক, আইনজীবী, বিচারক এবং শিক্ষাব্রতী—বহু মহিলাসহ শহরের সকল দিক থেকে এসেছিলেন তাঁর আশ্চর্য সুন্দর এবং প্রাঞ্জল 'ভারতের ধর্ম'-বিষয়ের সমর্থনে দেওয়া ভাষণটি শুনতে। তাঁরা শুনেছেন যে, শিকাগোয় অনুষ্ঠিত বিশ্বমেলার ধর্মমহাসভায় তিনি কৃষ্ণ, ব্রহ্ম এবং বুদ্ধের উপাসকদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এবং সেখানে অখ্রীস্টীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। তাঁরা শুনেছিলেন যে, তিনিই হলেন সেই দার্শনিক যিনি তাঁর ধর্মের জন্য পেশাগত দিক থেকে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পরিত্যাগ করেছেন, যিনি বৎসরের পর বৎসর নিষ্ঠা এবং ধৈর্য সহকারে অধ্যয়ন দ্বারা পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি গ্রহণ করেছেন এবং তা হিন্দু ঐতিহ্যের রহস্যময় দেশে বপন করেছেন, তাঁরা তাঁর উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন মন, পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা, বাগ্মিতা এবং পবিত্রতা, ঐকান্তিকতা ও সাধুতার কথা শুনেছেন, সেজন্য তাঁরা মহৎ কিছু প্রাপ্তির আশায় এসেছিলেন।

তাঁদের নিরাশ হতে হয়নি। স্বামী অর্থাৎ গুরু বা ধর্মনেতা বা শিক্ষাদাতা বিবেকানন্দ তাঁর খ্যাতির চেয়েও বড় মাপের। গত রাতে তিনি যখন মঞ্চে ছবির মতো সুন্দর উজ্জ্বল রক্তবর্ণ পোশাকে সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, একটি স্খলিত কুঞ্চিত কেশ তাঁর বহু ভাঁজযুক্ত পাগড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল—তাঁর শ্যামবর্ণ মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত হচ্ছিল তাঁর প্রবুদ্ধ চিন্তার দীপ্তি, তাঁর বিশাল চক্ষুদুটিতে ছিল ঈশাবতারের দ্যুতিময় প্রেরণার প্রকাশ, তাঁর চঞ্চল ওষ্ঠদ্বয় গভীর সুরব্যঞ্জনাসহ ত্রুটিহীন ইংরেজীতে কেবলমাত্র প্রেম, সহানুভূতি এবং সহনশীলতার বাণী উচ্চারণ করল, তখন বোঝা গেল তিনি হিমালয়-নিবাসী প্রখ্যাত ঋষিদের একজন অতি সুন্দর নিদর্শন, নতুন এক ধর্মের তিনি উদ্গাতা, বৌদ্ধধর্মের নৈতিকতার সঙ্গে খ্রীস্টধর্মের দার্শনিকতার সংমিশ্রণে সেই নতুন ধর্ম গঠিত এবং তাঁর শ্রোতৃবৃন্দ উপলব্ধি

করল কেন কলকাতা শহরে বিগত সেপ্টেম্বরের ৪ তারিখে একটি শ্রোতৃসমাগমে পূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল কেবলমাত্র "জনসাধারণের পক্ষ থেকে হিন্দুধর্মের প্রতি যে বিরাট সক্রিয় অবদান রেখেছেন তিনি সেজন্য তাঁকে সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি জানানোর জন্য।"

*স্বামীজীর বক্তৃতা বা ভাষণ (সম্পূর্ণ অপ্রস্তুতভাবে দেওয়া হয়েছিল এটি) সম্বন্ধে আর যাই বলা হোক না কেন, সুনিশ্চিতভাবে এটি ছিল চিত্তাকর্ষক। এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি ডঃ জেন্‌স তাঁকে পরিচিত করে দেবার পর শ্রোতৃবৃন্দ তাঁকে যে সাদর অভিনন্দন জানিয়েছিল তজ্জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানানোর পর বিবেকানন্দ যা বলেন তা অংশত হলো ঃ [এখানে স্বামীজীর ভাষণের সেই প্রতিলিপিটি দেওয়া হয়েছে যেটি তাঁর সম্পূর্ণ (ইংরাজী) রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে "হিন্দুধর্ম" * শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটি নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদসহ সমাপ্ত হয়েছে ঃ]*

বক্তাকে ঘনঘন আন্তরিকভাবে করতালিধ্বনি দিয়ে সমর্থন জানানো হয়। বক্তৃতার শেষে পনের মিনিট সময় দেওয়া হয় প্রশ্নোত্তরের জন্য, তারপর তাঁকে ঘরোয়াভাবে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়।

ডিসেম্বরের ৩১ তারিখের ব্রুকলিন টাইম্‌স ও ব্রুকলিন ডেলী ঈগল পত্রিকাদ্বয়েও একই বক্তৃতার ওপর দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। যেগুলি স্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিয়নের প্রতিবেদন হতে একটু অন্যরকম, সেজন্য সে-দুটি যথাক্রমে নিচে দেওয়া হলো ঃ

ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসন
হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ

ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসন বোম্বাইয়ের হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দকে গত রাত্রে পাউচ মঞ্চে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে; তিনি বিশ্বমেলা চলাকালে ধর্মমহাসভায় হিন্দুদের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করে এদেশে প্রথমে খ্যাতি অর্জন করেন।

অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের পূর্বে এই বিশিষ্ট অতিথি "ভারতীয় ধর্মসমূহ" বিষয়ে লক্ষণীয়ভাবে এক চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দেন। স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর বক্তৃতার প্রতি লোকের কী পরিমাণ আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল তা প্রতিফলিত হয়েছিল শ্রোতাদের সংখ্যার মধ্যে। ঘরগুলিতে শ্বাসরোধকারী ভিড়

* বাণী ও রচনার ১০ম খণ্ডে, "হিন্দু জীবন দর্শন" শীর্ষক বক্তৃতা

হয়েছিল। বক্তৃতা আরম্ভ হবার বহু পূর্বে সমস্ত আসনগুলি [এখানে মুদ্রাকর একটি লাইন ছেড়ে দিয়েছে] বিলাসবহুল হয়ে দাঁড়ায়—যে সময় প্রাচ্যদেশীয় ব্যক্তিটি বক্তৃতা আরম্ভ করলেন।

গতরাত্রে বিবেকানন্দ তাঁর প্রাচ্যদেশীয় পরিচ্ছদে শোভিত হয়ে দর্শকদের সামনে এসেছিলেন। তাঁর শরীর দৃঢ় গঠনের, উচ্চতা মধ্যম, মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ও সুন্দর, কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুদ্বয় হতে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল ক্ষণে ক্ষণে এবং তিনি হাসলে দু সারি সমান শুভ্র দন্তরাজি প্রকাশ হয়ে পড়ছিল। গতরাত্রে তিনি একটি পাগড়ি পরেছিলেন এবং একটি উজ্জ্বল রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ তাঁর পা পর্যন্ত সমস্ত শরীরকে আবৃত করে রেখেছিল। তিনি সাবলীল ইংরেজী বলেন। তিনি ভাষণ দিলেন একই স্বরগ্রামে যা, শুনতে খারাপ লাগছিল না। তিনি এমন একটি আন্তরিকতার সঙ্গে সব কিছু বলেন যে, তাতে তাঁর প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। নানা প্রসঙ্গের মধ্যে তিনি বলেন—"আমরা পৃথিবীতে এসেছি শিখতে, এটাই হলো হিন্দুদের জীবনদর্শন। জ্ঞানসঞ্চয়েই জীবনের পূর্ণ সুখ। মানবাত্মাকে বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা লাভের উপর প্রীতিপূর্ণ হতে হবে। তোমার বাইবেলের জ্ঞানের দ্বারা আমি আমার শাস্ত্র ভাল করে বুঝতে পারি। সেইরকম তুমিও তোমার বাইবেল সুষ্ঠুতরভাবে পড়তে পারবে, যদি আমার শাস্ত্রের সঙ্গে তোমার পরিচয় থাকে। একটা ধর্ম সত্য হলে, অন্যান্য ধর্মও নিশ্চয়ই সত্য। একই সত্য বিভিন্ন আকারে অভিব্যক্ত হয়েছে। আর এই আকারগুলি নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন জাতির শারীরিক ও মানসিক অবস্থার বৈচিত্র্যের উপর।

"আমাদের যা কিছু আছে, তা যদি জড়বস্তু ও তার পরিণাম দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেত, তাহলে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করার কোন প্রয়োজন থাকত না। কিন্তু চিন্তাশক্তি যে জড়বস্তু থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তা প্রমাণ করা যায় না। মানুষের দেহ কতকগুলি প্রবৃত্তি যে বংশানুক্রমে লাভ করে তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু এ প্রবৃত্তিগুলির অর্থ হলো সেই উপযুক্ত শারীরিক সংহতি, যার মাধ্যমে একটা বিশেষ মন নিজস্ব ধারায় কাজ করবে। জীবাত্মা যে বিশেষ মানসিক সংস্কার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে, তা তার অতীত কর্মদ্বারা সঞ্জাত। তাকে এমন একটি শরীর বেছে নিতে হবে, যা তার মানসিক সংস্কারগুলির বিকাশের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী হয়। সাদৃশ্যের নিয়মে এটা ঘটে। বিজ্ঞানের সঙ্গে এর সম্পূর্ণ

সামঞ্জস্য রয়েছে কেন না বিজ্ঞান 'অভ্যাস' দ্বারা সব কিছু ব্যাখ্যা করতে চায়। অভ্যাস সৃষ্ট হয় কোন কিছু পুনঃ পুনঃ সংঘটনের ফলে। অতএব নবজাত আত্মার চারিত্রিক সংস্কারগুলি ব্যাখ্যা করতে হলে পূর্বে তাদের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি স্বীকার করা প্রয়োজন। এ সংস্কারগুলি তো এ জন্মে উৎপন্ন নয়। অতএব নিশ্চয়ই অতীত জন্ম থেকে তারা এসেছে।

"মানবজাতির বিভিন্ন ধর্মগুলি বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। মানবাত্মা যে-সব ধাপ অতিক্রম করে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে, প্রত্যেকটি ধর্ম যেন সেই এক একটি ধাপ। কোন ধাপকেই অবহেলা করা উচিত নয়। কোনটিই খারাপ বা বিপজ্জনক নয়। সবগুলিই কল্যাণপ্রসূ। শিশু যেমন যুবক হয়, যুবক আবার যেমন পরিণত বয়স্কে রূপান্তরিত হয়, মানুষও সেইরূপ এক সত্য থেকে অপর সত্যে উপনীত হয়। বিপদ আসে তখনই, যখন এই বিভিন্ন অবস্থার সত্যগুলি অনমনীয় হয়ে দাঁড়ায় এবং আর নড়তে চায় না। তখন মানুষের আধ্যাত্মিক গতি রুদ্ধ হয়। শিশু যদি না বাড়ে তো বুঝতে হবে সে ব্যাধিগ্রস্ত। মানুষ ধর্মের পথে যদি ধীরভাবে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলে, তা হলে এই ধাপগুলি ক্রমশ তাকে পূর্ণ সত্যের উপলব্ধিতে উপনীত করে দেবে। এজন্য আমরা ঈশ্বরের সগুণ ও নির্গুণ উভয় ভাবকেই বিশ্বাস করি। আর ঐ সঙ্গে অতীতে যে-সব ধর্ম ছিল, বর্তমানে যেগুলি আছে এবং ভবিষ্যতে যেগুলি আসবে সবগুলিকেই বিশ্বাস করি। আমাদের আরও বিশ্বাস যে, ধর্মসমূহকে শুধু সহ্য করা নয়, আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করা কর্তব্য।

*"স্থূল জড় জগতে আমরা দেখতে পাই—বিস্তারই জীবন, সঙ্কোচই মৃত্যু। কোন কিছুর প্রসারণ থেমে গেলে তার জীবনেরও অবসান ঘটে। নৈতিক ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রয়োগ করলে বলতে পারা যায় যদি কেউ বাঁচতে চায় তো তাকে ভালবাসতেই হবে। ভালবাসা রুদ্ধ হলে মৃত্যু অনিবার্য। প্রেমই হলো মানবপ্রকৃতি। তুমি তাকে কিছুতেই এড়াতে পারো না, কেননা সেটাই জীবনের একমাত্র নিয়ম। অতএব আমাদের কর্তব্য ভালবাসার জন্যই ভগবানকে ভালবাসা। কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য সম্পাদন করা, কাজের জন্যই কাজ করা। অন্য কোন প্রত্যাশা যেন আমাদের না থাকে। জানতে হবে যে, মানুষ স্বরূপত শুদ্ধ ও পূর্ণ, মানুষই ভগবানের প্রকৃত মন্দির।"**

* বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৯৫-৬

ধর্ম যে অভিজ্ঞতা-প্রসূত এই মর্মে প্রচুর যুক্তির অবতারণা করে তিনি তাঁর ভাষণ সমাপ্ত করলেন।

বক্তৃতার শেষে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ভাষণের বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রশ্নসমূহের উত্তর দেন, প্রশ্নগুলি করেছিলেন অ্যাসোসিয়েসনের সদস্যাবৃন্দ।

ভারতের ধর্মসমূহ

হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের ভাষণ

এথিক্যাল সোসাইটি আয়োজিত সভায় বিপুল শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশে তিনি ভাষণ দিলেন। ছবির মতো সুন্দর পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে সুপ্রাচীন বেদসমূহের মূলতত্ত্বসমূহ

গত সন্ধ্যায় হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ প্রদত্ত "ভারতের ধর্মসমূহ" বিষয়ে বক্তৃতা শোনবার জন্য পাউচ প্রাসাদে বিপুল শ্রোতা সমাগম হয়েছিল। উপরতলার দর্শকাসনসহ সভাকক্ষ এবং পার্শ্ববর্তী বসার ঘরটিতে শ্রোতা উপচে পড়ছিল। বহু শ্রোতা বক্তৃতার আরম্ভ হতে শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিলেন। বক্তাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন ডঃ লুইস্ জি. জেন্‌স ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি—এই সংস্থাটির আহ্বানেই বক্তৃতাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি একটি উজ্জ্বল লাল রঙের পোশাক পরেছিলেন, যা তাঁর হাঁটু ছাড়িয়ে পড়েছিল। কোমরে একটি বন্ধনী দিয়ে আটকানো ছিল পোশাকটি। তাঁর মাথায় ছিল হালকা হলুদ রঙের সিল্কের পাগড়ি। তাঁব উচ্চতা মধ্যম, দৃঢ় গঠন, এবং তাঁর শ্যামবর্ণ মুখমণ্ডল পরিষ্কারভাবে ক্ষৌরিত। তাঁর চক্ষুদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ এবং তাঁর বিশাল অবয়ব সুগঠিত। তাঁর কণ্ঠস্বর নম্র এবং সঙ্গীতময়। তিনি একই স্বরগ্রামে কথা বলছিলেন, তাঁর ভাষায় একটু বিদেশী উচ্চারণভঙ্গি ছিল।

মহম্মদীয়, বৌদ্ধ এবং ভারতের অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের মতগুলির উল্লেখ করে বক্তা বলেন যে, "হিন্দুগণ তাঁদের ধর্ম বেদের আপ্তবাণী থেকে লাভ করেছেন। বেদের মতে সৃষ্টি অনাদি ও অনন্ত। মানুষ দেহধারী আত্মা। দেহের মৃত্যু আছে, কিন্তু আত্মা অবিনাশী। দেহ ধ্বংস হলেও আত্মা থেকে যাবেন। আত্মা কোন কিছু থেকে উৎপন্ন হন নি, কেননা উৎপত্তি অর্থে কতকগুলি জিনিসের মিলন আর যা কিছু সম্মিলিত, ভবিষ্যতে তার লয়ও অবশ্যম্ভাবী। এজন্য বলা হয় আত্মার উৎপত্তি নেই। যদি বলো, আমাদের পূর্ব পূর্ব জন্মের কোন কথা আমরা স্মরণ করতে পারি

না কেন তার ব্যাখ্যা সহজ। আমরা যাকে বিষয়ের জ্ঞান বলি তা আমাদের মনঃসমুদ্রের নেহাৎই ওপরকার ব্যাপার। মনের গভীরে আমাদের সকল অভিজ্ঞতা সঞ্চিত রয়েছে।

"একটা স্থায়ী কিছু অন্বেষণের আকাঙ্ক্ষা জাগল। মন, বুদ্ধি বস্তুত সারা বিশ্বপ্রকৃতিই তো পরিবর্তনশীল। এমন কিছু খুঁজে পাওয়া যায় কিনা, যা অসীম, অনন্ত—এ প্রশ্ন নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। এক দার্শনিক সম্প্রদায় বর্তমান বৌদ্ধগণ যার প্রতিনিধি—বলতেন, যা কিছু পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তার কোন অস্তিত্ব নেই। প্রত্যেক বস্তু অপর বস্তু নিচয়ের ওপর নির্ভর করে; মানুষ একটা স্বাধীন সত্তা—এ ধারণা ভ্রম। পক্ষান্তরে, ভাববাদীরা বলেন, প্রত্যেকেই এক একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি। সমস্যাটির প্রকৃত সমাধান এই যে, প্রকৃতি অন্যোন্য নির্ভরতা ও স্বতন্ত্রতা, বাস্তবতা ও ভাব সত্তা—এই উভয়ের সংমিশ্রণ। পারস্পরিক নির্ভরতার প্রমাণ এই যে, আমাদের শরীরের গতিসমূহ আমাদের মনের অধীন। মন আবার খ্রীস্টানরা যাকে 'আত্মা' বলে, সেই চৈতন্যসত্তা দ্বারা চালিত। মৃত্যু একটা পরিবর্তন মাত্র। মৃত্যুর পর অন্যলোকে গিয়ে যে আত্মারা উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন আর যাঁরা এই পৃথিবীতে রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে চৈতন্য সত্তাব দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। সেইরকম অপর লোকে নিম্নগতি প্রাপ্ত আত্মারাও এখানকার অন্যান্য আত্মার সঙ্গে অভিন্ন। প্রত্যেক মানুষই স্বরূপত পূর্ণ সত্তা। অন্ধকারে বসে 'অন্ধকার, অন্ধকার' বলে পরিতাপ করলে কোন লাভ নেই; বরং দেশলাই এনে আলো জ্বাললে তৎক্ষণাৎ অন্ধকার দূর হয়। সেইরকম 'আমাদের শরীর সীমাবদ্ধ, আমাদের আত্মা মলিন' বলে বসে বসে অনুশোচনা নিষ্ফল। তত্ত্বজ্ঞানের আলোককে যদি আবাহন করি, সংশয়ের অন্ধকার কেটে যাবে। জীবনের উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভ। খ্রীস্টানবা হিন্দুদের নিকট শিখতে পারেন, হিন্দুরাও খ্রীস্টানদের নিকট। আমাদের ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে তারা তাদের বাইবেল আরও ভাল করে বুঝতে পারবে।"

বক্তা বলেন : "তোমাদের সন্তানদের শেখাও যে, ধর্ম হলো একটা প্রত্যক্ষ বস্তু নেতিবাচক কিছু নয়। এটা শেখানো বুলি নয়, এটা হলো জীবনের একটি বিস্তার। মানুষের প্রকৃতির মধ্যে একটি মহৎ সত্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে যা অনবরত বিকশিত হতে চাইছে। এই বিকাশের নামই ধর্ম। প্রত্যেকটি শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে কতকগুলি পূর্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতা

নিয়ে আসে। আমরা আমাদের মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্যের ভাব অনুভব করি, তার থেকে বোঝা যায়, শরীর ও মন ছাড়া আমাদের মধ্যে অপর একটি সত্য রয়েছে। শরীর ও মন পরাধীন। কিন্তু আমাদের আত্মা স্বাধীন সত্তা। ওইটিই আমাদের ভেতরকার মুক্তির ইচ্ছে সৃষ্টি করছে। আমরা যদি স্বরূপত মুক্ত না হতাম, তাহলে আমরা জগৎকে সৎ ও পূর্ণ করে তোলার আশা পোষণ করতে পারতাম কি? আমরা বিশ্বাস করি যে, আমরাই আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ি। আমরা এখন যা, তা আমাদের নিজেদেরই সৃষ্টি। ইচ্ছে করলে আমরা আমাদেরকে ভেঙে নতুন করে গড়তে পারি। আমরা বিশ্বপিতা ভগবানকে বিশ্বাস করি। তিনি তাঁর সন্তানদের জনক ও পালয়িতা—সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান। তোমরা যেমন ব্যক্তি ঈশ্বরকে স্বীকার কর, আমরাও ঐরূপ করি। কিন্তু আমরা ব্যক্তি ঈশ্বরের পরেও যেতে চাই, আমরা বিশ্বাস করি, ঈশ্বরে নির্বিশেষ সত্তার সঙ্গে আমরা স্বরূপত এক। অতীতে যে-সব ধর্ম উদ্ভূত হয়েছে, সবগুলির ওপরই আমরা শ্রদ্ধাশীল। ধর্মের প্রত্যেক অভিব্যক্তির প্রতি হিন্দু মাথা নত করেন, কেননা জগতে কল্যাণকর আদর্শ হলো গ্রহণ, বর্জন নয়। সকল সুন্দর বর্ণের ফুল দিয়ে আমরা তোড়া তৈরি করে বিশ্বস্রষ্টা ভগবানকে উপহার দেব। তিনিই যে আমাদের একান্ত আপনার জন। ভালবাসার জন্যই আমরা তাঁকে ভালবাসব, কর্তব্যের জন্যই আমরা তাঁর প্রতি কর্তব্য সাধব, পুজোর জন্যই আমরা তাঁর পুজো করব।

ধর্মগ্রন্থসমূহ ভালই, তবে এগুলো শুধু মানচিত্রের মতো। ধর একটা বইয়ে লেখা আছে বছরে এত ইঞ্চি বৃষ্টি পড়ে। একজন যদি আমাকে বইটি নিঙড়াতে বলেন, ঐরূপ করে এক ফোঁটাও জল পাব না। বই শুধু বৃষ্টির ধারণা দেয়; ঠিক সেইরূপ শাস্ত্র, মন্দির, গির্জা প্রভৃতি আমাদেরকে পথের নির্দেশ দেয় মাত্র। যতক্ষণ ওরা আমাদেরকে ধর্মপথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে ততক্ষণ ওগুলি হিতকর। বলিদান, নতজানু হওয়া, স্তোত্রপাঠ বা মন্ত্রোচ্চারণ—এসব ধর্মের লক্ষ্য নয়। আমরা যখন যীশুখ্রীস্টকে সামনা-সামনি প্রত্যক্ষ দেখতে পাব, তখনই আমাদের পূর্ণতার উপলব্ধি হবে। পূর্বোক্ত ক্রিয়াকলাপ যদি আমাদেরকে সেই পূর্ণতা উপলব্ধি করতে সাহায্য করে, তবেই তারা ভাল। শাস্ত্রের কথা বা উপদেশ আমাদের উপকারে আসতে পারে। কলম্বাস এই মহাদেশ আবিষ্কার করার পর দেশে ফিরে গিয়ে স্বদেশবাসীকে নতুন পৃথিবীর সন্ধান দিলেন। অনেকে বিশ্বাস করতে চাইল না। তিনি তাদেরকে বললেন, নিজেরা গিয়ে খুঁজে দেখ।

আমরাও সেইরকম শাস্ত্রের উপদেশ পড়ার পর যদি নিজেরা সাধনা করে শাস্ত্রোক্ত সত্য প্রত্যক্ষ করতে পারি, তাহলে আমরা যে দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করি, তা কেউ কেড়ে নিতে পারে না।"*

বক্তৃতার পর সকলকে সুযোগ দেওয়া হলো বক্তাকে যে-কোন বিষয়ে প্রশ্ন করে বক্তার মতামত জেনে নেবার জন্য। অনেকে এ আহ্বানের সুযোগ গ্রহণ করলেন। মন্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি প্রশ্নের উত্তরে বক্তা বললেন তিনি প্রশ্নটির উত্তর দেবেন যদি প্রশ্নকর্তা মন্দের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে পারেন। তিনি বললেন—হিন্দুরা শয়তানের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। সকল মানুষ সমান আলোকপ্রাপ্ত নয়, সুতরাং কেউ একটু বেশি ভাল বা অধিক পবিত্র অন্যদের তুলনায়, এ হতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক মানুষেরই ভাল হবার সুযোগ আছে; আমরা আমাদের নিজেদের বিনাশ করতে পারি না। আমরা শক্তিকে ধ্বংস করতে পারি না, শক্তি আমাদের প্রাণায়িত করে, তবে তাকে আমরা ভিন্নতর দিকে চালনা করতে পারি। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন এবং আমাদের চারিপাশে পদার্থ দ্বারা গঠিত মহাজাগতিক অস্তিত্ব আছে কি না, এ-সকলই আমাদের কল্পনামাত্র—এসব প্রশ্ন সম্বন্ধে বক্তা উত্তর দিলেন একটি কাহিনীর মধ্য দিয়ে। একজন শিষ্যকে তাঁর গুরু প্রশ্ন করলেন—'পৃথিবী যদি স্থানচ্যুত হয়ে পড়ে যায় তো কি হবে?' উত্তরে শিষ্য বললেন—'পড়বে কোথায়?' বিশ্ব একটি অস্তিত্ব সন্দেহ নাই, কিন্তু বিশ্ব থাকুক বা না থাকুক তাতে কিছু এসে যায় না। আমরা ক্রমাগত এগিয়ে চলেছি। আমরা এখন ব্যক্তি নই, আমাদের মধ্যে যে আত্মা এবং পরমাত্মা বর্তমান তাই আমাদের অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিত্ব। আমরা যখন বর্তমান অবস্থা থেকে উচ্চতর অবস্থায় উন্নীত হব, যখন মুখোমুখি প্রত্যক্ষ ঈশ্বর সাক্ষাৎকার করব তখনই আমরা পূর্ণ ব্যক্তিত্ব অর্জন করব। যীশুর নিকট অন্ধের আনীত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে যে প্রশ্ন এটি কি তার নিজের পাপে ঘটেছে না তার পিতামাতার পাপে—তার উত্তরে বক্তা বলেন যে, তাঁর মনে এ-সম্বন্ধে পাপের প্রশ্ন ওঠেনি, কারণ তাঁর স্থির বিশ্বাস এই যে, এটি ঘটেছে অন্ধ ব্যক্তিটিরই অতীত কর্মের ফলে। মৃত্যুর পর জীবাত্মা সুখাবস্থায় উপনীত হয় কি না এ-প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—"দেশ ও কাল তোমারই মধ্যে অবস্থিত।

* বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৯৭-৯

তুমি দেশ ও কালে অবস্থিত নও। এটুকু জানাই যথেষ্ট যে, আমরা এ-জন্মে যত আমাদের জীবনকে উন্নত করে তুলব—যেহেতু এখানে আমাদের সুযোগ আছে নিজেদের জীবনকে উন্নত করে তোলবার, আমরা ততই ক্রমে পূর্ণ মানবত্বের দিকে অগ্রসর হতে পারব।"

ডিসেম্বরের ৩০ তারিখের বক্তৃতার পর প্রশ্নোত্তর পর্বে যে-সকল প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠিত হয়েছে সে-সম্বন্ধে বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ রচনাবলীর (ইং) পঞ্চম খণ্ডে "প্রশ্নোত্তর" শিরোনামায় পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া হয়েছে।* দেখা যায় যে, স্বামীজীকে এ-প্রশ্নও করা হয়েছিল "জন্মান্তর সম্বন্ধে হিন্দুধর্মোক্ত তত্ত্বটি কি?" "ভারতের নারীগণ উন্নত নয় কেন?" "আপনি কি মনে করেন না যে, যদি মানুষকে নরকাগ্নির ভয় না দেখানো হয়, তাহলে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না?" "আপনি কি হিন্দুধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান এ-দেশেও প্রবর্তিত করতে চান?" (এই শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—"আমি কেবলমাত্র দর্শনতত্ত্বের কথাই বলেছি।") এই প্রশ্নোত্তর পর্বের আলোচনা প্রসঙ্গেই প্রথমে সমস্ত প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর দেবার পর তাঁর প্রখ্যাত উক্তিটি করেন—"বুদ্ধের যেমন প্রাচ্য ভূখণ্ডের জন্য একটি বাণী দেবার ছিল, আমারও প্রতীচ্য ভূখণ্ডের জন্য একটি বাণী দেবার আছে।"[৪] (এক বছর পরে স্বামীজী সম্বন্ধে ১৮৯৬-এর জানুয়ারির ১৯ তারিখে নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে এই উক্তিটির অনুরূপ একটি উক্তি উদ্ধৃত করা হয়।)

॥ ২ ॥

১৮৯৫-এর জানুয়ারির ৩ তারিখে স্বামীজী শ্রীমতী বুলকে একটি চিঠিতে ব্রুকলিনে প্রদত্ত তাঁর প্রথম বক্তৃতার সাফল্য সম্বন্ধে লেখেন "*[এথিক্যাল সোসাইটির বিশিষ্ট সদস্যদের মধ্যে] কয়েকজন মনে করেন যে, এরূপ প্রাচ্যদেশীয় ধর্মপ্রসঙ্গ ব্রুকলিনের জনসাধারণের উপভোগ্য হবে না। কিন্তু প্রভুর কৃপায় বক্তৃতা খুব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। ব্রুকলিনের প্রায় আটশত গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগদান করেন; যাঁরা মনে করেছিলেন বক্তৃতা সফল হবে না। তাঁরাই ব্রুকলিনে কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতার আয়োজন করছেন।*"[৫] **

* বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৪৯১-২ ও ৪৯৬ দ্রঃ

** ঐ, ৮ম খণ্ড, ১ম সং, পত্রসংখ্যা ৫৪৩, পৃঃ ২০৭

ব্রুকলিনে স্বামীজীর তাৎক্ষণিক সাফল্য সম্বন্ধে এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের সদস্যা পরবর্তী কালে অনুগত শিষ্যা, কুমারী এলেন ওয়াল্ডো তাঁর 'দেববাণী' গ্রন্থের বর্ণনামূলক ভূমিকায় লিখেছেন "ভাষণটি ছিল হিন্দুধর্মের ওপর এবং যেই স্বামীজী তাঁর আলম্বিত পরিচ্ছদ ও পাগড়ি পরিহিত হয়ে এসে তাঁর মাতৃভূমির সুপ্রাচীন ধর্ম ব্যাখ্যা করতে লাগলেন, সকলের আগ্রহ এতো গভীরভাবে উদ্দীপিত হলো যে, সেই সন্ধ্যার শেষের দিকে ব্রুকলিনে নিয়মিত শিক্ষাদানের জন্য আসরের দাবি বেশ জোরালো হয়ে উঠল। স্বামীজী সস্নেহে সম্মত হলেন এবং অনেকগুলি শিক্ষার আসরে ভাষণ দিলেন এবং পাউচ প্রাসাদে ও আর কয়েকটি স্থানে সাধারণের জন্য জনসভায় বক্তৃতাও দিলেন।"[৬] ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসন এই জনসভাগুলি ঘোষণা করে নিম্নলিখিত ইস্তাহার প্রকাশ করল ঃ

ভারতের স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণাবলী

লাফেইট এভিনিউয়ের নিকটবর্তী
পাউচ মঞ্চ, ৩৪৫ ক্লিনটন এভিনিউ,
ভারতের ধর্ম ও প্রথাসমূহ

রবিবার সন্ধ্যা, জানুয়ারি ২০, ১৮৯৫ ঃ
হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান নারীত্বের আদর্শ।

রবিবার সন্ধ্যা, ফেব্রুয়ারি ৩, ১৮৯৫ ঃ
বৌদ্ধ ধর্ম — ভারত যেভাবে বুঝেছে

রবিবার সন্ধ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৭, ১৮৯৫ ঃ
বেদ এবং হিন্দুদিগের ধর্ম। পৌত্তলিকতা কাহাকে বলে?[৭]

প্রতিদিন সন্ধ্যা ৮ ঘটিকায় শুরু

পুরো শিক্ষাদানের আসরে জনপিছু-প্রবেশ মূল্য এক ডলার, শিক্ষাদানের আসরে জনপিছু একদিনের প্রবেশ মূল্য ৫০ সেন্ট। এ-বক্তৃতাগুলি আয়োজিত হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের এবং এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিলের সাহায্যার্থে।

ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসন

আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছে যে, ভারতের বোম্বাই প্রদেশের অধিবাসী বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং বাগ্মী হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দকে ওপরে ঘোষিত নির্ধারিত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্য নিযুক্ত করেছে। রবিবার ডিসেম্বরের ৩০ তারিখে সন্ধ্যায় পাউচ মঞ্চে তাঁর প্রদত্ত ভাষণের ফলে

সর্বসাধারণের মধ্যে হিন্দুধর্মের বেদ ও বেদান্ত দর্শনের এই প্রবক্তার মুখে কেবলমাত্র ধর্ম-দর্শন বিষয়েই নয়, ভারতের আধুনিককালের যে-জীবনধারা সে-সম্বন্ধেও শোনার জন্য প্রচণ্ড আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। এই সকল বিষয়ের ওপর বক্তা বিশেষ দখল নিয়ে কথা বলেন। তিনি জন্ম ও শিক্ষাসূত্রে ব্রাহ্মণ্য ধর্মবিশ্বাসের গূঢ় রহস্যের দ্বারা গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ। এই ব্রাহ্মণ্য ধর্মবিশ্বাসের চেয়ে আকর্ষণীয় গভীর তাৎপর্যপূর্ণ চিন্তাধারা আজ পর্যন্ত দার্শনিক চিন্তাধারার ইতিহাসে আর নেই। তুলনামূলক ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁর মত হলো সকল ধর্মমত ও বিশ্বাসকে সর্বজনীনভাবে সার সত্য বলে গ্রহণ করা এবং সেগুলি ধর্মীয় উপলব্ধির আবশ্যকীয় বিভিন্ন ধাপ হিসাবে ধরে নেওয়া। ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত তাঁর ভাষণ হতে আমরা নিচে পুনর্বার মুদ্রিত করছি কিছু অংশ ঃ [এখানে এর পরে দেওয়া হয় স্বামীজীর "হিন্দুধর্ম" শীর্ষক প্রবন্ধ হতে সকল ধর্মের ঐক্য সংক্রান্ত উক্তিগুলি এবং তারপরে ব্রুকলিন স্টাণ্ডার্ড ইউনিয়ন পত্রিকার ১৮৯৪-এ ডিসেম্বরের ৩১ তারিখে প্রকাশিত একটি উদ্ধৃতি। ইস্তাহারের শেষে নিম্নলিখিত ঘোষণাটি লিপিবদ্ধ হয়েছে ঃ]

টিকিট পাওয়া যাবে স্যাণ্ডলার্সে, বক্তৃতার দিনগুলিতে সন্ধ্যায় পাউচ মঞ্চে কিংবা অ্যাসোসিয়সনের সদস্যদের নিকট থেকেও তা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

ব্রুকলিনে স্বামীজীর প্রতি প্রবল আগ্রহদীপ্ত অভ্যর্থনা থেকে বিচার করতে হলে বলতে হয় যে, মোটের ওপর তার বাণী দেবার এখনই ঠিক ঠিক সময় হয়েছিল। মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের তুলনায় পূর্বতটবর্তী এলাকার মানুষেরা ছিলেন অনেক বেশি উদারচিত্ত। তাছাড়া তাঁর খ্যাতি তখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাঁর প্রতি তখন বহু আমেরিকাবাসী উচ্চশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী এবং সমাজের সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত নরনারী শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিলেন। তিনি তখন ভারত থেকেও সর্বোচ্চ ধর্মীয়-দার্শনিক চিন্তার প্রতিভূ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন, এ-সময় তিনি শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য একটি শক্তি বলে পরিচিত হয়েছেন, সেজন্য এখন আর কেউ তাঁর বিরোধিতা করতে সাহস পায়নি। গোঁড়া খ্রীস্টধর্ম প্রচারক শিবিরের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা এখন নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য একথা বলতেই হবে যে পরোক্ষভাবে গোঁড়া যাজকসম্প্রদায় তাঁর প্রভাব খর্ব করবার প্রয়াসে এখনও বেশ সক্রিয় ছিল।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে ব্রুকলিনের রেভারেণ্ড টি. দ্য. উইট ট্যালমেজ তখন পৃথিবী ভ্রমণ করছিলেন, তিনি ভারত থেকে সংবাদপত্রে ধারাবাহিক

প্রবন্ধ লিখে চলেছিলেন আমেরিকার অধিবাসিগণকে অ-খ্রীস্টীয় বর্বরদের কুসংস্কার ও পাপাচারের বিষয়ে আলোকিত করার জন্য। ডঃ ট্যালমেজের "বিশ্ব-ভুবন ঘুরে" শীর্ষক প্রবন্ধমালা ১৮৯৪-এর ডিসেম্বর থেকে ১৮৯৫-এর জানুয়ারি মাস পর্যন্ত প্রকাশিত হয়, কেবলমাত্র ব্রুকলিনের সংবাদপত্রসমূহে নয়, অন্যান্য শহরেরও। এই সকল পত্রিকাগুলি হতে মাত্র দুএকটি অংশবিশেষ উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করছি যে, এক কথায় ট্যালমেজ বক্তৃতামঞ্চে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও দর্শনীয় ব্যক্তি হিসাবে নেহাৎ সামান্য ক্ষমতার অধিকারি ছিলেন না। তিনি লিখেছেন—"হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম যে কি বস্তু তা যেখানে তারা খুব শক্তিশালী সেখানে গেলে বোঝা যায়। ধর্মমহাসভায় তাদের যেভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে তারা যে তা নয়, তা বোঝা যায় তাদের নিজস্ব প্রকৃতির পূর্ণ প্রকাশ সেখানে দেখে, তা দেখে বোঝা যায় যে, মানবপ্রকৃতি কতদূর নিষ্ঠুর এবং কতদূর ঘৃণ্য হতে পারে। ভয়ঙ্কর পাপাচারের প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্তগুলি তুলে ধরবার জন্য এবং মৃত্যু এবং কবরের ওপর আমাদের গৌরবময় খ্রীস্টধর্ম নিজের জয় ঘোষণা কি করে করতে পারে তা দেখাবার জন্য আমি 'বিশ্বভুবন ঘুরে'- শীর্ষক দ্বিতীয় ধর্মোপদেশে 'রক্তস্রোতের শহরে'-র অর্থাৎ ভারতের কানপুরের কথা বলব।" "প্রচারকের জীবন বিলাসবহুল ও আলস্যমগ্ন। হিন্দুধর্ম হলো এমন একটি ধর্ম যার ওপর হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। বর্বরদের রাজ্যে অনুপ্রবেশ করার জন্য খ্রীস্টধর্ম ঔদ্ধত্যের অপরাধে অপরাধী। তোমার উচিত ব্রহ্ম, বুদ্ধ, মহম্মদ এবং খ্রীস্টকে একই সারিতে দাঁড় করানো। এইরূপ কলঙ্ক আরোপ এবং ঈশ্বরের নিন্দাসূচক প্রচার যা এখন চলছে তা খণ্ডন করবার জন্য এবং খ্রীস্টীয় জগতের সঙ্গে মূর্তিপূজকদের পার্থক্য প্রদর্শনের জন্য আমি এই উপদেশ দিচ্ছি...।" "হিন্দুদের নিকট গঙ্গা হলো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নদী, কিন্তু আমার নিকট এটি হলো জঘন্যতম নদী যা কখনও কখনও পূতিগন্ধ বহন করে সমুদ্রে ভয়াবহতা সৃষ্টি করে তার সঙ্গে মিশেছে।... বারাণসী হলো হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের রাজধানী। কিন্তু হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মকে পদদলিত করেছে, একটি দানবের পায়ের ক্ষুর অন্য একটি দানবের ঘাড়ের ওপর চেপে বসেছে। এটি জঞ্জালের, দুর্গন্ধের এবং অশালীনতারও রাজধানী।" "শিকাগো ধর্মমহাসভায় এ-ধর্মের [হিন্দুধর্মের] পক্ষে যাই বলা হোক না কেন, এ-ধর্ম মানুষকে পশু করে তোলে এবং নারীকে করে তোলে হীনতম ক্রীতদাসী। হিন্দু যে আদৌ জন্মেছে সেটাই হলো তার পক্ষে সবথেকে সর্বনাশা ব্যাপার।"

এইভাবে ট্যালমেজ, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, সংবাদপত্রে স্তম্ভের পর স্তম্ভে তাঁর ভ্রমণকাহিনীর অংশীদার করেছেন জনসাধারণকে। তিনি অবশ্য আশার বাণী না শুনিয়ে ছাড়েন নি :

তিনি লিখেছেন—"খ্রীস্ট ধর্মপ্রচারকেরা ব্যস্ত, কেউ গির্জায়, কেউ বেসরকারী ভজনালায়ে, কেউ বাজারে।... যেখানে তার সবচেয়ে দৃঢ় দুর্গ [বারাণসী] সেখানেই হিন্দুধর্মকে আঘাত করা হচ্ছে।... খ্রীস্টধর্ম অখ্রীস্টীয় ধর্মগুলিকে অবদমিত করছে এবং এই একটিমাত্র নগর বা শহর নয় বা একটি জনপদ নয়—সর্বত্র প্রত্যক্ষ বা অপ্রতক্ষ্যভাবে এর প্রভাব অনুভূত হচ্ছে এবং সেইদিন দ্রুত আসছে যেদিন হিন্দুধর্ম হুড়মুড় করে ভেঙে ছত্রখান হয়ে পড়বে।... সমগ্র ভারত যীশুর জন্য অধিকৃত করা হবে।" "...কুসংস্কার এবং পাপের মসজিদ এবং মন্দিরগুলিকে গির্জায় রূপান্তরিত করা হবে। মুসলমান ধর্মের শেষ মসজিদটিকে খ্রীস্টীয় গির্জায় পরিণত করা হবে।...শেষ বৌদ্ধ মন্দিরটি আলোর দুর্গ হয়ে উঠবে। হিন্দুধর্মের শেষ বিগ্রহটিকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হবে।"[৭]

এ ধরনের জিনিস স্বভাবতই খ্রীস্টধর্মযাজকদের শেষ ভিত্তিভূমি হয়েছিল এবং এ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা যে, রেভারেণ্ড ডঃ টি. দ্য উইট ট্যালমেজ বেশ কয়েকমাস ধরে আমেরিকার চিন্তাধারার গতিপ্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ইতঃপূর্বেই হেরে যাওয়া একটি যুদ্ধকে চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কারণ যে-কথা স্বামীজী ১৮৯৪-এর অন্তিমলগ্নে ভারতে লিখেছিলেন "এখানে খ্রীস্টধর্মপ্রচারকেরা এবং তাঁদের ধ্বজাধারিগণ চিৎকার করে করে নীরব হয়ে গিয়েছে এবং সারা পৃথিবীই তা অনুসরণ করবে।"[৮]

কিন্তু এখনও স্বামীজী এবং মিশনারী ধ্বজাধারীদের মধ্যে একটা যুদ্ধ বাকি রয়ে গিয়েছিল। এরা ভারতকে সাহায্যদানের নামে ভারতের নিন্দামন্দ করা পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করত এবং ভারতের পক্ষে একটি কথা উচ্চারণমাত্র ভারসাম্য হারিয়ে ফেলত। ব্রুকলিনে এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসন কর্তৃক আয়োজিত স্বামীজীর দ্বিতীয় বক্তৃতার কালে একটি নতুন উৎস থেকে তীব্র বিরোধিতা এল। এই বক্তৃতাটি—"হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রীস্টধর্মানুসারে নারীর আর্দশ"-প্রসঙ্গে পাউচ প্রাসাদে দেওয়া হয়েছিল রবিবার জানুয়ারি ২০ তারিখ সন্ধ্যায় এবং এ-প্রসঙ্গে জানুয়ারির ২১ তারিখে স্টাণ্ডার্ড ইউনিয়ন পত্রিকায় নিম্নলিখিত প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয় :

আদর্শ নারী

পাশ্চাত্যে স্ত্রী, প্রাচ্যে মাতা

উমর এবং শিবর [উমা এবং শিব]-এর কাহিনী

হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ পাউচ প্রাসাদে বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে বলেন যে পূর্ণ নারীত্ব হবে সকল আদর্শের সংমিশ্রন-প্রসূত, এই সংমিশ্রনই সকল অকল্যাণের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায়।

সুবিখ্যাত হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ক্লিণ্টন এ্যাভিনিউস্থ পাউচ প্রাসাদে ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসন কর্তৃক আয়োজিত তিনটি বক্তৃতামালার—"নারীর আর্দশ—হিন্দু মুসলমান ও খ্রীস্টধর্মানুযায়ী" বিষয়ে—প্রথম বক্তৃতা দেবার কালে বিপুল শ্রোতৃমণ্ডলীকে কিছুটা নিরাশ করেছেন।

এ নয় যে, আলোচনাটি চিত্তাকর্ষক ছিল না। তা মোটেও নয়, কিন্তু মনে হচ্ছিল স্বামী বিবেকানন্দ যেন প্রায়শই মূল প্রসঙ্গ হতে দূরে সরে গিয়ে অন্য বিষয়ে প্রবেশ করছিলেন, তদ্দ্বারা শ্রোতাদের মন বিভ্রান্ত ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়ছিল। তথাপি, বক্তৃতাটির মধ্যে এত সব সুন্দর সুন্দর চিন্তা ছিল, এত সব মহান সত্যসমূহের উদঘাটন ছিল, আমাদের থেকে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একটি জাতির প্রথা, প্রতিষ্ঠান ও অবস্থা সম্বন্ধে এমন সব উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল যে, এই প্রাচ্য-দেশীয় ঋষির পাদমূলে দুঘণ্টা সময় যারা অতিবাহিত করেছিল, তার জন্য তাদের কারো কোন আক্ষেপ থাকতে পারে না। এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি ডঃ জেন্‌স কর্তৃক তাঁর পরিচিতি দেবার পর স্বামী বিবেকানন্দ যা বলেন তার অংশবিশেষ হলো ঃ

"কোন জাতির বস্তিতে উৎপন্ন জিনিস ঐ জাতিকে বিচার করার পরিমাপক নয়। পৃথিবীর সকল আপেল গাছের তলা থেকে কেউ পোকায় খাওয়া সব পচা আপেল সংগ্রহ করে তাদের প্রত্যেকটিকে নিয়ে এক একখানা বই লিখতে পারে। তবুও আপেল গাছের সৌন্দর্য এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে তার কিছুই জানা নেই, এমনও সম্ভব। জাতির মহত্তম ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের দিয়েই জাতিকে যথার্থ বিচার করা চলে। যারা পতিত, তারা তো নিজেরাই একটা শ্রেণীবিশেষ। অতএব কোন একটা রীতিকে বিচার করার সময় তার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি আর আদর্শ দিয়েই বিচার করা শুধু সমীচীন নয়, ন্যায্য ও নীতিসঙ্গত।

"পৃথিবীর ইতিহাসে প্রাচীনতম জাতি ভারতীয় আর্যগণের নিকট নারীত্বের আদর্শ অতি প্রধান স্থান গ্রহণ করেছিল। আর্যজাতিতে পুরুষ এবং নারী উভয়েই ধর্মাচার্য হতে পারতেন। বেদের ভাষায় স্ত্রী ছিলেন স্বামীর সহধর্মিনী [রিপোর্টে আছে : "সবাতিমিনি"] অর্থাৎ ধর্মসঙ্গিনী। প্রত্যেক পরিবারে একটি যজ্ঞ-বেদী থাকত। বিবাহের সময় তাতে যে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করা হতো তা মৃত্যু পর্যন্ত জাগিয়ে রাখা হতো। দম্পতির একজন মারা গেলে তার শিখা থেকে চিতাগ্নি জ্বালা হতো। স্বামী ও স্ত্রী একত্রে গৃহের যজ্ঞাগ্নিতে প্রত্যহ দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দিতেন। পত্নীকে ছেড়ে পতির একা যজ্ঞে অধিকার ছিল না, কেন-না পত্নীকে স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী মনে করা হতো। অবিবাহিত ব্যক্তি যাজ্ঞিক হতে পারতেন না। প্রাচীন রোম ও গ্রীসেও এই নিয়ম প্রচলিত ছিল।

"কিন্তু একটি স্বতন্ত্র পৃথক পুরোহিত শ্রেণীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল জাতির ভিতর নারীর ধর্মকৃত্যে সমান অধিকার পেছনে হটে গেছিল। সেমিটিক রক্তসম্ভূত অ্যাসিরিয় জাতির ঘোষণা প্রথমে শোনা গেল : কন্যার কোন স্বাধীন মত থাকবে না, বিবাহের পর তাকে কোন অধিকার দেওয়া হবে না। পারসীকরা এই মত বিশেষভাবে গ্রহণ করল, পরে তাদের মাধ্যমে তা রোম ও গ্রীসে পৌঁছল আর সর্বত্র নারীজাতির উন্নতি ব্যাহত হতে লাগল।

"আর একটা ব্যাপারও এ ঘটনার জন্য দায়ী বিবাহ পদ্ধতির পরিবর্তন। প্রথমে পারিবারিক নিয়ম ছিল জননীব কর্তৃত্ব অর্থাৎ মাতা ছিলেন পরিবারের কেন্দ্র। কন্যা তাঁর স্থান অধিকার করত। এর থেকে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহরূপ আজব প্রথার উদ্ভব হয়। অনেক সময় পাঁচ ও ছয় ভ্রাতা একই স্ত্রীকে বিবাহ করত। এমন কি বেদেও এর আভাস দেখতে পাওয়া যায়। নিঃসন্তান অবস্থায় কোন পুরুষ মারা গেলে তাঁর বিধবা পত্নী সন্তান না হওয়া পর্যন্ত অপর একজন পুরুষের সঙ্গে বাস করতে পারতেন। সন্তানের দাবি কিন্তু এই পুরুষের থাকত না। বিধবার মৃত স্বামীই সন্তানের পিতা বলে বিবেচিত হতেন। পরবর্তী কালে বিধবার পুনর্বিবাহের প্রচলন হয়। বর্তমানকালে অবশ্য তা নিষিদ্ধ।

"কিন্তু এই সকল অস্বাভাবিক অভিব্যক্তির পাশাপাশি ব্যক্তিগত পবিত্রতার একটা প্রগাঢ় ভাব জাতিমানসে দেখা দিতে থাকে। এই সম্পর্কে বিধানগুলি খুবই কঠোর ছিল। প্রত্যেক বালক বা বালিকাকে গুরুগৃহে পাঠানো হতো।

বিশ বা ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত তারা সেখানে বিদ্যাচর্চায় ব্যাপৃত থাকত। চরিত্রে লেশমাত্র অশুচিভাব দেখা গেলে প্রায় নিষ্ঠুরভাবেই তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হতো। জাতির হৃদয়ে এই ব্যক্তিগত শুচিতার ভাব এত গভীর রেখাপাত করেছে যে, তা যেন একটি বাতিক বিশেষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুসলমানগণের চিতোর অবরোধের সময় এর একটা সুস্পষ্ট উদাহরণ দেখা যায়। প্রবল আক্রমণের বিরুদ্ধে পুরুষরা নগরীটি অনেকক্ষণ রক্ষা করে চলেছিল। কিন্তু যখন দেখা গেল পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, তখন নগরীর নারীগণ বাজারে একটি বিরাট অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করলেন। শত্রুপক্ষ নগর দ্বার ভেঙে ভেতরে ঢুকতেই ৭৪,৫০০ কুলললনা একসঙ্গে ঐ কুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মবিসর্জন দিলেন। এই মহৎ দৃষ্টান্তটি ভারতে বর্তমান কাল পর্যন্ত স্মরণীয় হয়ে আসছে। চিঠির খামের ওপর ৭৪,৫০০ সংখ্যাটি লিখে দেওয়ার রীতি আছে। এর তাৎপর্য এই যে, যদি কেউ বে-আইনীভাবে ঐ চিঠিটা পড়ে, তাহলে যে মহাপাপ থেকে বাঁচার জন্য চিতোরের মহাপ্রাণা নারীকুলকে অগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে হয়েছিল, ঐরূপ অপরাধে সে অপরাধী হবে।

"এর (বৈদিক যুগের) পর হলো সন্ন্যাসীদের যুগ, যা আসে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে। বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা দিয়েছিল—গৃহত্যাগী যতিরাই শুধু নির্বাণের অধিকারি। নির্বাণ হলো কতকটা খ্রীস্টানদের স্বর্গরাজ্যের মতো। এই শিক্ষার ফলে সারা ভারত যেন সন্ন্যাসীদের একটি বিরাট মঠে পরিণত হলো। সকল মনোযোগ নিবদ্ধ রইল শুধু একটি মাত্র লক্ষ্যে—একটি মাত্র সংগ্রামে কি করে পবিত্র থাকা যায়। স্ত্রীলোকের ওপর সব দোষ চাপানো হলো। এমন কি চলতি হিতবচনে পর্যন্ত নারী থেকে সতর্কতার কথা ঢুকে গেল। যথা ঃ নরকের দ্বার কি? এই প্রশ্নটি সাজিয়ে উত্তরে বলা হলো ঃ 'নারী'। আর একটি ঃ এই মাটির সঙ্গে আমাদের বেঁধে রাখে কোন শেকল?—'নারী'। অপর একটি ঃ অন্ধ অপেক্ষাও অন্ধ কে?—'যে নারী দ্বারা প্রবঞ্চিত।'

"পাশ্চাত্যের মঠসমূহেও অনুরূপ ধারণা দেখা যায়। সন্ন্যাস-প্রথার পরিবিস্তার সব সময়েই স্ত্রীজাতির অবনতি সূচিত করেছে।

"কিন্তু অবশেষে নারীত্বের সম্বন্ধে আর একটি ধারণা উদ্ভূত হলো। পাশ্চাত্যে এই ধারণা রূপ নিল পত্নীর আদর্শে ভারতে মাতার। এই পরিবর্তন শুধু ধর্মযাজকদের চেষ্টাতেই এসেছিল, এরকম মনে করো না। আমি

জানি জগতে যা মহৎ কিছু ঘটে, ধর্মযাজকরা তার উদ্যোক্তা বলে দাবি করে, কিন্তু এ দাবি যে ন্যায্য নয়, নিজে একজন ধর্মপ্রচারক হয়ে একথা বলতে আমার সঙ্কোচ নেই। জগতের সকল ধর্মগুরুর উদ্দেশ্যে আমি সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি বলতে বাধ্য যে, পাশ্চাত্যে নারী প্রগতি ধর্মের মাধ্যমে আসেনি। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মতো ব্যক্তিরা এবং বিপ্লবী ফরাসী দার্শনিকরাই এর জনয়িতা। ধর্ম সামান্য কিছু করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সবটা নয়। বেশি কথা কি, আজকের দিনেও এশিয়া-মাইনরে খ্রীস্টান বিশপরা উপপত্নী-গোষ্ঠী রাখেন।

"অ্যাংলো স্যাক্সন জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকের প্রতি যে মনোভাব দেখা যায় তাই খ্রীস্টধর্মের আদর্শানুগ। সামাজিক ও মানসিক উন্নতির বিচারে পাশ্চাত্য দেশীয় ভগিনীগণ থেকে মুসলমান নারীর পার্থক্য বিপুল। কিন্তু তা বলে মনে করো না যে, মুসলমান নারী অসুখী, কেননা বাস্তবিকই তাঁর কোন কষ্ট নেই। ভারতে হাজার হাজার বছর ধরে নারী সম্পত্তির মালিকানা ভোগ করে আসছে। এদেশে কোন ব্যক্তি, তাঁর পত্নীকে সম্পত্তির অধিকার নাও দিতে পারেন, কিন্তু ভারতবর্ষে স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি স্ত্রীর প্রাপ্য—ব্যক্তিগত সম্পত্তি তো সম্পূর্ণভাবে, স্থাবর সম্পত্তি জীবিতকাল পর্যন্ত।

"ভারতে পরিবারের কেন্দ্র হলেন মা। তিনিই আমাদের উচ্চতম আদর্শ। আমরা ভগবানকে বিশ্বজননী বলি আর গর্ভধারিণী মাতা হলেন সেই বিশ্বজননীরই প্রতিনিধি। একজন মহিলা ঋষিই প্রথম ভগবানের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছিলেন। বেদের একটি সূক্তে তাঁর অনুভূতি লিপিবদ্ধ হয়েছে। আমাদের ঈশ্বর সগুণ এবং নির্গুণ দুই-ই। নির্গুণ হলো পুরুষ, সগুণ প্রকৃতি। তাই আমরা বলি, 'যে হাত দুটি শিশুকে দোল দেয় তাইতেই ভগবানের প্রথম প্রকাশ।' যে জাতক ঈশ্বর আরাধনার ভেতর দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, সেই হলো আর্য; আর অনার্য সে-ই, যার জন্ম হয়েছে ইন্দ্রিয়পরায়ণতার মাধ্যমে।

"প্রাগ্‌জন্ম প্রভাবসম্বন্ধীয় এই মতবাদ বর্তমানকালে ধীরে ধীরে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়েই বলছে, 'নিজেকে শুচি এবং শুদ্ধ রাখো।' ভারতবর্ষে শুচিতার ধারণা এত গভীর যে আমরা এমন কি বিবাহকে পর্যন্ত ব্যভিচার বলে থাকি, যদি না বিবাহ ধর্মসাধনায় পরিণত হয়। প্রত্যেক সৎ হিন্দুর সঙ্গে আমিও বিশ্বাস করি যে, আমার জন্মদাত্রী মাতার চরিত্র

*নির্মল ও নিষ্কলঙ্ক আর সেইজন্যই আমার মধ্যে আজ যা কিছু প্রশংসনীয় তা তাঁরই নিকট হতে পাওয়া। ভারতীয় জাতির জীবন রহস্য এটাই—এই পবিত্রতা।"**

স্বামীজীর ব্রুকলিনে দেওয়া প্রথম বক্তৃতা ও জানুয়ারি ২০ তারিখে প্রদত্ত দ্বিতীয় বক্তৃতার মধ্যবর্তী সময় শিকাগোতে হেল পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে কাটিয়ে আসেন। তিনি এখন নিউ ইয়র্ক থেকে ইসাবেল ম্যাককিণ্ডলিকে জানুয়ারির ২৪ তারিখে চিঠিতে লিখলেন ঃ

প্রিয় কুমারী বেল,

আশা করি তুমি ভাল আছ,

দরজীকে যেতে বলো—

কারণ সে আমার ফতুয়াটি দেয়নি।

আমার শেষ বক্তৃতাটি পুরুষদের পছন্দ হয়নি, কিন্তু মেয়েদের দারুণ পছন্দ হয়েছে। তোমরা জান যে, এই ব্রুকলিন হলো নারীর অধিকার আন্দোলনের বিরোধিতার কেন্দ্র এবং আমি যখন তাদের বললাম যে, মেয়েরা সর্বপ্রকার অধিকার লাভের যোগ্য, তা অবশ্যই পুরুষদের পছন্দ হয়নি। কিন্তু ওতে কিছু মনে করো না কারণ—মেয়েরা আনন্দে আটখানা হয়েছে।

আমার আবার একটু ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছে। আমি গার্নসিদের বাড়িতে যাচ্ছি অবশ্য শহরের উপকণ্ঠেও আমার একটি ঘর আছে, সেখানে অবশ্য যাব কয়েক ঘণ্টার জন্য একটি শিক্ষাদানের আসরে শিক্ষাদান করতে। মা গির্জা নিশ্চয়ই এতদিনে সুস্থ হয়ে গিয়েছেন এবং আশা করি তোমরা সকলেই এই ঠাণ্ডা হাওয়াকে উপভোগ করছ। শ্রীমতী অ্যাডমসের সঙ্গে যখন দেখা হবে তখন তাঁকে আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধা জানিও।

যেমন এতদিন পাঠিয়েছ সেরকমই আমার চিঠিপত্র গার্নসিদের ওখানে পাঠিও। সকলকে ভালবাসা জানিয়ে

তোমার চিরদিনের স্নেহময় ভ্রাতা[১]

*বিবেকানন্দ***

কিন্তু সব মহিলারই বিবেকানন্দের বক্তৃতা ভাল লাগেনি। পণ্ডিতা রমাবাঈ এতদিন আমেরিকাতে যা প্রচার করে এসেছেন, তার আলোকে এ-বক্তৃতা ব্রুকলিনে রমাবাঈ-চক্রের সদস্যাদের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করল।

* বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১০০-০৩

** ঐ, ৭ম খণ্ড, ১ম সং, পত্রসংখ্যা ১৬০, পৃঃ ৮৬-৭

অবশ্য এ-আলোড়নকারী বক্তৃতাটি দেবার পর পাঁচ সপ্তাহ কাটবার আগে জনসমাজের গোচরে আসেনি। এ-প্রসঙ্গে আমরা পরে আলোচনা করব। ইতোমধ্যে স্বামীজী ব্রুকলিনে সর্বসাধারণের জন্য এবং পুরোপুরি সর্বসাধারণের জন্য নয়—এই দুরকমের ভাষণই দিয়েছেন।

সম্প্রতি আমাদের হাতে এসেছে ইসাবেল ম্যাক্‌কিণ্ডলিকে লেখা লিও ল্যাণ্ডস্‌বার্গের একটি চিঠি, যা স্বামীজীর ১৮৯৫-এর জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহের কার্যকলাপের ওপর প্রভূত আলোকপাত করে। চিঠিটার পাঠ নিম্নোক্তরূপ :

প্রিয় মহাশয়া,

চিঠির সঙ্গে যে প্রচারপত্রটি আছে তাতে আপনার আগ্রহ হতে পারে। স্বামীজী শ্রীমতী আয়ুলের বৈঠকখানায় তাঁর যে ধারাবাহিক ভাষণ দেবার কথা তার প্রথমটি গতকাল সন্ধ্যায় দিয়েছেন। বক্তৃতায় ৬৫ জনের মতো শ্রোতা যোগদান করেছিল, তার মধ্যে বেশির ভাগই মহিলা। স্বামীজী উপনিষদ্ ও যোগদর্শনের একটি রূপরেখা তাদের সামনে উপস্থাপিত করলেন এবং তাঁর কথা সকলেরই খুবই ভাল লেগেছে। তাঁর পরবর্তী ভাষণটি আগামী মঙ্গলবার দেওয়া হবে।

আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, স্বামীজী শিকাগো হতে এখানে আসার পর থেকেই ক্রমাগত সর্দিজ্বরে ভুগছেন। তবে আমি আশা করি আবহাওয়ার পরিবর্তন হলে তিনি পুনর্বার তাঁর স্বাভাবিক সুস্বাস্থ্য ফিরে পাবেন।

আন্তরিক প্রীতি-সহ[১০]
লিও ল্যাণ্ডস্‌বার্গ

এই চিঠির সঙ্গে ছিল নিম্নলিখিত ইস্তাহারটি

ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসন

ভারত সম্বন্ধে একটি ভূমিকাস্বরূপ

ভাষণ ও কথোপকথনে অংশ নেবেন

ভারতের

স্বামী বিবেকানন্দ
ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের উদ্যোগে
শ্রীমতী চার্লস আমুলের ৬৫ লেফার্স প্লেসে
অনুষ্ঠিত হবে
শুক্রবার অপরাহ্ন ৩-৩০ মিনিটে, জানুয়ারি ১৮৯৫-এর ২৫ তারিখে
এটি হবে ভারতের ঋষিগণ কর্তৃক অনুশীলিত
উপনিষদ্ এবং যোগদর্শন শিক্ষার জন্য
শিক্ষাদানের আসর গঠনের প্রারম্ভিক ভাষণ
প্রথম আলোচনার বিষয়

"উপনিষদ্ এবং আত্মতত্ত্ব"

বেদান্তদর্শন এবং হিন্দুদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাগুলি সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ প্রদত্ত ব্যাখ্যাগুলি কেম্ব্রিজ, শিকাগো, সেন্ট লুই এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য স্থানসমূহে সুসংস্কৃতিবান শ্রোতাদের পক্ষে আলোকপ্রদ ও শিক্ষণীয় হয়েছে।

মন নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে যে-সকল পাঠ দেওয়া হবে দাবি করা হচ্ছে যে, সেগুলি বিজ্ঞান-সম্মত মনোবিজ্ঞানের নিয়মানুগ।

স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক কেম্ব্রিজের শিক্ষাদানের আসরগুলিতে যোগদান করেছেন এমন এক ব্যক্তি লিখেছেন : "তিনি অনেক ছাত্রকে (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত) যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দার্শনিক সমস্যাসমূহের সমাধান খুঁজে পাচ্ছিল না, তাদের সেই সমাধান খুঁজে পেতে সহায়তা করেছিলেন।"

যেহেতু এ-সকল শিক্ষাদানের আসরে কেবলমাত্র সীমিত সংখ্যক ব্যক্তিকে প্রবেশানুমতি দেওয়া হবে, সেজন্য স্থির হয়েছিল প্রতিটি ভাষণের সময় প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকবার সময় ৫০ সেন্ট প্রবেশমূল্য হিসাবে দিতে হবে। যাঁরা অবশ্য নিজেরা ইচ্ছে করবেন বেশি দিতে, তা দিতে পারবেন স্বামীজীর শিক্ষাপ্রচারমূলক কর্মের সাহায্যার্থে।

(উপরে কথিত "কেম্ব্রিজ শিক্ষার আসরসমূহ"—এর উল্লেখ অবশ্যই ডিসেম্বর মাসে শ্রীমতী ওলি বুলের গৃহে স্বামীজীর প্রাতঃকালীন ভাষণসমূহের সম্বন্ধে বলা।)

ল্যাণ্ডস্‌বার্গের ২৬ জানুয়ারি তারিখে লিখিত চিঠি হতে দেখা যায় যে, স্বামীজী ব্রুকলিনে একটি বৈঠকখানার আসরে জানুয়ারি ২৯ তারিখে বক্তৃতা দেন, ২৫ জানুয়ারি তারিখেও দেন। খুব সম্ভব ব্রুকলিনে এরকম আরও

বৈঠকখানার আসরে বক্তৃতা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের কাছে সে-সম্বন্ধে লিখিত কিছু নেই।

ব্রুকলিনে সাধারণের জন্য তৃতীয় বক্তৃতাটি দেওয়া হয় পাউচ মঞ্চে, বিষয় ছিল—"বৌদ্ধধর্ম ঃ ভারতে যেরূপে প্রতিভাত"। তিনি এটি দেন ববিবার ফেব্রুয়ারি ৩ তারিখে এবং এটি সম্বন্ধে ব্রুকলিন স্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিয়ন পত্রিকায় সোমবার ফেব্রুয়ারির ৪ তারিখে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি নিম্নোক্তরূপ ঃ

খাঁটি বৌদ্ধধর্ম

স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক প্রাঞ্জল ভাষায় সমর্থন

হিন্দুধর্ম-প্রবক্তা এদিন সর্বোত্তম ভাষণটি দিয়েছেন

বৌদ্ধধর্ম, প্রাচীন সমাজ এবং ধর্মের সংস্কৃত রূপ—এটি বর্ণবিভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেছে, এটি প্রথম জীব-জন্তুর প্রতি দয়া প্রদর্শনের কথা প্রচার করেছে—বুদ্ধের জীবনের চিত্রসমূহ—পাউচ প্রাসাদে এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের দ্বারা আয়োজিত সভা।

ইতঃপূর্বে এ-শহরে তাঁর অবস্থানকালে স্বামী বিবেকানন্দ এর চেয়ে অধিক বাগ্মিতা আর কখনও দেখান নি, এত গভীরভাবে সকলের চিত্তকে স্পর্শ করেন নি, যা গতকাল সন্ধ্যায় করলেন যখন তিনি এক বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে "বৌদ্ধধর্মকে ভারত যেভাবে বুঝেছে"—সে-বিষয়ে তাঁর ভাষণটি দেন। নিজ পূর্বপুরুষদের ধর্ম সম্বন্ধে প্রেরণায় উদ্দীপিত এই খ্যাতনামা হিন্দু তাঁর শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন তাঁর চিত্তাকর্ষক ভাষণে অনন্য ঐকান্তিকতা প্রদর্শন করে।

বুদ্ধ আর কখনও এই তরুণ যাজকের চেয়ে উৎসাহী শিষ্য লাভ করেন নি, যিনি নিজ শক্তি সম্বন্ধে সচেতনতা থেকে অকুতোভয়ে ঘোষণা করেন "খাঁটি বৌদ্ধধর্মের যে নীতিতত্ত্ব তা সারা বিশ্বে মহত্তম!" "বুদ্ধ-সুমহান লোকগুরু" সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ মর্মস্পর্শী হয়েছিল, তাঁর অপূর্ব সরলতার জন্য এবং অপূর্ব বাগ্মিতার জন্যও তা ছিল মনোগ্রাহী। গত রাত্রিতে তাঁর উচ্চারিত বাক্যসমূহ কোন একটি অদ্ভুত দর্শনতত্ত্বের পেশাদার ব্যাখ্যাতার মতো ছিল না, ছিল একজন দিব্যভাবে উদ্বুদ্ধ প্রবক্তার মতো, যিনি এমন একটি ধর্মের কথা বলছেন, যা তাঁর সত্তারই অঙ্গস্বরূপ।

স্বামী বিবেকানন্দকে বক্তাদের সামনে উপস্থাপিত করেন আয়োজক সংস্থা এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি ডঃ জেন্‌স, তারপর স্বামী

বলেন, "বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে হিন্দুদের একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি আছে। যীশুখ্রীস্ট যেমন প্রচলিত ইহুদি ধর্মের প্রতিপক্ষতা করেছিলেন, বুদ্ধও সেরকম ভারতবর্ষের তৎকালীন ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। খ্রীস্টকে তাঁর দেশবাসীরা অস্বীকার করেছিল, বুদ্ধ কিন্তু স্বদেশে ঈশ্বরাবতার বলে গৃহীত হয়েছিলেন। যে-সব মন্দিরের দ্বারদেশে বুদ্ধ পৌরোহিত্য ক্রিয়াকলাপেব নিন্দা করেছিলেন, সে-সকল মন্দিরেই আজ তাঁর পুজো হচ্ছে। কিন্তু তাই বলে তাঁর নামে যে মতবাদ প্রচলিত হয়েছিল, তাতে হিন্দুদের আস্থা নেই। বুদ্ধ যা শিক্ষা দিয়েছিলেন, হিন্দুরা তাকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু বৌদ্ধেরা যা প্রচার করে তা গ্রহণ করতে তারা রাজী নয়। কারণ বুদ্ধের বাণী নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে বহু বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হয়েছিল।

"বৌদ্ধধর্মকে পুরোপুরি বুঝতে হলে, তা যা থেকে উদ্ভূত আমাদেরকে সেই মূল ধর্মটির দিকে অবশ্যই ফিরে তাকাতে হবে। বৈদিক গ্রন্থগুলির দুটি ভাগ ঃ প্রথম কর্মকাণ্ড (রিপোর্টে আছে ঃ 'Cura Makunda' অর্থাৎ 'Karma Kanda), যাতে যাগযজ্ঞের কথা আছে, আর দ্বিতীয় হলো বেদান্ত, যা যাগযজ্ঞের নিন্দা করে দান ও প্রেম শিক্ষা দেয়, মৃত্যুকে বড় করে দেখায় না। বেদ-বিশ্বাসী যে সম্প্রদায়ের বেদের যে অংশে প্রীতি, সেই অংশই তারা গ্রহণ করেছে। অবৈদিকদের মধ্যে চার্বাকপন্থী বা ভারতীয় জড়বাদীরা বিশ্বাস করত যে, সব কিছু হলো জড়; স্বর্গ, নরক, আত্মা বা ঈশ্বর বলতে কিছু নেই। দ্বিতীয় একটি সম্প্রদায় জৈনগণও নাস্তিক, কিন্তু অত্যন্ত নীতিবাদী। তারা ঈশ্বরের ধারণাকে অস্বীকার করত, কিন্তু আত্মা মানত। আত্মা অধিকতর পূর্ণতার অভিব্যক্তির জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করে চলেছে। এই দুই সম্প্রদায়কে অবৈদিক বলা হতো। তৃতীয় একটি সম্প্রদায় বৈদিক হলেও ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করত না। তারা বলত বিশ্বজগতের সবকিছুর জনক হলো পরমাণু বা প্রকৃতি।

"অতএব দেখা যাচ্ছে, বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতের চিন্তা জগৎ ছিল বিভক্ত। তাঁর ধর্মের নির্ভুল ধারণা করার জন্য আর একটি বিষয়েরও উল্লেখ প্রয়োজনীয় তা হলো সেই সময়কার জাতি প্রথা। বেদ শিক্ষা দেয় যে, যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ; যিনি সমাজের সকলকে রক্ষা করেন, তিনি খোক্ত (ক্ষত্রিয়); আর যিনি ব্যবসা বাণিজ্য করে অন্নসংস্থান করেন, তিনি বিশ (বৈশ্য)। এই সামাজিক বৈচিত্র্যগুলি পরে অত্যন্ত ধরা বাঁধা কঠিন জাতিভেদের ছাঁচে পরিণতি অর্থাৎ অবনতি লাভ

করে এবং ক্রমে দৃঢ় গঠিত সুসম্বদ্ধ একটি পুরোহিত-প্রধান শাসন সমগ্র জাতির কাঁধে ভর করে দাঁড়িয়ে থাকে। বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন ঠিক এই সময়েই। অতএব তাঁর ধর্মকে ধর্মবিষয়ক ও সামাজিক সংস্কারের একটি চরম প্রয়াস বলা যেতে পারে।

"সেই সময়ে দেশের আকাশ বাতাস বাদ-বিতণ্ডায় ভরে আছে। বিশ হাজার অন্ধ পুরোহিত দু-কোটি পরস্পর বিবদমান অন্ধ মানুষকে পথ দেখাবার চেষ্টা করছে। এইরকম সঙ্কটকালে বুদ্ধের ন্যায় একজন জ্ঞানী পুরুষের প্রচার কার্য অপেক্ষা জাতির পক্ষে বেশি প্রয়োজনীয় আর কি থাকতে পারে? তিনি সকলকে শোনালেন—'কলহ বন্ধ কর, পুঁথিপত্র তুলে রাখো, নিজের পূর্ণতাকে বিকাশ করে তোল।' জাতি বিভাগের মূল তথ্যটির বুদ্ধ কখনও বিরোধিতা করেন নি। কেন-না ওটি ছিল সমাজ জীবনের একটি স্বাভাবিক প্রবণতারই অভিব্যক্তি এবং সবসময়েই মূল্যবান। কিন্তু যা বংশগতভাবে বিশেষ সুবিধার দাবি করে, বুদ্ধ সেই অবনত জাতি-প্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। ব্রাহ্মণগণকে তিনি বললেন, 'প্রকৃত ব্রাহ্মণেরা লোভ, ক্রোধ আর পাপকে জয় করে থাকেন। তোমরা কি তা করতে পেরেছ? যদি না পেরে থাকো তো আর ভণ্ডামি করো না। জাতি হলো চরিত্রের একটা অবস্থা, কঠোর গণ্ডীবদ্ধ শ্রেণী নয়। যে কেউ ভগবানকে জানে ও ভালবাসে, সে-ই যথার্থ ব্রাহ্মণ।' যাগযজ্ঞ সম্বন্ধে বুদ্ধ বললেন, 'যাগ-যজ্ঞ আমাদেরকে পবিত্র করে। এমন কথা বেদে কোথায় আছে? হয়ত দেবতাদেরকে সুখী করতে পারে। কিন্তু আমাদের কোন উন্নতি বিধান করে না। অতএব এইসব নিষ্ফল আড়ম্বরে ক্ষান্তি দিয়ে ভগবানকে ভালবাসো আর পূর্ণতা লাভ করার চেষ্টা কর।"

"পরবর্তীকালে বুদ্ধের এই সকল শিক্ষা লোকে বিস্মৃত হয়। ভারতের বাইরে এমন অনেক দেশে তা প্রচারিত হয় যেখানকার অধিবাসিদের এই মহান সত্যসমূহ গ্রহণের যোগ্যতা ছিল না। এই সকল জাতির বহুতর কুসংস্কারও কদাচারের সঙ্গে মিশে বুদ্ধবাণী ভারতে ফিরে আসে এবং কিম্ভূতকিমাকার মতসমূহের জন্ম দিতে থাকে। এইভাবে গজিয়ে ওঠে শূন্যবাদী সম্প্রদায়, যার মতে বিশ্বসংসার, ভগবান ও আত্মার কোন মূলভিত্তি নেই। সবকিছুই নিয়ত পরিবর্তনশীল। ক্ষণকাল সম্ভোগ ব্যতীত অন্য কিছুতেই তারা বিশ্বাস করত না। এর ফলে এই মত পরে অতি জঘন্য কদাচারসমূহের সৃষ্টি করে। যাই হোক ওগুলো তো বুদ্ধের শিক্ষা নয়। বরং তাঁর শিক্ষার

ভয়াবহ অধোগতি মাত্র। হিন্দুজাতি যে এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এই কুশিক্ষাকে দূর করে দিয়েছিল। এজন্য তাঁরা অভিনন্দনীয়।

"বুদ্ধের প্রত্যেকটি বাণী বেদান্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বেদান্ত গ্রন্থে এবং অরণ্যের মঠসমূহে লুকিয়ে থাকা সত্যগুলিকে যারা সকলের গোচরীভূত করতে চেয়েছিল, বুদ্ধ সেই সকল সন্ন্যাসীর একজন। অবশ্য আমি বিশ্বাস করি না যে, জগৎ এখনও ঐ সকল সত্যের জন্য প্রস্তুত। লোকে এখনো ধর্মের নিম্নতর অভিব্যক্তিগুলিকেই চায় যেখানে ব্যক্তি ঈশ্বরের উপদেশ আছে। এই কারণেই মৌলিক বৌদ্ধধর্ম জনগণের চিত্তকে বেশিদিন ধরে রাখতে পারে নি। তিব্বত ও তাতার দেশগুলি থেকে আমদানী বিকৃত আচার সমূহের প্রচলন যখন হলো তখনই জনগণ দলে দলে বৌদ্ধধর্মে ভিড়েছিল। মৌলিক বৌদ্ধধর্ম আদৌ শূন্যবাদ নয়। তা জাতিভেদ ও পৌরোহিত্যের বিরুদ্ধে একটি সংগ্রাম প্রচেষ্টা মাত্র। বৌদ্ধধর্মই পৃথিবীতে প্রথম মূক ইতর প্রাণিদের প্রতি সহানুভূতি ঘোষণা করে এবং মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টিকারী আভিজাত্য প্রথাকে ভেঙে দেয়।"

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ভাষণ শেষ করলেন বুদ্ধের জীবনের কয়েকটি চিত্রের উপস্থাপনা করে। তাঁর ভাষায় বুদ্ধ ছিলেন এমন একজন মহাপুরুষ যাঁর মনে একটিমাত্র চিন্তাও ওঠেনি বা তাঁর দ্বারা একটিমাত্র কার্যও সাধিত হয়নি, যা মানুষের হিতসাধন ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে চালিত। তাঁর মেধা ও হৃদয় উভয়ই ছিল বিরাট—তিনি সমুদয় মানবজাতি এবং প্রাণিকুলকে প্রেমে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং কি উচ্চতম দেবদূত, কি নিম্নতম কীটটির জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন।" বুদ্ধ কিভাবে জনৈক রাজার যজ্ঞে বলি প্রদানের উদ্দেশ্যে নীত একটি মেষপালকে বাঁচাবার জন্য নিজেকে যূপকাষ্ঠে নিক্ষেপ করে বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছিলেন, বক্তা প্রথমে তা বর্ণনা করেন। তারপর তিনি চিত্রিত করেন দুঃখসন্তপ্ত মানুষের ক্রন্দনে ব্যথিত এই মহাপুরুষ কিভাবে স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে ত্যাগ করেন, পরে তাঁর শিক্ষা ভারতে সর্বজনীনভাবে যখন গৃহীত হলো, তখন কিভাবে তিনি জনৈক নীচকুলোদ্ভব পারিয়ার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে তৎপ্রদত্ত শূকর মাংস আহার করেন এবং তার ফলে অবশেষে মৃত্যুবরণ করেন।*

* বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১০৩-০৭

ফেব্রুয়ারি ৪ তারিখে নিউ ইয়র্ক ওয়ারল্ড পত্রিকা বৌদ্ধধর্মের ওপর এই বক্তৃতাটির সংক্ষেপিত বর্ণনা প্রকাশ করে নিম্নলিখিতভাবে ঃ

বৌদ্ধধর্মের একটি ভাষ্য

৩৪৫ নং ক্লিন্টন অ্যাভিনিউস্থ পাউচ প্রাসাদের নৃত্যানুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে গত সন্ধ্যায় ৬০০ লোক এসেছিল স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ শুনতে, যাঁর বেদের দর্শন-তত্ত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা পূর্বে ব্রুকলিনের শ্রোতৃমণ্ডলীকে আনন্দ দান করেছিল।

যেহেতু ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনে বক্তৃতাটি দেওয়া হয় সেই হেতু শ্রোতাদের অধিকাংশ ছিল সেই সংস্থাটির সদস্য।

॥ ৩ ॥

পাউচ প্রাসাদে প্রদত্ত ভাষণে স্বামীজী জানুয়ারি ২০ তারিখে বলেন—"ভারতে নারীগণ সহস্র সহস্র বৎসর ধরে সম্পত্তির অধিকার ভোগ করে আসছে। এখানে একজন পুরুষ একজন স্ত্রীকে অধিকারচ্যুত করতে পারে, ভারতে একজন মৃত স্বামীর সমস্ত সম্পত্তি তার স্ত্রীর ওপর বর্তায়, তার অস্থাবর সম্পত্তি পূর্ণভাবে আর স্থাবর সম্পত্তি জীবৎকালের জন্য।" একে নির্দোষ উক্তি মনে হয়, কিন্তু এই বিবৃতি ব্রুকলিনস্থ রমাবাঈ গোষ্ঠীর মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল।

পণ্ডিতা রমাবাঈ সরস্বতী হিন্দু বালবিধবাদের শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একজন খ্যাতনামা প্রবক্তা ছিলেন এবং তাঁর জীবনের কিছু কাহিনী তাঁর পাশ্চাত্যের বন্ধুবর্গের নিকট রূপকথার মতো রোমাঞ্চকর ছিল। ১৮৫৮ সালে তাঁর জন্ম হয়, তিনি মহারাষ্ট্রের একজন পুরোহিত কন্যা, যিনি তাঁকে সম্পূর্ণ লোকচক্ষুর অন্তরালে সংস্কৃত শিক্ষায় সুশিক্ষিত করেছিলেন। তাঁর পিতামাতার মৃত্যুর পর, যখন তাঁর বয়স ষোল, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সারা ভারত ভ্রমণ করে বিভিন্ন ব্রাহ্মণ পরিবারে রাঁধুনীর কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখেন এবং এভাবে তিনি হিন্দুজাতির বিভিন্ন প্রথার সঙ্গে পরিচিত হন। কলকাতায় যখন এলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলী তাঁকে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলে গ্রহণ করলেন এবং তাঁকে "সরস্বতী" উপাধি দিলেন যার অর্থ হলো বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এর পরের দু-বছর তিনি হিন্দুনারীগণের স্বার্থে বক্তৃতা দিয়ে এবং লেখনী ব্যবহার করে দেশের নানাস্থানে

পরিভ্রমণ করেন। যখন তাঁর বয়স বাইশ, তখন তিনি বিবাহ করলেন। অবশ্য দু-বছর পরেই তাঁর বৈধব্য ঘটল, তখন তাঁর কোলে আটমাসের একটি শিশুকন্যা সন্তান। তিনি তখন অবিলম্বে স্বামীর বাড়িটি বিক্রয় করে সেই অর্থ নিয়ে ইংলণ্ডের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন, সেখানে গিয়ে তিনি খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন এবং চেলটেনহ্যাম কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকপদে বৃত হলেন। তারপর যখনই এই সিদ্ধান্তে এলেন যে তিনি তাঁর দেশের নারীগণের সেবা সবচেয়ে ভালভাবে করতে পারবেন, যখন বালবিধবাদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারবেন, তখনই তিনি আমেরিকায় এসে উপস্থিত হলেন আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করবার জন্য। যে আড়াই বছর এই দেশে রইলেন সে সময়টুকু তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন ২৫০০০ ডলার পরিমাণ এককালীন অর্থ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সংগ্রহ করতে এবং বিদ্যালয়টির স্থায়িত্বের জন্য দশ বছর ধরে বছরে ৫০০০ ডলার দানের ব্যবস্থা করতে। এই উদ্দেশ্যে তিনি বহু নরনারীর সমর্থন সংগ্রহ করলেন এবং 'রমাবাঈ গোষ্ঠী' নামে আমেরিকার এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ৫৫টি কেন্দ্র স্থাপন করলেন। এ গোষ্ঠীগুলি কিছু অজ্ঞাত প্রতিষ্ঠান ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে আমেরিকাস্থ রমাবাঈ অ্যাসোসিয়েসনের প্রথম পরিচালক সমিতিতে ছিলেন ঐ-অ্যাসোসিয়েসনের সদস্য লীম্যান অ্যাবট এবং এডওয়ার্ড এভারেট হেল, দুজনেই অত্যন্ত প্রভাবশালী ধর্মযাজক এবং লেখক।

কিন্তু যদিও রমাবাঈয়ের উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ছিল কিন্তু তিনি অর্থ সংগ্রহের জন্য যে-উপায় অবলম্বন করেছিলেন তাতে আমেরিকাবাসীদের মনে ভারত সম্বন্ধে যে খারাপ ধারণা গভীরভাবে বদ্ধমূল হয়েছিল, তা দূরীভূত করার জন্য কিছুই করা হয়নি। অর্থসংগ্রহ করবার জন্য তিনি তাঁর মহান মাতৃভূমি সম্পর্কে যে-সকল কাহিনী বলতেন তা খ্রীস্টধর্ম প্রচারকগণকৃত অতিরঞ্জিত ভয়াবহ কাহিনীগুলির সমপর্যায়ভুক্ত। তাঁর বক্তৃতাসমূহ, যা আমেরিকার পত্রিকাসমূহে প্রকাশ পেত, তাতে এই ধরনের বিবৃতির প্রাচুর্য থাকত—"বিধবাদের পুনর্বিবাহ করতে দেওয়া হয় না এবং তাদের ভাগ্য হলো দাসত্ব করবার এবং অনাহারে মৃত্যুর। ভারতে ২০,০০০,০০০ বালবিধবা আছে, এদের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ চার বছরের কমবয়সী, তাদের দুর্গতি ও দুর্ভাগ্য অবর্ণনীয়। ভারতের ২৫০,০০০ [?] নারীর মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ হলো বিধবা, সমাজের ভারবাহী পশুতুল্য তাদের জীবন। কিন্তু বালবিধবাগণের

ওপর বিশেষ করে সমাজের নিন্দা এবং ঘৃণা বর্ষিত হয়, যেন তারা সর্বাপেক্ষা জঘন্য অপরাধী হিসাবে স্বর্গের বিচারে—চিহ্নিত হয়েছে।" এইরকম আরো কত কি।

১৮৮৭ সালে লিখিত—"হাই কাস্ট হিন্দু উওম্যান" (উচ্চবর্ণের হিন্দু-নারী) গ্রন্থে রমাবাঈ আবেগপূর্ণ কল্পনাকে একেবারে পূর্ণরূপে বল্‌গা ছেড়ে দিয়েছেন। এই বইটিকে 'মাদার ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের পূর্বগামী বলে ধরা যেতে পারে। তাঁর বক্তৃতাগুলি সেজন্য আমেরিকার নারীদের হৃদয় ও অর্থভাণ্ডার নিংড়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে হিসেব করে দেওয়া।+ রমাবাঈ তাঁর গ্রন্থ সমাপ্ত করে লিখছেন—"মাতৃ ও পিতৃগণ, আরামদায়ক অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে উপবিষ্ট আপনাদের প্রিয় কন্যাদের সঙ্গে তুলনা করুন ভারতে এদেরই সমবয়সী লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র বালিকাদের, যাদের ইতোমধ্যেই একটি অপবিত্র অমানবিক প্রথার বেদীতলে বলি দেওয়া হয়েছে এবং তারপর নিজেদের প্রশ্ন করুন আপনারা এইসকল শিশু বিধবাদের তাদের অত্যাচারকারীদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য কিছু করবেন কিনা। ভারতীয় গৃহের অন্দরমহলের প্রস্তর নির্মিত প্রাচীর ভেদ করে নারীগণের ক্রন্দনধ্বনি ধ্বনিত হচ্ছে, সহস্র সহস্র বালবিধবা প্রতিবৎসর একবিন্দু আশার আলোক না দেখতে পেয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে এবং আরো সহস্র সহস্র নারী পাপ এবং লজ্জার ভারে নিষ্পেষিত হচ্ছে এবং এমন কেউ নেই যে তাদের ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার পথ দেখায়।" এই গ্রন্থখানির বিক্রয় বাড়াবার জন্য রমাবাঈয়ের বন্ধুরা প্রকাশিত করেছিল 'এ ক্রিস্টমাস থট ফর ইণ্ডিয়া' (ভারতের জন্য খ্রীস্টমাসের চিন্তাভাবনা) যাতে বলা হয়েছিল—"যুক্তরাজ্যের যে-সকল নারী রমাবাঈকে জানে এবং তাকে বিশ্বাস করে এই ঋতুতে পরস্পরের মধ্যে উপহার এবং আনন্দ বিনিময়ের মধ্য দিয়ে একযোগে চেষ্টা করবে তার অসাধারণ 'দি হাই কাস্ট হিন্দু উওম্যান' (উচ্চ বর্ণের হিন্দু নারীগণ) গ্রন্থখানি অধিক সংখ্যায় বিক্রয় করতে।"

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকার মহিলাগণ ছিলেন অস্থির-চিত্ত। দেশের অলঙ্কারস্বরূপ হয়ে থাকতে থাকতে তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং নারী হিসাবে নিজেদের অধিকার দাবি করতে আরম্ভ করেছিলেন—নারী কথাটির উপর জোর দেবার জন্য আদ্যাক্ষরটি বড় করে লিখছিলেন—তথাপি এখনও তাঁরা ব্যবসায় ও রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারেন নি, সেজন্য তাঁরা অনুসন্ধান করে ফিরতেন নতুন কোন মহৎ কর্মসাধনের এমন সুযোগ

যা একমাত্র নারীগণই অনুধাবন করতে এবং নিজেরাই সম্পন্ন করতে পারবে। রমাবাঈয়ের বক্তৃতাদি ও গ্রন্থে বর্ণিত অত্যাচারিতা ভারতীয় বালবিধবাগণ ঠিক তারা যেরকমটি চাইছিল, ঠিক সেইরকম নাটকীয়, সেইরকম করুণারসমিশ্রিত এক পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগ প্রদান করল। এমতাবস্থায় স্বামীজীর প্রদত্ত এই তথ্য যে—ভারতীয় স্ত্রী ও বিধবাগণ উনিশ শতকের আমেরিকার মহিলাগণ অপেক্ষা আইনের দ্বারা অধিক সুরক্ষিত—রমাবাঈ গোষ্ঠীর প্রতি শুভেচ্ছা প্রণোদিত মহিলাগণকে যেন প্রচণ্ড আঘাত করল। এ যে শুধু অর্থসংগ্রহের জন্য তাঁদের প্রচারের শক্তি হ্রাস করল তা নয়, অনেকখানি নিজেদের অপেক্ষা কম স্বাধীন, কম সম্মানিত নারীকুলকে উদ্ধার করে যে ব্যক্তিগত পরিতৃপ্তিলাভ, তারও যেন হ্রাস ঘটাল। রবিবার ফেব্রুয়ারি ২৪ তারিখ রমাবাঈ গোষ্ঠির সভানেত্রী 'ডেলী ঈগ্‌ল' পত্রিকায় একটি প্রতিবাদ জানালেন, যার বয়ান হলো নিম্নোক্তরূপ ঃ

রমাবাঈ গোষ্ঠী জাগরিত

স্বামী বিবেকানন্দের বিবৃতি

বিধবাদের প্রতি আচরণ সম্বন্ধে অস্বীকৃতিমূলক হিন্দু-সন্ন্যাসীর এই মর্মে ঘোষণা যে উচ্চবর্ণের বালবিধবাগণ আইনের দ্বারা সুরক্ষিত—রমাবাঈ গোষ্ঠীর সভানেত্রীর প্রমাণ দাখিল যে তাদের অনাহারে রাখা হয় এবং প্রহার করা হয়।

এই শহরে যারা ভারতে খ্রীস্টধর্মীয় কাজকর্মের সমর্থক তাদের ও ব্রুকলিনে আগত হিন্দু-সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে ভারতের বালবিধবাদের দুঃখ দুর্গতি বিষয়ে তীব্র মতভেদ উপস্থিত হয়েছে। একপক্ষকাল পূর্বে পাউচ প্রাসাদে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ এ-কথা অস্বীকার করেন যে, ভারতীয় উচ্চবংশীয় হিন্দু বিধবাগণ দুঃখ দুর্গতি ভোগ করে। তিনি এই কথা বলেন যে ঐ বিধবাগণ আইনের দ্বারা সুরক্ষিত। এই বিবৃতিটিকে এই শহরের অনেক ব্যক্তি প্রশ্ন-সাপেক্ষ বলে মনে করেন, বিশেষ করে ব্রুকলিনের রমাবাঈ গোষ্ঠীর সদস্যাগণ। পণ্ডিতা রমাবাঈ সরস্বতী, যাঁর নামে নামাঙ্কিত এই গোষ্ঠী এই শহরে এবং আরো ষাটটি স্থানে বর্তমান, এদেশে আট বৎসর পূর্বে আগমন করেন এবং অন্যান্য বড় বড় শহরে ও ব্রুকলিনেও আসেন। তিনি খ্রীস্টধর্মে ধর্মান্তরিত এবং এখন ভারতে বালিকাদের জন্য একটি অসাম্প্রদায়িক বিদ্যালয় পরিচালনা করছেন। এ-দেশের প্রত্যেকটি রমাবাঈ গোষ্ঠী এই বিদ্যালয়টিব ব্যয় নির্বাহের জন্য বছরে একশ থেকে দেড়শ ডলার দান করে থাকে। যে কারণে রমাবাঈ

গোষ্ঠী স্থাপিত হয় এবং বিদ্যালয়টির ব্যয়বহন প্রকল্পের পশ্চাতে শক্তিস্বরূপ সেটি হলো এখানে রমাবাঈ প্রদত্ত চিত্ত-আলোড়নকারী বর্ণনাসমূহ, যদিও এও ঘোষিত হয়েছে যে তিনি এ বিষয়ে যা উপস্থাপিত করেছেন তার সপক্ষে তথ্য প্রমাণাদি আছে।

ব্রুকলিন রমাবাঈ গোষ্ঠীর সভানেত্রী হলেন ১৩৬ নং হেনরী স্ট্রীট নিবাসী শ্রীমতী জেম্‌স ম্যাক্‌কিন। 'ঈগ্‌ল' পত্রিকার প্রতিবেদককে গতকাল শ্রীমতী ম্যাক্‌কিন বলেন ঃ

"ভারতের বালবিধবাদের দুর্গতি সম্বন্ধে পুরোপুরি তথ্যপ্রমাণাদি দেওয়া যেতে পারে। আমরা এখানে রমাবাঈয়ের ভাষণসমূহ হতে জেনেছি যে ৩, ৪, ৫, ৬ বৎসবের মেয়েদের ৫০।৬০ বৎসরের পুরুষের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। যদি এগার বছর বয়সের পূর্বে তাদের বিবাহ না হয় তাহলে সেটা পরিবারের পক্ষে সম্মান হানিকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। যদি পুত্রের জন্ম দেবার পূর্বেই স্বামীর মৃত্যু হয়, তাহলে নারীগণ বাধ্য হয় অত্যন্ত হেয় জীবন যাপন করতে। তাদের সমস্ত সুন্দর পোশাক ও গহনাপত্র কেড়ে নেওয়া হয়, মোটা খারাপ দেখতে পোশাক পরতে দেওয়া হয় এবং গৃহদাসীতে পরিণত হতে হয় তাদের। আমি একজন আমেরিকাবাসী মহিলার নিকট হতে এ-বিষয়ে একটি দৃষ্টান্তের কথা শুনেছি, তিনি কিছুকাল ভারতে ছিলেন এবং বাস্তব ঘটনার সঙ্গে পরিচিত। দৃষ্টান্তটি হলো ঃ একটি তরুণী হিন্দু নারী একজন বৃদ্ধের সঙ্গে পরিণীতা হয়, একবছর পরে বৃদ্ধের মৃত্যু হয়, তখন দেখা গেল মেয়েটি অসুস্থ হয়ে পড়েছে এবং মোটা বিশ্রী একটি শাড়ী পরে একটি ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে প্রার্থনা করছে মৃত্যু যেন তাকে তার যন্ত্রণা হতে মুক্তি দেয়। সেই মেয়েটি এই আমেরিকাবাসী মহিলাকে বলেছিল—আমি তার নিজ মুখে শুনেছি—'প্রার্থনা কর যেন সব বালবিধবারই মৃত্যু হয়। এতে তারা যন্ত্রণা হতে মুক্তি পাবে।' অন্যান্য সূত্র থেকেও যা সংবাদ পেয়েছি—তাতে আমি পুরোপুরি বিশ্বাস কবি যে, রমাবাঈ বর্ণিত কাহিনীসমূহের প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারও সত্য। বিগত ছ বছর ব্রুকলিনে রমাবাঈ গোষ্ঠীর একজন সদস্যা হিসাবে আমি অনেকবার জনসাধারণের নিকট ভাবতীয় আর্ত অসহায় বিধবাদের জন্য অর্থের আবেদন করেছি। সম্প্রতি আমাকে অনেক সম্মানিত ব্যক্তি জানিয়েছেন যে যাঁর সবকিছু জানার কথা এমন একজন ব্যক্তিকে তাঁরা সম্প্রতি বলতে শুনেছেন যে, ভারতের যাদের সাহায্যের জন্য আমরা

অর্থের আবেদন করেছি এরকম কোন শ্রেণীই সেখানে নেই। ভারত একটি বিশাল দেশ, আমরা অনেকে ৫০০ মাইল এক ইঞ্চি ম্যাপের মধ্যে আনা রেখাচিত্র দেখে যা অনুমান করে থাকি তার চেয়েও অনেক বড়। এর কোন অংশে আমি নিজে কখনো যাইনি এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সেখানকার আচার আচরণ বা প্রথা সম্বন্ধে বলার আমার কোন অধিকার নেই। কিন্তু আমার মনে হয় যে, কোন কোন দিক থেকে এ-বিষয়ের সঙ্গে এই ব্যক্তিগত যোগ না থাকার ফলেই শান্তভাবে সমস্ত প্রমাণ বিচার করবার অধিক যোগ্যতা এনে দেয়, ঠিক যেমন আদালতে সেই বিচারকই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হন যিনি তাঁর ব্যক্তিগত সহানুভূতি আগ্রহ বা রুচির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারেন। যিনি ভারতে জন্মেছেন তাঁর নিকট যা সুখের অবস্থা, তা একজন যিনি পাশ্চাত্যে জন্মেছেন বা লালিত হয়েছেন তাঁর নিকট অবমাননার এবং দুঃখের মনে হতে পারে। এ-বিষয়ে কোন উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারি হবার বাসনা না রেখে, কিংবা যাঁরা নিজেদের মতাদর্শের দিক থেকে বিবৃতি দিয়েছেন সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না তুলে—সুখ এবং অসুখ কথাগুলি অনেকখানি আপেক্ষিক—আমি সেই যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করতে পারি, যার দরুন আমরা এখনো বিশ্বাস করি যে, ভারতের বালবিধবার অনেক দুঃখ এবং দুর্গতি আছে যা আমেরিকার সুখী ব্যক্তিগণ তাদের ক্ষমতানুযায়ী দূর করতে দায়বদ্ধ।

"আমার সাক্ষ্য প্রমাণের বিশ্বাসযোগ্যতা কোথায়—এ-প্রশ্ন করা যেতে পারে। স্বাভাবিক যে, প্রথম যে-সাক্ষীর কথা আমি ধরব তিনি হলেন পণ্ডিতা রমাবাঈ। তাঁর সততা সম্বন্ধে বিবেচ্য তাঁকে যাঁরা অনেক বৎসর ধরে জানেন, তাঁদের তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা—এ-দেশে এবং ইংলণ্ডে তাঁর সম্মান ও সততা সম্বন্ধে তাঁর সহমর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত সাক্ষ্যপ্রমাণগুলিও দেখুন। [এখানে রমাবাঈ এবং তাঁর কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিবরণ ম্যাক্সমূলার, জনৈক কুমারী হ্যামলিন, একটি অপরিচিত মাদ্রাজের পত্রিকার এবং লণ্ডন অ্যাথেনিয়াম-এর-উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রীমতী ম্যাক্‌কিন এরপর বলেছেন :]

"আমার মনে হয় রমাবাঈ-এর মতো একজন মহিলা যখন কোন একটি শ্রেণীর দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন, তখন এরকম একটি শ্রেণীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা অযৌক্তিক নয়।

"বোম্বাই-এর বিশপ নিশ্চিতরূপে জেনেছেন যে, এরকম একটি শ্রেণী

আছে, কারণ তিনি রমাবাঈকে ৫৮ পাউণ্ড পাঠিয়েছেন তাঁর কাজের সহায়তার জন্য। ব্রিটিশ ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের অবৈতনিক সম্পাদিকা, কুমারী ম্যানিং-এর বিশ্বাস যে, এরূপ একটি শ্রেণী আছে, কারণ তিনি রমাবাঈকে এদের ত্রাণের জন্য ১৫৮ পাউণ্ড দিয়েছেন এবং পরিশেষে বলি, ম্যাসাচুসেটসের অন্তর্গত বোস্টনের শ্রীমতী জে. ডব্লু. অ্যাডাম্‌স, যাঁর এ-শহরে বর্তমানে বহুল পরিচিতি বর্তমান, আর যাঁকে অনেকে ভালবাসে ও সম্মান করে—তাঁকে ভারতে পাঠানো হয়েছে রমাবাঈয়ের কাজকর্ম দেখার জন্য, তিনি পুণা থেকে নিম্নলিখিত চিত্ত আলোড়নকারী কথাগুলি লিখেছেন ঃ

"'আমাদের বলা হয়েছে যে, বালবিধবার জীবন যেভাবে উপস্থাপিত করা হয়, ঠিক ততখানি কঠিন এবং নিষ্করুণ নয়, বলা হয়েছে যে, অধিকাংশেরই সুখী গৃহ-পরিবার আছে আর সেখানে তারা সানন্দে সাহসভরে সব কঠিন নিষেধের বিধি-নিয়ম ও তাদের ওপর আরোপিত ধর্ম মেনে নেয়। তাহলে কেন তাদের মস্তক মুণ্ডিত এবং কুৎসিত-দর্শন সাদা পোশাক লজ্জার চিহ্নস্বরূপ তাদের ধারণ করতে হয়? তাহলে কেন তাদের শরীর অনাহার এবং আঘাতের দরুন বিকৃত? তাহলে কেন তাদের মুখচ্ছবি বিষণ্ন এবং নিরানন্দ? তাহলে কেন বালবিধবাদের এত আত্মহত্যার ঘটনা এবং লজ্জাকর ঘৃণিত জীবন যাপনের দৃষ্টান্ত দেখা যায়? যদি কেউ এ-সকল কাহিনী বিশ্বাস করে, হোক না তা হিন্দুদের দেওয়া বিবৃতি অনুসারেই, তাহলে সে যেন সারদা সদনে আসে এবং সেখানকার অধিবাসিনীদের করুণ কাহিনীগুলি শোনে। মাথায় গরম লোহা দিয়ে করা সাদা দাগ, কোমল মুখের ওপরে ছোট ছোট তীক্ষ্ণ আঙুলের নখের দ্বারা আঁচড়ানোর দাগগুলি—আমি যা শুনেছি ও দেখেছি এবং আরো অনেক কিছু আছে দেখবার আর শোনবার, যা দেখে ও শুনে সে সত্য জানতে পারবে এবং অনুভব করবে যে এইসকল দুর্ভাগ্য-পীড়িত শিশুদের জন্য কিছু করতে পারাটা সৌভাগ্যের কথা।'

"আমি মনে করি আমি যা বলেছি তা যে-কোন সংস্কারমুক্ত মানুষের মনে এই বিশ্বাসই এনে দেবে যে, আমি যদি এ-ব্যাপারে ভুল করেও থাকি, আমি না জেনে কথা বলিনি এবং এ-ভুল করার ব্যাপারে সঙ্গে পেয়েছি অন্যান্য সজ্জন ব্যক্তিদের। আমাকে যে-কেউ নিজের ঠিকানা জানাবে, আমি সানন্দে ভারতে এ বিষয়ে যা কাজকর্ম হয়েছে তার বিবরণী তার কাছে পাঠাব।"

সংবাদপত্রগুলির নিকট এ-ধরনের মতদ্বৈধতার ব্যাপার সবসময়ই খুব স্বাগত। ডেলী স্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিয়ন সত্বর শ্রীমতী ম্যাক্‌কিনের নিন্দাসূচক সমালোচনার সুযোগটি গ্রহণ করল এবং ফেব্রুয়ারির ২৫ তারিখে নিম্নলিখিত নিবন্ধটি প্রকাশ করল ঃ

ভারতের বিধবাগণ ঃ

স্বামী বিবেকানন্দের বিবৃতির সত্যতা অস্বীকার করল রমাবাঈ গোষ্ঠী

দু-সপ্তাহ পূর্বে [জানুয়ারির ২০ তারিখে] পাউচ মঞ্চে ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনে যে বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন হিন্দু-সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ— যিনি চেষ্টা করেছেন আমেরিকাবাসীদের ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় বিষয়সমূহের ব্যাপারে আলোকিত করতে, তিনি এ-কথা অস্বীকার করেন যে, তাঁর দেশে বিধবাদের সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করা হয়। খ্রীস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিতা পণ্ডিতা রমাবাঈ, যিনি ৮ বৎসর পূর্বে এদেশে এসেছিলেন এবং বর্তমানে তাঁর নিজ দেশে নারীদের জন্য একটি অসাম্প্রদায়িক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন—তিনি এদেশে বলেছিলেন যে, যদি কোন স্বামী কোন পুত্রসন্তান না রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহলে তাঁর বিধবাটির গহনা এবং উত্তম বস্ত্রাদি কেড়ে নেওয়া হয় এবং তাকে গৃহদাসীতে পরিণত করা হয়। এবম্বিধ বিবৃতির সপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ অন্যান্য সূত্র থেকেও পাওয়া গিয়েছে। এ-ধরনের বক্তব্যকে অস্বীকার করে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে, ভারতে উচ্চ বর্ণের হিন্দু নারীগণ বিশেষভাবে আইনের দ্বারা সুরক্ষিত। তাঁর এই অস্বীকৃতি এ-শহরে রমাবাঈ গোষ্ঠীর মধ্যে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে—এ-গোষ্ঠীটি এদেশে আরো অনেকগুলি গোষ্ঠীর মতো রমাবাঈয়ের কাজকর্মে সহায়তা করবার জন্য প্রতিষ্ঠিত।

এই অস্বীকৃতি বেশ বিতর্কের সৃষ্টি করবে বলে মনে হয়, যেহেতু স্বামী বিবেকানন্দ এ-শহরে প্রচুর বন্ধুলাভ করেছেন এবং নিঃসন্দেহে তাঁর অনুরাগিবৃন্দও যথেষ্ট সম্মানিত ব্যক্তি। এদিকে অনেক ব্যক্তি যারা এ-ধরনের প্রশ্নে আগ্রহান্বিত তাদের প্রবণতা হবে উভয় পক্ষের বক্তব্য পক্ষপাতিত্বশূন্য হয়ে শোনা। গত রাতে পাউচ মঞ্চে সভার প্রারম্ভে ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের অধ্যক্ষ ডঃ লুইস জি. জেন্‌স বিষয়টি উত্থাপন করেন। তিনি মনে করেন রমাবাঈ গোষ্ঠীর প্রচেষ্টা স্বামী বিবেকানন্দের

স্বদেশের জন্য তাঁর নিজের যে-শিক্ষাবিষয়ক পরিকল্পনা আছে তাকে অসম্মান করবার জন্য এবং তিনি বলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দকে আমন্ত্রণ জানাবার পূর্বে তাঁরা সযত্নে এই সন্ন্যাসীর মর্যাদা এবং চরিত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছেন।

সত্যসত্যই স্বামীজীকে সমর্থনের জন্য দাঁড়াতে ডঃ জেন্‌স একটুও বিলম্ব করেননি। ঈগ্‌ল পত্রিকায় শ্রীমতী মাক্‌কিন-এর বক্তব্য পাঠ করা মাত্র তিনি পত্রিকাটিতে একটি চিঠি লিখে পাঠান। যদিও চিঠিটাতে ভ্রমবশত মার্চ ৩ তারিখ লেখা হয়েছে এবং মার্চের ৬ তারিখে এটি প্রকাশিত হয়, প্রকৃতপক্ষে চিঠিটা লেখা ও পাঠানো হয় ফেব্রুয়ারির ২৪ তারিখে।

স্বামী বিবেকানন্দ

ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি কর্তৃক সমর্থিত

ব্রুকলিন ঈগ্‌ল পত্রিকার সম্পাদক

সমীপেষু ঃ

রমাবাঈ গোষ্ঠীর উচ্চ প্রশংসার যোগ্য মহিলাগণ একটি দুর্ভাগ্যজনক ভ্রমাত্মক ভীতির বশবর্তী হয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ পাউচ প্রাসাদ বা অন্যত্র কোথাও এ-কথা বলেননি যে, উচ্চবর্ণের হিন্দু বিধবাগণ কোন দুঃখকষ্ট ভোগ করেন না। আমি যতদূর জানি এও নয় যে, তিনি জনসমক্ষে বা লোকচক্ষুর অন্তরালে হিন্দু নারীগণের শিক্ষা দেওয়া এবং উন্নত করার জন্য কোন প্রয়াসের অনুমোদন করেননা। ব্রুকলিনে জনসমক্ষে দেওয়া একমাত্র "নারীর আদর্শ—হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রীস্ট ধর্মানুসারে" বিষয়ে বক্তৃতায় তিনি হিন্দু বিধবাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। এ-বক্তৃতাটি তিনি দুসপ্তাহ আগে নয়, রবিবার জানুয়ারির ২০ তারিখে অর্থাৎ পাঁচ সপ্তাহ আগে দিয়েছেন। এ-বক্তৃতায় তিনি পণ্ডিতা রমাবাঈয়ের বা তাঁর কাজকর্ম প্রসঙ্গের কোন উল্লেখই করেননি এবং আপনাদের আজকের কাগজে যা উদ্ধৃত করা হয়েছে—এরকম কোন কথাও বলেননি। হিন্দু বিধবাগণ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তিটি ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং তাঁর মূল ভাষণের প্রসঙ্গক্রমে করা এবং তিনি কেবলমাত্র হিন্দু আইনের দ্বারা উচ্চবর্ণের হিন্দু বিধবাদের সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষিত—এই কথাটিই বলেছেন। সেখানে এ-কথা জোর দিয়ে বলেছেন যে, সেগুলি এদেশে নারীদের যা দেওয়া হয়েছে তা থেকে উন্নততর, তাদের আইনে স্বামীর এবং পৈত্রিক সম্পত্তিতে

অধিকার এবং নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেওয়া হয়। [ডঃ জেন্‌স এখানে ভুল করেছেন—স্বামীজী কিন্তু 'পৈত্রিক সম্পত্তি'তে অধিকারের কথা বলেন নি।] যদি এ-কথাগুলি অসত্য বলে প্রমাণিত না করা যায়, তাহলে ব্রুকলিনে করা স্বামী বিবেকানন্দের এ-সম্পর্কে একমাত্র উক্তিটি বিতর্কের ঊর্ধ্বে থেকে যায়। "নারীর আদর্শ" শীর্ষক বক্তৃতাটির ভূমিকায় ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা হয় যে, বক্তার উদ্দেশ্য হলো কেবল আদর্শের দিকটি তুলে ধরা। বিভিন্ন সভ্যতার সামাজিক পবিত্রতা বিষয়ে এবং নারীর মর্যাদা বিষয়ে প্রধান প্রধান দিকগুলি মাত্র তুলে ধরা। তিনি স্বীকার করেন যে, এগুলির থেকে নিম্নতর দিকও আছে, ভারতেও আছে এবং খ্রীস্টানদের দেশেও আছে, কিন্তু এ-দিকগুলি নিয়ে বলবার প্রস্তাব তিনি করেননি। ভারতকে কেবলমাত্র তার অধঃপতনের দিকগুলি দিয়ে বিচার করা অন্যায় হবে যতটা অন্যায় হবে যদি আমেরিকাকে পার্কহার্স্ট এবং লেক্সো অনুসন্ধান সমিতিদ্বয়ের দ্বারা উদ্ঘাটিত তথ্যগুলির দ্বারা বিচার করা হয়। বাল্যবিবাহ বা হিন্দুবিধবার সামাজিক দুর্বলতা বা অযোগ্যতা সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেননি। একজন স্বদেশপ্রেমিক হিন্দু হিসাবে নারীত্বের সর্বোত্তম এবং আদর্শ দিকগুলি তাঁর দেশের ধর্ম এবং সভ্যতার প্রভাবে যেভাবে বিকশিত হয়েছে সে সম্বন্ধে বলেন। সে আদর্শটি হলো মাতৃত্বের আদর্শ। নারীপ্রকৃতির সর্বোত্তম বিকাশের নিদর্শনরূপে মাতৃত্বের বিকাশ—এর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আর কোন ধারণা ইতঃপূর্বে শুনিনি। অন্য কোন অত্যাবশ্যকীয় নীতিকথা, যা স্ত্রী-পুরুষের উভয়ের পক্ষে প্রযোজ্য, এই গির্জা-বহুল শহরে কোন ধর্মীয় মঞ্চ হতে উচ্চারিত হতে কখনো শোনা যায়নি। আমার এই পত্রের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র 'রমাবাঈ গোষ্ঠী জাগ্রত হয়েছে' শীর্ষক যে সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে তাতে যে-সকল ভ্রম রয়েছে তা অস্বীকার করা কিংবা সংশোধন করা নয়, রমাবাঈ গোষ্ঠীর ভদ্রমহিলাবৃন্দ যে-ধরনের মানবহিতৈষী কাজকর্ম করতে আগ্রহী সে-সম্বন্ধে আমাদের অতিথির প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি কি সে বিষয়ে আলোকপাত করা। ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের ভারতীয় অবৈতনিক পত্রদাতাদের মধ্যে এক ভদ্রলোক আছেন, যিনি উচ্চবর্ণের হিন্দু বিধবাদের শিক্ষা এবং উন্নয়নমূলক যে কাজ করছেন তার সূচনা রমাবাঈ গোষ্ঠীর অনেক আগে হয়। এই ভদ্রলোক হলেন বরানগরের শশীপদ ব্যানার্জী। বরানগর কলকাতার এক শহরতলী। ইনি নিজে একজন হিন্দু, যিনি বর্তমান কুসংস্কারসমূহকে অগ্রাহ্য করে প্রায় ত্রিশ বছর ধরে এই সংস্কারকার্যে

ব্রতী হয়ে আছেন, কাজগুলি তিনি তাঁর স্ত্রীর সহায়তায় অক্লান্ত শ্রম ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর স্বধর্মাবলম্বী সর্বশ্রেষ্ঠ নাগরিকদের মধ্যে অনেকের শ্রদ্ধা ও সমর্থন তিনি আদায় করে নিয়েছেন। তিনি এরূপ কিছু খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদের সমর্থন পেয়েছেন যাঁরা এ-কথা মানেন যে, ন্যাজারেথের বাইরেও কিছু সৎকার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বন্ধু এবং তাঁর কাজের ওপর আস্থা রাখেন। আমি তাঁর স্ব-মুখ থেকে এ-বিষয়ে সুস্পষ্ট স্বীকৃতি শুনেছি। বাবু শশীপদ ব্যানার্জীর কর্ম নীরবে সম্পন্ন হয়েছে, তা নিয়ে কোন ঢাক ঢোল পেটানো হয়নি, কিন্তু সেগুলি সুফলপ্রদ হয়েছে। রমাবাঈয়ের উদ্দেশ্যকে সমালোচনা করা স্বামী বিবেকানন্দের লক্ষ্য নয়। কিন্তু যে-পদ্ধতি অবলম্বন করে সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়, সেটাই তাঁর সমালোচনার বিষয় এবং এরূপ উপায় অবলম্বন করে কোন মহৎ ফল লাভ করা যে অসম্ভব—সেটাই তাঁর বিশ্বাস। রমাবাঈ খ্রীস্টধর্মে ধর্মান্তরিত এ-সত্যটিই এমন কি উদার-হৃদয় উচ্চবর্ণের হিন্দুগণের পর্যন্ত মনে তাঁর কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিতৃষ্ণার উদ্রেক করে বলেই তাঁরা তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসেন না—এ-সকল কথা রমাবাঈ গোষ্ঠী কর্তৃক প্রকাশিত কার্যবিবরণীতে যথাযথভাবে উল্লিখিতও হয় না। উচ্চ ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভূত যারা, যাদের আত্মসম্মান জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ঘৃণাযোগ্য বলে বিবেচনা করা চলে না, তা তাদের দূরদেশে অন্য ধর্মের মানুষদের নিকট থেকে অর্থ চাইতে বা তাদের অনুগ্রহভাজন হতে দেবে না। এরূপ করা যে তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার বিরোধী, এ-ব্যাপারটিতে তাদের আমরা সমর্থন করি বা না করি—এটা হচ্ছে প্রশ্নাতীত সত্য। যিনি মানুষের বন্ধু, মানুষকে সহায়তা করতে অগ্রসর তিনি কখনো যা সত্য তার বিরুদ্ধে হাত-পা ছোঁড়েন না। রমাবাঈয়ের কাজকর্মের বিবরণী থেকেও দেখা যায় যে বিদ্যালয়টি সম্পূর্ণরূপে অ-খ্রীস্টীয় এবং ধর্মান্তরকরণের কোন প্রচেষ্টাই বরদাস্ত করা হবে না এবম্বিধ আশ্বাস না দিলে সামান্যতম সাফল্য অর্জন সম্ভব হতো না। এ-নিয়ম লঙ্ঘিত হবার কিছু আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় তা কিছুদিন হলো কিছু সংখ্যক বিদ্যার্থিনীদের বিদ্যালয় পরিত্যাগের এবং পরামর্শদাতা সমিতি হতে সব কজন উদার-হৃদয় এবং অতি উচ্চ সামাজিক প্রতিষ্ঠার অধিকারি হিন্দুগণের পদত্যাগের কারণ হয়েছে। এ দেশে অবস্থান করার কালে স্বামী বিবেকানন্দের আচরণ যে কর্তব্য সম্পর্কে উচ্চ ধারণানুযায়ীই হয়েছে, এ জানার সুযোগ আমার হয়েছে।

যদিও তাঁর হৃদয়ে তাঁর নিজ ধর্মের আচার্যদের অর্থনীতি, সমাজ-তত্ত্ব এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার সুমহৎ জিনিসগুলি সম্বন্ধে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা সম্পর্কে একটি সুমহান সঙ্কল্প আছে, কিন্তু তিনি সে উদ্দেশ্যে কোন প্রকার অর্থসংগ্রহের কোন প্রচেষ্টাই করেননি। শিক্ষাদাতা হিসাবে তিনি এক কপর্দকও গ্রহণ করবেন না, এমন কি তাঁর বৃহত্তর কর্মের জন্যও শান্তভাবে বিচার করে কাজটির গুরুত্ব সম্বন্ধে বৌদ্ধিক বিশ্বাস জন্মাবার পর স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে যারা কিছু দান করবেন তাছাড়া আর কিছুই নেবেন না। ব্রুকলিনে এমন কোন শিক্ষাদানের আসরে তিনি শিক্ষাদান করতে সম্মত হননি, যেখানে তার জন্য শিক্ষার্থীদের কোন অর্থ দিতে হয়, এমন কি ঘরভাড়া এবং বিজ্ঞাপনের খরচ তোলবার জন্যও অর্থসংগ্রহের ব্যাপারটি তিনি সমর্থন করেননি। তাঁর জন্য সাধারণ সভায় সেইটুকু অর্থই গ্রহণ করেন যেটুকু তাঁর নিজের বাসস্থান, আহার, পোশাক এবং ভ্রমণের জন্য প্রতি সপ্তাহে প্রয়োজন হয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে একটি ঘটনা জানি যেখানে তিনি স্বেচ্ছা-প্রদত্ত একটি ৫০০ ডলারের চেক ফেরত দেন। তিনি এটা ফেরত দেন তাঁর প্রয়োজন নেই বলে এবং এজন্যও যে, তাঁর মনে হয়েছিল দাতা অবাঞ্ছিত উৎসাহের জোয়ারে ভেসে গিয়ে অর্থ দিয়েছেন।[১১] যাঁরা স্বামী বিবেকানন্দকে ভাল করে জানেন তাঁরা তাঁর চরিত্র-মাহাত্ম্য, পবিত্রতা এবং উন্নত দৈনন্দিন জীবন-যাপন সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবেন। আমি শিকাগোতে শ্রম স্বীকার করে অনুসন্ধান করেছি, সেখানে তাঁর অনেক অনুরাগী বন্ধু আছেন, কেম্ব্রিজে গিয়েছি, সেখানে তাঁর বক্তৃতা ও শিক্ষাদানের আসরে যাঁরা যোগদান করেছেন তার মধ্যে আছেন উচ্চতম সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষেরা, আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমূহ। তাঁদের মধ্যে এবং অন্যত্রেও অনুসন্ধান করে দেখেছি, একটাই উত্তর পেয়েছি। কলকাতায় টাউন হলে সেপ্টেম্বরের ৫ তারিখে তার দেশবাসীদের এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়, সে সভায় তাঁর চরিত্র এবং কার্যকলাপ সম্বন্ধে অকুণ্ঠ প্রশংসা করা হয়। এই সভার বিবরণ পরের দিন ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তার সঙ্গে প্রকাশিত হয় তাঁর জীবনকথা এবং অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে এমন একজনের প্রতিবেদন যিনি তাঁকে সারাজীবন ধরে জানেন। সেপ্টেম্বরের ২ তারিখে নিউ ইয়র্ক সান পত্রিকায় মাদ্রাজে অনুরূপ একটি সভানুষ্ঠানের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। আমরা অধ্যাপক রিস ডেভিডসের নিকট হতেও এ আশ্বাস পেয়েছি যে, সে সভায় যে-সকল সজ্জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন

তাঁরা সমাজের শীর্ষস্থানীয়। সুতরাং স্বামীজীর কথাগুলি নিন্দার উর্ধ্বে এবং এ-দেশে বা তাঁর নিজের দেশের মানুষের উন্নয়নের এবং উৎকর্ষসাধনের যে-কোন আন্দোলনের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন আছে। ভারতেরও যে আমাদের শিক্ষা দেবার মতো সম্পদ আছে, আমাদের কর্তব্যের দায় যে পারস্পরিক—এ তিনি প্রশ্নাতীতরূপে বিশ্বাস করেন এবং প্রচার করেন। যদি আমরা আমাদের জাতিগত সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে পারি, তাহলে আমি বিশ্বাস করি যে, তাঁর সঙ্গে সহমত হতে পারি। আমার কেবল আর একটি কথাই যোগ করবার আছে যে, আমি এই চিঠি লেখার ব্যাপারে বিবেকানন্দের সঙ্গে পরামর্শ করিনি এবং তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে আমি যা বলেছি তা তাঁর মতো বিনয়ী এবং সম্মানিত ধর্মীয় আচার্যকে নিজের সম্বন্ধে উচ্চারণ করতে বাধা দেবে।

লুইস জি. জেন্‌স,
সভাপতি, ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসন
ব্রুকলিন, মার্চ ৩ [ফেব্রুয়ারি ২৪] ১৮৯৫

ডঃ জেন্‌স যে-কথা বলেছেন এ-কথা সত্য যে, স্বামীজী তাঁর বক্তৃতায় উচ্চবর্ণের হিন্দুবিধবাদের অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলেননি। সত্যসত্যই বিধবাদের জীবন প্রসঙ্গটি তিনি আদৌ উল্লেখই করেননি। তাহলে ঠিক কোন্ জিনিসটি শ্রীমতী ম্যাক্‌কিনকে আবেগের সঙ্গে সজোরে একথা ঘোষণা করতে প্রবৃত্ত করল যে-হিন্দু-বিধবাগণ নির্যাতন ভোগ করে'? আমি বিশ্বাস করি যে, এ প্রশ্নের আংশিক উত্তর দেওয়া হয়েছে, ইতঃপূর্বে এ-বিষয়ে যা বলা হয়েছে তার মধ্যে। উত্তরটি হলো যে, স্বামীজীর ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন সম্বন্ধে উক্তিটির মধ্যে এ তাৎপর্য নিহিত আছে যে, ভারতে বিধবাগণ শ্রেণী হিসাবে নির্যাতনের শিকার হন না। এ প্ররোচনা ব্যতিরেকে রমাবাঈ গোষ্ঠীর উষ্মার আর একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় অপর একটি ভাষ্যের মধ্যে—সেটি হলো যে, ভারতে বালবিধবাদের সম্বন্ধে স্বামীজীর মতামত তাদের অজ্ঞাত ছিল না। পাঠকগণের স্মরণ থাকতে পারে যে, আমেরিকায় স্বামীজীর প্রথম জনসমক্ষে দেওয়া ভাষণটি প্রদত্ত হয়েছিল বোস্টনে রমাবাঈ গোষ্ঠীতে ১৮৯৩-এর আগস্ট মাসে (প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, সে সময় স্বামীজী সোজাসুজি ভারতে হিন্দু বিধবাদের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে কথা বলেছেন এবং রমাবাঈয়ের অনুরাগিগণ তাতে ভয়ানক নাড়া খান। এ-কথা বিশ্বাস করা অযৌক্তিক হবে না যে, তারপর

থেকেই আমেরিকার ৫৫টি রমাবাঈ গোষ্ঠীই স্বামীজীর ওপর বিরূপ হয় এবং এই বিরূপ মনোভাব স্বামীজীর খ্যাতি ও প্রভাব বৃদ্ধির অনুপাতে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছিল। তাছাড়া, এটা খুবই সম্ভব যে, রমাবাঈ গোষ্ঠীগুলি স্বামীজীর প্রতি মনোভাবে খ্রীস্টীয় প্রচারকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। সত্যিই ১৮৯৫-এর জুলাই মাসের ১ তারিখে আলাসিঙ্গাকে লিখিত একটি চিঠিতে স্বামীজী এই মর্মেই মত প্রকাশ করেছেন।[১২*] সুতরাং ব্রুকলিন গোষ্ঠীটি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়েনি যা একজন বাইরের লোকের মনে হতে পারে, বরঞ্চ এটা একজন পুরান এবং ভীতি-উদ্রেককারী প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শেষ প্রচেষ্টাস্বরূপ ছিল।

নীরবতাই হয়ত রমাবাঈ গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক হতো, কারণ স্বামীজী তাঁর উত্তর দেবার ব্যাপারে ছিলেন আপসহীন। ব্রুকলিনে তাঁর চতুর্থ বক্তৃতার শেষে, শ্রীমতী ম্যাক্‌কিনের সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হবার পরের দিন, তাঁকে সরাসরি হিন্দু বিধবাদের প্রসঙ্গে প্রশ্ন কবা হয় এবং স্বামীজী কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কথায় সুস্পষ্টভাবে রমাবাঈ বর্ণিত কাহিনীগুলি সত্য নয় বলে অভিহিত করেন—এ-ধরনের অভিমত প্রকাশ হবে এটা রমাবাঈ গোষ্ঠী অনুমান করেছিল। এটি তাদের পক্ষকে চুরমার করে দেবার মতো। সোমবার ফেব্রুয়ারির ২৫ তারিখে দেওয়া "জগতের প্রতি ভারতের অবদান" শীর্ষক ভাষণটির ওপর একটি প্রতিবেদন ব্রুকলিন স্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিয়ন পত্রিকা ফেব্রুয়ারির ২৭ তারিখে প্রকাশ করে। প্রতিবেদনটি নিম্নোক্তরূপ ঃ

"ভারতের অবদানসমূহ"

স্বামী বিবেকানন্দ প্রদত্ত শেষ বক্তৃতার বিবরণ
ধর্ম, বিজ্ঞান ও চারুকলা—এ সকলেরই উৎকর্ষ
সাধন করেছে প্রাচ্য ভূখণ্ড, তিনি বলেন
যে, খ্রীস্টধর্ম হলো বৌদ্ধধর্ম হতে প্রসূত—
হিন্দু সন্ন্যাসী কর্তৃক কিছু কিছু অভিযোগ অস্বীকার।

হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ক্লিন্টন স্ট্রীট এবং পিয়েরোপন্ট স্ট্রীটের সংযোগস্থলে অবস্থিত লং আইল্যাণ্ড হিস্টরিক্যাল সোসাইটি ভবনে মোটের ওপর বেশ বড় শ্রোতৃমণ্ডলীর সমাবেশে গত সোমবার রাতে ব্রুকলিন এথিক্যাল সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় একটি ভাষণ দেন। তাঁর বিষয় ছিল—"বিশ্বে ভারতের অবদান"।

* বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১ম সং, পত্রসংখ্যা ১৯১, পৃঃ ১৩২

তিনি তাঁর স্বদেশের বিস্ময়কর সৌন্দর্যের কথা বলেন—"যে দেশ নীতি, শিল্পকলা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আদিম বিকাশভূমি, যে দেশের পুত্রদের চরিত্রবত্তা ও কন্যাদের ধর্মনিষ্ঠার কথা বহু বৈদেশিক পর্যটক কীর্তন করে গেছেন।" অতঃপর তিনি বিশ্বজগতকে ভারত কি কি দিয়েছে, তা দ্রুতগতিতে বিস্তারিতভাবে প্রদর্শন করেন।

তিনি বলেন, "ধর্মের ক্ষেত্রে, খ্রীস্টধর্মের ওপর ভারত প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। যীশুখ্রীস্টের উপদেশাবলীর মূল উৎসের অনুসন্ধান করলে দেখানো যায়, তা বুদ্ধের বাণীর ভেতরেই রয়েছে।"

ইউরোপীয় ও আমেরিকান গবেষকদের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে বক্তা বুদ্ধ এবং খ্রীস্টের মধ্যে বহু সাদৃশ্য প্রদর্শন করেন। "যীশুর জন্ম, গৃহত্যাগান্তে নির্জন বাস, অন্তরঙ্গ শিষ্য সংখ্যা এবং তাঁর নৈতিক শিক্ষা তাঁর আবির্ভাবের বহু শত বৎসর পূর্বেকার বুদ্ধের জীবনের ঘটনার মতোই।" বক্তা জিজ্ঞাসা করেন, "এটা কি শুধু একটি আকস্মিক ব্যাপার অথবা বুদ্ধের ধর্ম খ্রীস্ট ধর্মের একটি পূর্বতন আভাস? পাশ্চাত্যের অধিকাংশ মনীষী দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিতেই সন্তুষ্ট, কিন্তু এমনও কোন কোন পণ্ডিত আছেন, যাঁরা নির্ভীকভাবে বলেন খ্রীস্টধর্ম সাক্ষাৎ বৌদ্ধধর্ম থেকে প্রসূত, যেমন খ্রীস্টধর্মের প্রথম বিরুদ্ধবাদী শাখা মনিকাই বাদকে (Moneccian heresy) এখন সর্বসম্মতভাবে বৌদ্ধধর্মের একটি সম্প্রদায়ের শিক্ষা বলে মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু খ্রীস্ট ধর্ম যে বৌদ্ধ ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত এ বিষয়ে আরও অনেক প্রমাণ রয়েছে। ভারত সম্রাট অশোকের সম্প্রতি আবিষ্কৃত শিলালিপিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। অশোক খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর লোক। তিনি গ্রীক রাজাদের সঙ্গে সন্ধিপত্র সম্পাদন করেছিলেন। পরবর্তীকালে যে-সব অঞ্চলে খ্রীস্টধর্ম প্রসার লাভ করে সম্রাট অশোকের প্রেরিত প্রচারকগণ সেই সকল স্থানে বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা বিস্তার করেছিলেন। এর থেকে বুঝতে পারা যায় খ্রীস্টধর্মে কি করে ঈশ্বরের ত্রিত্ববাদ, অবতারবাদ ও ভারতীয় নীতিতত্ত্ব এল আর কেনই বা আমাদের দেশের মন্দিরের পূজার্চনার সঙ্গে তোমাদের ক্যাথলিক গির্জার 'মাস' আবৃত্তি এবং আশীর্বাদ প্রভৃতি ধর্মকৃত্যের এত সাদৃশ্য।' খ্রীস্টধর্মের বহু আগে বৌদ্ধধর্মে এই সকল জিনিস প্রচলিত ছিল। এখন এই তথ্যগুলির ওপর নিজেদের বিচার-বিবেচনা তোমরা প্রয়োগ করে দেখ। আমরা হিন্দুরা তোমাদের ধর্ম প্রাচীনতর তা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত আছি, যদি যথেষ্ট প্রমাণ তোমরা উপস্থিত করতে পারো। আমরা

তো জানি যে, তোমাদের ধর্ম যখন কল্পনাতেও উদ্ভূত হয় নি, তার অন্তত তিনশত বছর আগে আমাদের ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত।

"বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এটা প্রযোজ্য। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের আর একটি দান বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন চিকিৎসকগণ। সার উইলিয়াম হান্টারের মতে বিবিধ রাসায়নিক পদার্থের আবিষ্কার এবং বিকল কর্ণ ও নাসিকার পুনর্গঠনের উপায় নির্ণয়ের দ্বারা ভারতবর্ষ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে। অঙ্কশাস্ত্রে ভারতের কৃতিত্ব আরও বেশি। বীজগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা এ বর্তমান বিজ্ঞানের বিজয় গৌরব স্বরূপ মিশ্র গণিত এদের সবগুলিই ভারতবর্ষে উদ্ভাবিত হয়; বর্তমান সভ্যতার প্রধান ভিত্তি প্রস্তর স্বরূপ সংখ্যা দশকও ভারত মনীষার সৃষ্টি। দশটি সংখ্যাবাচক দশমিক (decimal) শব্দ বাস্তবিক সংস্কৃত ভাষার শব্দ।

"দর্শনের ক্ষেত্রে আমরা এখনো পর্যন্ত অপর যে কোন জাতির চেয়ে অনেক উপরে রয়েছি। প্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক সোপেনহাওয়ারও এটা স্বীকার কবেছেন। সঙ্গীতে ভারত জগৎকে দিয়েছে প্রধান সাতটি স্বর এবং সুরের তিনটি গ্রামসহ স্বরলিপি প্রণালী। খ্রীস্টপূর্ব ৩৫০ অব্দেও আমরা এইরকম প্রণালীবদ্ধ সঙ্গীত উপভোগ করেছি। ইউরোপে তা প্রথম আসে মাত্র একাদশ শতাব্দীতে। ভাষা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটা এখন সর্বসম্মত যে, আমাদের সংস্কৃত ভাষা যাবতীয় ইউরোপীয় ভাষার ভিত্তি। এই ভাষাগুলি বিকৃত উচ্চারণ বিশিষ্ট সংস্কৃত ছাড়া আর কিছু নয়।

"সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের মহাকাব্য, কাব্য ও নাটক অপর যে-কোন ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনার সমতুল্য। জার্মানির শ্রেষ্ঠ কবি আমাদের শকুন্তলা নাটক সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে বলেছেন, 'ওতে স্বর্গ ও পৃথিবী সম্মিলিত।' 'ঈসপ্‌স ফেব্‌ল্‌স' নামক প্রসিদ্ধ গল্পমালা ভারতেরই দান, কেননা ঈসপ একটি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে তাঁর বইয়ের উপাদান নিয়েছিলেন। 'অ্যারাবিয়ান নাইট্‌স' নামক বিখ্যাত কথা-সাহিত্য এমন কি 'সিণ্ডারেলা ও বরবটির ডাঁটা' গল্পের উৎপত্তিও ভারতেই। শিল্পকলার ক্ষেত্রে ভারতই প্রথম তুলা ও লাল রঙ উৎপাদন করে এবং সর্বপ্রকার অলঙ্কার নির্মাণেও প্রভূত দক্ষতা দেখায়। চিনি ভারতেই প্রথম প্রস্তুত হয়েছিল। ইংরাজী 'সুগার' কথাটি সংস্কৃত 'শর্করা' থেকে উদ্ভূত। সর্বশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে যে দাবা, তাস ও পাশা খেলা ভারতেই আবিষ্কৃত হয়। বস্তুত সবদিক দিয়ে ভারতবর্ষের উৎকর্ষ এত বিরাট ছিল যে দলে দলে বুভুক্ষু

ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষীরা ভারতের সীমান্তে উপস্থিত হতে থাকে এবং পরোক্ষভাবে এই ঘটনাই পরে আমেরিকা আবিষ্কারের হেতু হয়।

"এখন দেখা যাক এই সকলের বিনিময়ে জগৎ ভারতকে কি দিয়েছে। নিন্দা, অভিশাপ আর ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারত সন্তানদের রুধির স্রোতের মধ্য দিয়ে অপরে তার সমৃদ্ধির পথ করে নিয়েছে, ভারতকে দারিদ্র্য নিষ্পেষিত করে আর ভারতের পুত্রকন্যাদেরকে দাসত্বে ঠেলে দিয়ে। আর এখন আঘাতের ওপর অপমান হানা হচ্ছে ভারতে এমন একটি ধর্ম প্রচার করে যা পুষ্ট হতে পারে শুধু অপর সমস্ত ধর্মের ধ্বংসস্তূপের ওপর। কিন্তু ভারত ভীত নয়। সে কোন জাতির কৃপা ভিখারী নয়। আমাদের একমাত্র দোষ এই যে, আমরা অপরকে পদদলিত করার জন্য যুদ্ধ করতে পারি না। আমরা বিশ্বাস করি সত্যের অনন্ত মহিমায়। বিশ্বের কাছে ভারতের বাণী হলো প্রথমত তার মঙ্গলেচ্ছা। অহিতের প্রতিদানে ভারত দিয়ে চলে হিত। এই মহৎ আদর্শের উৎপত্তি ভারতেই। ভারত তা কার্যে পবিণত করতে জানে। পরিশেষে ভারতের বাণী হলো : প্রশান্তি, সাধুতা, ধৈর্য ও মৃদুতা আখেরে জয়ী হবেই। একসময় যাদের পৃথিবীতে ছিল বিপুল অধিকার সেই পরাক্রান্ত গ্রীক জাতি আজ কোথায়? তারা বিলুপ্ত। একদা যাদের বিজয়ী সৈন্যদলের পদভারে মেদিনী প্রকম্পিত হতো, সেই বোমান জাতিই বা কোথায়? অতীতের গর্ভে। পঞ্চাশ বছরে যারা একসময়ে অতলান্তিক মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছিল সেই আরবরাই বা আজ কোথায়? কোথায় সেই লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষের নিষ্ঠুর হত্যাকারী স্প্যানিয়ার্ডগণ? উভয়জাতিই আজ প্রায় বিলুপ্ত, তবে তাদের পরবর্তী বংশধরদের ন্যায়পরতা ও দয়াধর্মের গুণে তারা সামগ্রিক বিনাশের হাত থেকে রক্ষা পাবে, পুনরায় তাদের অভ্যুদয়ের ক্ষণ আসবে।"

বক্তৃতার শেষে স্বামী বিবেকানন্দকে করতালি ধ্বনিতে সাদরে অভিনন্দিত করা হয়। ভারতের রীতি-নীতি সম্পর্কে তিনি কতকগুলি প্রশ্নেরও উত্তর দেন। গতকল্যকাব (২৫ ফেব্রুয়ারী) 'স্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিয়ন' পত্রিকায় ভারতবর্ষে বিধবাদের নির্যাতিত হওয়া নিয়ে যে বিবৃতিটি প্রকাশিত হয়েছে তার তিনি স্পষ্ট ভাষায় প্রতিবাদ করেন।

বিবাহের পূর্বে নারীর নিজস্ব সম্পত্তি যদি কিছু থাকে, ভারতীয় আইন অনুসারে স্বামীর মৃত্যুর পর তাতে তাঁর অধিকার তো বজায় থাকেই,

তাছাড়া স্বামীর কাছ থেকে তিনি যা কিছু পেয়েছেন এবং মৃত স্বামীর সাক্ষাৎ অপর কোন উত্তরাধিকারি না থাকলে তাঁর সম্পত্তিও বিধবার দখলে আসে। পুরুষের সংখ্যাল্পতার জন্য ভারতে বিধবারা ক্বচিৎ পুনর্বিবাহ করেন।

*বক্তা আরো উল্লেখ করেন যে, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীলোকের সহমরণ প্রথা এবং জগন্নাথের রথচক্রে আত্ম বলিদান সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। এর প্রমাণের জন্য তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে উইলিয়াম হান্টার প্রণীত 'ভারত সাম্রাজ্যের ইতিহাস' নামক পুস্তকটি দেখতে বলেন।**

ফেব্রুয়ারির ২৬ তারিখে ব্রুকলিন টাইম্স পত্রিকা স্বামীজীর ভাষণের একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে এবং ফেব্রুয়ারির ২৭ তারিখে ডেইলী ঈগল্ পত্রিকা তাঁর হিন্দু বিধবাদের প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তরের বিশদ কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ একটি বিবরণ প্রকাশ করে। এই দুটি প্রবন্ধ যথাক্রমে উদ্ধৃত করা হলো :

স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণাবলী

তিনি ভারতের কলা ও বিজ্ঞানসমূহ সম্বন্ধে বললেন

হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো মেলার ধর্মমহাসভায় যিনি এ দেশে প্রাধান্য অর্জন করেন এবং যিনি সম্প্রতি ব্রুকলিনে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়েছেন, তিনি গতরাত্রে ঐতিহাসিক ভবনে ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের ব্যবস্থাপনায় একটি বক্তৃতা দেন। তিনি তাঁর "জগতে ভারতের অবদান" শীর্ষক ভাষণটি দিয়েছেন অত্যুৎসাহী এবং গ্রহণশীল শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে। বক্তার বিষয়টি ছিল যাদের প্রাচীন বস্তুর প্রতি ঝোঁক আছে তাদের নিকট বিশেষ করে আগ্রহের ব্যাপার, কারণ তিনি সেইসকল কলাবিদ্যা এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলেছেন যা ভারত জগৎকে দিয়েছে, বলেছেন জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধে— যেগুলি তাঁদের দেশেই বিকাশলাভ করেছিল। তাঁকে আন্তরিকতার সঙ্গে ঘনঘন হাততালি দিয়ে অভিনন্দিত করা হচ্ছিল। তাঁর সঙ্গে মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি লুইস জি. জেন্স। এই সংস্থার অন্যান্য পদাধিকারিদের মধ্যে চার্লস এইচ. শেপার্ডে, জেম্স এ. স্কেলটন, শ্রীমতী ওলি বুল এবং অন্যান্য আরও বহুসংখ্যক ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

---

* বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১০৭-১১

স্বামী বিবেকানন্দ

অস্বীকার করলেন এ কথা যে, ভারতে বালবিধবাগণ অত্যাচারিত হন

হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ইতিহাস ভবনে গত সোমবার রাত্রে ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের ব্যবস্থাপনায় "জগতে ভারতের অবদান" বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন। যখন স্বামী মঞ্চে আরোহণ করেন তখন সভাকক্ষে প্রায় আড়াইশ লোক উপস্থিত হয়েছিল। অনেকখানি আগ্রহের সঞ্চার হয়েছিল, ব্রুকলিন রমাবাঈ গোষ্ঠীর সভানেত্রী শ্রীমতী জেম্‌স ম্যাক্‌কিন বক্তার—ভারতে বালবিধবাগণ নির্যাতিত হন না—এই-মর্মে বিবৃতির প্রতিবাদ করায়। রমাবাঈ গোষ্ঠী ভারতে খ্রীস্টীয় কাজকর্ম চান। বক্তৃতার কোন অংশেই বক্তা এই প্রতিবাদের বিষয় উল্লেখ করেননি, কিন্তু তাঁর ভাষণ সমাপ্ত হলে শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্য হতে এক ব্যক্তি উঠে প্রশ্ন করেন উপর্যুক্ত প্রতিবাদের উত্তরে তিনি কি বলবেন? স্বামী বিবেকানন্দ বললেন যে এ-কথা সত্য নয় যে, বালবিধবাদের কটুকাটব্য করা হয় বা তারা কোনপ্রকারে নির্যাতিতা হন। তিনি আরও বলেন ঃ

"একথা সত্য যে কিছু কিছু হিন্দু খুব অল্প বয়সে বিবাহ করে, অন্যরা মোটামুটি বয়ঃপ্রাপ্তির পরই বিবাহ করে এবং কেউ কেউ আদৌ বিবাহ করে না। আমার পিতামহ শিশুকালে বিবাহিত হন, আমার পিতা ১৪ বৎসর বয়সে বিবাহ করেন, আমার বয়স ত্রিশ, আমি এখনো বিবাহ করিনি। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর যা কিছু সম্পত্তি তা তাঁর বিধবা পান। যদি কোন বিধবা দরিদ্র হন, তাহলে অন্য যে-কোন দেশের দরিদ্র বিধবা রমণীর মতোই তাঁর অবস্থা হয়। বৃদ্ধরাও কখনো কখনো শিশুকন্যা বিবাহ করেন, কিন্তু স্বামী যদি ধনী ব্যক্তি হন, তাহলে তিনি যত তাড়াতাড়ি লোকান্তরিত হন ততই বিধবার পক্ষে মঙ্গল। আমি সারা ভারত ভ্রমণ করেছি, আমি কোথাও বিধবাদের নির্যাতিত হতে দেখিনি। একসময় ধর্মীয় গোঁড়া বিধবারা ছিলেন, যাঁরা নিজেরাই নিজেদের অগ্নিতে নিক্ষেপ করতেন এবং স্বামীর চিতার অগ্নি তাঁদের গ্রাস করত। হিন্দুরা এতে বিশ্বাসী ছিলেন না, কিন্তু বাধা দিতেন না এবং ইংরেজরা ভারতে অধিকার বিস্তার না করা পর্যন্ত এ-প্রথা নিষিদ্ধ হয়নি। এ-সকল নারীকে দেবী মনে করা হতো এবং তাঁদের স্মৃতিসৌধ নির্মিত হতো।"

ডঃ জেন্‌স পরে দেখান যে, স্বামীজীর উত্তরের এই বিবরণ অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিপূর্ণ ছিল। বিধবাগণ নির্যাতিত হন না বলে আবার তিনি বলছেন

কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের ওপর নির্যাতন হয়ে থাকতেও পারে—এ-কথাই তিনি স্বীকার করে নিচ্ছেন। এগুলি অবশ্যই সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত ঘটনা, দৈবাৎ ঘটেছে। তিনি জোরের সঙ্গে অস্বীকার করেছেন এ-কথা যে, বিধবাদের ওপর কোনরূপ নির্যাতন করা হিন্দু ধর্মস্বীকৃত প্রথা বা হিন্দু ঐতিহ্যসম্মত। তিনি এ প্রসঙ্গে পুনর্বার ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিয়ন পত্রিকার প্রতিবেদনে যা দেখা যায়, প্রাসঙ্গিক উত্তরাধিকার আইনের বিধিগুলি উল্লেখ করেন। তাছাড়া স্বামীজী এও ঘোষণা করেন যে, হিন্দুবিধবাদের শিক্ষাদান আন্দোলন সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ সহানুভূতিসম্পন্ন।

ব্রুকলিন ডেলী ঈগ্‌ল পত্রিকার সম্পাদকদের রমাবাঈ গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব ছিল কি না, কিংবা তাঁরা এ বিষয়ে বিতর্ককে জিইয়ে রাখতে চেয়েছিলেন—এ প্রশ্নে মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু যে-কথাই সত্য হোক, তাঁরা এ বিষয়ে প্রচুর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিলেন। ৬ মার্চ তারিখে ঈগ্‌ল অবশ্য ভাবল যে ডঃ জেন্‌স এর ফ্রেবুয়ারি ২৪ তারিখের চিঠিটা প্রকাশের যোগ্য যাতে ডঃ জেন্‌স দেখিয়েছেন যে স্বামীজী "নারীর আর্দশ" শীর্ষক ভাষণে বিধবাদের অবস্থা বিষয়ে কিছু বলেন নি। এই চিঠির তারিখ এরপর মিথ্যে করে মার্চের ৩ তারিখেব বলে উল্লেখ করা হয়, যাতে মনে হয় চিঠিটি স্বামীজীর ফেব্রুয়ারি ২৫ তারিখের ভাষণ দেবার পর লেখা হয়েছে যে ভাষণে তিনি হিন্দু-বিধবাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে। ডঃ জেন্‌স এজন্য যে মিথ্যা পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন শ্রীমতী ম্যাক্‌কিন তার সুযোগ নিলেন অতি দ্রুত এবং আরও অনুরূপ প্রতিবেদন দিলেন। রবিবার মার্চের ১০ তারিখে ঐ কাগজে নিম্নলিখিত সুলিখিত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলো ঃ

পণ্ডিতা রমাবাঈ

শ্রীমতী ম্যাক্‌কিন বলেন যে, তিনি এমন একজন
মহিলা, যাকে খ্রীস্টান বা হিন্দু যেই হোন, বিশ্বাস করতে পারেন।

পণ্ডিতা রমাবাঈ-এর এবং হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের অনুরাগী বন্ধুবর্গের মধ্যে ভারতে বালবিধবাদের সঙ্গে যেরূপ আচরণ করা হয় সেই প্রসঙ্গে বির্তক চলছেই। যদিও তা এতদিন প্রকাশ্যে আসেনি, কিন্তু তার মীমাংসা হওয়া এখনো সুদূরপরাহত। যখন পণ্ডিতার একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীমতী জেম্‌স ম্যাক্‌কিনকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের ডঃ লুইস জি. জেন্‌স এই মর্মে যে বিবৃতিটি দিয়েছেন যে-হিন্দু সন্ন্যাসী

কখনো একথা অস্বীকার করেন নি যে, হিন্দু বিধবাগণ নির্যাতিত হন, যে-নির্যাতনের বিষয় পণ্ডিতা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন, সে সম্পর্কে তাঁর কি বলার আছে, এর উত্তরে তিনি বলেন ঃ

"পণ্ডিতা রমাবাঈয়ের বন্ধুদের নিকট এ খুবই সন্তোষজনক কথা যে ডঃ জেন্‌স যিনি স্বামী বিবেকানন্দকে এ দেশীয় সমাজে একজন ধর্মীয় আচার্য হিসাবে পরিচিত করে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তিনি আমাদের বলেছেন যে তাঁর প্রাচ্যদেশীয় অতিথি 'পাউচ প্রাসাদে বা এই ব্রুকলিনে অন্যত্র প্রদত্ত ভাষণসমূহে উচ্চবর্ণীয় হিন্দু বিধবাগণ যে অত্যাচারিত হয়ে থাকেন—তা অস্বীকার করেন নি।' তথাপি সর্বত্র সম্পূর্ণ একটি বিপরীত ধারণা গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ায়, নিউ ইয়র্ক বাণিজ্যসভার একজন সদস্য, যাঁর কথা তাঁর প্রদত্ত ঋণপত্রের মতোই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করা হয়, তিনি বর্তমান লেখককে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনি সন্ন্যাসীটিকে এ ঘোষণা করতে শুনেছেন যে ভারতে বালবিধবাগণ অত্যাচারিত হয় না এবং একদা এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন এমন দুজন ব্যক্তিও এই লেখকের নিকট এই একই সংবাদ পৌঁছে দিয়েছেন আর যেহেতু চারজন সম্ভ্রান্ত ও সর্বত্র সুপরিচিত নাগরিক একযোগে একই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে যেহেতু ঈগল পত্রিকা ফেব্রুয়ারি ২৫ তারিখে ইতিহাস-ভবনে যে বক্তৃতা দেওয়া হয়েছে তার প্রতিবেদনে একই সাক্ষ্য দিচ্ছে, পরিশেষে যেহেতু আমাদের জাতীয় পরিচালক সমিতির জনৈক সদস্য প্রখ্যাত বোস্টন সাহিত্য-সংসদের এক সভায় সন্ন্যাসীটিকে একই ঘোষণা করতে শুনেছেন, সেজন্য মনে হয় যে, একথা ধরে নেওয়া অযৌক্তিক হবে না যে—সন্ন্যাসীর কথাগুলির দুরকম ব্যাখ্যা করা যায় অথবা আমাদের বন্ধু সভাপতির আসনে বসে নিদ্রাভিভূত হয়েছিলেন।

"এ কথাও লিপিবদ্ধ করতে আনন্দ অনুভব করছি যে আমাদের বিদুষী পণ্ডিতা ডঃ জেন্‌স এবং তাঁর হিন্দু বন্ধুর সঙ্গে হিন্দুবিধবার (তিনি নির্যাতিতা হোন বা না হোন) অবস্থা উন্নয়নের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় সম্বন্ধে একমত এবং সেটি হলো তাকে শিক্ষারূপ অমূল্য বরদান দেওয়া। রমাবাঈ বোস্টনে একটি খ্যাতনামা কংগ্রিগেশন্যাল গির্জার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং প্রত্যাখ্যান করেছেন এপিস্কোপালিয়ান গির্জা কর্তৃক দানের অনুরূপ প্রস্তাবও, যারা এরূপ সহায়কের সাহচর্যে ভারতে প্রবেশের সুযোগ পেলে আহ্লাদিত হতো। তিনি

ক্রমাগত একই কথা বলেছেন যে গোঁড়া উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের নিকট পৌঁছতে হলে একমাত্র ধর্মবহির্ভূত বিদ্যালয়ের মাধ্যমে পৌঁছনো যাবে এবং তিনি একমাত্র সকল ধর্মের ও সম্প্রদায়ের এমন সব সজ্জন পুরুষ ও নারীর নিকট হতে সাহায্য গ্রহণ করবেন যাঁরা কেবলমাত্র বালবিধবাদের অজ্ঞতা এবং দুর্দশা হতে মুক্তি দিতে চান।

"আইনের চোখে এইরকম বিধবাদের স্থান কোথায় এ-প্রসঙ্গে রমাবাঈ তাঁর ভারত সম্বন্ধীয় বহু জনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতায় বলেছেন যে, হিন্দুগণ নিজেরাই এই সকল শিশুদের ওপর যখন নির্যাতন করেন, তখন মুখে প্রাচীন শাস্ত্রবিধি মেনে চলছেন একথা বললেও প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সে-সকল লঙ্ঘনই করে থাকেন। লুথার যেমন উইটেনবার্গে দাঁড়িয়ে শাস্ত্রের বিধিগুলি উল্লেখ করে দেখিয়েছিলেন যে গির্জার বিধিগুলিই গির্জার বিরোধিতা করছে, রমাবাঈও অনুরূপভাবে দাঁড়িয়েছিলেন শাস্ত্রীয় বিধানের ওপরেই। বিবেকানন্দের বন্ধু বাবা শশীপদ প্যানার্জী [বাবু শশীপদ ব্যানার্জী] যাঁর কাজকর্ম তিনি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেন, আমিও তাঁকে উচ্চ প্রশংসায় ভূষিত করছি। আমার ইচ্ছা হচ্ছে কয়েকবছর আগে তাঁর কাছ থেকে যে-চিঠিটা পেয়েছিলাম যাতে তিনি নিজের কাজকর্মের বিবরণ দিয়ে আমাদের সমিতির সমর্থন এবং সহায়তা চেয়েছিলেন, সেটি আজ যদি আমাদের হাতে থাকত ভাল হতো। উচ্চশিক্ষিত হিন্দুদের রমাবাঈ এবং তাঁর কাজকর্ম সম্বন্ধে বদ্ধমূল একটি বিরূপ মনোভাব কেন রয়েছে---তা বোঝা শক্ত। হয়তো শ্রীযুক্ত মনকিওর ডি. কনওয়ে আমাকে তাঁর যে-অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন তার দ্বারা এর কিছুটা ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। শ্রীযুক্ত কনওয়ে যখন পারস্য দেশে ছিলেন তখন রমাবাঈয়ের খ্রীস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার সংবাদ পৌঁছয়। রমাবাঈয়ের এই পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য শ্রীযুক্ত কনওয়ের নিজেরই দুঃখ বোধ হয়েছিল। তিনি আমাকে বলেছেন পারস্যের তরুণবৃন্দ ক্রোধে দন্তঘর্ষণ করছিল বলা যায় এবং অবিরাম অশ্রু বর্ষণ করতে করতে তারা বলছিল---'চিন্তা কর একবার আমাদের রমাবাঈ, আমাদের মনস্বিনী রমাবাঈ, যার সম্পর্কে আমরা এত গর্বিত ছিলাম---সেই রমাবাঈ খ্রীস্টান হয়েছে।' শ্রীযুক্ত কনওয়ের মতে এ-কথা চিন্তামাত্র তারা ক্রোধে ও লজ্জায় অভিভূত হয়ে পড়ছিল।

"এ-কথা সুবিদিত যে, ধর্মীয় বিরোধিতার তুল্য আর কোন বিরোধিতা নেই এবং যদিও এ-কথা অবিশ্বাস্য মনে হবে তবুও এ সত্য যে, এ-দেশে

এবং ভারতে উভয় দেশেই রমাবাঈ যাদের যাদের প্রভূত এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সাহায্য দিয়েছিলেন, তারাই তাঁকে সর্বাপেক্ষা অধিক কঠিন আঘাত দিয়েছে। একটি হিন্দু ছাত্র এ-দেশে বন্ধুহীন এবং কপর্দক-শূন্য অবস্থায় এসেছেন রমাবাঈয়ের গোষ্ঠির নিকট তাঁর দেওয়া একটি পরিচয়পত্র নিয়ে যাতে অনুরোধ করা হয়েছে যে, কোষাধ্যক্ষ যেন তাঁর সামান্য আয় থেকে শতকরা ১০ ভাগ তার পড়াশুনার জন্য দেন। সেই যুবকটি সেই টাকাটা পেয়ে এখানে কাজকর্ম শুরু করল। তাঁর সদ্য-অর্জিত শক্তি সে সর্বপ্রথম নিয়োগ করল রমাবাঈকে আক্রমণ করতে এবং এই ঘোষণা করতে যে রমাবাঈয়ের সমস্ত কাজকর্ম প্রচণ্ডভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আমি অবশ্য আনন্দের সঙ্গে বলছি যে এ-ব্যক্তিটি শ্রীবিবেকানন্দ নন। এ-ঘটনাটি কিন্তু শিক্ষিত হিন্দুদের ধর্মীয় ঘৃণা কার্যত কতদূর গভীর হতে পারে, তারই একটি দৃষ্টান্ত।

"শাওদা সদন [শারদা সদন] গত বৎসর সত্যসত্যই একটি গভীর আঘাত পেয়েছে এবং তাও এ-প্রতিষ্ঠানের ঘোষিত বন্ধুবর্গের হাতে। যাই হোক আমরা অবশ্য এখন এ-সংবাদ জানাতে পারছি যে, তাঁদের মধ্যে অনেকে তাঁদের দ্রুত সিদ্ধান্তের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে কয়েকজন অতি বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁদের কথা ডঃ জেন্‌স উচ্চ প্রশংসা করে উল্লেখ করেছেন তাঁরা জনসমক্ষে এই বিদ্যালয়ে তাঁদের পুনর্জাগ্রত আস্থার কথা ঘোষণা করেছেন। সর্বশেষ সংবাদ অনুসারে ছাপ্পান্নজন শিক্ষার্থী এখন ওখানে রয়েছে এবং প্রতিদিন আরও প্রার্থীর আবেদনপত্র আসছে। রমাবাঈয়ের খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে আর একটি কথা—এই খ্রীস্ট ধর্মের ব্যাপারটি আমাদের এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের মাননীয় সভাপতির নিকট হতে রমাবাঈয়ের প্রতি মৃদু তিরস্কারের মতো এসেছে। হিন্দু ধর্মের নৈতিক দিকটি রমাবাঈয়ের চেয়ে আর কেউ অধিক জোর দেন নি। তাঁর দেশবাসীর প্রতি তাঁর পূর্ণ আনুগত্য আছে, তিনি তাদের একটি বিদেশীয় ধর্মে দীক্ষিত করে তাদের ইংরেজ-ভাবাপন্ন বা আমেরিকান-ভাবাপন্ন করবেন না। তাঁর হৃদয় হলো পলের হৃদয়-সদৃশ, পিটারের সদৃশ নয়, এবং আমি তাঁকে যা বলতে শুনেছি আর আমি তাঁর লেখা যা পড়েছি তাতে আমি বিশ্বাস করি যে, তিনি খ্রীস্টধর্মকে সর্বোচ্চ ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধী বলে মনে করেন না, বরঞ্চ এ উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করেছে তাঁর ধর্ম, পল যেমন মার্স পর্বতে বলেছিলেন—'যাকে অজ্ঞানতাবশত তুমি পূজা করছ, তাকেই আমি

ঘোষণা করছি।' সংক্ষেপে বলতে গেলে, তিনি এমন একজন নারী যাঁর ওপর হিন্দু ও খ্রীস্টান—উভয়েই সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে পারেন।"

এখন তাহলে স্বামীজীকে ধর্মীয় ঘৃণা প্রচারের অপবাদ দেওয়া হলো। আমেরিকায় তিনি যতগুলি বর্শার ফলার দ্বারা বিদ্ধ হয়েছিলেন তার মধ্যে এটি তুলনাহীন। কিন্তু হিন্দুদের খ্রীস্টধর্মে ধর্মান্তরকরণ অপছন্দ হওয়ার দরুন শ্রীমতী ম্যাক্‌কিন যে আঘাত পেয়েছিলেন সেই ক্ষত তখনো শুকোয়নি, তিনি তখনো সেই ক্ষতে ভুগছিলেন। শারদা সদনের [পুনাস্থ রমাবাঈয়ের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়] ওপর যে প্রচণ্ড আঘাতের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, সেটি হলো সমস্ত হিন্দু পরামর্শদাতাদের একযোগে পদত্যাগ। ব্রুকলিন রমাবাঈ গোষ্ঠীর নথিপত্রের মধ্যে ১৮৯৩-এর ১৩ আগস্ট তারিখে লেখা নিম্নলিখিত চিঠিটি পাওয়া যায়, চিঠিটিতে লেখা—

"শ্রীমতী জে. ডব্লু. এ্যাণ্ড্রুজ, বোস্টন : সর্বশেষ চিঠি যা আমরা আপনাকে লিখেছিলাম... তাতে বলা হয়েছিল আমরা পরামর্শদাতা সমিতি হিসাবে শারদা সমিতির কোন দায়িত্ব গ্রহণ করতে অপারগ। সেজন্য আমরা আপনাদের প্রকাশিত কার্য-বিবরণীতে আমাদের নাম পুনাস্থ পরামর্শদাতা সমিতির সদস্য হিসাবে এখনো উল্লিখিত হওয়ায় বিস্মিত হয়েছি।...আপনারা যা উল্লেখ করেছেন ঐরূপ কোন পরামর্শদাতা সমিতির গত দু-তিন বৎসর ধরে কোন অস্তিত্বই ছিল না। যদি সদনটি একটি স্বীকৃত ধর্মান্তরকরণ কেন্দ্র হিসাবে পরিচালিত হয়, তাহলে আমরা এর সঙ্গে আমাদের সমস্ত সম্পর্ক অস্বীকার করব। আমরা প্রার্থনা করি যে, আপনারা এই ঘোষণাটিকে বিবেচনা করবেন এবং পরামর্শদাতা সমিতির সদস্য হিসাবে আমাদের নাম উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকবেন।" (১৮৯৩-এর আগস্ট মাস থেকেই রমাবাঈয়ের বন্ধুদের মস্তকের ওপর আঘাতের পর আঘাত অজস্র ধারায় বর্ষিত হচ্ছিল। শ্রীমতী এণ্ড্রুজ ওপরে বর্ণিত চিঠিটা পাবার অল্প পরে স্বামীজী বোস্টন গোষ্ঠীতে মহিলাদের সামনে তাঁর ভাষণ দিয়েছিলেন।) শ্রীমতী এণ্ড্রুজ অবিলম্বে বোস্টন থেকে পুনায় ছুটে গিয়েছিলেন "নিজে চাক্ষুষ সব দেখবার জন্য" এবং তিনি ফিরে এলেন এই সংবাদ নিয়ে যে, কোনরূপ ধর্মান্তরকরণ করা হয়নি। যদিও, কিছুকাল পরে পরামর্শদাতা সমিতির কেউ কেউ নরম হয়েছিলেন, কিন্তু রমাবাঈ খ্রীস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ায় ভালমত সংশয় রয়েই গেল।

"বলা হয়েছে যে, এই বিতর্ক ব্রুকলিনের সংবাদপত্রগুলিকে বিক্রয়

বৃদ্ধির এবং রমাবাঈ গোষ্ঠীকে প্রচারের চমৎকার সুযোগ এনে দিয়েছিল। মার্চের ১৬ তারিখে, স্টাণ্ডার্ড ইউনিয়ন পত্রিকা আড়াই স্তম্ভব্যাপী রমাবাঈয়ের জীবন ও কর্ম-প্রচেষ্টার বিবরণ প্রকাশ করল, তার মধ্যে বিশদভাবে ভারতে বিধবাদের পরিস্থিতির ভয়াবহতা প্রকাশ করল। এর শিরোনামাটি নিম্নোক্তরূপ, যেটি উল্লেখ করাই যথেষ্ট ঃ

রমাবাঈয়ের কর্মকাণ্ড

একজন উচ্চবর্ণীয় হিন্দু রমণীর কৃতিত্ব

"তমসাবৃত ভারতে" আলোক প্রদানের জন্য ব্রুকলিনের অর্থদান—বালবিধবাদের পরিস্থিতি সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা—পুনার বিস্ময়-উৎপাদক বিদ্যালয় এবং তার কতিপয় শিক্ষার্থী।

মার্চের ১০ তারিখে ব্রুকলিন ঈগ্‌ল পত্রিকায় অদম্য শ্রীমতী ম্যাক্‌কিনের মন্তব্যসমূহ পাঠ করে ডঃ জেন্‌স পুনরায় পাঠকদের নিকট স্বামীজীর মতামত পরিষ্কার করে তোলবার জন্য বাধ্যবাধকতা অনুভব করলেন। যদিও কতকগুলি বিষয়ে স্বামীজীর যথার্থ মতামত ঠিক ঠিক উপস্থাপিত করতে তিনি ব্যর্থ হন, তথাপি তাঁর প্রচেষ্টা সাহসিকতাপূর্ণ ছিল। মার্চের ১২ তারিখে লেখা নিম্নলিখিত চিঠিটি মার্চের ১৭ তারিখে ডেইলী ঈগ্‌ল পত্রিকায় প্রকাশিত হলো ঃ

স্বামী বিবেকানন্দ

লুইস জি. জেন্‌স হিন্দু-বিধবাদের সংক্রান্ত প্রশ্নে—

ব্রুকলিন ঈগ্‌ল পত্রিকার সম্পাদক সমীপেষু—

রমাবাঈ গোষ্ঠীর মহৎ-হৃদয় মহিলাদের সঙ্গে কোনপ্রকার বিতর্কে প্রবেশে আমার ঘোর অনীহা আছে। আমার পূর্বপত্রের এমন কোন ব্যাখ্যা যেন না করা হয় যে, আমি কোনপ্রকার বিতর্কের মধ্যে যেতে চাই—এ আমি কোনমতেই চাই না। বরঞ্চ আমার উদ্দেশ্য ছিল এটাই দেখানো যে বিতর্কের কোন ক্ষেত্রই এখানে নেই। এর উৎপত্তি আমাদের মধ্য থেকে হয়নি এবং এর সূচনা হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দু-বিধবাগণকে শিক্ষাদান করার ব্যাপারে যে প্রকৃত মনোভাব সে সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা থেকে। শ্রীমতী জেম্‌স ম্যাক্‌কিন-এর যে সাক্ষাৎকার আপনাদের কাগজে রবিবাসরীয় সংখ্যায় [মার্চের ১০ তারিখে] প্রকাশিত হয়েছে তা আমার ফেব্রুয়ারি ২৪ তারিখের চিঠিতে যা বলা হয়েছে তাকেই সমর্থন করে, কিন্তু সেখানে

আমার চিঠিটা যেটা মার্চের ৬ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে, ভুলক্রমে তা মার্চের ৩ তারিখ লেখা বলে উল্লিখিত হয়েছে। শ্রীমতী ম্যাক্‌কিন শ্রীযুক্ত মনকিওর ডি. কনওয়েের বর্ণিত বলে যে কাহিনীর উল্লেখ করেছেন তা আশ্চর্যজনকভাবে আপনাদের প্রতিবেদকের দ্বারা পারস্য দেশে ঘটেছে বলে উল্লিখিত হয়েছে, অথচ সেদেশে কোন হিন্দু বাস করে না, সেখানে পণ্ডিতা রমাবাঈয়ের নাম কখনো কেউ শোনে নি। হিন্দু জনগণের নিকট তাদের নিজেদের ধর্মের আচার্যগণই পৌঁছতে পারবেন এবং তাদের সাহায্য করতে পারবেন—স্বামী বিবেকানন্দের এই বাস্তবজ্ঞানকে এই ঘটনা সমর্থন করছে। খ্রীস্টধর্মে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের দ্বারা ধর্মীয় শিক্ষাদান কার্যের ওপর উচ্চ হিন্দুদের ঘৃণা যতটা তীব্র বলে প্রথম দর্শনে মনে হয়, ততটা তীব্র মনে হবে না যদি আমরা নিজেদের তাদের জায়গায় উপস্থাপিত করে দেখার চেষ্টা করি এবং চিন্তা করে দেখি যে, আমরা খ্রীস্টধর্মত্যাগীকে ঠিক কি চক্ষে দেখি। ব্রুকলিনের একজন সর্বাপেক্ষা উচ্চশিক্ষিতা এবং ঐকান্তিকতাপূর্ণ নারী যদি বৌদ্ধ বা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে তাকে আমরা সমাজ-সংস্কারের ব্যাপারে পণ্ডিতা রমাবাঈকে ভারত যেটুকু গ্রহণ করেছে তার চেয়ে বেশি ভালভাবে গ্রহণ করব কি না, সে প্রশ্নও তোলা যেতে পারে। মানুষের স্বভাব পৃথিবীর সর্বত্র একইপ্রকার হয়ে থাকে। আমি পণ্ডিতা রমাবাঈয়ের নিষ্ঠা বা ঐকান্তিকতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করছি না। তাঁর খ্রীস্টধর্মকে আমি মৃদু বা অন্যভাবে তিরস্কারও করছি না। আমি বিবেকানন্দের হিন্দুধর্মকেও নিন্দা করি না বা শ্রীমতী বেশান্তের বৌদ্ধধর্ম এবং থিয়োসফিকেও মন্দ বলি না। আমি প্রত্যেক মানুষের আন্তরিক বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করি এবং মানুষের উন্নতির জন্য যাঁরা যা কিছু করবেন, আমি তাদেরই বলব—"এগিয়ে যাও"। আমি স্বামী বিবেকানন্দকে রমাবাঈয়ের নাম করে যে আক্রমণ করা হচ্ছে তার নিন্দা করি। আমার বিশ্বাস সেই আদর্শনিষ্ঠ মহিলা কখনো এটা করতেন না। চিন্তাশক্তিরহিত ব্যক্তিবর্গ এর থেকে যে মিথ্যা সিদ্ধান্ত করবে অর্থাৎ স্বামী হিন্দু বিধবাদের শিক্ষার বিরোধী—আমি এরও নিন্দা করি। আমরা আশা করি এ বিষয়ে সব সংশয় শিগ্‌গিরই দূর হবে এবং কার্যকারীভাবেই হবে যখন স্বামী বিবেকানন্দ ব্রুকলিনে বাবু শশীপদ ব্যানার্জীর শিক্ষামূলক যে-কর্মকে শ্রীমতী ম্যাক্‌কিন উচ্চ প্রশংসা জানিয়েছেন, তারই সহায়তার জন্যই শিগ্‌গির একটি বক্তৃতা দেবেন। হিন্দু-বিধবাগণের সবচেয়ে বেশি ক্লেশের কারণ—অজ্ঞতা।

যে মুখ্য বোঝা সে আজ বহন করে চলেছে, শিক্ষাই তাকে তার হাত থেকে মুক্তি দেবে। আর তাদের ওপর যে নির্যাতন ইত্যাদি যা কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো আছে, তা হচ্ছে বিক্ষিপ্ত এবং ব্যতিক্রমমূলক—এ-সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। যখন বলা হয় যে, এইগুলি স্বাভাবিক ঘটনা তখন যে একজন দেশপ্রেমিকের মনে অসহিষ্ণু প্রতিবাদ জাগবে এতে আশ্চর্যের কি আছে? আমার পক্ষ থেকে আমি আর একটু যোগ করতে চাই যে, আমার চিঠির সঙ্গে একটি ভুল তারিখ জুড়ে দেওয়ার ফলে মনে হতে পারে যে, আমার চিঠিটা বিবেকানন্দের ফেব্রুয়ারি ২৫ তারিখে ইতিহাস-ভবনে দেওয়া বক্তৃতার যে-বিবরণ পরদিন ঈগ্‌ল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তার পরে লেখা। আসলে এটি তাঁর বক্তৃতার আগের দিন লেখা এবং স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষে আমি বলব যে ঈগ্‌ল পত্রিকায় তাঁর মন্তব্যসমূহ সম্বন্ধে প্রতিবেদনটি ত্রুটিপূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ ছিল। হিন্দু বিধবাদের ওপরে যে আচরণ করা হয় সে-সম্বন্ধে অন্যায় ও অতিরঞ্জিত বর্ণনাগুলি তিনি অস্বীকার করেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও ঘোষণা করেন যে তাদের শিক্ষাদান সম্পর্কিত যে-সকল কাজকর্ম তাঁর বন্ধু শশীপদ ব্যানার্জী করছেন সে-সকলের ওপর তিনি তাঁর পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করছেন।

লুইস জি. জেন্‌স
সভাপতি, ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসন
ব্রুকলিন, মার্চ ১২, ১৮৯৫

স্বামীজীর পরবর্তী ভাষণ-বাবদ সংগৃহীত সমস্ত অর্থ শশীপদ ব্যানার্জীর কাজের জন্য দান করার যে সিদ্ধান্ত, তা ছিল স্বামীজীর নিজের এবং নিঃসন্দেহে এটি নেওয়া হয়েছিল শুধুমাত্র হিন্দু-বিধবাদের শিক্ষাদান ব্যাপারে তাঁর নিজের মতামতকে স্পষ্ট করে জানানোর উদ্দেশ্যে তা কিন্তু নয়, ব্যানার্জীর কর্মে সাহায্যদানের একান্ত প্রয়োজনীয়তার জন্যও বটে। এ-ঘটনাটি অশুদ্ধভাবে ব্রুকলিন বিতর্কের প্রসঙ্গের কোন উল্লেখ ছাড়াই তাঁর জীবনীর প্রথম সংস্করণে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ "স্বামীজী ব্রুকলিনের এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনে প্রদত্ত তাঁর 'হিন্দু নারীর আদর্শ' বিষয়ক বক্তৃতা-বাবদ অর্থ ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের সভাপতির হাতে অর্পণ করেন বাবু শশীপদ ব্যানার্জীর বরানগরস্থিত হিন্দুবিধবাদের আবাসিক বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে।" (এখন আমরা জানি যে, 'হিন্দুনারীর আদর্শ' সম্বন্ধে বক্তৃতাটি প্রদত্ত হবার বহু পরে শশীপদ ব্যানার্জীর ব্যাপারটিতে প্রবেশ ঘটে) জীবনীতে

আরও বলা হয়েছে ঃ "সংগৃহীত অর্থ শশীপদবাবুকে পাঠাবার কালে ডঃ জেন্‌স নিম্নলিখিত কথাগুলি লেখেন—'এ টাকাটি আমাদের অ্যাসোসিয়েসনে আপনাদের দেশের সুযোগ্য প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক প্রদত্ত একটি বক্তৃতা-দান বাবদ সংগৃহীত। ইনি কয়েকবার বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে বক্তৃতা দিয়েছেন এবং তার ফলে বেদান্ত-দর্শনের প্রতি এবং ভারতের রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটি আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। স্বামীর প্রতি সুবিচারের জন্য আমার এ-কথা বলা কর্তব্য যে, আপনার বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে একটি বক্তৃতা দানের প্রস্তাব তাঁর স্বেচ্ছা-প্রণোদিত, যে-প্রস্তাবে আমরা সকলে সহযোগিতা করতে পেরে আনন্দিত।'"[১৩]

কিন্তু সর্বপ্রকার সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং ডঃ জেন্‌সের এ ব্যাখ্যা সত্ত্বেও স্বামীজী যে হিন্দু নারীগণের শিক্ষাদানের বিরোধী ছিলেন না, বরঞ্চ বিপরীত অর্থাৎ তার পক্ষেই ছিলেন, শ্রীমতী ম্যাক্‌কিন স্বামীজীকে (১) হিন্দুবিধবাগণ স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার লাভ করেন এবং (২) তাদের নির্যাতন করা হয় না—এই কথাগুলি বলার জন্য কখনই ক্ষমা করেন নি। এ-বিবৃতিগুলি রমাবাঈ গোষ্ঠীর যে বদ্ধমূল ধারণাসমূহ ছিল, যা তাঁরই একার বৈশিষ্ট্য নয়, যা খ্রীস্টীয় প্রচারকদের প্রচারের ফলে একটি পুরো প্রজন্মের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল—তারই ওপর প্রচণ্ড আঘাতস্বরূপ হয়েছিল। স্বামীজী যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিলেন, তা হলো প্রাচ্য ভূখণ্ডের জাতিগুলি অধঃপতিত এই দৃঢ়মূল মানসিকতার বিরুদ্ধে। আর এই মানসিকতাকে রক্ষার প্রয়োজন হয়েছিল পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের স্বপক্ষে সমর্থনকে সুরক্ষিত করবার জন্য, এবং তাদের নিজেদের কাজ যে ন্যায়সঙ্গত আর তারা যে জাতিহিসাবে অনেক উচ্চস্তরের এ-বিষয়ে আত্মতুষ্টি অনুভবের জন্য এই মানসিকতার চেয়ে উপযোগী আর কিছুই ছিল না। সুবিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী রবার্ট ইঙ্গারসোল স্বামীজীকে আলোকদান করে বলেছিলেন ঃ "তুমি যদি এদেশে পঞ্চাশ বছর আগে প্রচার করতে আসতে তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হতো, কিংবা জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হতো। তোমাকে পাথর ছুড়ে গ্রামের বাইরে তাড়িয়ে দেওয়া হতো, যদি তুমি তার বেশ কিছুকাল পরেও আসতে।"[১৪] যদিও ১৮৯০-এর দশকে জনগণের ক্রমবর্ধমান একাংশ যারা স্বামীজীর ভাষণ শুনে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে এবং আনন্দলাভ করেছে, যারা তাঁকে সমর্থন করেছে এবং যাদের তিনি সমর্থন করেছেন, তাদের সম্বন্ধেও ইঙ্গারসোল তাঁকে সাবধানতা অবলম্বন করতে বলেছেন। সহস্রের যিনি প্রতিনিধি সেই শ্রীমতী

ম্যাক্‌কিনের ক্রোধের কথা চিন্তা করে দেখলে বোঝা যাবে কেন ইঙ্গারসোল তাঁকে একথা বলেছেন। ধর্মপ্রচারক গোষ্ঠীর মতোই রমাবাঈ গোষ্ঠীও তাঁকে কলঙ্কভূষিত করতে দ্বিধা বোধ করেনি। ১৮৯৫-এর মার্চ মাসের ২১ তারিখে তিনি শ্রীমতী বুলকে লেখেন ঃ "রমাবাঈ গোষ্ঠী আমার সম্বন্ধে যা দুর্নাম প্রচার করে বেড়াচ্ছে, তা দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি। তার মধ্যে একটি হলো ডেট্রয়েটের শ্রীমতী ব্যাগলি আমার দুশ্চরিত্রতার জন্য তাঁর একটি কাজের মেয়েকে তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন !!! শ্রীমতী বুল, আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন না যে, একজন মানুষ যত ভাল আচরণই করুক না কেন, সবসময়ই কিছু মানুষ তার সম্বন্ধে জঘন্যতম মিথ্যা বলবেই। শিকাগোতে প্রতিদিন আমার বিরুদ্ধে এইসকল প্রচারের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আর এই মহিলাগণ হলেন খ্রীস্টানদের মধ্যেও আরও খাঁটি খ্রীস্টান! হিন্দুরা যে তাদের অস্পৃশ্য বলে অভিহিত করেন এতে আর আশ্চর্য কি? এবং কেবলমাত্র স্নান ও পূজা ব্যতীত এদের স্পর্শজনিত ক্লেদ হতে মুক্ত হবার আর কি উপায় থাকতে পারে?"[১৫]*

যদিও ডঃ জেন্‌স স্বামীজীর মতামত পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন, তথাপি রমাবাঈ গোষ্ঠী আরো বেশি উঠে পড়ে লাগে এ ব্যাপারে। ডেলী ঈগ্‌ল পত্রিকায় শ্রীমতী ম্যাককিনের পরবর্তী সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হলো এপ্রিলের ৬ তারিখে এবং তার বয়ান নিম্নোক্তরূপ ঃ

তিনি বালবিধবাদের জন্য আবেদন রেখেছেন

শ্রীমতী জেম্‌স ম্যাক্‌কীন ডঃ জেনসকে উত্তর দিয়েছেন
হিন্দু আইন প্রণেতাদের উদ্ধৃত করা হয়েছে
সুদর্শন স্বামী বিবেকানন্দ যিনি পণ্ডিত
রমাবাঈয়ের কার্যপদ্ধতির সমালোচনা করেছেন
তিনি বোস্টনের মহিলাদের সম্মোহিত করেছেন
এই মর্মে— সংশয় প্রকাশ
শশীপদ ব্যানার্জী পরিস্থিতি,
—তিনি এখন ব্রুকলিনে

ব্রুকলিন এথিক্যাল সোসাইটি স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাসভায় যোগদান করার জন্য একটি আমন্ত্রণপত্র প্রকাশ করেছেন, তাতে জানানো হয়েছে যে, বক্তৃতাটি দেওয়া হবে রবিবার সন্ধ্যায় যখন কলকাতার সন্নিকটস্থ বাবু শশীপদ ব্যানার্জী দ্বারা পরিচালিত হিন্দু বিধবাশ্রমের সাহায্যার্থে অর্থ

* বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১ম সং, পত্রসংখ্যা, ১৩৬, পৃঃ ৯৪

সংগ্রহ করা হবে। এই ঘোষণাটি ভারতে হিন্দুবিধবাদের প্রতি আচরণ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমতের প্রশ্নটি এবং পণ্ডিতা রমাবাঈ এবং তাঁর প্রচার সম্বন্ধে শ্রীমতী জেম্‌স ম্যাক্‌কিন্‌ এবং এথিক্যাল সোসাইটির ডঃ জেন্‌সের মধ্যে যে বিতর্ক চলছে, যা সময় সময় ঈগল-এ ছাপা হয়েছে, তাকে পুনরুজ্জীবিত করছে। শ্রীমতী ম্যাক্‌কিনের সঙ্গে তাঁর ১৩৬ নং হেনরী স্ট্রীটস্থ গৃহে সাক্ষাৎ করা হয় এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, ডঃ জেন্‌সের ঈগ্‌ল পত্রিকায় ছাপা শেষ চিঠিটি সম্বন্ধে তাঁর কিছু বক্তব্য আছে কিনা। উত্তরে ব্রুকলিন রমাবাঈ গোষ্ঠীর পরিচালিকা শ্রীমতী ম্যাক্‌কিন বলেন ঃ

"ডঃ জেন্‌স এবং আমার মধ্যে যে বিতর্কের ঝড় উঠেছে তারই ফলে এই বিরাট দানের পরিকল্পনায় যদি ভালমত সাহায্য আসে, আমি কেবল প্রার্থনা-পুস্তকের কথাগুলি শব্দান্তর করে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলব—'ঈশ্বর আমাদের সব মুশকিল থেকে বেরিয়ে আসবার মতো একটি সুখেব বিষয় হাতে তুলে দিয়েছেন!' কিন্তু এটা বোঝা শক্ত যে, এর পূর্বে এরকম একটি ঘোষণার মুখবন্ধ কেন করা হলো যে, হিন্দু তরুণী বিধবাদের ওপর ধর্মীয় কুসংস্কার হেতু নির্যাতন করা হয় না, যা আমবা মনে করি করা হয় এবং এ-কথা কেন বলা হলো যে, 'তাদের এ-দেশের বিধবাদের চেয়েও সম্পত্তির ওপর অধিকার অধিক স্বীকৃত—তাদের স্বামীর এবং পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তির ওপর পূর্ণ অধিকার দেওয়া আছে।' সম্পত্তির ওপর অধিকার প্রসঙ্গে প্রমাণ আছে যে, তাদের এরূপ কোনপ্রকার অধিকার নেই। প্রথমত আমাদের এ-সিদ্ধান্তের পক্ষে আছে তাদের বিরাট আইন-প্রণেতা মনু, এই মনুর বিধান আজও প্রচলিত এবং তা এতই কঠোর যে, বর্তমান অধঃপতনের সময়েও আরো কঠোর করা সম্ভব নয়। মনুর গ্রন্থের পঞ্চম ভাগে ১৪৭-১৫৬ নং শ্লোকগুলিতে বলা হয়েছে—'একজন নারী বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্রের অধীন থাকবে, একজন নারী কখনই স্বাধীন হতে পারে না।' তারপর দেবেন্দ্রনাথ দাস, যিনি একজন হিন্দু, ১৮৮৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'নাইনটিন্‌থ সেঞ্চুরী' নামক পত্রিকায় মনুর বিধান অনুসারে বলেছেন—'হিন্দুদের মধ্যে একজন নারী কখনো পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকার পায় না এবং তার স্বামী যদি তার জন্য সম্পত্তি রেখেও যায়, সে সম্পত্তিকে সে নিজের বলে দাবি করতে পারে না। তার সমস্ত সম্পত্তিই তার

পুত্রের যদি তার কোন পুত্র থাকে, যদি তার কোন পুত্র না থাকে তাহলে তাকে একজন কাউকে দত্তক নিতে হয় এবং সে প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাকে সোজা সেইসব সম্পত্তি দিয়ে দিতে হয় এবং এই দত্তকপ্রদত্ত ভাতার ওপর তার জীবন কাটাতে হয়। একজন হিন্দু বিধবার পক্ষে সেই দুর্দশাগ্রস্ত অস্তিত্বের চেয়ে মৃত্যুই অধিক বাঞ্ছনীয়।'

"শ্রীযুক্ত জেম্স উইলসন শ্রীযুক্ত ব্যানার্জীর একজন ঘনিষ্ঠতম বন্ধু এবং সমর্থক, তিনি 'বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা' শীর্ষক তাঁর গ্রন্থে 'বিধবাশ্রম' সম্পর্কে বলেছেন—'শ্রীযুক্ত ব্যানার্জীর এটি এ-পর্যন্ত একটি অতি দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং একে চালাতে হলে উদারহস্তের আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন। বিধবাগণ নিজেরা নিজেদের অন্নবস্ত্রের সংস্থানটুকুও করার সঙ্গতি রাখে না।' বিদ্যালয়টির ১৮৯৩ সালের বার্ষিক কার্য-বিবরণীতেও বলা হয়েছে—'এ-দেশে হতভাগিনী বিধবাদের কথা ভেবে দেখলে দেখা যায় তাদের অবস্থা অনুকম্পার বিষয়।' এবং ১৮৮৯-এর লণ্ডনের ইণ্ডিয়ান ম্যাগাজিন-এ কলকাতার এ-বিদ্যালয়টি কলকাতার খ্রীস্টীয় যাজকদের মধ্যে উচ্চতম পদাধিকারিদের দ্বারা পরিদর্শন লিপিবদ্ধ করা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে—'শ্রী এবং শ্রীমতী ব্যানার্জী অনেক তরুণী বিধবাদের দুঃখজনক পরিস্থিতি দেখে তীব্র সহানুভূতি অনুভব করেছেন।' মনুর পঞ্চমভাগে ১৫৭-১৫৮ সংখ্যক শ্লোকে আমরা পড়ি—'বিধবাগণ বিশুদ্ধ ফুল, শেকড়বাকড় এবং ফলাহার করে তাদের শরীরকে জীর্ণ করুক। আমৃত্যু তাদের পক্ষে কঠোরতাকে ধৈর্যের সঙ্গে মেনে নেওয়াই বিধেয়।' যদি তাদের মতো পরিস্থিতিতে কেউ না থেকে থাকে তাহলে কেবলমাত্র বিধবাদের জন্যই—'তাদের ভাগ্যকে কঠোরভাবে ধৈর্যের সঙ্গে মেনে নিতে হবে'—এ বিধান কেন দেওয়া হয়েছে? 'শশীপদ ব্যানার্জীর জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে কয়েকটি কথা'-গ্রন্থে হিন্দু বিধবাদের সম্বন্ধে এ-কথা লেখা দেখি—তাদের মধ্যে 'শিক্ষা এবং উত্তম ভাবধারা অনুপ্রবিষ্ট হবার পর হিন্দু বিধবাগণ এখন বিধবাদের জন্য নির্দিষ্ট কঠোর বিধিনিয়ম পালন দুঃসহ বলে মনে করে।'

"যাঁরা দীর্ঘকাল ধরে ভারতের নিঃসন্তান বালবিধবাদের বর্ণনার অতীত দুঃখকষ্টের কথা ভাল করে জানেন তাঁদের মনে হবে আমরা আকাশে সূর্যের অস্তিত্বের কথা প্রমাণ করতে চাইছি। যাঁরা নিজেরা ইচ্ছে করে অন্ধ সাজতে চান না তাঁদের সকলেরই এ-কথা জানা। মার্চ মাসের ৩ তারিখে লেখা ডঃ জেন্‌সের চিঠিতে একটি জিনিস ধাঁধার মতো দুর্বোধ্য

মনে হয়। তিনি বলছেন—'ব্রাহ্মণের যে মহান গর্ব যাকে পুরোপুরি দোষাবহ বলা যায় না তা তাঁকে বিজাতীয় ধর্মাবলম্বী দূর দেশসমূহে অর্থ ভিক্ষা করে অনুগ্রহপ্রার্থী হতে দেবে না। এটা করা হলে একটি দৃঢ়মূল ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের পরিপন্থী কাজ করা হবে, এ হলো প্রশ্নাতীত সত্য—আমরা তা সমর্থন করি বা না করি।' তাই যদি হয় তাহলে এখন এথিক্যাল সোসাইটির একটি সভায় শ্রীযুক্ত ব্যানার্জীর বিধবাশ্রম এবং বিধবা বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে কি করে অর্থ সংগ্রহ করা যাবে? ডঃ জেন্‌স কি মনে করেন যে, পুরো এথিক্যাল সোসাইটিটি এই বাগ্মী হিন্দুটির দ্বারা হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে এবং তারপর তারা আর 'বিজাতীয় ধর্মের' লোক থাকছেন না যাদের কাছ থেকে 'দোষাবহ নয় এরকম গর্বে গর্বিত' একজন হিন্দু অর্থ সংগ্রহ করতে বাধা দেবেন? বোস্টনের কতিপয় মহিলা ঘোষণা করেছেন যে, সুদর্শন হিন্দুটি তাঁদের সম্মোহিত করেছেন এবং আমরাও এথিক্যাল সোসাইটির অমন সুপণ্ডিত সভাপতি মহাশয়ের বুদ্ধি-বিকৃতির কারণ একই বলে তাঁর কথাগুলি ধর্তব্যের মধ্যে না আনতে পারি। কারণ এ সুনিশ্চিত যে, এরকম কোন বিকাশ করে দেওয়া শক্তি বিনা এরকম একজন সুদক্ষ ব্যক্তি সাধারণ বোধবুদ্ধি হারাতে পারেন না। আমরা এই সম্মোহিনী শক্তি সম্বন্ধে নিঃসংশয় হই যখন আমরা পূর্বোক্ত মার্চের ৩ তারিখের চিঠিতে পড়ি যে, রমাবাঈয়ের কর্মের উদ্দেশ্যকে যে স্বামী বিবেকানন্দ সমালোচনা করেন তা নয়, করেন তাঁর অর্থসংগ্রহের পদ্ধতিকে এবং এইসকল উপায় অবলম্বন করে বড় কোন ফল লাভ হতে পারে—এতে তিনি বিশ্বাস করেন না। স্বামী বিবেকানন্দ 'শ্রীযুক্ত ব্যানার্জীর একজন বন্ধু এবং তাঁর কাজের ওপর আস্থা রাখেন।' শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ নিশ্চিতরূপে কোন জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করেছেন নতুবা তিনি সভাপতি এবং তাঁর সম্প্রতি ধর্মান্তরিত সমিতির সকলের কাছ থেকে এ-কথা লুকিয়ে রাখলেন কি করে যে, শশীপদ ব্যানার্জী ১৮৭১ সালের ১৮ এপ্রিল ইংলণ্ডের উদ্দেশ্যে সস্ত্রীক যাত্রা করেন এবং সে-দেশের সর্বত্র ভ্রমণকালে ভারতে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনের কাজে অর্থ সংগ্রহ করে সহায়তা করার জন্য বহু সমিতি গঠন করেন? এই ভ্রমণের একটি লক্ষণীয় ফল যা শ্রীযুক্ত ব্যানার্জী নিজমুখে তাঁর বিধবাশ্রম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ব্যক্ত করেছেন তা হলো—'বিধবাশ্রম ইংলণ্ডের বন্ধুবর্গের সাহায্য এবং সমর্থন ছাড়া কখনোই সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারত না।' যেহেতু তিনি শ্রীযুক্ত ব্যানার্জীর

ধর্মমত সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাঁকে হিন্দু বলে অভিহিত করেছেন এবং তিনি তাঁর নিজধর্মের শ্রেষ্ঠ নাগরিকদের মধ্যে অনেকের সমর্থন লাভ করেছেন বলে প্রশংসা করেছেন—এর থেকে এ-সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ে যে, তিনি তাঁকে একজন গোঁড়া হিন্দু বলেই মনে করেন।

"সুতরাং এই বিভ্রান্তকারী প্রশ্ন আমাদের আরো বিভ্রান্তি বাড়িয়ে দেয় ঃ এটা কি করে সম্ভব যে, ডঃ জেন্‌স একথা জানেন না যে—ব্রুকলিনের এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের অবৈতনিক সংবাদদাতা সদস্য শ্রীযুক্ত শশীপদ ব্যানার্জী স্বদেশে ততখানি ধর্মদ্রোহী এবং জাতিচ্যুত বলে বিবেচিত হন যতখানি হয়েছেন রমাবাঈ নিজে? এজন্য যে প্রচণ্ড নির্যাতন শ্রীযুক্ত ব্যানার্জী ভোগ করেছেন, তা যে যখন তিনি প্রথম বিধবাদের বন্ধু হিসাবে কাজ শুরু করেছেন অথবা যখন তিনি স্ত্রীশিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন তখন নয়, পেয়েছেন তখনই যখন ১৮৬৫ সালের জুলাই মাসে তিনি মূর্তিপূজা অস্বীকার করে জাতি এবং ব্রাহ্মণত্বের অভিজ্ঞান যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করেন। পরবর্তী আগস্ট মাসে গোঁড়া হিন্দুদের একটি সভায় স্থির হয় যে—'এঁর ওপর অত্যাচার চালাতে হবে'। দিবারাত্র সভা করা হয়েছে তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে নানাবিধ অসুবিধায় ফেলবার জন্য। একজনও সহায়ক বন্ধু ছিল না তখন তাঁর পাশে, কোন দিক থেকে একটি সহানুভূতিসূচক কথাও কেউ বলেনি তখন তাঁকে। শ্রীযুক্ত উইলসন 'বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষাসূচক' গ্রন্থে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি ইণ্ডিয়া মাইনর [ইণ্ডিয়ান মিরর] পত্রিকায় একজন ইংরেজের চিঠিতে উল্লিখিত হয়েছিল—'হঠাৎ এ-বিদ্যালয়টির অগ্রগতি থেমে গিয়েছে কারণ এর প্রতিষ্ঠাতা ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। কয়েক মাস ধরে তাঁর ভাগনী ছাড়া অন্য কোন ছাত্রী সে-বিদ্যালয়ে পদার্পণ করেনি।'

"কিন্তু আমরা রমাবাঈয়ের বিরুদ্ধে যে-সকল আপত্তি তোলা হয়েছে তা বোধগম্য নয় বলে পরিত্যাগ করেছি, কারণ ডঃ জেন্‌সের মার্চের ৩ তারিখের চিঠিতে বলা হয়েছে যে, শশীপদ ব্যানার্জীর কাজকর্মের প্রশংসা করা হয়েছে কারণ 'সে-কাজ নীরবে ঢাকঢোল না পিটিয়ে করা হয়েছে' এবং পণ্ডিতার কাজকর্মের নিন্দা করা হয়েছে কারণ তা নীরবে করা হয়নি এবং ঢাকঢোল পিটিয়ে করা হয়েছে। নিশ্চিতরূপেই এই সজ্জন ডাক্তার কোন প্রকার সাংঘাতিক অশুভ প্রভাবের কবলে পড়েছেন। কারণ শ্রীযুক্ত ব্যানার্জীর কাজকর্ম সম্পর্কিত প্রত্যেকটি প্রকাশিত পুস্তকে এ-সংবাদ পাওয়া

যায় যে, তাঁর বিদ্যালয়ের সূচনা থেকেই তিনি সমর্থন পেয়েছেন সম্ভ্রান্ত বংশীয় লর্ড এবং লেডীদের নিকট থেকে এবং উচ্চপদস্থ ধর্মযাজকদের কাছ থেকে, আবার উপহার পেয়েছেন ইংলণ্ডের রাজ পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে এবং মহামান্য রাণীর কাছ থেকে পেয়েছেন অভিনন্দনপত্র। শ্রীযুক্ত ব্যানার্জী সাহায্য প্রাপ্তির প্রত্যেকটি পথ সম্বন্ধে ভাল করে সংবাদ রাখতেন, আমরা ভাল করে জানি রমাবাঈয়ের উদ্যমের সূচনাকাল থেকে তাঁর সাহায্যের আবেদনপত্রগুলি কে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে নিন্দা করা দূরে থাকুক আমরা তাঁর কর্মপদ্ধতিকে সমর্থন করি। সত্যসত্যই ইংলণ্ড ভ্রমণের উদ্দেশ্যে তাঁর যাত্রা করা দেখেই রমাবাঈ তাঁর পথের দিশা পেয়ে যান এবং বিনয়নম্রভাবে তাঁর প্রদর্শিত পথই এদেশে এসে অনুসরণ করেন। সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'বম্বে এডুকেশন্যাল রিভিউ' পত্রিকায় বলা হয়েছে : 'আমরা বিস্মিত হয়ে ভাবছি একজন অরক্ষিত হিন্দু বিধবার আমেরিকা যাত্রা করা, সেখানে আমেরিকাবাসী মহিলাগণ কর্তৃক তাকে সহৃদয়তার সঙ্গে গ্রহণ করা, রমাবাঈগোষ্ঠী সকল গঠন এবং পরিশেষে এই পথিকের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন এবং শারদা সদনকে একটি ৪৫,০০০ টাকা মূল্যের নিজস্ব ভবনে প্রতিষ্ঠা—কোন্ গুণবাচক অভিধায় অভিহিত করব ? রোমাঞ্চকর শব্দটি এর উপযুক্ত নয়। এটা খুবই সন্তোষের ব্যাপার যে, ভারতের নিজ সমাজের যাঁরা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাঁদের আন্তরিক সহানুভূতি এই বিবিধ গুণশালী সাহসী মারাঠী মহিলার প্রতি বর্তমান আছে।'

"পণ্ডিতা রমাবাঈ বাবু কেশবচন্দ্র সেনের একজন শিষ্যা এবং বন্ধু ছিলেন। এই মহান আচার্যের দেওয়া পুস্তকাদি হতেই ইনি সর্বপ্রথম খ্রীস্টধর্মের কথা জানতে পারেন এবং এঁর কাছ থেকেই শ্রীযুক্ত ব্যানার্জী তাঁর আধ্যাত্মিক প্রেরণা লাভ করেছিলেন। চন্দ্র সেন ছিলেন একটি উদারপন্থী ধর্মীয় সমাজের প্রতিষ্ঠাতা যার ঈশ্বরভক্তির জন্য ঠিক ততখানি খ্যাতি যতখানি বিবেকানন্দ যে নব্য-হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত তার 'আত্মার মুক্তির' বাণীর খ্যাতি তাঁর ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে। আমি শ্রীযুক্ত ব্যানার্জীর জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে যে-সকল বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে বৃথাই অন্বেষণ করেছি, কোন সন্ন্যাসী বন্ধু ও সাহায্যকারীর নাম, তিনি বিশদভাবে যারা প্রভূত সাহায্য করেছে এবং যারা সামান্যতম বন্ধুজনোচিত কর্ম করেছে সকলেরই নামোল্লেখ করেছেন। আমি তার মধ্যে কোন সন্ন্যাসীর নামের কোন উল্লেখ পেতে ব্যর্থ হয়েছি, যদি না সত্যসত্যই যে-সকল গোঁড়া হিন্দু দলে দলে এসে তাঁকে নির্যাতন

করেছিল, ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করবার জন্য তাদের মধ্যে নামহীন ভাবে তিনি থেকে থাকেন। সত্যসত্যই শ্রীযুক্ত ব্যানার্জী কলকাতার যে-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন সেই ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র ইউনিটি অ্যাণ্ড মিনিস্টার পত্রিকা এ-কথাও বলে যে, তারা বাবু নরেন্দ্রনাথ দত্তকে (ওরফে স্বামী বিবেকানন্দ) নব-বৃন্দাবন রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা হিসাবে অধিক জানে, একজন দার্শনিক হিসাবে নয়। এথিক্যাল সোসাইটি হিন্দু পত্রিকাসমূহ হতে তাদের আশ্রিতের সম্পর্কে বহু প্রশংসাসূচক অংশ প্রকাশিত করেছে, কিন্তু তারা ভারতের অন্যান্য উচ্চমানের পত্রিকাসমূহে যে-সকল সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে, তা উপেক্ষা করেছেন বলে মনে হয়। 'ইণ্ডিয়ান রিভিউ' বিবেকানন্দ যে হিন্দুধর্ম প্রচার করছেন—এ ধারণাকেই উপহাস করেছে, বলছে যে তাঁর নীতিশাস্ত্র শিক্ষা হয়েছিল কলকাতার একটি খ্রীস্টীয় মহাবিদ্যালয়ে এবং ইউনিটি এ্যাণ্ড মিনিস্টার পত্রিকা, যা হতে আমরা ওপরে উদ্ধৃতিসকল উল্লেখ করেছি, আরো বলছে যে—আধুনিক হিন্দুধর্মের যে কোন একজন অনুরাগী (বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে) আমাদের নিকট থেকে সেই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে না, যা খাঁটি একজন গোঁড়া হিন্দুর ওপর আমাদের আছে।"

যেদিন 'ঈগ্‌ল' পত্রিকায় এই অসাধারণ সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়, সেই একই দিনে 'ব্রুকলিন টাইম্‌স'-এ নিম্নলিখিত ঘোষণাটি প্রকাশিত হয় ঃ

ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসন—আগামী ৭ এপ্রিল সন্ধ্যা আটটায় ৩৪৫ নং ক্লিন্টন অ্যাভিনিউস্থ পাউচ মঞ্চে স্বামী বিবেকানন্দের বিনা প্রবেশমূল্যে ভাষণ। বিষয় ঃ 'কিছু ভারতীয় রীতিনীতি—তাদের অর্থ কি এবং কিভাবে সেগুলির অপব্যাখ্যা করা হয়।' বাবু শশীপদ ব্যানার্জীর হিন্দু বিধবাগণের বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহ করা হবে। সকলকে যোগদানের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

স্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিয়ন এবং ডেইলী ঈগ্‌ল পত্রিকায় এপ্রিলের ৮ তারিখে তাঁর বক্তৃতার বিবরণ প্রকাশিত হয়—ভাষণটি দেবার সময় স্বামীজী মঞ্চে পায়চারি করছিলেন—"তাঁর চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল এবং তাঁর মুখমণ্ডলে ছিল অগ্নিশিখার আবরণ"—শ্রীমতী ম্যাক্‌কিন এবং তাঁর সকল বিরোধীদের অভিযোগের উত্তর দিলেন তাঁর স্বকীয় পদ্ধতিতে।

যথাক্রমে প্রতিবেদন-দুটির পাঠ নিম্নোক্তরূপ ঃ

তাদের রীতিনীতিসমূহ

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্বন্ধে বললেন
জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে তাঁর ভাষণ—জাতিভেদের সুবিধা এবং অসুবিধাসমূহ
এবং
অদূর ভবিষ্যতে এগুলির মূলোচ্ছেদের সম্ভাবনা।

গত রাত্রে ক্লিন্টন অ্যাভিনিউস্থ পাউচ মঞ্চে এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয় যার বিশেষ কার্যসূচী ছিল হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ। যে বিষয়টির ওপর ভাষণটি দেওয়া হয়, সেটি ছিল "হিন্দুদের কিছু রীতিনীতি—সেগুলির অর্থ কি এবং কিভাবে সেগুলির অপব্যাখ্যা করা হয়।" প্রশস্ত সভাগৃহে প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল।

পরিধানে প্রাচ্য পোশাক, উজ্জ্বল চক্ষু এবং মুখে প্রতিভার দীপ্তি নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর স্বদেশ, তার অধিবাসী এবং রীতিনীতি সম্বন্ধে বলতে আরম্ভ করলেন। বক্তা বলেন, "শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট তিনি শুধু চান তাঁর ও তাঁর স্বদেশের প্রতি ন্যায় দৃষ্টি।" তিনি ভাষণের প্রারম্ভে ভারত সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা উপস্থাপিত করবেন। তিনি বলেন, 'ভারত একটি দেশ নয়, মহাদেশ। যে-সব পর্যটক কখনো ভারতবর্ষে যাননি, তাঁরা তার সম্পর্কে অনেক ভুল তথ্য প্রচার করেছেন। ভারতে নয়টি পৃথক প্রধান ভাষা আছে আর প্রাদেশিক উপভাষার সংখ্যা একশতেরও বেশি।" বক্তা তাঁর দেশ সম্বন্ধে যাঁরা বই লিখেছেন, তাঁদের কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, এইসব ব্যক্তির মস্তিক কুসংস্কার দ্বারা বিকৃত হয়ে গেছে। এদের একটি ধারণা এই যে, এদের ধর্মের গণ্ডীর বাইরে প্রত্যেকটি লোক ভয়ানক শয়তান। হিন্দুদের দন্তধাবন প্রণালীর অনেকসময় কদর্থ করা হয়ে থাকে। তারা মুখে পশুর লোম বা চামড়া ঢুকানোর পক্ষপাতী নয় বলে বিশেষ কয়েকটি গাছের ছোট ডাল দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করে। জনৈক পাশ্চাত্য লেখক এজন্য লিখেছেন, 'হিন্দুরা প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করে একটা গাছ গিলে ফেলে।' বক্তা বলেন যে, হিন্দু বিধবাদের জগন্নাথের রথচক্রের নীচে আত্ম বলিদানের রীতি কখনো ছিল না। এ গল্প যে কিভাবে চালু হলো তা বোঝা ভার।

জাতিভেদ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের মন্তব্যগুলি ছিল বেশ ব্যাপক এবং চিত্তাকর্ষক। ভারতীয় জাতিপ্রথা উচ্চাবচ শ্রেণীতে বিভক্ত নয়। প্রত্যেকটি জাতি নিজ নিজ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ। জাতিপ্রথা কোন ধর্মকৃত্য নয়, তা হলো বিভিন্ন কারিগরির বিভাগ ব্যবস্থা স্মরণাতীত কাল থেকে তা মানবসমাজে প্রচলিত রয়েছে। বক্তা ব্যাখ্যা করে দেখান কিভাবে সমাজে প্রথমে কয়েকটি

মাত্র নির্দিষ্ট অধিকার বংশানুক্রমিক ছিল। পরে চলল প্রত্যেকটি শ্রেণীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন করা আর বিবাহ ও পানাহারকে সীমাবদ্ধ করা হলো নিজ নিজ শ্রেণীর মধ্যে।

হিন্দুগৃহে খ্রীস্টান বা মুসলমানের উপস্থিতিতে কি প্রভাব হয়, বক্তা তা বর্ণনা করেন। কোন শ্বেতকায় ব্যক্তি হিন্দুদের ঘরে ঢুকলে ঘর অশুচি হয়ে যায়। বিধর্মী গৃহে এলে গৃহস্বামী প্রায়ই স্নান করে থাকেন। অন্ত্যজ জাতিদের প্রসঙ্গে বক্তা বলেন যে, তারা সমাজে মেথরের কাজ, ঝাড়ুদারি প্রভৃতি কাজ করে থাকে এবং তারা গলিত মাংসভোজী। তিনি আরো বলেন যে, ভারত সম্বন্ধে যে সকল পাশ্চাত্য লেখক বই লিখেছেন তাঁরা সমাজের এই সকল নিম্নস্তরের লোকেদের সংস্পর্শেই এসেছেন, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের জীবনের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটেনি। জাতির নিয়ম কানুন ভাঙলে কি শাস্তি হয়, তা বক্তা বর্ণনা করেন। শাস্তি শুধু এই যে, নিয়মভঙ্গকারী যে জাতির অন্তর্ভুক্ত, সেই জাতির মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান ও পানাহার তাঁর ও তাঁর সন্তানগণের পক্ষে নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে অন্য যে-সব ধারণা পাশ্চাত্যে প্রচারিত তা অতিরঞ্জিত ও ভুল।

জাতিপ্রথার দোষ দেখাতে গিয়ে বক্তা বলেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ না দিয়ে এ প্রথা জাতির কর্মজীবনে জড়তার সৃষ্টি করেছে এবং তাতে জনগণের অগ্রগতি সম্পূর্ণভাবে প্রতিহত হয়েছে। এই প্রথা সমাজকে পাশবিক রেষারেষি থেকে মুক্ত রেখেছে সত্য, কিন্তু অন্যদিকে তা সামাজিক উন্নতি রুদ্ধ করেছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা বন্ধ করে তা প্রজাবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। জাতিপ্রথার সপক্ষে বক্তা বলেন যে, ওটাই সমতা এবং ভ্রাতৃত্বের একমাত্র কার্যকর আদর্শ। কারও আর্থিক অবস্থা জাতিতে তার উচ্চাবচ স্থানের পরিমাপক নয়। জাতির মধ্যে প্রত্যেকেই সমান। বড় বড় সমাজ-সংস্কারকগণের সকলেরই চিন্তায় একটা মস্ত ভুল হয়েছিল। জাতিপ্রথার যথার্থ উৎপত্তি সূত্র যে সমাজের একটা বিশিষ্ট পরিবেশ, সেটা দেখতে না পেয়ে তাঁরা মনে করেছিলেন ধর্মের বিধিনিষেধই ঐ প্রথার জনক। বক্তা ইংরেজ ও মুসলমান শাসকগণেব দেশকে বেয়নেট, গোলাবারুদ এবং তরবারির সাহায্যে সুসভ্য করার চেষ্টার তীব্র নিন্দা করেন। তাঁর মতে জাতিভেদ দূর করতে হলে সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধ্বংসসাধন একান্ত প্রয়োজন। তিনি বলেন, এটার চেয়ে বরং বঙ্গোপসাগরের জলে সকলকে ডুবিয়ে মারা শ্রেয়। ইংরেজী সভ্যতার উপাদান হলো তিনটি 'ব'—বাইবেল, বেয়নেট ও ব্র্যাণ্ডি। এরই নাম সভ্যতা। এই সভ্যতাকে

এতদূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে, একজন হিন্দুর গড়ে মাসিক আয় ৫০ সেন্টে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। রাশিয়া বাইরে দাঁড়িয়ে আছে আর বলছে 'আমরাও একটু সভ্যতা নিয়ে আসি।' ইংলণ্ডের সভ্যতা বিস্তার কিন্তু চলছেই।

সন্ন্যাসী বক্তা মঞ্চের ওপর একদিক থেকে অপর দিকে পায়চারি করতে করতে হিন্দুদের প্রতি কিভাবে অবিচার করা হয় তা বর্ণনা করার সময় খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তাঁর কথাও বেশ দ্রুত গতিতে চলে। বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দুদের কটাক্ষ করে তিনি বলেন যে, তারা স্বদেশে ফিরবে শ্যাম্পেন আর বিজাতীয় নতুন ভাবে পুরোপুরি দীক্ষা নিয়ে। বাল্যবিবাহকে নিন্দা করার এত ধূম কেন? না, সাহেবরা বলেছে ওটা খারাপ। হিন্দুগৃহে শাশুড়ী যদি পুত্রবধূকে নিপীড়ন করে তো তার কারণ এই যে পুত্র প্রতিবাদ করে না। বক্তা বলেন, বিদেশীরা যে-কোন সুযোগে হিন্দুদের ওপর গালিবর্ষণ করতে উন্মুখ, কেন-না তাঁদের নিজেদের এত বেশি দোষ আছে যে, তাঁরা তা ঢাকা দিতে চান। তাঁর মতে প্রত্যেক জাতিকে নিজের মুক্তি সাধন নিজেই করতে হবে, অন্য কেউ তার সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে না।

বিদেশী ভারত-বন্ধুদের প্রসঙ্গে বক্তা জিজ্ঞেস করেন আমেরিকায় ডেভিড হেয়ারের কথা কেউ কখনো শুনেছে কিনা। ইনি ভারতের নারীদের জন্য প্রথম কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের অধিকাংশ শিক্ষা প্রচারের জন্য ব্যয় করেন। বক্তা অনেকগুলি ভারতীয় প্রবাদ বাক্য শোনান। ঐগুলি আদৌ ইংরেজগণের প্রশংসাসূচক নয়। ভারতের জন্য একটি ব্যাকুল আবেদন প্রকাশ করে তিনি বক্তৃতার সমাপ্তি করেন। তিনি বলেন, 'ভারত যতদিন তার নিজের প্রতি এবং ধর্মের প্রতি খাঁটি থাকবে। ততদিন কোন আশঙ্কার কারণ নেই। কিন্তু ঈশ্বর-জ্ঞানহীন এই ভয়ানক পাশ্চাত্য যখন ভারতে ভণ্ডামি ও নাস্তিকতা রপ্তানি করে, তখনই ভারতের বুকে প্রচণ্ড আঘাত হানা হয়। ঝুড়ি ঝুড়ি গালাগাল, গাড়ি বোঝাই তিরস্কার আব জাহাজ ভর্তি নিন্দা না পাঠিয়ে অন্তহীন একটি প্রীতির স্রোত নিয়ে আসা হোক্। আসুন, আমরা সকলে মানুষ হই।'*

সন্ন্যাসীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে প্রস্তাবাদি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং বাবু শশীপদ ব্যানার্জী প্রতিষ্ঠিত বরানগরস্থিত হিন্দু বিধবাদের জন্য বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে অর্থ সংগৃহীত হয়।

---

* বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১১২-৫

ভারতকে একাকী থাকতে দাও
তাহলে ভারতের সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে,
বলছেন স্বামী বিবেকানন্দ

ভারতের স্বামী বিবেকানন্দ গতরাতে ইংলণ্ডের কড়া সমালোচনা করেছেন, ইনি পাউচ প্রাসাদে প্রচুর শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে বক্তৃতা করছিলেন। তিনি বলেন ইংরেজরা ভারতকে সভ্য করবার জন্য তিনটি 'ব' ব্যবহার করেছে—বাইবেল, ব্র্যাণ্ডি (অর্থাৎ মদ) এবং বন্দুক। ধর্মপ্রচারক এগিয়ে গিয়েছেন বাইবেল হাতে দুর্গের ভিত্তিমূলে ঘা দেবার জন্য। তিনি বলেন ইংরেজরা তাদের লেখায় ভারতের সামাজিক পরিস্থিতিকে অতিরঞ্জিত করেছে। যারা পারিয়া অর্থাৎ মেথর শ্রেণী তাদের কাছ থেকে সব ধারণা সংগ্রহ করেছে। তিনি ঘোষণা করেন যে-কোন আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হিন্দু একজন ইংরেজের সহযোগী হবে না। জগন্নাথের রথের সামনে বিধবাদের নিজেকে নিক্ষেপ করার কাহিনীকে তিনি বলেন—কল্পিত। বাল্যবিবাহ এবং জাতিভেদপ্রথা নিন্দনীয়—এ-কথা তিনি স্বীকার করেন। তিনি বলেন জাতিভেদের সূচনা হয় বৃত্তি-ভিত্তিক গোষ্ঠীগঠন হতে। ভারতের যা প্রয়োজন তা হলো তাকে তার নিজের মতো চলতে দেওয়া এবং তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

উপর্যুক্ত এই সকল প্রতিবেদন থেকে যদি বিচার করতে হয় তাহলে মনে হবে যে, রমাবাঈ গোষ্ঠীর অভিযোগসমূহের বিশদ উত্তর দেওয়া তো দূরের কথা স্বামীজী এমন কি বিধবাদের পরিস্থিতি সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেননি! আগে যেসকল বক্তৃতা দিয়েছেন তিনি সেগুলিরও পুনরাবৃত্তি করেননি। তিনি নিজের ছাড়া অন্যান্য যোগ্য ব্যক্তিদের সমর্থন উল্লেখ করে সেগুলি জোরদারও করেননি। বরঞ্চ ভারতের রীতিনীতিসমূহের ব্যাখ্যা করে এবং সমস্ত ব্যাপারে নাক গলানো যাদের স্বভাব সেই বিদেশীদের সম্বন্ধে হিন্দুদের যে মনোভাব তা উল্লেখ করেন। তিনি বিধবাদের যে বিশেষ সমস্যা সেটিকে একটি নতুন আলোকে আলোকিত করেন তাঁর বিরোধীদের বিরোধিতার মূল ভিত্তি উচ্ছেদ করে এবং তাঁর কথাবার্তা আবেগের প্রগাঢ়তায় তেজোময় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু জনসাধারণের মনে এই প্রবল আবেগ-মণ্ডিত ভাষণ যত গভীরে প্রবেশ করে প্রভাব বিস্তার করে থাকুক না কেন, আপাতদৃষ্টিতে নথিপত্র দ্বারা প্রমাণিত, শ্রীমতী ম্যাক্‌কিনকৃত অভিযোগগুলির প্রত্যেকটির দফায় দফায় উত্তর কিন্তু স্বামীজী দেননি, বিতর্কমূলক প্রশ্নগুলিকে যেন হাওয়ায়

ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হিন্দু বিধবাগণ আইনের হাতে সুবিচার পেয়েছেন না পাননি—শ্রীমতী ম্যাক্‌কিন বলছেন পাননি, স্বামীজী বলছেন পেয়েছেন, বিষয়টি সেখানেই ঝুলে রইল এবং এমতাবস্থায় পুনর্বার মহান ডঃ জেন্‌স কলম ধরলেন। এপ্রিলের ১৬ তারিখে মেরী হেলকে লেখা শ্রীমতী বুলের একটি চিঠিতে শ্রীমতী ম্যাক্‌কিনের অভিযোগের উত্তরে স্বামীজী সম্বন্ধে জেন্‌সের মন্তব্যসকল পাওয়া যায়। শ্রীমতী বুল যা লিখেছেন তা অংশত নিম্নোক্তরূপ :

আমি এইমাত্র একটি চিঠি পেয়েছি তার থেকে কিছু উদ্ধৃতি এখানে দিচ্ছি। এতে তোমার কৌতূহল কিছুটা মিটবে, কারণ উদ্ধৃতিটি হলো অতি সুন্দর মন এবং চরিত্রের অধিকারি এবং যাঁর বন্ধুত্ব ও প্রশংসা মূল্যবান এমন একজনের লেখা—ইনি হলেন ব্রুকালিন এথিক্যাল সোসাইটির সভাপতি ডঃ জেন্‌স এবং তিনি বলছেন—"স্বামীজী যে ব্রুকলিনে আমাদের মধ্যে এসেছিলেন এতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছি—এবং তাঁর বক্তৃতার যা ফলশ্রুতি ও রমাবাঈ গোষ্ঠীর সঙ্গে যে যৎসামান্য বিতর্ক ঘটেছে তা সুনিশ্চিতরূপে হিন্দুদের ধর্ম-দর্শনের ও সমাজ-জীবন সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আরো অধিকতর উদার এবং ন্যায়সঙ্গত হয়ে উঠতে সহায়তা করবে। ... আমি ঈগ্‌ল পত্রিকায় প্রকাশিত অভিযোগসূমহের একটি পূর্ণাবয়ব উত্তর, মনুসংহিতা এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রামাণ্য গ্রন্থাদি হতে প্রচুর উদ্ধৃতিসহ প্রস্তুত করেছি, যা ব্রুকলিনের সমালোচকগণ কর্তৃক উত্থাপিত আইনগত প্রশ্ন সকলের সম্পূর্ণরূপে নিষ্পত্তি করবে। আমার প্রবন্ধটি দীর্ঘ, আমি সেজন্য নিশ্চিত নই ঈগ্‌ল এটা ছাপবে কিনা, কিন্তু যে-কোন উপায়েই হোক আমি ব্রুকলিনের জনগণের সামনে উত্তরটি উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করব।"[১৬]

ঈগ্‌লকে প্রশংসা করতে হয়, ঈগ্‌ল সত্যই ডঃ জেন্‌সের প্রবন্ধটি ছাপল এবং চোখে পড়বার মতো বড় বড় অক্ষরে শিরোনামা দিয়ে ছাপল :

ভারতে নারীর স্থান

ডঃ জেন্‌স কর্তৃক নারীর সামাজিক ও আইনগত মর্যাদার বিচার

তিনি বলেন যে সবকিছু তত মন্দ
নয় যতটা মন্দ বলে অঙ্কিত হয়েছে।
স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষ সমর্থন।

এই শিরোনামার নিচে যে প্রবন্ধটি দেওয়া হয় তা সত্যই দীর্ঘ, ঈগ্‌লের পাতার আড়াই স্তম্ভ এবং হিন্দু নারীগণের সামাজিক ও আইনগত মর্যাদা

সম্পর্কিত বিতর্কিত কোন একটি বিষয়েরও উত্তর না দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়নি, ডঃ জেন্‌স সাধারণভাবে হিন্দুজনগণকে এবং বিশেষভাবে স্বামীজীকে নাছোড়াবান্দা নিন্দুকদের হাত থেকে রক্ষা করতেও অবহেলা করেন নি। সংক্ষেপে বলতে গেলে তিনি শ্রীমতী ম্যাক্‌কিনকে একটি পূর্ণাবয়ব এবং প্রশ্নের অবকাশরহিত উত্তর দেন। প্রকৃতপক্ষে বিরোধীদের দাঁড়াবার আর কোন স্থানই তিনি রাখেননি। এই প্রবন্ধটির (অথবা পত্রটি, কারণ ডঃ জেন্‌স এটিকে সম্পাদক সমীপেষু—একটি পত্র হিসাবে লিখেছেন) পুরো বয়ানটি 'ঘ' পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে, সুতরাং এখানে কিছুটা সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত করা হলো। ডঃ জেন্‌স অংশত লিখেছেন ঃ

...সম্ভবত এমন কোন জীবিত ইউরোপীয় নেই, যিনি অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার অপেক্ষা হিন্দু জনগণ, তাদের পবিত্র শাস্ত্রাদি এবং আইন বিষয়ক সংহিতাসমূহের বিষয়ে অধিক জ্ঞাত আছেন। তাঁর চিত্তাকর্ষক ছোট্ট একটি পুস্তক—"ভারত ঃ আমাদের কি শিক্ষা দিতে পারে?" এটি আদতে হলো কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের সম্মুখে প্রদত্ত একটি বক্তৃতামালা। তার মধ্যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় হলো—"হিন্দুদের সৎ চরিত্র"। সেখানে তিনি তাদের এত উচ্চ প্রশংসা করেছেন যা লাভ করতে পারলে যে-কোন জাতিই গৌরব বোধ করবে। ভারতের বহু পর্যটক এবং শিক্ষার্থীদের উক্তিসমূহ উদ্ধৃত করে তিনি স্বয়ং মন্তব্য যোগ করেছেন যে—"আমি এভাবে গ্রন্থের পর গ্রন্থ উদ্ধৃত করতে পারি, বারে বারে যাতে দেখব যে, ভারতের সংস্পর্শে যাঁরাই এসেছেন তাঁরাই ভারতের জনসাধারণের সত্যের প্রতি ভালবাসা দেখে মোহিত হয়েছেন এবং লক্ষ্য করেছেন এটি হলো তাদের জাতীয় চরিত্রের মস্ত বড় একটি দিক। কেউ কখনো তাদের মিথ্যা ভাষণের অপবাদ দেয়নি।" এই প্রসঙ্গের শেষে তিনি বলেছেন—"নিঃসন্দেহে ভারতের জনগণের নৈতিক ভ্রষ্টতা আছে এবং পৃথিবীর এমন কোন্ জায়গা আছে যেখানে নৈতিক ভ্রষ্টতা নেই? কিন্তু এ-বিষয়ে বিভিন্ন জাতির যে পরিসংখ্যান আছে তা উদ্ধৃত করা খুব বিপজ্জনক খেলা হয়ে দাঁড়াবে।... অন্যদের সাধারণ বা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে আমরা যদি সহৃদয় মনোভাব দেখাই তা কখনই কারও ক্ষতি করবে না, একথা ভুললে চলবে না। এই সত্যের পূজারী জাতি এবং এদের সম্মানিত ধর্মীয় আচার্যদের মধ্যে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিগণ এক শত সহস্র সংখ্যক, তাঁদেরই একজন প্রতিনিধি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি

একজন আইনবিদ্ হিসাবে শিক্ষালাভ করেছেন—রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা হিসাবে নয় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে উচ্চ সম্মানের সঙ্গে স্নাতক পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি কেবলমাত্র মনু বা তৎপরবর্তী হিন্দু আইন প্রণেতাদের সম্বন্ধেই নয়, তুলনামূলক আইনেও শিক্ষাপ্রাপ্ত। যে-সকল ব্যক্তিবর্গ বর্তমান বিতর্কে আগ্রহান্বিত যদি তাদের আগ্রহের কথা বিবেচনা করতে হয়, তাহলে তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারেন যে, ইনি যা বলছেন তা এ-সম্বন্ধে ভাল করে জেনেই বলেছেন এবং হিন্দুনারীর উত্তরাধিকার সম্বন্ধে প্রশ্নাতীত তথ্যসমূহও দিয়েছেন। রমাবাঈ গোষ্ঠীর মাননীয়া পরিচালিকার যে সাক্ষাৎকারটির বিবরণ গত শনিবার ঈগল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তা কৌতূহলোদ্দীপক এবং তার মধ্যে পড়াশুনা করে হিন্দু বিধবাদের মর্যাদা সম্বন্ধে তথ্যসমূহ উদঘাটিত করবার জন্য প্রশংসনীয় উদ্যম নেওয়া হয়েছে। আমার আশঙ্কা, ভদ্রমহিলাটি তাঁর তথ্যাদি লোকমুখে শোনা উৎস হতে সংগ্রহ করেছেন, মূল প্রামাণ্য সূত্র হতে নয়, তা না হলে তাঁর সাক্ষাৎকারে এমন কিছু মন্তব্য করেছেন যা হয়ত করতেন না। প্রথমত একটি কথায়, স্বামী বিবেকানন্দ একজন অভিনেতা ছিলেন; এ কাহিনীটির নিষ্পত্তি করা যাক।

[এখানে ডঃ জেন্‌স বেশ বিশদভাবে বর্ণনা দিয়েছেন কোন্ পরিস্থিতিতে স্বামীজী (বেদমন্ত্রাদি উচ্চারণ করে) কেশবচন্দ্র সেন রচিত ধর্মীয় নাটক 'নব বৃন্দাবন' অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন—(দশম অধ্যায়, প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য)। জেন্‌স লিখছেন—"এইভাবে তিনি নব-বৃন্দাবন রঙ্গমঞ্চে পরিচিত হন। যদি তিনি একজন অভিনেতা হন, তাহলে কেশবচন্দ্র সেন এবং প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার আরও বেশি মাত্রায় অভিনেতা।" অতঃপর জেন্‌স "স্বামী বিবেকানন্দের কাজকর্মের সমর্থনে ভারতে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভাসমূহের কথা" উল্লেখ করেন এবং আরো এর সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য প্রসঙ্গেও বক্তব্য রাখেন ঃ]

একথা সত্য যে কিছু ছিদ্রান্বেষী সমালোচক থাকতে পারে। কিন্তু ইউনিটি এ্যাণ্ড মিনিস্টার পত্রিকা হতে যে-উদ্ধৃতিটি শ্রীমতী ম্যাক্‌কিন দিয়েছেন তা প্রাসঙ্গিক নয়। নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী পত্রিকা হতে দেবেন্দ্রনাথ দাসের যে-উদ্ধৃতিটি দেওয়া হয়েছে তা এ-দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কাছে ভারতের সর্বাপেক্ষা অগ্রণী পণ্ডিতকুলের এবং ভারত-তত্ত্ব ও তার সাহিত্যের জ্ঞানার্থীদের দেওয়া যেসকল সাক্ষ্য প্রমাণাদি, মনুসংহিতা পর্যন্ত যা আমি উপস্থাপিত

করতে প্রস্তুত সে-সকলের তুলনায় অধিকতর গুরুত্ব পাবে বলে মনে করি না। আমার পাওয়া সংবাদ যদি সঠিক হয়, তাহলে শ্রীযুক্ত দাস একজন অত্যন্ত অল্পবয়স্ক এক তরুণ ভদ্রলোক যিনি রমাবাঈয়ের কয়েক বৎসরব্যাপী ইংলণ্ড ভ্রমণের সঙ্গী হয়েছিলেন। তাঁর প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল ইংলণ্ডের বাজারের জন্য এবং সুস্পষ্ট একটি অন্য উদ্দেশ্যে। স্বামী বিবেকানন্দের ঠিক এই ধরনের পক্ষ সমর্থন, যা বিকৃত একদেশদর্শী এবং ভারতের বর্তমান বিধিনিয়ম, রীতিনীতি সম্বন্ধে অতিকথন— সেগুলিতেই আপত্তি। বাস্তব তথ্য এবং মনুর সুস্পষ্ট বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে [শ্রীমতী ম্যাক্‌কিনের] এই ধরনের জোরদার দাবি "তাদের [বিধবাদের] সম্পত্তির অধিকারের প্রসঙ্গে এরকম প্রমাণ সর্বত্র আছে যে তাদের প্রকৃতপক্ষে কোন অধিকারই নেই"—খুবই আশ্চর্যজনক। মনুর বিধানে বারে বারে হিন্দু নারীগণের পৃথক সম্পত্তির অধিকার সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত, তাদের মধ্যে বিধবারাও অন্তর্ভুক্ত। বিধবাদের অধিকার সুস্পষ্ট ধারায় সংরক্ষিত। দৃষ্টান্ত হিসাবে মনুসংহিতার ম্যাক্সমূলার রচিত যে ইংরেজী প্রামাণিক গ্রন্থ 'সেক্রেড বুকস অফ দি ইস্ট' অর্থাৎ "প্রাচ্যের শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ"—তা থেকেই উদ্ধৃতি দেব অন্য কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর নিম্নমানের গ্রন্থ হতে নয়। প্রথমে আমাকে অনুমতি দিন সারা বিশ্বে যে-সকল গ্রন্থাদি প্রামাণিক এবং নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকৃত সেগুলি হতে সাধারণভাবে হিন্দু-চরিত্র এবং হিন্দু নারীদের সম্বন্ধে আইনের যে মনোভাব সে প্রসঙ্গে তার থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিতে।

[এখানে ডঃ জেন্‌স একটার পর একটা উদ্ধৃতি দিয়েছেন জন ম্যালকম, বিশপ হেবার, মাউন্ট স্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন, টমাস মুরো, স্যামুয়েল জনসন প্রভৃতি বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তিদের প্রামাণিক গ্রন্থাদি হতে। এঁরা প্রত্যেকেই একই কথা লিখেছেন—হিন্দুগণ "সাহসী, ভদ্র, বুদ্ধিমান, জ্ঞান ও উৎকর্ষলাভের জন্য সতত আগ্রহী; স্থিতধী, পরিশ্রমী, পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্যপরায়ণ, সন্তানদের প্রতি স্নেহশীল, সমরূপে নম্র এবং ধৈর্যশীল।" জেন্‌স তারপর সোজাসুজি মনু থেকে উদ্ধৃত করেছেন শ্লোকের পর শ্লোক যার মধ্যে নারীদের সম্পত্তির অধিকারের কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে।]

এর থেকে মনে হয় [জেন্‌স সংক্ষিপ্ত করে বলছেন] স্ত্রী স্বামীর ব্যক্তিগত সম্পদের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে উত্তরাধিকারত্ব লাভ করে এবং ভূসম্পত্তির ক্ষেত্রে জীবনস্বত্ব উপভোগ করে। তাই শুধু নয় তার নিজস্ব স্বতন্ত্র কোন সম্পত্তি যদি থেকে থাকে তাহলে সেটি তার সন্তানেরা

পায়, তার স্বামী নয়। যদি তার সন্তানাদি না থাকে তাহলে আইনের একটি পৃথক ধারা তার স্বামীকে উত্তরাধিকারী করে। কিংবা তাদের বিবাহ যদি বিধিসম্মতভাবে না হয়ে থাকে, তাহলে তার মাতাপিতা তার সম্পত্তির অধিকার লাভ করে, তার অবৈধ স্বামী নয়।

[জেন্‌স এরপর "মনুস্মৃতির বিধানই যে বর্তমান ভারতে প্রচলিত আইন" সে-বিষয়ে সাক্ষ্য প্রমাণাদি দাখিল করেন এবং সাক্ষ্য হিসাবে সম্প্রতি প্রাপ্ত জনৈক হিন্দু বিধবার একটি পত্র উল্লেখ করেন।]

এইভাবে [তিনি লিখছেন] আমি যে কেবল মূল গ্রন্থখানি হতে উদ্ধৃতি দিতে সমর্থ তাই নয় প্রামাণিক অনুবাদ অনুসারেও স্বামীজী যেরূপ বলেছেন আইন তদ্রূপই—এ কথাও বলতে পারি, এও প্রমাণ করতে সাক্ষ্য দাখিল করতে পারি যে এই আইন এখন মৃত নয়, প্রকৃতপক্ষে ভারতে এখনো এই আইন বলবৎ। সুতরাং আমি এই নিবেদন রাখছি যে এ-বিষয়ের পূর্ণ সাক্ষ্য প্রমাণ দেওয়া হয়েছে, যার পরে আর বলবার কিছু থাকে না এবং এ-সমস্ত সাক্ষ্য একত্রিত করার পর আমাদের অতিথির সত্যবাদিতা সম্বন্ধে বা তৎকর্তৃক এই বিষয়ে পরিবেশিত সংবাদের যাথার্থ্য সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্নই উত্থাপিত হতে পারে না। রমাবাঈ গোষ্ঠীর নেত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে "বাবু নরেন্দ্রনাথ দত্ত (ওরফে বিবেকানন্দ)" এবম্বিধ উল্লেখ দেখে দুঃখ পেলাম কারণ এই ধরনের নির্বাচিত শব্দরাজি সাধারণ পুলিস ও আদালতের নথিপত্রে তাদেরই সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয় যারা প্রবঞ্চনা করার উদ্দেশ্যে নিজ নাম ব্যবহার না করে অন্য মিথ্যা নাম ব্যবহার করে থাকে। সকলেরই এ-কথা ভাল করে জানা যে হিন্দু সন্ন্যাসীদের রীতিনীতি ক্যাথলিক এবং কোন কোন প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের মতো একই ধরনের। একজন ধর্মাচার্য কর্তৃক একটি নতুন নাম নেওয়া হয় তাঁর কর্মের জন্য সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের প্রতীক হিসাবে এবং তাঁর সংসার-জীবন ও পারিবারিক সম্পর্কের সঙ্গে পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ বোঝাবার জন্য।

স্বামী বিবেকানন্দের মাতার স্বহস্তে লিখিত একটি চিঠি যার মূল লিপিটি আমি দেখেছি এবং যার একটি অনুবাদ পাঠ করবার অনুমতি আমি পেয়েছি—তাতে দেখা যায় যে স্বামীজীর ব্রতদ্বারা যে-বিচ্ছেদ বোঝায় তা আর হাজার হাজার মাইল দূরত্ব সত্ত্বেও তিনি এখনো তাঁর সন্তানের প্রতি মায়ের ভালবাসা ও গর্ব নিয়ে দৃঢ়ভাবে তাঁর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ও বিনয়নম্রভাবে তাঁর সন্তান যে-সকল সৎকাজ সম্পন্ন করে চলেছেন

এবং দূর দেশে যে-সকল বন্ধু লাভ করেছেন তজ্জন্য কৃতজ্ঞচিত্ত হয়ে আছেন। এর চেয়ে সুমহান ও কোমল ভাবোদ্দীপক ও মাতা কর্তৃক সন্তানের প্রতি লিখিত কোন পত্র ইতঃপূর্বে আমার দৃষ্টিপথে আর কখনো পড়েনি।

[ডঃ জেন্‌স এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসন কর্তৃক বাবু শশীপদ ব্যানার্জীর কাজের জন্য দানকার্যের সমর্থনে এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, "এই সংস্থাটি প্রকাশ্য এবং স্বীকৃতভাবে অসাম্প্রদায়িক এবং বাবু শশীপদ ব্যানার্জী আমাদের সংস্থার একজন সদস্য।"]

[তিনি আরো লিখছেন] এও সত্য নয় যে, যা বলা হয়েছে, যে মনু স্মৃতিশাস্ত্রে কষ্ট-সহিষ্ণুতার বিধি কেবলমাত্র বিধবাগণের জন্য নির্দেশিত হয়েছে। এই ধরনের নিয়ন্ত্রণবিধি পুরুষদের জন্যও দেওয়া আছে, একই ধরনের নির্বাচিত শব্দসমষ্টি সহায়ে যা বিধবাদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়েছে। দ্বিজ-জাতি-সম্ভূত স্নাতকদের জন্য যে-সকল বিধিনিয়ম রয়েছে, তার মধ্যে আমরা দেখি নিম্নলিখিত বিধানটি—"নিজ বেদাধ্যয়ন বিষয়ে সে পরিশ্রমী হোক, সে কষ্ট-সহিষ্ণু হোক। অথবা যে-ফুল, মূল বা যে-ফল যথাসময়ে পক্বাবস্থায় বৃক্ষ হতে চ্যুত হয় যা তার ভিক্ষাগ্রহণের পক্ষে রীতিসম্মত, তাই গ্রহণ করে সে জীবন ধারণ করুক। সে বিলাসদ্রব্য বা আরামের জন্য কোন কিছু সংগ্রহ করতে চেষ্টা করবে না, পবিত্র-চিত্ত হয়ে ভূতলে শয়ন করবে, কোন আশ্রয়ের সন্ধান করবে না, বৃক্ষতলে বাস করবে।" এখানে যে কৃচ্ছ্রতার কথা বলা হয়েছে হয়ত আমরা তা অযৌক্তিক মনে করব, কিন্তু এর থেকে এ-কথা অতি সুস্পষ্ট যে কৃচ্ছ্রতা যে কেবল নারী বা বিধবাদের জন্য নির্দেশিত তা নয়। হিন্দুবিধবাদের পোশাক এবং জীবনচর্যার বিধি সবই মূলত ব্রহ্মচর্য ব্রতধারী শিক্ষার্থীদেরই মতো—সাদাসিধে সরল, অলঙ্কারবিহীন, অমিতাচার এবং শক্তিক্ষয়কারী আমোদপ্রমোদ বর্জিত। আমি এ-মত সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তুলছি না যে ও দেশের নারীজীবন বিশেষ করে বিধবাদের জীবন, যাদের দ্বিতীয়বার বিবাহ ও-দেশের রীতি অনুযায়ী নিষিদ্ধ—ক্লেশকর এবং তারা এমন একটি জীবনযাপন করতে বাধ্য হয় যা আমাদের মনে হয় একঘেয়ে এবং নানাদিক দিয়ে অযৌক্তিকভাবে গণ্ডীবদ্ধ। সেজন্য শিক্ষা, যা জীবনে অধিকতর সক্রিয় কর্তব্য পালনের জন্য তাদের প্রস্তুত করবে, সেই শিক্ষা অতিশয় বাঞ্ছনীয় বস্তু। এ-বিষয়ে যে কোন সজ্ঞান প্রয়াস আমার আন্তরিক প্রশংসা এবং সমর্থন পাবে। বাল্যবিবাহ কখনো কখনো এমন অবাঞ্ছিত ফল আনয়ন

করে যা ঘৃণার সঙ্গে নিন্দা করা উচিত। কিন্তু সর্বত্রই যে এরূপ ফল দেখা যায় তা নয়। এ-বিষয়ে সাম্প্রতিককালেও চিকিৎসকদের একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, পঞ্চান্নজন কর্মরত চিকিৎসকের একটি দল সমগ্র ইংরেজ-শাসিত ভারতে মাত্র তেরটি এরূপ নিন্দনীয় পরিণাম প্রত্যক্ষ করেছেন। যদি আমাদের দেশে চিকিৎসকগণকে ডাকা হয় অনুরূপ সাক্ষ্য প্রমাণ দাখিল করতে, তাহলে কি হয়? তুলনাটি কি আমাদের অনুকূলে সাক্ষ্য দেবে? বাল্যবিবাহের কোন সমর্থন বেদে নেই। এর যে অপপ্রয়োগ, তার কোন সমর্থনও মনুতে নেই। এটি এসেছে হিন্দুদের বৃদ্ধা বা তরুণী যেই হোক তাদের সতীত্ব একটি দুর্লঙ্ঘ ব্যাপার—এরূপ একটি আবেগপূর্ণ ও দুর্দমনীয় আশয় থেকে। ভারতে বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে উদার-হৃদয় হিন্দুদের পক্ষপাতিত্বহীন মতামতের জন্য, যারা এ-বিষয়ে জানতে আগ্রহী, তারা অক্টোবর ১৮৮৮ সালের নর্থ আমেরিকান রিভিউ পত্রিকায় কেশবচন্দ্র সেনের সম্পর্কে ভাগিনেয় এবং ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের একজন অবৈতনিক পত্রদাতা-সদস্য বাবু রাজকুমার রায়ের একটি প্রবন্ধ পাঠ করতে পারেন।...

ডঃ জেন্‌সের নথিপত্রাদি হতে উদ্ধৃত সাক্ষ্যপ্রমাণসহ অকাট্য প্রবন্ধটি এমন একটি অতি প্রয়োজনীয় দলিল হয়েছিল, যা না লেখা হলে শ্রীমতী ম্যাক্‌কিন এবং রমাবাঈ গোষ্ঠী কর্তৃক উত্থাপিত বিতর্কের সমাধান হতো না এবং আরো বেশি বলতে গেলে বলতে হয় যে বিভ্রান্তি থেকেই যেত। শ্রীমতী ম্যাক্‌কিন ও তাঁর সুহৃৎবর্গের পক্ষে যদিও এটি যথেষ্ট উত্তর হয়েছিল, আমরা এর সঙ্গে আরো একটু তথ্য যোগ করতে পারি বর্তমানকালের পাঠকদের স্বার্থে, কারণ ডঃ জেন্‌স একটি ব্যাপার পরিষ্কার করেননি। সেটি না জানা থাকলে হিন্দু বিধবাদের জীবনকে বোঝা কিংবা তৎসম্বন্ধে সঠিক বিচার করা সম্ভব নয়। একথা সত্য যে হিন্দু বিধবাদের জীবন চূড়ান্ত ধর্মীয় কৃচ্ছ্রের জীবন ছিল অর্থাৎ দারিদ্র্য এবং আত্মবিলুপ্তির জীবন ছিল। এটা সত্য বলে প্রমাণিত যে হিন্দুদের এ-বিশ্বাস অযৌক্তিক নয় যে আত্মনির্যাতন ব্যতীত নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সম্পদ লাভ করা যায় না। রীতি অনুসারে বিধবার জীবনে আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক মূল্যের স্থানই সর্বাগ্রে এবং সেজন্যই এ-জীবনের জন্য বিধিনিয়ম এত কঠোর। হিন্দুসমাজের বাইরের কোন ব্যক্তির নিকট যিনি এ-বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞাত নন বা বিষয়টি বোঝবার মতো মানসিকতা যাঁর নেই তাঁর এরূপ জীবনকে মনে হবে হিন্দুদের নিষ্ঠুরতা এবং নারীদের

প্রতি দুর্ব্যবহারের অকাট্য প্রমাণ। কিন্তু যাঁরা বিষয়টি বোঝেন, তাঁদের নিকট বিধবাদের জীবন রমাবাঈ যেভাবে চিত্রিত করেছেন তা থেকে সম্পূর্ণ অন্যরকম মনে হবে।

হিন্দুসমাজে বিধবাগণ একটি প্রথাবহির্ভূত সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায়, যদিও তাঁরা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন মঠবাসিনী নন। জীবনের আসল দিক থেকে দেখলে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসজীবনই যাপন করত। যদি এরূপ জীবনকে দুর্ব্যবহারের প্রমাণ হিসাবে ধরা হয়, তাহলে সমানভাবে বিচার করতে হলে খ্রীস্টীয় সন্ন্যাসিনীদের জীবনও খ্রীস্টীয় নিষ্ঠুরতার প্রমাণরূপে ধরা যেতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই নারীর জীবন হলো কঠোরতার এবং উভয় ক্ষেত্রেই একটি অত্যুচ্চ ধর্মীয় জীবনের জন্য ঐতিহ্যানুযায়ী বরণ করা হয়। হিন্দুদের ঐতিহ্যানুসারে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে, তরুণী বা বৃদ্ধা যেই হোক, তাদের অলঙ্কারসমূহ ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না, তারা মোটা কাপড় পরিধান করে এবং চুল কেটে ফেলে। সন্ন্যাসিনীদের মতো তাদের সাদাসিধে আহার গ্রহণ করতে হয়, কঠিন শয্যার আশ্রয়ে নিদ্রা যেতে হয় এবং পরিবারের সাংসারিক উৎসবাদিতে অংশগ্রহণ হতে বিরত থাকতে হয়। কিন্তু ঐসকল কঠোর বৈধব্যের বিধি যখন তারা পালন করত, যা কোন অবস্থাতেই ভঙ্গ করা যেত না, তাদের পিতা মাতা বা শ্বশুরালয়ের অন্যান্য আত্মীয়বর্গ তাদের সঙ্গে অত্যন্ত সহমর্মিতা ও সহানুভূতির সঙ্গে ব্রতপালনে সহায়তা করত, যাতে তারা এ-সকল সংযমবিধি পালন করতে সমর্থ হয় এবং সেগুলি দৃঢ়ভাবে পালন করে যেতে পারে।

বালবিধবাগণ, যাদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না, কিন্তু রমাবাঈ যাদের ব্যাপারে বিশেষ করে জড়িত ছিলেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরিবারের অন্যান্য কন্যাদের সঙ্গে সমান যত্ন ও সমান ভালবাসা পেত এবং যদিও তারা প্রথমটায় হয়ত বুঝে উঠতে পারত না বৈধব্যের কঠোর নিয়মগুলি পালনের হেতু কি, নিয়মগুলি তাদের পক্ষে সরল করে অনুসরণযোগ্য করে তোলা হতো এবং কোন অর্থেই তাদের দাসীত্বের, বিচ্ছিন্নতার বা অধঃপতিত অবস্থায় পড়তে হতো না। বাল্যবিবাহ প্রথাটি অবশ্য স্বামীজীর ভ্রূকুটির কারণ ছিল। "আমি বালক-বালিকার বিবাহের নাম অবধি শুনতে ঘৃণা বোধ করি,"[১৭]—তিনি ১৮৯৪-এর মে মাসে স্বামী সারদানন্দকে লিখেছিলেন। পুনরায় ১৮৯৫-এর ডিসেম্বরের ২৩ তারিখে তিনি লিখছেন— "বাল্যবিবাহকে আমি তীব্র ঘৃণা করি। এজন্য আমি নিজে কষ্ট পেয়েছি ভীষণভাবে এবং

এটা একটা দারুণ পাপ যার জন্য আমাদের জাতিকে ক্লেশ ভোগ করতে হয়। ... আমার সমস্ত শক্তি আমি নিয়োজিত করব এই জঘন্য প্রথার উচ্ছেদকল্পে। ... যে-ব্যক্তি একটি শিশুকন্যার জন্য পাত্রের সন্ধান দেয়, আমি তাকে খুন করে ফেলতে পারি।"[১৮] কিন্তু যদিও স্বামীজী বাল্যবিবাহ প্রথার জন্য পরিতাপ করেছেন, তার অর্থ এই নয় যে, যে-কন্যার বৈধব্য ঘটত, তার সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হতো, কিংবা এও ঠিক নয় যে পুনর্বিবাহ করত না বলে তাদের জীবন একেবারে ধ্বংস হয়ে যেত। স্বামীজীর কাছে, যেমন অন্যান্য অনেক হিন্দুদের কাছেও বিবাহিত জীবনই মানুষের সব আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ নয়। ভারতে আধ্যাত্মিকতার জন্য সর্বস্ব ত্যাগের যে-ব্রত বিধবাগণও গ্রহণ করত, সকলে তাকে মনে করত বিবাহের চেয়ে উচ্চতর এবং ফলপ্রসূ জীবন এবং যদিও বিধবার নিবেদিত জীবনে আরামের স্থান ছিল না, কিন্তু তার বিনিময়ে তার মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মিলত। বিশেষ করে লক্ষণীয়, তাদের পূর্ব-প্রবণতা যাই থাকুক না কেন তাদের মধ্যে বিকশিত হতো সহনশীলতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, স্বার্থত্যাগ এবং প্রশান্তি—এই সকল গুণগ্রাম। ধর্ম আচরণের অভ্যাসের দরুণ, যে আধ্যাত্মিক জীবন প্রাণায়িত হয়ে উঠত, তার ফলে সে সমাজের একটি মহাসম্পদ হয়ে উঠত, তার নেতৃত্ব, তার পরামর্শ সকলে গ্রহণ করতে আগ্রহভরে এগিয়ে আসত এবং তাকে সকলে এমন একটি শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখত, যাকে ভক্তি বলে অভিহিত করা যায়।

হিন্দু বিধবাদের অর্থনৈতিক মর্যাদা সম্বন্ধে ডঃ জেন্‌স যথেষ্ট বিশদভাবে পূর্ণায়ত আলোচনা করেছেন। আমরা এখানে তার সঙ্গে যোগ করতে পারি যে, যদিও একথা সত্য যে, নারীগণ তাঁদের পিতার নিকট হতে উত্তরাধিকারসূত্রে কিছুই পেতেন না (ইতঃপূর্বে এ-বিষয়ে জেন্‌স স্বামীজীর কথার ভুল উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি একথা বলেননি যে তাঁরা পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারিণী হন)। কিন্তু তা বলে তাঁদের পিতৃগণ যে, তাঁদের উপেক্ষা করতেন তা নয়। শ্রীমতী ম্যাক্‌কিন অথবা তাঁর মতের যাঁরা তাঁদের একথা হয়ত জানা ছিল না যে, হিন্দু পিতামাতাগণ তাঁদের কন্যাদের প্রতি অতি দয়ার্দ্রচিত্ত হন এবং সম্পত্তির পরিবর্তে বিবাহকালে তাঁরা যথাসম্ভব যৌতুক দিতেন এবং তার জন্য তাঁরা অনেক সময় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়তেন। তাছাড়া, পিতামাতা বিবাহকালে যথাসম্ভব স্বর্ণালঙ্কারও দিতেন, যেগুলি সবসময়ই সম্পূর্ণরূপেই কন্যার নিজস্ব সম্পত্তি, যা থেকে তাদের বঞ্চিত করা যেত না। এমন

কি কোন বিপদ-আপদ ঘটলে কোন হিন্দু তার স্ত্রীকে তার গহনা বিক্রয় করতে বলতে দ্বিধা বোধ করতেন। সত্য কথা যে, তাদের বিবাহিত জীবনের কালে স্বামী নিজেও স্ত্রীকে যথাসাধ্য গহনাপত্র দিতেন, যাতে তার বৈধব্য ঘটলে তার জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট সম্বল থাকে।

একথা সত্য যে, অনেক হিন্দু দরিদ্র ছিল এবং অনেক হিন্দু বিধবার গহনাপত্র যৎসামান্যই থাকত। এও ঠিক যে, অনেক বিধবার লক্ষ লক্ষ হিন্দুদের মতো শিক্ষার প্রয়োজন ছিল এবং লক্ষ লক্ষ হিন্দুর, শ্রীমতী ম্যাক্‌কিনের ভাষায় 'অন্নবস্ত্র সংস্থানেরও সঙ্গতি থাকত না।' কেউই, স্বামীজী তো কখনই নয়, ভারতে যে শিক্ষার প্রয়োজন আছে এ কথা অস্বীকার করেননি। এ-কথা সুবিদিত যে স্বামীজীর ভারতের পুনরুজ্জীবনের জন্য যে পরিকল্পনা ছিল, তার মধ্যে অন্যতম "জরুরী" বলে চিহ্নিত ছিল নারীশিক্ষার পরিকল্পনা—তা বিধবাই হোক বা অবিবাহিতা নারী—যেই হোক না কেন, তাঁর শিষ্য এবং সন্ন্যাসী-ভাইদের নিকট লেখা চিঠিপত্রে আমরা বারবার পড়ি জাতীয় জীবনে নারীর ভূমিকা কত গুরুত্বপূর্ণ। সে-বিষয়ে তাঁর গভীর বিশ্বাসের কথা। ১৮৯৩-এর ডিসেম্বর মাসে তিনি লিখছেন—"তোমাদের মেয়েদের উন্নতি করতে পার? তবে আশা আছে, নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না।"[১৯]* ১৮৯৫-এ লেখা আর একটি পত্রে লিখছেন—"জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হলে সম্ভাবনা নেই। একপক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নয়।"[২০]** সত্যকথা, যদি তিনি যেভাবে হিন্দু নারীদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তার দেশবাসীদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সে-সম্বন্ধে যে-সকল কথা লিখেছেন, তা যদি সব উদ্ধার করা যায় তাহলে বহু পৃষ্ঠা ভরে যাবে।

এ কথাও সত্য নয় যে তিনি আমেরিকা বা অন্যান্য বিদেশী জাতির সহায়তাকে স্বাগত জানান নি। তাঁর আমেরিকা আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল আর্থিক সহায়তা লাভ। দুর্ভাগ্যবশত অতি সজ্জন ব্যক্তি ডঃ জেন্‌স যেমন বিধবাদের জীবনচর্যার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছেন, ঠিক তেমনিই ব্যর্থ হয়েছেন কেন রমাবাঈয়ের পন্থায় স্বামীজী অ-হিন্দুদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা পছন্দ করেন নি—সে-বিষয়টিও বোঝাতে। অথচ ব্যাপারটি খুবই সহজ ও সরল। এমনকি রমাবাঈ গোষ্ঠীর একজন সদস্যও

---

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, পত্রসংখ্যা ৭৬, পৃঃ ৩৮৯

** ঐ, ৭ম খণ্ড, ১ম সং, পত্রসংখ্যা ২৪১, পৃঃ ১৯৮

বুঝবে যে কেন কেউ, যারা তাদের নিন্দামন্দ করে তাদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করার চেয়ে অনাহারে মৃত্যুও শ্রেয় বলে মনে করে; এর মধ্যে যে আত্মমর্যাদার প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। বিদেশ থেকে ভারতে সাহায্য নেওয়ার ব্যাপারে এই প্রশ্নই জড়িত। স্বামীজী খুব তীব্র সচেতনতার সঙ্গে জানতেন যে সাহায্য দুপ্রকার হতে পারে এবং সাধারণত তাঁর দেশকে যা দেওয়া হয় তা ঘৃণাভরে দেওয়া হয়। খ্রীস্টান প্রচারকদের দেওয়া 'সাহায্য' ছিল এই ধরনেরই এবং ঠিক একইভাবে রমাবাঈ গোষ্ঠী কর্তৃক দেওয়া সাহায্যও এইরূপ ঘৃণার স্পর্শে কলঙ্কিত। স্বামীজী এ-কথা স্পষ্ট করে বলেন বিশেষ করে ডেট্রয়েটে দেওয়া তাঁর বক্তৃতাসমূহের মধ্যে যে, এরূপ সাহায্য কিছু না দেওয়ার চেয়েও খারাপ, কারণ এ-জিনিস যে-জাতি গ্রহণ করে তাতে তার আত্মমর্যাদাটুকুও রিক্ত হয়, শুষে নেওয়া হয়, তার ফলে সে-দেশটিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, এ-সাহায্য তার জীবনীশক্তিকে ফিরে পেতে সহায়তা করে না।

স্বামীজীর রমাবাঈয়ের পন্থার বিষয়ে আপত্তির কারণ ছিল এই যে, এই পন্থায় সে যুগের আমেরিকার মহিলাদের যে মনস্তাত্ত্বিক তাগিদ ছিল একটি পুরো দুঃস্থ হতভাগিনী শ্রেণীর জন্য 'মূর্তিমতী বদান্যতার' ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার—রমাবাঈ তাতে ইচ্ছাপূর্বক ইন্ধন যুগিয়েছেন। তাছাড়া রমাবাঈয়ের নিজেরও একটি অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব ছিল যা তাঁকে ভারতের একজন সেবক হবার জন্য যে-সকল গুণগ্রামসম্পন্ন হওয়ার দরকার ছিল, তাতে ঘাটতি ঘটিয়েছিল। যদিও তাঁর অস্বাভাবিক এবং রোমাঞ্চকর জীবন শ্রীমতী ম্যাক্‌কিনের প্রজন্মের নারীদের নিকট বিশেষ অনুভূতি জাগিয়েছিল, এ-কথা ভাবা মুশকিল যে তিনি যেরূপ বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠেছেন তাতে হিন্দু-সমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তার জটিল পরিস্থিতির প্রতি সুবিচার করার যোগ্যতা লাভ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল। তাঁর আগ্রহ ছিল আন্তরিক এবং গভীর; কিন্তু কেউ যেন মনে করবেন না যে তা ছিল জ্ঞানদীপ্ত। তাঁর গ্রন্থ এবং বক্তৃতাদির অংশ-বিশেষ পাঠ করলে দেখা যায় যে, তাঁর বিচারবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত ছিল ওপর ওপর যতটুকু দৃষ্টিগোচর হয় তারই ওপর এবং সে বিচার ছিল ভাবাবেগপূর্ণ প্রতিক্রিয়ামাত্র। অন্তর্নিহিত গভীর সত্যসমূহ অনুধাবন করা বা ধীর মস্তিষ্কে সুচিন্তিত বিচার করবার ক্ষমতা তাঁর আয়ত্তে ছিল না। ভারতের ব্যাপারে রমাবাঈয়ের প্রত্যয়ের ঘাটতি ছিল এইখানে যে হিন্দুদের স্বার্থে কাজ করতে গিয়ে তিনি তাদেরই অগ্নিবর্ষী গালমন্দ করেছেন। তাছাড়া,

রমাবাঈ হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে নিজেকে এমন একটি ভিন্নধর্মের অঙ্গীভূত করেছেন যার প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু বলতে যা বোঝায় সে সমস্তই ধ্বংস করা। এই আনুগত্য পরিবর্তনের পক্ষে তাঁর ব্যক্তিগত কারণ যাইই থাকুক না কেন, এ-কথা সত্য যে তিনি খ্রীস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ায় পুণাতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লোকজনদের মনে সংশয় উদ্রিক্ত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে এটাও দেখানো যেতে পারে যে, হিন্দুগণের মনে খ্রীস্টীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি যে অনাস্থা ছিল তার মধ্যে হিন্দুদের কুসংস্কারের কোন প্রশ্ন ছিল না। যদি খ্রীস্টানদের সম্পর্কে তারা সতর্ক দৃষ্টি রেখে থাকে তার কারণ এ নয় যে, খ্রীস্টানরা যীশুখ্রীস্টকে অনুসরণ করে। তার কারণ তারা হিন্দুধর্মের ঘোষিত শত্রু। শ্রীমতী ম্যাক্‌কিন বা রমাবাঈ নিজ মুখে অন্য যাই বলুন না কেন, রমাবাঈ গোষ্ঠীর ভারতের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি তা থেকে বোঝা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য খ্রীস্টানদের থেকে তিনি কোন ব্যতিক্রম ছিলেন না। যদিও খ্রীস্টীয় প্রচারকেরা যা করেন নি বমাবাঈ তা করেছেন, হিন্দু আদর্শসমূহের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রচার অভিযানের মোট ফল হয়েছে একই—তাদেরই মতো। তাঁর প্রচারের ফলে তাঁর অনুরাগিগণের মনে সুস্পষ্ট হিন্দু রীতিনীতির প্রতি কোন শ্রদ্ধা বা হিন্দু জনগণের ওপর কোন ভালবাসা জন্মাতে পারেনি, হিন্দু আদর্শের প্রসঙ্গে বলা যায়, এর উল্লেখমাত্র তারা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন। এই কারণেই স্বামীজী যেমন কখনই রমাবাঈয়ের সমালোচনা করেন নি, তেমনি তাঁর কাজের জন্য সাহায্য সংগ্রহের পন্থাটিকে অনুমোদনও করতে পারেন নি।

অপরপক্ষে শ্রীশশীপদ ব্যানার্জী, যাঁকে স্বামীজী পূর্বেও সাহায্য করেছেন, কখনো নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করে এমন কোন ধর্ম গ্রহণ করেননি, যা তাঁর ধর্মকে ধ্বংস করতে চায়। যদিও ব্রাহ্মসমাজ শ্রীশশীপদ ব্যানার্জী যার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এমন সব সমাজ-সংস্কারের কথা বলেছে যা সনাতনীদের নিকট ভয়াবহ, তথাপি এ-ধর্ম হিন্দুধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত এবং যদিও শ্রীশশীপদ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হয়ে সনাতনী হিন্দুসমাজের আওতার বাইরে এসেছিলেন তথাপি তিনি হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্তই ছিলেন। মোটের ওপর তাঁর শিক্ষাসংক্রান্ত কার্যাবলী ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার আন্দোলনের কার্যসূচীর

অন্তর্ভুক্ত ছিল, যে-কার্যসূচী সম্পর্কে স্বামীজীর সহানুভূতি ছিল যে-কথা তিনি অধ্যাপক রাইটকে লিখেওছিলেন। এ-কথা সত্য যে, কতকগুলি বিশদ ব্যাপারে ব্যানার্জীর কর্মপদ্ধতি আরও উন্নতির অপেক্ষা রাখত এবং যে-কথা শ্রীমতী ম্যাক্‌কিন বেশ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দেখাতে চেয়েছেন—রমাবাঈয়ের কার্যপ্রণালীর সঙ্গে যেখানে তার সাদৃশ্য ছিল—সেটি হলো অসম্মানজনকভাবে তোষামোদপূর্বক বৈদেশিক সহায়তা প্রার্থনা করা। স্বামীজী এই দুর্ভাগ্যজনক এবং নিন্দনীয় পরিস্থিতি সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন কিনা বা কতদূর জ্ঞাত ছিলেন—এ প্রশ্নের উত্তর আজ আমরা দিতে পারি না এবং তা আদৌ গুরুত্বপূর্ণও নয়। রমাবাঈকে সাহায্য না দিয়ে তাঁর ব্যানার্জীকে সাহায্য দেবার কারণ ব্যানার্জী হিন্দু ছিলেন, একজন হিন্দু হিন্দুবিধবাদের সাহায্য করতে চাইছিলেন, সেজন্যই তাঁর প্রকল্প সাহায্যের যোগ্য।

যতক্ষণ পাশ্চাত্যের সহায়তার বৈশিষ্ট্য থাকবে পিঠচাপড়ানোভাব এবং গালমন্দ সমন্বিত ততক্ষণ স্বামীজী তার বিন্দুমাত্রও নেবেন না, তিনি নিজদেশের জন্য সহায়তা তখনই গ্রহণ করবেন যখন তা দেওয়া হবে সহৃদয়তা এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে। তাঁর মনে যে ধরনের বৈদেশিক সাহায্যের কথা স্থান পেয়েছিল, তা পরবর্তিকালে সেই সকল পাশ্চাত্যবাসিগণ তাঁদের জীবন দিয়ে দেখিয়েছেন যাঁরা তাঁর অনুরোধে ভারতে গিয়ে তার সেবায় ব্রতী হয়েছিলেন। বোধ হয় এঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হলেন নিবেদিতা, যিনি হিন্দুদের সেবায় নিযুক্ত হয়ে নিজে হিন্দু-সমাজভুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর সহায়তা যাঁরা পেয়েছেন তা কখনো তাঁদের শক্তিকে খর্ব করেনি।

শ্রীমতী ম্যাক্‌কিন, যাঁকে আমরা তখনকার যুগের বহু আমেরিকান মহিলাদের আদর্শ প্রতিরূপ বলে ধরতে পারি, তার পক্ষে কি এসব কথা বোঝা সম্ভব ছিল? উদাহরণস্বরূপ ভারতীয় বিধবাদের জীবনের যে আধ্যাত্মিক ভিত্তিভূমি ছিল তাকে কি তিনি বুঝতে পারতেন? তিনি কি বুঝতে পারতেন যে, তপঃকৃচ্ছ্রতার জীবন পাশবিক ব্যবহারের ফল নয়? তিনি কি করে বুঝবেন যে, ঘৃণা ও করুণার সঙ্গে দেওয়া দান প্রাপকের পক্ষে মৃত্যুর সমান? তিনি এই সকল বুঝতে পারুন আর নাই পারুন, স্বামীজী এই মহিলাকে বা তাঁর বন্ধুদের এসকল কথা এপ্রিলের ৭ তারিখের বক্তৃতায় বোঝাবার কোন চেষ্টাই করেন নি।

ডঃ জেন্‌সও এসকল বিষয় পুরোপুরি সুস্পষ্ট করতে কোন চেষ্টাই করেন নি। কিন্তু তাঁর সুলিখিত প্রবন্ধটি যে জনসাধারণের পক্ষে যথেষ্ট

সদুত্তর হয়েছিল—তাতে আর কোন প্রশ্নের অবকাশ ছিল না। স্বামীজী তাঁর বন্ধু সত্যের পক্ষে এভাবে দাঁড়ানোয় গভীরভাবে অভিভূত হয়েছিলেন। এ-বিষয়ে তিনি তাঁর প্রশংসাসূচক উপলব্ধি নিউ ইয়র্ক থেকে ১৮৯৫ সালের এপ্রিলের ২৫ তারিখে লেখা নিম্নলিখিত চিঠিতে প্রকাশ করেছেন ঃ

প্রিয় ভ্রাতা,

আমি ক্যাটস্কিল পর্বতমালায় রিজলি ম্যানরে গিয়েছিলাম এবং আমি যেখানে ছিলাম সেখান থেকে ডাকযোগে প্রেরিত চিঠি নিয়মিতভাবে পাওয়া অসম্ভব ছিল—সুতরাং প্রথমে আপনার "ঈগ্‌ল" পত্রিকায় লেখা চিঠিখানির জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে বিলম্বের দরুন আমার দুঃখপ্রকাশ গ্রহণ করুন।

এটি অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ, সত্যনিষ্ঠ, প্রশংসনীয় হয়েছে এবং সর্বোপরি কল্যাণ এবং সত্যের জন্য আপনার প্রকৃতিগত বিশ্বজোড়া ভালবাসা দ্বারা এটি অনুস্যূত। বিশ্বকে একটি সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব দ্বারা একত্রিত করার এই যে মহান কাজ তা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার মতো সাহসী হৃদয়ের মানুষেরা নিজ বিশ্বাসের ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন ততদিন নিঃসন্দেহে সম্পন্ন হবে। ঈশ্বর আপনাকে সতত আশীর্বাদ করুন এবং যে মহান কর্ম আপনি এবং আপনাদের সংস্থা হাতে নিয়েছেন, তা সম্পন্ন করবার জন্য আপনি দীর্ঘজীবী হোন।

আপনার এবং এথিক্যাল সোসাইটির সকল সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা সহ

আপনাদের সতত বিশ্বস্ত[২১]

বিবেকানন্দ

এবং এইভাবে ভারতের জন্য "উপকার" করতে ব্রতী পাশ্চাত্যের গোষ্ঠীর সঙ্গে স্বামীজীর শেষ তীব্র সংগ্রাম সমাপ্ত হলো। অবশ্য একথা সত্য যে, এর পরও কখনো কখনো অসাবধানী খ্রীস্টীয় প্রচারকগণ অখ্রীস্টীয়-ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশ্যে উচ্চকণ্ঠে নিন্দাবর্ষণ করেছে, কিন্তু সর্বপ্রকার পরিকল্পিত এবং প্রভাবশালী বিরুদ্ধ আচরণ এরপর হতে নীরব হয়ে যায়। মতান্ধতার প্রবল জোয়ারকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য যুক্তিতর্কের দ্বারা এটি সম্ভব হয়নি, কারণ মতান্ধকে যুক্তি দিয়ে থামানো যায় না। অন্য কোন বস্তু কি এর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল? যা আমরা ভাবতে পারি তা হলো যে, কোন প্রকারে, কি প্রকারে তা শুধু তিনিই জানতেন, স্বামীজী ডেট্রয়েটে

যেমন করেছিলেন, ব্রুকলিনেও সেই ঠিক একই শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। ডেট্রয়েটে শেষ একটি বক্তৃতায় তিনি খ্রীস্টীয় প্রচারকদের অকারণে খুঁত বার করবার প্রবৃত্তিকে একেবারে ঠাণ্ডা করে দিয়েছিলেন। প্রায় এ-কথা মনে হবে যে, এই সকল সময় তিনি নিজেকে এমন একটি স্থানে উত্তীর্ণ করেছেন যেখান থেকে তিনি সকলের মনের গভীরতম প্রদেশে পৌঁছতে পারেন এবং তিনি নিজে সৎ হওয়ায় আর সকলের মঙ্গল করার জন্য অদম্য প্রেরণার বশে সেই সকল মন হতে যা অমঙ্গলের উৎস, যা অসত্য, তা উৎপাটিত করে দিয়েছেন। একমাত্র একজন স্বামী বিবেকানন্দেরই পক্ষে সমষ্টিমনের অবচেতন স্তরে পৌঁছবার এবং প্রভাবিত করবার ক্ষমতা থাকা সম্ভব; এবং তাঁর যে সে-ক্ষমতা ছিল, এ আমরা জ্ঞাত থাকায় এ-কথা বলা একটুও কষ্টকল্পিত হবে কি যে, যখনই প্রয়োজন হয়েছে তিনি এ-ক্ষমতা ব্যবহার করেছেন ?

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের টীকা

পৃষ্ঠা	সাঙ্কেতিক চিহ্ন	টীকা
২৮৩	+	এটা জানা যে স্বামীজী ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৫ রবিবার সন্ধ্যায় ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন, কিন্তু বর্তমানের লেখায় এর বিষয়ে ব্রুকলিন সংবাদপত্রে কিছু পাওয়া যায় নি।
৩০০	+	১৯২৭ সালে লণ্ডনে প্রকাশিত ক্যাথেরিন মেয়োর লেখা 'মাদার ইণ্ডিয়া' ভারত ও তার লোকদের বিরুদ্ধে লেখা একটি অসাধারণ গালিগালাজপূর্ণ এবং তীব্রনিন্দাব্যঞ্জক বই যা বহুলভাবে পঠিত হয়েছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শেষ সংগ্রাম

॥ ১ ॥

শুক্রবার ২৮ ডিসেম্বর তারিখে স্বামীজী শ্রীমতী ওলি বুলকে চিঠিতে লিখলেন, "*আমি নিরাপদে নিউইয়র্কে পৌঁছেছি; ল্যাণ্ডস্‌বার্গ ডিপোয় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে আমি তখনই ব্রুকলিনের দিকে রওনা হলাম ও সময়মতো সেখানে পৌঁছলাম।*"* আসলে সেইদিনই সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত হিগিন্‌স তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন, তারই ঠিক প্রাকমুহূর্তে স্বামীজী সেখানে পৌঁছান। চিঠিটাতে তিনি আরও লেখেন—"*সন্ধ্যাকালটা পরমানন্দে কেটে গেল—এথিক্যাল কালচার সোসাইটির (Ethical Culture Society) কতকগুলি ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।...*

"*ডঃ জেন্‌স তাঁর স্বভাবসিদ্ধ খুব সহৃদয় ও অমায়িক ব্যবহার করলেন, আর মিঃ হিগিন্‌সকে পূর্বেরই মতো দেখলাম খুব কাজের লোক। বুঝতে পারি না কেন, অন্যান্য শহরের চেয়ে এই নিউইয়র্ক শহরেই দেখছি মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের ধর্মালোচনায় আগ্রহ বেশি।*"[১]*

ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসন—যেটিকে স্বামীজী "এথিক্যাল কালচার সোসাইটি" নামে অভিহিত করেছেন—১৮৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ডঃ লুইস জি. জেন্‌সের দ্বারা এবং তিনিই ১৮৮৫ সালে এর সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। জেন্‌সের ঘন ঘন বক্তৃতা দেওয়ার ফলে এই অ্যাসোসিয়েসন অনতিবিলম্বে ক্রমবিকাশবাদের এবং হার্বার্ট স্পেন্সারের দর্শনতত্ত্ব, ন্যায়তত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্বের সমর্থক হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। প্রধানত স্বয়ং-শিক্ষিত জেন্‌স ছিলেন উদ্দীপনাময় এবং উচ্চাঙ্গের পাণ্ডিত্যের অধিকারি, স্বাধীনভাবে জ্ঞানান্বেষণে ব্রতী। ১৮৯৬ সালে তিনি এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি পদ ত্যাগ করে কেম্ব্রিজ সম্মেলনসমূহের নির্দেশক হন, সম্মেলনগুলি ছিল "তুলনামূলক নীতিতত্ত্ব ধর্ম ও দর্শনে"র ওপর প্রদত্ত বাৎসরিক বক্তৃতামালা

---

* বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১ম সং, পত্রসংখ্যা ১৫০, পৃঃ ৫৪

আমাদের সমাপ্ত হয়েছে, একটি মূলগত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর এখনো অনুল্লিখিত রয়ে গিয়েছে।

পাঠকের স্মরণে থাকতে পারে যে, অষ্টম অধ্যায়ের শেষাংশে আমরা স্বামীজীর মধ্য পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলে বক্তৃতা সফরের আসল তাৎপর্য আবিষ্কার করতে প্রয়াসী হয়েছিলাম। তিনি নিজে যা বলেছিলেন এবং করেছিলেন তা অনুসরণ করে আমরা দেখেছিলাম যে, পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচার করার ব্রতের কথা ১৮৯৪-এর শেষভাগের পূর্বে তাঁর মনে উদয় হয়নি এবং তৎপূর্বে আপাত যে-সকল উদ্দেশ্য তাঁকে পরিচালিত করেছিল তা ছিল দুপ্রকারের ঃ (১) তাঁর ভারতের কাজকর্মের জন্য অর্থ-সংগ্রহ করা এবং তাঁর এদেশে অবস্থানের জন্য ব্যয়ভার বহন করার সঙ্গতি সংগ্রহ করা এবং (২) আমেরিকার জনগণকে হিন্দুধর্ম (সাধারণভাবে শুধু ধর্ম) সম্বন্ধে একটি নির্ভুল ধারণা দেওয়া, তাঁর মাতৃভূমি সম্বন্ধে সমস্ত ভুল ধারণা দূর করা এবং ধর্মীয় সহনশীলতার মনোভাব সকলের মধ্যে সঞ্চার করা। কিন্তু যদিও এই উদ্দেশ্যগুলি তাঁর মহান দেশপ্রেম এবং বৌদ্ধিক প্রতিভার পক্ষে অনুপযুক্ত ছিল না, কিন্তু এটা সবাই স্বীকার করবে যে, এগুলি তার বিরাট আধ্যাত্মিক উচ্চতার সমানুপাতিক নয়। সুতরাং আমরা এ-কথা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, তাঁর এই আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ আরো গভীরতর তাৎপর্যে পূর্ণ এবং এ-সকল পর্যালোচনা করে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে তাঁর এই ভ্রমণের সময় অ-সচেতন বা সচেতনভাবে তিনি আমেরিকায় একজন সত্যদ্রষ্টা দিব্যপুরুষের ভূমিকা পালন করেছেন। যেখানেই তিনি গিয়েছেন সেখানেই আধ্যাত্মিকতা বিতরণ করেছেন এবং অগণিত নরনারীর ওপর তাঁর আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছে।

এই যে ঈশ্বরের দূতোচিত ব্রত অবশ্য যে কেবলমাত্র তাঁর বক্তৃতা সফরেরই মধ্যে নিহিত ছিল, তা নয়। তাঁর সারাজীবন ধরেই তিনি যেখানেই গিয়ে থাকুন না কেন এবং বাহ্যত যে কাজেই ব্যাপৃত থাকুন না কেন সর্বাবস্থায় তিনি যারাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছে, তাদের সকলেরই চেতনাকে উর্ধ্বভূমিতে উত্তরিত করে দিয়েছেন চিরতরে। তাঁর সম্বন্ধে এ অতি সত্য কথা যে—"বিবেকানন্দ একজন বন্ধনমোচনকারী ছাড়া আর কিছুই নন।"[১] তাঁর উপস্থিতিই ছিল একটি গভীর আশীর্বাদ এবং আমরা তাঁর কাজকর্ম এবং শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য কখনই অনুধাবন করতে পারব না যদি আমরা এ-কথা ভুলে যাই যে, সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন ঈশ্বরের বাণীদূত।

যদি তাঁর গুরুর কথায় বিশ্বাস করতে হয়, তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন মানবের কল্যাণের জন্য। এখানে অবশ্য তাঁর ঈশ্বরের বাণীদূত হিসাবে যে ভূমিকা তা প্রাসঙ্গিক নয়, এখানে প্রাসঙ্গিক তাঁর বাণীর এবং বিশ্ব হিতব্রতের যে বিকাশ তাঁর মধ্যে ঘটেছিল সেই বিকাশের ধারাটি।

যদি কেউ এমত গ্রহণ করেন যে, স্বামীজী আমেরিকায় একেবারে সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং পূর্ণ বিকশিত বাণী নিয়ে আসেননি, তাহলে যে প্রশ্নটি থেকে যায় তা হলো কি করে কেন এবং কখন তা পূর্ণ বিকশিত হলো। এখন আমি এই প্রশ্নটির আলোচনাতেই প্রবৃত্ত হতে চাই এবং এই প্রশ্নের যথা-সম্ভব সুস্পষ্ট উত্তর পেতে চাই। এই আলোচনা করবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হলো পূর্ব-বর্ণিত কাহিনীগুলি, তাঁর প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত চিঠিপত্র এবং ১৮৯৫-এর পূর্ববর্তী তাঁর লিপিবদ্ধ চিন্তাগুলি যা লভ্য—এ-সকল হতে প্রাপ্তব্য সূত্রসমূহের অনুসন্ধান করা।

এই অনুসন্ধান-কার্য করার পক্ষে কতকগুলি অসুবিধা আছে, সেগুলি সম্বন্ধে আমি অনবহিত নই। প্রথম হলো, যদিও ইতঃপূর্বে তাঁর জীবনীসমূহ এবং তাঁর সম্পূর্ণ রচনাবলীতে যে-সকল তথ্যাদি তাঁর জীবনের ১৮৯৩ ও ১৮৯৪-এর কাল সম্বন্ধে দেওয়া হয়েছে, তার থেকে বেশি তথ্যাদি এখন আমাদের হাতে আছে, তথাপি এই কাল সম্বন্ধে আমাদের জানায় এখনও অনেক ফাঁক রয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয়, যে-সকল তথ্য আমরা এতাবৎ কাল পেয়েছি তার বেশির ভাগই সংবাদপত্রসমূহের প্রতিবেদন হতে, এগুলির মাধ্যমে স্বামীজীর ভাষণ এবং কথাবার্তার যেসকল লিপিবদ্ধ বর্ণনা আমাদের হাতে পৌঁছেছে সেগুলি প্রতিবেদকের মনের রঙে রঞ্জিত। যখন আমরা এইসকল প্রতিবেদন পরবর্তী কালের সাঙ্কেতিক লিপিকার জোসিয়া জে. গুডউইন কর্তৃক লিপিবদ্ধ করা ভাষণসমূহের সঙ্গে তুলনা করি এবং যদি সংবাদপত্রের প্রতিবেদকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলছি, অ্যানিস্কোয়ামে শ্রীমতী জন হেনরী রাইট স্বামীজীর কথাবার্তার যে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন তার তুলনা করি, তাহলে আমরা দেখব যে, তাঁর চিন্তার মৌলিকত্ব এবং সূক্ষ্মত্ব এবং অনেক সতেজ এবং উজ্জ্বল অন্তর্দৃষ্টির ঝলক যা তাঁর বক্তৃতার মধ্যে জ্বলে উঠেছে পুরো জ্ঞানের জগৎকে উজ্জ্বল প্রভায় আলোকিত করে, তা সাধারণ প্রতিবেদকেরা ধরতে না পারায় হারিয়ে গিয়েছে আমাদের কাছেও। তাছাড়া, সংবাদপত্রের প্রতিবেদনগুলি বেশির ভাগই সংক্ষিপ্ত করা। যেখানে প্রতিবেদকেরা স্বামীজীর চিন্তার স্বচ্ছতা ও শক্তি, তাঁর নতুন

ধারণা দেবার ক্ষমতার কথা বলেছে, সেখানেও কদাচিৎ সে-সকল ধারণাগুলির আক্ষরিক বিবরণ আমরা পেয়েছি। যে বক্তৃতা দিতে তাঁর দু-ঘণ্টা সময় লেগেছে তা অনেক সময়ই দেওয়া হয়েছে (অদক্ষভাবে) সংবাদপত্রের দুটি একটি স্তম্ভের পরিসরে। আর যে-সকল ধারণা প্রবল ধারায় বর্ষিত হয়েছে তা ছিটেফোঁটায় পরিণত হয়েছে। (এ-কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কখনো কখনো স্বামীজীকে ইচ্ছাকৃতভাবেই বিরুদ্ধমনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা ভুল উদ্ধৃত করেছে এবং তাঁকে ভুলভাবে উপস্থাপিত করতে প্রয়াস করেছে। কিন্তু এ-সকল ক্ষেত্রে তাঁর বন্ধুবর্গ, যেমন আমরা ইতঃপূর্বে দেখে এসেছি, তাঁর পক্ষ সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন সে-সকল ভুল শুধরে নিতে। সুতরাং এ-ব্যাপারে আমাদের ভুলপথে পরিচালিত হবার কোন সম্ভাবনা নেই। এও সম্ভব যে, যারা তাঁর শত্রুতা করছিলেন তাঁদের চক্রান্তে ভারতে কথাগুলি মিথ্যা এবং ক্ষতিকররূপে এসেছে, কিন্তু এ নিয়ে আমাদের এখানে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই।)

যাই হোক, এ-সকল ত্রুটি সত্ত্বেও, এ-গ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রতিবেদনগুলি মোটের ওপর নির্ভরযোগ্য এবং যখন নির্ভুল কিনা তা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য স্বামীজীর পত্রাবলীর সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হয়, তখন তা আকর অমূল্য উপাদান হিসাবে কাজ করে। সত্যি সত্যিই এই প্রতিবেদকগণ যা করেছে এবং তা যতটা ভালভাবে করেছে তজ্জন্য কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত। তারা শুধু স্বামীজীর জীবনব্রতের বিকাশের ওপরেই আলোকপাত করেনি, করেছে আরও অনেক কিছুরই ওপরে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাঁর কার্যকলাপ সম্বন্ধে তারা আমাদের সাধারণ যে-সকল সংবাদ দিয়েছে তা আমরা অন্য কোথাও পাই না। তারা তিনি কখন কি করলেন এ-বিষয়ে খুঁটিনাটি অনেক বিশদ বিবরণ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে, যেগুলি হয়তো সবসময় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু এগুলি আমাদের অনেক আনন্দের উৎস, কারণ এ-রকম ছোটখাট, প্রিয় এবং আলোকপ্রদ ঝলকের মধ্য দিয়ে তিনি জীবন্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসাবে উদ্ভাসিত হন আমাদের চোখের সামনে। বিশেষ করে এইসব প্রতিবেদকের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত এই কারণে যে, তারাই তাঁর আকৃতি, তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ, তাঁর হাবভাব, তাঁর কণ্ঠস্বর এবং তাঁর বাক্যালাপের ধরন সম্বন্ধে প্রচুর মনোযোগ দিয়েছে। এই সকল বর্ণনাগুলিই আমাদের এ উপলব্ধি এনে দেয় যে, আমার আপনার মতোই স্বামীজী একদিন এই মর্তের বুকে চলেছেন, ফিরেছেন, কথা বলেছেন,

হেসেছেন, যা অন্য অনেক সময় বিশ্বাস হতে চায় না। এই খুঁটিনাটি বর্ণনাগুলি উপহার দেওয়া ছাড়াও, সংবাদপত্রগুলি তাদের সম্পাদকীয় স্তম্ভে, চিঠিপত্রের বিভাগে এমন কি শিরোনামাগুলিতেও "হিন্দু-সন্ন্যাসী" জনমানসে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছেন সে-সম্বন্ধে ধারণা দিয়েছে। বক্তৃতার শিরোনামা সম্বন্ধে সংবাদগুলি তাঁর এ-সময়কার বক্তৃতা-সফরের কালে তিনি কোন্ বিষয় প্রচার করতে চাইছিলেন সে-সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাধারার সূচী-নির্দেশিকার মতো। যদিও সেগুলি সময সময় দুঃখজনকভাবে অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ততা দোষযুক্ত তথাপি সেগুলি আমাদের নিকট উন্মোচন করে এইসকল ধারণা তিনি কিভাবে পরিবেশন করেছেন, তিনি কিভাবে আমেরিকায় সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির মূল্যায়ন করেছেন, সমর্থন করেছেন; এ-সকল বিষয়ে আমরা মোটামুটি এগুলির মাধ্যমে ভালমত জ্ঞান লাভ করি, আমরা জানতে পারি তিনি কিভাবে খ্রীস্টীয় ধর্মান্ধতাকে আক্রমণ করতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য মানসের ওপর তাঁর প্রভাব এবং তাঁর ওপর পাশ্চাত্য মানসের প্রভাব সম্পর্কেও জানতে পারি।

যদিও আমরা জানি এ-সকল জ্ঞান আমাদের মূল অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যের দিক হতে গৌণ, কিন্তু এগুলি নিজস্বভাবে স্বামীজীর যারা ভাবশিষ্য এবং ভক্ত তাদের কাছে অমূল্য এবং সেইজন্যই আমি প্রসঙ্গত আমেরিকার সংবাদপত্র-সমূহের এই অবদান সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম।

এটি একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা যে, আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহ ব্যতীত অন্যত্র স্বামীজীর ব্যক্তিগত আকৃতি বিষয়ক এত বিশদ বর্ণনা কোথাও পাওয়া যায় না। যদিও রোমাঁ রোলাঁ তাঁর একটি রেখাচিত্র আমাদের দিয়েছেন তাঁর "নব ভারতের বাণীদূতগণ" (প্রফেট্স অব দি নিউ ইণ্ডিয়া) শীর্ষক গ্রন্থে এবং 'জীবনী'-তে (লাইফ), যে নিউ ইয়র্কের করোটিতত্ত্ব বিষয়ক পত্রিকা' (ফ্রেনোলজিক্যাল জার্নাল) হতে একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করা হয়েছে যার মধ্যে তাঁর মস্তিষ্কের পরিমাপসমূহ এবং তাঁর মস্তকের উচ্চ অংশুগুলির অর্থ তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় জীবনীগুলি এবং তাঁকে যাঁরা জানতেন এমন ব্যক্তিবর্গের স্মৃতিচাবণাগুলি দেখে মনে হয় তাঁরা যেন সযত্নে তাঁর চেহারা বর্ণনা করতে বিরত থেকেছেন। দুর্ভাগ্যবশত এ-কথা শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য শিষ্যবর্গ এবং স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীগুলি সম্পর্কেও সত্য। যদি কয়েকটি মাত্র আলোকচিত্র না থাকত এইসকল মহাপুরুষদের আকৃতি সম্বন্ধে আমরা একেবারেই অন্ধকারে থাকতাম। এই অবহেলার কারণ মনে হয়

হিন্দুলেখকদের আধ্যাত্মিক ব্যাপারে ঐকান্তিক আগ্রহ এবং ঐহিক ব্যাপারে অনীহা। তথাপি হিন্দু জানে যে, একজন উপাসক তার উপাস্য সম্বন্ধে প্রতিটি খুঁটিনাটি বর্ণনা জানবার ব্যাপারে কখনো ক্লান্তি বোধ করে না। সে জানতে চায় তাঁর চোখের গড়ন এবং আকার, তাঁর চুল কি প্রকার, তাঁর গাত্রবর্ণের কিরূপ আভা, তাঁর উচ্চতা, তাঁর শরীর কিরূপ মজবুতভাবে তৈরি, তাঁর কণ্ঠস্বরের ঐশ্বর্য, তাঁর হাবভাবের বৈশিষ্ট্য, তাঁর পরিচ্ছদ, তাঁর পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের অবতারপুরুষদের এবং যাঁরা ঈশ্বরকে জেনেছেন তাঁদের বাহ্য আকৃতি সম্বন্ধে জানার আকুলতা পাশ্চাত্যবাসীদের তুলনায় ভারতীয় মানসিকতারই অনুগ। কেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তার মহান শিষ্যদের ব্যাপারে জীবনীকারেরা এমন বাস্তবতাবোধরহিত তা মনে হয় এমন একটি প্রশ্ন, যার উত্তর পাওয়া দুঃসাধ্য।

সে যাই হোক, ১৮৯০ দশকের আমেরিকার সংবাদদাতারা স্বামীজীর সম্বন্ধে এ অভাব পূরণ করে দিয়েছেন। যদিও কতকগুলি ক্ষেত্রে তাঁদের বিবরণ পরস্পরবিরোধী, মোটের ওপর তাঁরা একমত এবং সেগুলিকে একত্র করলে যখন তিনি পূর্ণ যৌবনে ও শক্তিতে ভরপুর সেই সময়কার মোটামুটি একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়।

সকলের মতানুয়ায়ী তিনি মধ্যমাকৃতির চেয়ে একটু বেশি উচ্চতাসম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁর শরীর ছিল মজবুত গড়নের। ১৮৯৪-এর গ্রীষ্মের পরে তাঁকে একটু ভারী ওজনের মনে হতো—একজন সংবাদদাতার মতে ২২৫ পাউণ্ড ওজনের বলে বলা হয়েছে। সম্ভবত এখানে একটু বেশি কল্পনার রঙ চড়ানো হয়েছে, কারণ মস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্য বিষয়ক পত্রিকাটির (ফ্রেনোলজিকাল জার্নাল) লেখকেরা তাঁর নিখুঁত পরিমাপ বলে তাঁকে পাঁচ ফুট সাড়ে আট ইঞ্চি উচ্চতাসম্পন্ন, ১৭০ পাউণ্ড ওজন-বিশিষ্ট বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সম্ভবত স্বামীজীর ক্ষেত্রে নিখুঁত পরিমাপ দেওয়া সম্ভবপরও ছিল না। কারণ 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড' পত্রিকার এক সংবাদদাতার ১৮৯৬-এর জানুয়ারির ১৮ তারিখে পরিবেশিত একটি সংবাদ হতে আমরা জানতে পারি যে, স্বামীজীর একটি অদ্ভুত অভ্যাস ছিল তাঁর শরীরের উচ্চতাকে আশ্চর্যরকম হারে বাড়ানো এবং কমানো! তাঁর ওজন সম্বন্ধেও একথা সত্য হতে পারে। কিন্তু কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে স্বামীজীর ওজন যাই-ই হোক না কেন, তাঁকে সর্বদা সুগঠিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাঁর দেহভঙ্গিমা ছিল সবসময় মহিমময়, শ্রীমণ্ডিত এবং সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অ-সচেতনতা

ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাঁর ওপর প্রথম দৃষ্টিপাত করেই শ্রীমতী রাইট তাঁর নিজ মাতাকে লিখেছিলেন—"তিনি শুক্রবার দিন এসেছিলেন। একটি দীর্ঘ গেরুয়া পরিচ্ছদে মণ্ডিত তিনি সকলের বিস্ময়ের কারণ হয়েছিলেন। তিনি মহিমান্বিত জ্যোতির্ময় দর্শন, আশ্চর্যরূপে সুন্দর, তাঁর মস্তককে বহন করবার ভঙ্গি কি অপূর্ব মহিমময় এবং প্রাচ্য দেশীয় রীতিতে তিনি কি অপূর্ব সুদর্শন...।" তিনি এই প্রথম দর্শনের কালে যে-সকল কথা সংক্ষেপে লিখে রেখেছিলেন তারই ভিত্তিতে পরবর্তিকালে স্বামীজীর আকৃতি সম্বন্ধে একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখেছিলেন—"তাঁর গ্রীবা এবং শিরোভূষণহীন নগ্ন মস্তকের কি অপূর্ব সম্ভ্রম জাগানো এবং চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিমা ছিল, যার জন্য যারই দৃষ্টিপথে তিনি পড়েছেন, তাকেই দাঁড়িয়ে পড়ে তাঁকে দর্শন করতে হয়েছে; তিনি ধীর পদক্ষেপে চলতেন, এমন সাবলীল ভঙ্গিতে যেন তিনি কখনো ত্বরা করেন না।" এবং তাঁকে প্রথম দর্শন করার কথা স্মরণ করে শ্রীমতী মেরী ফাঙ্কে লিখেছেন—"আমি এখনো মনশ্চক্ষে দেখি তিনি [ডেট্রয়েটে] প্ল্যাটফর্মে পা রাখলেন, একটি রাজকীয় মহিমময় মূর্তি প্রাণপ্রাচুর্যে পূর্ণ, শক্তিমণ্ডিত এবং যেন আধিপত্য বিস্তার করে চলেছেন...।"

নিঃসন্দেহে স্বামীজীর "অপূর্ব মহিমময় ভঙ্গিমা" যা তাঁর পরিচ্ছদ ও শিরোভূষণকে দারুণ দৃষ্টিনন্দন করে তুলেছিল—যদিও এগুলি স্বতন্ত্রভাবেও দর্শনীয়, তবুও সেগুলি তাঁর অঙ্গের ভূষণ হয়ে যেন রাজকীয় ভূষণে পরিণত হয়েছিল। প্রায় প্রত্যেক সংবাদদাতাই এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। মিনিয়াপোলিস ও ডেস মইনসে, যেখানে মনে হয় স্বামীজী ওদেশীয় পোশাক পরিহিত ছিলেন যার রঙ ছিল তাঁর আলখাল্লার রঙেরই মতো, সেখানে যথেষ্ট সঙ্কোচের সঙ্গে তা উল্লিখিত হয়েছে "রক্তবর্ণ অন্তর্বাস" বলে। কিন্তু পরবর্তী সাক্ষ্যসমূহে দেখা যায় সেগুলি ছিল কালো। তাঁর আলখাল্লা, যা তার হাঁটু ছাড়িয়ে কিছুদূর ছড়িয়ে পড়ত, প্রথম প্রথম সেটা ছিল উজ্জ্বল কমলা-হলুদ মিশ্রিত রঙের, একটি রক্তবর্ণের কোমরবন্ধনীর দ্বারা আটকানো, যার জন্য তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে "বাল্টিমোরের ওরিওল"-এর পোশাকে সজ্জিত বলে—বাল্টিমোরের ওরিওল হলো এক ধরনের গাঢ় কমলা ও কালো পাখার এক পাখি। ১৮৯৪-এর মে মাসে তিনি একটি নতুন আলখাল্লা প্রস্তুত করলেন; খাঁটি গেরুয়া রঙ পাওয়া অসম্ভব বলে, এটার রঙ ছিল কমলার চেয়ে লালের দিকেই বেশি এবং বাল্টিমোর এবং ব্রুকলিনে একে নানাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—"তামাটে. লাল রঙ", "উজ্জ্বল লোহিত

বর্ণ" এবং "উজ্জ্বল রক্তবর্ণ" বলে। তাঁর পাগড়ির কথা বলতে গেলে তা ছিল হালকা পীতবর্ণের সিল্কের (বা কখনো সাদা), "যার শেষ প্রান্তটি এক দিকের কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে এনে ঝোলানো থাকত"। এ-প্রান্তটি সম্বন্ধে সালেমের একজন সংবাদদাতা লিখছেন—"তাকে তিনি তাঁর রুমাল হিসাবে ব্যবহার করেন।" এই সংবাদদাতাটি আমাদের আরো বলেন যে, স্বামীজী পায়ে "কংগ্রেসী জুতো" পরেছেন—এ ধরনের জুতোর তখন খুব চল হয়েছিল—পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত উঁচু এবং ত্রিকোণ নমনীয় দুপাশে অন্তর্নিবিষ্ট ঢাকার সরঞ্জামসহ ছিল সে-জুতোগুলি।

যখন তিনি বক্তৃতা দিতেন না, তখন কখনো কখনো তিনি একজন "সচ্ছল আমেরিকাবাসী"র মতো পরিচ্ছদ পরতেন। অবশ্য পাগড়িটি ব্যতিক্রম। ১৮৯৪-এর বসন্তকালে তাঁর নর্দাম্পটন ভ্রমণের সময় তাঁর সাক্ষাৎলাভ করেন শ্রীমতী মার্থা ব্রাউন ফিঙ্কে। এই ফিঙ্কের মতে তাঁর পোশাক ছিল "একটি কালো রঙের প্রিন্স আলবার্ট কোট, গাঢ় রঙের প্যান্ট এবং হলদে রঙের পাগড়ি যা জটিল ভাঁজে ভাঁজে তাঁর সুগঠিত মস্তককে আবরিত করে রেখেছিল।" এটা সম্ভবত সেই পোশাকটি যেটি মেরী হেলের "খুব ভাল লেগেছিল" এবং যা পরে অ্যানিস্কোয়ামে জলে ভিজে গিয়েছিল। যদিও স্বামীজী জোর করে বলতেন যে, এই ভিজে যাওয়ায় তাঁর পোশাকটির কোন ক্ষতিই হয়নি, সম্ভবত তিনি আর একটি নতুন পোশাক করিয়ে নিয়েছিলেন, কারণ দুমাস পরে বাল্টিমোরের এক সংবাদদাতা আমাদের জানাচ্ছেন যে, "যে পোশাক তিনি পরেছিলেন... সেটি পাদরীদের পোশাকের ছাঁদের।"

স্বামীজীর পরিচ্ছদ ও পাগড়ি এবং যে মহিমার সঙ্গে তিনি সেগুলি পরিধান করতেন তা যেমন লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করত, তাঁর মুখমণ্ডল তেমনি তাদের মন্ত্রমুগ্ধ করত। সমস্ত প্রাপ্ত সংবাদ অনুসারে, তিনি অসাধারণ সুদর্শন ছিলেন—সত্যসত্যই অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্য ছিল তাঁর—"গ্রীক-রোমান দেবতার মূর্তির মতো সুন্দর"—লিখছেন শ্রীমতী কনস্টান্স টাউন তাঁর স্মৃতিচারণায়। তাঁর গায়ের রঙ সম্বন্ধে নানা মত পাওয়া যায়—"বেশ ঘোর বর্ণ", "তাম্রবর্ণ", "কৃষ্ণবর্ণ", "বরঞ্চ শ্যামবর্ণ", "গাঢ় জলপাই রঙ", "একজন ইণ্ডিয়ানের মতো রঙ"—শেষ কথাটি সম্ভবত আমেরিকান ইণ্ডিয়ান বোঝাতে চাওয়া হয়েছে, যাদের গায়ের রঙে একটু তামার আভা আসে। মোটের ওপর মনে হয় স্বামীজী একজন হিন্দুর পক্ষে ঘোর বর্ণের চেয়ে ফর্সা রঙের এবং যখন তাঁর মুখে বিদ্যুতের আভা ঝলক

মারত ব্রুকলিনে একটি বক্তৃতা দেবার সময় যা হয়েছিল—তখন তাঁর গায়ের রঙ মনে হতো তপ্তকাঞ্চনবর্ণ এবং জ্যোতির্ময়।

তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুগঠিত ছিল। তাঁর কপাল "বুদ্ধিমানের মতো" এবং তাঁর মুখমণ্ডল "সুন্দর, বুদ্ধিদীপ্ত এবং ভাবানুযায়ী পরিবর্তনশীল", "মুখের দৃঢ় গঠনে সূক্ষ্মতার ব্যঞ্জনা ছিল", "এর রেখাগুলি আবেগ এবং বুদ্ধিমত্তা—এ উভয়েরই ব্যঞ্জক" ছিল। তাঁর চুল ছিল ঘন, কুঞ্চিত এবং "মধ্যরাত্রির মতো ঘোর কৃষ্ণবর্ণের" এবং "যখন পাগড়ি পরিহিত থাকতেন না, তখন চুলগুলি কপালে লুটিয়ে পড়ে প্রায় ভ্রূ-যুগল ছুঁয়ে ফেলত।" তাঁর দন্তরাজি, যা তাঁর পরিচিত ছবিগুলিতে কদাচিৎ দৃশ্য হয়েছে, এগুলি ছিল সোজা, সমান এবং মুক্তোর মতো সাদা ধবধবে।" কিন্তু স্বামীজীর মুখমণ্ডলে সব থেকে আশ্চর্য বস্তু ছিল তাঁর দৃষ্টি-আকর্ষণকারী চক্ষুদ্বয়। চক্ষু দুটি ছিল বিশাল, ঘোর কৃষ্ণবর্ণের (অথবা শ্রীমতী গিবনসের স্মৃতিচারণানুসারে "মধ্যরাত্রির মতো গভীর নীলবর্ণের"), "অত্যন্ত দীপ্তিপূর্ণ", "উজ্জ্বল", "জ্যোতিবিচ্ছুরণকারী", "বিদ্যুৎপ্রভাময়", "আলোকচ্ছটাপূর্ণ", "একজন ঈশ্বরের দূতের মতো উজ্জ্বল জ্যোতিপূর্ণ", "কৃষ্ণবর্ণ, সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাপূর্ণ, অন্তর্ভেদী", "গভীর আধ্যাত্মিকতা-জ্ঞাপক" ; এবং যদিও সংবাদদাতারা ঠিক একথা বলেননি, এ হচ্ছে সেরকম দুটি চোখ যা ঈশ্বরকে দর্শন করেছে এবং তাদের গভীরতার মধ্যে অসীমের জ্যোতিকে ধরে রেখেছে।

স্বামীজীর কণ্ঠস্বরকে অনেকসময় যন্ত্রসঙ্গীতের মূর্ছনার মতো বলে তুলনা করা হয়েছে। অ্যানিস্কোয়ামে তাঁর আলাপচারিতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শ্রীমতী রাইট বর্ণনা করে বলেছেন কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভাবগম্ভীর উক্তিসমূহ উচ্চারণের সময় তাঁর "গভীর কণ্ঠস্বর" আরো গভীর হয়ে পড়ত "যতক্ষণ না তাকে ঘণ্টাধ্বনির মতো মনে হতো"। কুমারী জোসেফাইন ম্যাকলাউড রোমাঁ রোলাঁকে বলেছিলেন তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল বেহালাধ্বনির মতো, কিন্তু বেশি উচ্চ বা নিচুগ্রামে ওঠানামা না করলেও গভীর সুব মূর্ছনা-সমন্বিত ছিল যা সভাকক্ষ এবং শ্রোতাদের হৃদয়কে পূর্ণ করে দিত। একবার যদি শ্রোতার চিত্ত সে সুর মূর্ছনায় মগ্ন হয়ে যেত, তাহলে তারা ডুব দিতে পারত আত্মার গভীরে যে-সঙ্গীতলহরী ধ্বনিত হয় তারই সুর-মূর্ছনার মধ্যে।... এমা কালভে, যিনি স্বামীজীকে জানতেন, তাঁর কণ্ঠস্বরকে বর্ণনা করেছেন এই বলে, "একটি প্রশংসনীয় পুরুষকণ্ঠের গায়কের কণ্ঠস্বরের মতো, চীনা পেটাঘড়ির ঘণ্টাধ্বনির মতো সুরছন্দের ব্যঞ্জনা ছিল তাতে।" হ্যারিয়েট মনরো তাঁর কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে

লিখেছেন—"ব্রোঞ্জ ঘণ্টাধ্বনির মতো ঐশ্বর্যময়" এবং মেরী ফাঙ্কের মতে "আগাগোড়া সুরপূর্ণ—এই মুহূর্তে ইউরোপীয় বীণার তারের কোমল-বিষণ্ন ধ্বনির মতো, পরমুহূর্তে গভীর, ছন্দোময়, অনুরণনপূর্ণ।" সংবাদপত্রসমূহের প্রদত্ত সংবাদ এইসকল বর্ণনাগুলিকে সমর্থন করে, তারা ধারাবাহিকভাবে একই কথা বলেছে স্বামীজীর কণ্ঠস্বর বর্ণনা করে—"একটিও কথা না বুঝলেও সঙ্গীতের মতো মনে হয়", "গম্ভীর সঙ্গীতময়", "ঐশ্বর্যময় এবং গম্ভীর ভাবপূর্ণ", "এমন কণ্ঠস্বর যা বক্তার অনুকূলে", "এমন কণ্ঠস্বর যা বিদ্যুতের মতো শ্রোতাদের স্পর্শ করে।"

আর তাঁর ভাষণ সম্পর্কে তাঁর অনর্গল বাগ্মিতাপূর্ণ ইংরেজী ভাষার যথাযথ ব্যবহার "প্রশংসার ঊর্ধ্বে" এবং তা অনেকসময় ততখানিই বিস্ময়ের বস্তু যতখানি বিস্ময়ের বস্তু তাঁর চিন্তার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা আর ঔজ্জ্বল্য যা সেই ভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতো। ডেট্রয়েটের একজন সংবাদদাতা লিখেছেন—"এই পৌত্তলিক যে ইংরেজী ভাষায় কথা বলেন তা আমাদের বক্তৃতামঞ্চ, গির্জার বেদি হতে যা শোনা যায়, তা থেকে অনেক বেশি মার্জিত এবং তিনি তাঁর ভাষণগুলিকে অত্যন্ত সুরুচিপূর্ণ বুদ্ধিদীপ্ত সরসতায় মণ্ডিত করেন, এ-বিষয়ে যতজন বক্তার সঙ্গে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরিচয় ঘটেছে, তাদের সকলের মধ্যে তুলনাহীন।" আর একজন সংবাদদাতা লিখছেন—"তাঁর নির্বাচিত শব্দগুলি ইংরেজী ভাষার মণিমুক্তোর মতো।" 'ক্রিটিক' পত্রিকার লুসী মনরো মন্তব্য করেছেন—"কোন লিখিত নির্দেশিকার সাহায্য ছাড়াই তিনি ভাষণ দেন, তাঁর তথ্যাদি ও সিদ্ধান্তসমূহ অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে, অত্যন্ত বিশ্বাস-উৎপাদক আন্তরিকতার সঙ্গে উপস্থাপিত করেন এবং এক এক সময় বাগ্মিতার প্রেরণাসঞ্চারী চরম উচ্চতায় আরোহণ করেন।" আমাদের বলা হয়, "স্বামীজীর উচ্চারণভঙ্গি কতকটা ইংরেজী ভাষার সঙ্গে পরিচিত ল্যাটিন ভাষাভাষী জাতির উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিদের মতো।" (কুমারী কংগারের মতে "সুশিক্ষিত আয়ার্ল্যাণ্ড-বাসীর উচ্চারণের মতো"।) কখনো কখনো তিনি কোন ইংরেজী শব্দের ভুল অংশের ওপর জোর দিয়েছেন এবং কখনো কখনো যদি তাঁর কথাগুলি ঠিক ঠিক উদ্ধৃত হয়ে থাকে, তিনি কোন কোন ইংরেজী প্রচলিত শব্দগুচ্ছকে এমন ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন যা রমণীয় হলেও অদ্ভুত—এ-সব মিলে মিশে কিন্তু তাঁর বক্তৃতায় যে সরসতা ও কাব্যময়তা তা তাকে আরো মনোহর করে তুলেছে! ফলে "তিনি যে-কোন বিষয়ে বলেছেন তাকেই এ-সকল প্রাণবন্ত এবং আলোকপূর্ণ

করে তুলেছে।", "তাঁর মনের যে প্রক্রিয়া তা এত সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাপূর্ণ, এত বুদ্ধিদীপ্ত, এত সমৃদ্ধ এবং এত সুশিক্ষার পরিচায়ক যে তাতে শ্রোতাদের যেন চোখ ধাঁধিয়ে যেত"—এ-কথা লিখেছেন একজন সংবাদদাতা; আর একজন সংবাদদাতা লিখেছেন—"তিনি যে সুস্পষ্ট উচ্চারণে ইংরেজী বলেন তাই শুধু নয়, অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে বলেন এবং তাঁর ধারণাসকল নতুন এবং বিদ্যুৎ ঝলকের মতো আলোকপূর্ণ, সেগুলি তাঁর জিহ্বা হতে নির্গত হয় অতি সুন্দর অবাক করে দেওয়া অলঙ্কারপূর্ণ ভাষার প্রাচুর্যে ভরপুর হয়ে।... চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি একজন শিল্পী, বিশ্বাসে আদর্শবাদী এবং বক্তৃতামঞ্চে একজন নাটকীয় ব্যক্তিত্ব।"

কিন্তু—যদিও স্বামীজীর ভাষণসমূহ কাব্যিক-চিত্রকল্প এবং নাটকীয়তায় পরিপ্লুত ছিল সেগুলি তর্কশাস্ত্রের দিক থেকেও অত্যন্ত সঠিক। মেমফিসের একজন সংবাদদাতা মন্তব্য করেছেন, "বক্তা একটি বিষয়ে কয়েকজন আমেরিকার বক্তাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি তাঁর ধারণাসমূহ ঠিক যেমন করে একজন গণিতের অধ্যাপক ছাত্রদের সামনে বীজগণিতের দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা করেন ঠিক তেমনি চিন্তাভাবনা করে উপস্থাপিত করেন। তিনি এমন কোন ভাষণ দেন না বা এমন কোন সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করেন না যা শেষপর্যন্ত নিশ্চিতই তর্কশাস্ত্রের বিধিসম্মত সিদ্ধান্তরূপে পরিণত না করতে পারেন।" স্বামীজীর সমালোচকেরা সময় সময় এই তথ্যের ওপর জোর দেবার প্রবণতা দেখিয়েছেন (ধরা যেতে পারে নিশ্চিতই তা নিন্দার উদ্দেশ্যেই) যে তাঁর শ্রোতাদের অধিকাংশই ছিল মহিলা। এ-কথা সত্য যে, মহিলারাই ছিল বক্তৃতাকক্ষগুলিতে শ্রোতাদের মধ্যে অধিকসংখ্যক। কিন্তু তাঁর বিশাল পাণ্ডিত্য এবং অকাট্য যুক্তি যার দ্বারা তিনি তাঁর বক্তব্য পেশ করতেন তা বুদ্ধিমান এবং শিক্ষিত পুরুষ এবং মহিলা উভয়কেই আকৃষ্ট করত। নর্দাম্পটন ডেইলী হেরাল্ড মন্তব্য করেছে—"স্বামী বিবে কানন্দকে দেখা এবং তাঁর ভাষণ শোনা এমনই একটা মহাসুযোগ যা কোন বুদ্ধিমান ন্যায়বোধসম্পন্ন আমেরিকাবাসীর হারানো উচিত নয়, যদি অবশ্য তিনি যে জাতি তার বয়স সহস্রের হিসেবে নির্ণয় করে, যেখানে আমরা আমাদের জাতির বয়স শতের হিসেবে নির্ণয় করি, সেইরকম একটা জাতির মননশীলতার বিকাশ, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ পরিণতির উজ্জ্বল জ্যোতিকে—যিনি প্রতিটি মনের অনুধাবনের বিষয়—প্রত্যক্ষ করতে আগ্রহী হন।" একই পত্রিকা লিখেছে—"সকল শ্রেণীর মানুষ তাঁর কথা শুনতে

যেত, বিশেষ করে বিভিন্ন বৃত্তির মানুষ তাঁর যুক্তিসিদ্ধ এবং দৃঢ় প্রতিষ্ঠ চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হতে আগ্রহ বোধ করত। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ডেট্রয়েটের শ্রীমতী ব্যাগলি যাঁদের তাঁর ভাষণ শুনতে আমন্ত্রণ জানাতেন তাঁদের মধ্যে থাকতেন "আইনজীবী, বিচারক, ধর্মপ্রচারক, সেনাদলের উচ্চ আধিকারিক, চিকিৎসক এবং ব্যবসায়ীগণ—তাঁদের স্ত্রীকন্যাদিসহ" এবং "প্রত্যেকে সুগভীর আগ্রহের সঙ্গে তাঁর কথা শুনতেন।" ব্রুকলিনে সকলপ্রকার বৃত্তির এবং কর্মের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা—চিকিৎসক, আইনজীবী, বিচারক, এবং শিক্ষক—বহু মহিলাসহ শহরের সকল অঞ্চল থেকে শুনতে এসেছেন 'ভারতীয় ধর্মসমূহের' সমর্থনে তাঁর অপরিচিত ভাবের সুন্দর বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষণ... তাঁরা শুনেছেন তাঁর শিক্ষাদীক্ষা, পাণ্ডিত্য, তাঁর রসজ্ঞতা, বাগ্মিতা, তাঁর পবিত্রতা, নিষ্ঠা ও পুণ্যময়তার কথা, সেজন্য তাঁরা আশা করেছেন তাঁর কাছে অনেক বড় কিছু এবং তাঁরা নিরাশ হননি।"

স্বামীজীর পাণ্ডিত্য ছিল বিস্ময়কর যার সঙ্গে "আমাদের পণ্ডিতেরা তুলনায় আসতেই পারেন না" এবং এই পাণ্ডিত্য এবং তৎসহ তাঁর অদম্য মনোহারী "চুম্বকের মতো আকর্ষণী শক্তি", তাঁকে যে অতুলনীয় বক্তা করেছিল তাইই নয়, আলাপচারিতায়ও অপূর্ব দক্ষতা এনে দিয়েছিল। মেমফিসের একজন সংবাদদাতা সৌভাগ্যক্রমে স্বামীজী যেখানে যেখানে বক্তৃতা দিয়েছেন সেখানে সেখানে জানতে পেরে গিয়েছেন, তিনি লিখছেন—"সঙ্গী হিসাবে তিনি অসাধারণ চিত্তাকর্ষক ব্যক্তি এবং আলাপচারী হিসাবে সম্ভবত যে কোন পাশ্চাত্য দেশের বৈঠকখানায় যারা দক্ষ আলাপচারী বলে খ্যাত, তাদের সকলকে ছাড়িয়ে যান।" বিনয়ের সঙ্গে পাণ্ডিত্য, সারল্যের সঙ্গে প্রজ্ঞার সংমিশ্রণ, যারই নিকট সংস্পর্শে তিনি এসেছেন তারই নিকট তাঁকে প্রিয় করে তুলেছে। "ধর্ম, বিজ্ঞান ও দর্শনতত্ত্ব সম্বন্ধীয় এবং শুধু তাঁর দেশের বিষয়েই পাণ্ডিত্য নয়, সমগ্র বিশ্বের সাহিত্যে তাঁর জ্ঞান ছিল অতি লক্ষণীয়ভাবে বিস্তীর্ণ এবং তিনি তাঁর এই বহুমুখী জ্ঞানের দরুন যেকোন পরিস্থিতি বা পদে তাঁর ভাগ্য উত্তীর্ণ করুক না কেন, তিনি তার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন। তাঁর সমস্ত আচরণে এবং কথাবার্তার মধ্যে এমন একটি শিশুসুলভ সরল ভাব আছে যা সকলের সহানুভূতি আদায় করে নেয় এবং তাঁর কথাগুলির মধ্যে যে আন্তরিকতা আছে তা তিনি কথা আরম্ভ করার আগেই অনুভূত হয়"—এ-সকল কথা লিখেছেন মেমফিসের আর

একজন সংবাদদাতা। মেমফিস কমার্সিয়াল পত্রিকা লিখেছে—"স্বামী বিবেকানন্দ সরকারি এবং বেসরকারিভাবে নাগরিকদের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছেন এবং সংস্কৃতিমনা জনগোষ্ঠীর মধ্যে গভীর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন। তাঁর এতরকম বিষয়ে পাণ্ডিত্য এবং তাঁর জ্ঞান এত ব্যাপক, এত গভীর যে এমন কি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যাঁরা বিশেষজ্ঞ, কিংবা ধর্মতত্ত্ব, কলা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশারদ—সকলেই, তাঁর উক্তি হতে জ্ঞান আহরণ করেন এবং তাঁর উপস্থিতিতেই সেগুলি আত্মস্থ করেন।" বাল্টিমোরে তাঁর সম্বন্ধে লেখা হলো—"একজন চিত্তাকর্ষক আলাপচারী... বিভিন্ন ডজন খানেক ভাষার সকল শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনাদির সঙ্গে সুপরিচিত তিনি এবং তিনি স্পেন্সার, ডারউইন, মিল এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের লেখা থেকে যে সাবলীল ভঙ্গিতে দীর্ঘ উদ্ধৃতি-সকল দেন তা বিস্ময়জনক।" এবং সর্বোপরি স্বামীজী ছিলেন "একজন মানুষের পক্ষে যতটা সৎ ও আনন্দময় হওয়া সম্ভব ততটাই সৎ ও আনন্দময়।"

তথাপি তাঁর চারপাশে ছিল তাঁর আধ্যাত্মিক উচ্চতার মহিমা। যদিও তিনি "হাসিখুশি" ছিলেন এবং কোন কোন সময় "কোন [উদ্ধত] প্রশ্নকর্তার ওপর হাসিটাকে ফিরিয়ে দিতেন"। তাঁর বক্তৃতাবলীর এবং আলাপচারিতার যে-সকল বিবরণ পাওয়া যায় তার মধ্য দিয়ে অনুভব করা যায় তাঁর "বিনয়ের" মধ্যেও তাঁর সমুন্নত মহিমা এবং "চুম্বকের মতো আকর্ষণী শক্তিকে"। ম্যালভিনা হফম্যান লিখছেন—"তাঁর চারপাশে ছিল একটি প্রশান্তি এবং শক্তি যা আমার মনে যে-ছাপ রেখেছিল তা কখনো মুছে যাবার নয়। ব্রহ্মের খাঁটি আচার্যগণের মধ্যে যে-রহস্যময়তা এবং ধর্মীয় বৈরাগ্যের ভাব থাকে তিনি যেন তার মূর্ত বিগ্রহ এবং এর সঙ্গে সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর মধ্যে একটি করুণাঘন নম্র সরল মনোভাবের যা ছিল তার আশেপাশের মানুষদের অভিসিঞ্চিত করবাব জন্য উৎসারিত।" শ্রীমতী মার্থা ব্রাউন ফিঙ্কে, যিনি স্মিথ কলেজে তাঁর সাক্ষাৎলাভ করেছিলেন যখন তিনি একটি কিশোরী মেয়ে মাত্র। তিনি লিখেছেন—"তাঁর মুখমণ্ডলে একটি দুর্জ্ঞেয় অভিব্যক্তি ছিল, চোখ এমন ঝলসানো জ্যোতিপূর্ণ এবং এমন একটি শক্তির বিকিরণ ঘটছিল তার মধ্য থেকে যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।"

"গতিময়" শব্দটি স্বামীজী সম্বন্ধে প্রায়ই ব্যবহৃত হতো, এতে অবশ্য তাঁর সম্বন্ধে একটি ভুল চিত্র দেওয়া হয়ে থাকতে পারে। তিনি সাধারণ অর্থে "গতিময়" বলতে যা বোঝায়, তা ছিলেন না ; অর্থাৎ, তিনি বিস্ফোরক

ছিলেন না। তাঁর মধ্যে নিহিত ছিল গভীর সংহত-শক্তি এবং চুম্বকের মতো আকর্ষণ-যোগ্যতা যা চোখে দেখার নয়, অনুভবের বস্তু; এবং প্রচণ্ডতা দূরে থাক তাঁর "হাবেভাবে ছিল মৃদুতা, তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল চিন্তা করে ফেলা, আর প্রতিটি উচ্চারিত শব্দে ও উচ্চারণভঙ্গিতে ছিল ভদ্রতা।" তাঁর উচ্চারিত বাক্যে শক্তি এবং প্রাণময়তা থাকা সত্ত্বেও, তাঁর বাচনভঙ্গি ছিল ধীর, বাক্যের লক্ষ্য ছিল সুনির্দিষ্ট। সমকালীন অধিকাংশ বক্তাগণ যেখানে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখতেন, সেখানে বিবেকানন্দের অভ্যাস ছিল মঞ্চে পায়চারি করতে করতে বলা—"এক এক সময় তাঁর ভঙ্গিতে মনে হতো যেন তিনি স্বগতোক্তি করছেন"। তিনি কখনো বাক্যে অলঙ্কার বিস্তার করতেন না বা কণ্ঠস্বরকে উচ্চগ্রামে নিয়ে শক্তির পরিচয় রাখতে চেষ্টা করতেন না। তিনি শ্রোতাদের বিশ্বাস উৎপাদন করতেন "তাঁর বক্তৃতাকালে সৌম্যশান্ত প্রকাশভঙ্গির দ্বারা, হড়বড় করে নয়, তাঁর নিম্নগ্রামে বলা আন্তরিক উপস্থাপনা তাঁর উচ্চারিত শব্দগুলিকে আশ্চর্যরকম আবেদনময় করে তুলত।" নর্দাম্পটনের একজন সংবাদদাতা যে-কথা খুব দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করেছে, বলেছে—"তাঁর ধীর, কোমল, শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন সঙ্গীতময় কণ্ঠস্বর তাঁর চিন্তারাজিকে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বাহ্যশক্তি প্রয়োগে উচ্চরিত শব্দ সমূহের শক্তি ও অগ্নিময়তাকে ধারণ করে সোজা লক্ষ্যে পৌঁছে দিত।" ব্রুকলিনে দেওয়া তাঁর প্রথম বক্তৃতাটির কণ্ঠস্বর বিন্দুমাত্র উচ্চগ্রামে না তুলে বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিদ্যুৎস্পর্শের মতো আলোকিত করে তোলার তাঁর যে ক্ষমতা ছিল তার একটি লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এই ভাষণটি, যেটি অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল এবং যেটি "সেই সভায় শত শত যোগদানকারীকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল", একজন সংবাদদাতা লিখছেন—সেটি দেওয়া হয়েছিল "উত্থানপতন-বিহীন একই স্বরগ্রামে।"

পাশ্চাত্যজীবন সম্বন্ধে স্বামীজী সমালোচনা করেছেন এবং তা যত দিন অতিবাহিত হয়েছে তত বেশি করেই করেছেন কিন্তু তার মধ্যে কখনো কোন অতিরঞ্জন থাকত না, যদিও সেগুলি সোজা লক্ষ্যমুখী ছিল, কিন্তু সেগুলি সর্বদা ব্যক্ত হয়েছে "সৌজন্যের সঙ্গে, দয়ার্দ্রভাবে এবং অত্যন্ত শোভনভঙ্গিতে।" "যদিও কখনো তিনি কোন বিশ্বাস বা প্রথা যা তাঁর নিকট অরুচিকর মনে হয়েছে তাকে আঘাত করেছেন, কিন্তু তাকে সবসময় সূচীবিদ্ধ করেছেন কখনো শলাকার মতো বস্তু তার জন্য ব্যবহার করেননি"—এ কথা লিখেছিল ডেট্রয়েটের একটি পত্রিকা এবং লুসী মনরো তাঁর গোড়ার

দিককার ভাষণাদি সম্বন্ধে একই কথা বলেছেন—"যদিও ছোটখাট ব্যঙ্গোক্তিগুলি যা তাঁর ভাষণে তিনি ঢোকাতেন তীক্ষ্ণ তরবারির খোঁচার মতো করে, তাহলেও সেগুলি এতই শোভন রুচিকর যে তাঁর শ্রোতাদের মধ্যেও অনেকে তা বুঝতেই পারতেন না। এই তরবারির খোঁচা দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর সৌজন্যে কখনো কোন অভাব ঘটেনি, কারণ আমাদের প্রথাগুলির প্রতি এই ধাক্কা সোজাসুজি নয়, সেজন্য তা রূঢ় হয়ে ওঠে না"। পরবর্তী সময়ে স্বামীজীর এই ধাক্কাগুলি আরো সোজাসুজি হয়ে দাঁড়িয়েছিল ১৮৯৪-এর মে মাসে। এ-বিষয়ে শ্রীমতী রাইট লিখছেন—"কৌতুকপূর্ণ, তিক্ত, তীক্ষ্ণ হুল ফোটানো—যা এগুলির যথাযোগ্য এবং খুব সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন এবং প্রত্যেকটিই বিষয়বস্তুর সঙ্গে সুসঙ্গত উত্তর...।"

সত্যসত্যই যত সময় অতিবাহিত হতে লাগল স্বামীজীর হাবভাবও পরিবর্তিত হতে লাগল। যদিও তিনি সবসময়ই সংযত থেকেছেন, কিন্তু জনসাধারণের নিকট তাঁর পৌঁছবার ভঙ্গি আরো দৃঢ়তাব্যঞ্জক হয়েছিল। গোড়ার দিকে তিনি "হাবভাবে নম্র ও শিষ্ট থাকতেন যতক্ষণ না তিনি উত্তেজিত হয়ে জেগে উঠতেন।" ধর্মমহাসভার অব্যবহিত পরে অধ্যাপক রাইটের নিকট লিখিত পত্রসমূহে, তিনি বিনয়ী ও নম্রনত তাঁর শক্তির জন্য ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল এবং বাহ্যত তাঁর নতুন কর্মক্ষেত্রে পথের সন্ধান করেছেন আর সে-পথের বাধাবিঘ্নগুলি অনুভব করে যে কোনরকম সহানুভূতি ও সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞ থাকতেন। স্বামীজী কখনো দয়ার্দ্রতার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাননি, কিন্তু যেই তিনি তাঁর কাজের পরিধি ও তাঁর দায়িত্ব উপলব্ধি করতে পারলেন, তিনি তাঁর নিজের মধ্যে এক "জগৎ-আলোড়নকারী" শক্তির বিকাশ সম্বন্ধে একটি অটুট বিশ্বাস লাভ করলেন। তিনি ক্রমবর্ধমান নিশ্চয়তার সঙ্গে জানলেন যে, তাঁর নিজের কাজের এবং কথার পশ্চাতে জগতের অন্য কোথাও তা নেই এ-রকম একটি মহাশক্তি বর্তমান। "আমার পিছনে এমন একটা শক্তি দেখছি, যা মানুষ দেবতা বা শয়তানের চেয়ে অনেকগুণ বড়।"[২*] তিনি আলাসিঙ্গাকে ১৮৯৫-এর সেপ্টেম্বরে লিখলেন এবং যত বিনয়ীই তিনি হোন না কেন, তিনি সেইসঙ্গে এই শক্তির বিচ্ছুরণ দ্বারা গঠিত একটি জ্যোতির্মণ্ডল নিজের চারপাশে বহন করেছেন, যা অনেকের সহ্য করতে কষ্ট হয়েছে। (১৮৯৩ এবং ১৮৯৪-এ তিনি এই শক্তি তাঁর

* বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পত্র সংখ্যা ২১৩, পৃঃ ১৩৩

সমালোচকদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছেন। ১৮৯৫-এর বসন্তকালে তিনি অনুভব করলেন যে, ধর্মযাজকদের গোঁড়ামির পৃষ্ঠদেশ ভেঙে দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। তারপর থেকে তিনি তুলনামূলকভাবে সমালোচনার প্রতি অপ্রতিরোধী হয়ে রইলেন।)

যদিও স্বামীজী সমালোচনা যখন করেছেন তখন দৃঢ়তা অবলম্বন করেছেন কিন্তু তিনি "কখনই আক্রমণাত্মক" ছিলেন না এবং একমাত্র যারা তাঁর তীক্ষ্ণ মন্তব্যের সত্যতার দরুন পরাজিত হতো, তারাই তাতে দোষ দেখত। তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিদ্বেষ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। শ্রীমতী ব্যাগলি লিখেছেন—"তিনি কাউকে শত্রুতে পরিণত করতেন না, বরঞ্চ মানুষকে একটি উচ্চতর স্তরে উন্নীত করতেন—সেটি কোন মানুষের সৃষ্ট মতবাদ বা সুনির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের নামাঙ্কিত কোন কিছু নয়, তার অনেক উর্ধ্বের একটা ব্যাপার এবং তারা তাদের নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর একটি ঐক্য অনুভব করত।" তিনি যাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন তারা তাঁর সরলতা সম্পর্কে স্বীকৃতি রেখেছে। আইওয়া স্টেট রেজিস্ট্রার লিখেছে—"যারা তাঁকে ভালভাবে জানতে পেরেছে তারা দেখেছে যে, তিনি অত্যন্ত মৃদু স্বভাবের এবং ভালবাসার যোগ্য মানুষ, সৎ এবং খোলামেলা, উদার, কোন ঢং নেই, তাঁর প্রতি যে-সকল সহৃদয়তা প্রকাশ করা হয়েছে তজ্জন্য সর্বদা কৃতজ্ঞ"। তাঁর উজ্জ্বল প্রতিভা, তাঁর সরস উপস্থিত বুদ্ধি, তাঁর বিশাল আশ্চর্য জ্ঞানভাণ্ডার যা বিস্তৃত ছিল প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই এবং প্রত্যেক মানুষ ও পরিস্থিতির বিষয়ে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি, একদিকে আত্মসচেতনতা অথচ অভিমানশূন্যতা যা তাঁর শিশুর মতো স্বভাবকে আবরিত না করে আরো বেশি করে উদ্ঘাটিত করে দিত—এ-সবই ছিল তাঁর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। আসলে সত্য কথা হলো এই যে, স্বামীজী যখন আমেরিকায় আসেন তখনই তিনি পরমহংস অবস্থায় (ঈশ্বর সম্বন্ধে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভে) সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং সেটাই তাঁর পুণ্য পবিত্র চরিত্রের মধ্যে শিশুর মতো অমল এবং দিব্যানন্দময় স্বভাবে পরিণত হয়। এর থেকে মাঝে মাঝে ইঙ্গিত পাওয়া যায় ভারত পরিক্রমাকালে তাঁর অন্তর্জীবনের অবস্থা কিরূপ ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ সহস্রদ্বীপোদ্যান (থাউস্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্ক) থেকে ১৮৯৫-এর জুন মাসে মেরী হেলকে লেখা চিঠিতে তিনি তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে হৃদয় উন্মুক্ত করে লেখেন—"প্রতিদিনই মনে হচ্ছে—আমার করণীয় কিছু নেই। আমি সর্বদাই পরম শান্তিতে আছি। কাজ তিনিই করছেন।

আমরা যন্ত্রমাত্র। তাঁর নাম ধন্য!" কাম, কাঞ্চন ও প্রতিষ্ঠারূপ ত্রিবিধ বন্ধন যেন আমা থেকে সাময়িকভাবে খসে পড়েছে। ভারতে মধ্যে মধ্যে আমার যেমন উপলব্ধি হতো, এখানেও আবার তেমনি হচ্ছে— 'আমার ভেদবুদ্ধি, ভালমন্দ বোধ, ভ্রম ও অজ্ঞান বিলুপ্ত হয়েছে, আমি গুণাতীত রাজ্যে বিচরণ করছি। কোন্ বিধিবিশেষ মানব ? কোন্টাই বা লঙ্ঘন করব ?"[৩*] শেষ দুটি বাক্য স্বামীজী কর্তৃক "শুকাষ্টকম"-এর (শুকদেব রচিত আটটি শ্লোক) প্রথম শ্লোকটির উদার অনুবাদ এবং এ হলো গুণাতীত অবস্থা বা অতীন্দ্রিয় অবস্থার বর্ণনা। এ-অবস্থা একবার প্রাপ্ত হলে, আর কখনো তা হারিয়ে যায় না।

এমন কি যখন স্বামীজী কঠিন শ্রমসাধ্য কর্মে লিপ্ত ছিলেন তখনো দেখি তাঁর "শিশুসুলভ সরল হাবভাব" এবং তাঁর চরিত্রের পুণ্যময়তা নিয়ে প্রচুর মন্তব্য করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্মরণে জাগে যে শ্রীমতী রাইট লিখেছেন তাঁর আমেরিকা দর্শনের প্রথম দিকে "আমরা দেখলাম আমাদের অতিথি একজন নানাগুণ সমন্বিত উৎসাহী প্রিয় শিশু অজানা পৃথিবীর বুকে চলতে আরম্ভ করে যেরকম ভীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেরকমই একটু ভীতু ভীতু ভাব নিয়ে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন।" যাত্রা শুরু করে কিন্তু স্বামীজী খ্যাতি বা কঠিন জীবনযাত্রা এর কোনটার দ্বারাই পরিবর্তিত হয়ে যাননি। মধ্য পশ্চিমাঞ্চল এবং পূর্বাঞ্চল ভ্রমণের পর যখন তিনি মন্দ অভিপ্রায়-যুক্ত ব্যক্তিদের নিন্দা লাভ করেছেন এবং বৌদ্ধিক ও সামাজিক ক্ষেত্রের অগ্রণী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে বিখ্যাত ব্যক্তি হিসাবে সমাদর লাভ করেছেন, সে সময়েও শ্রীমতী ব্যাগলি তাঁর সম্পর্কে লিখছেন—"তিনি শক্তিমান, মহৎ মানুষ এবং এমন একজন যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে হাঁটেন এবং তিনি শিশুর মতো সরল-হৃদয় এবং বিশ্বাসপ্রবণ" ; ও ব্রুকলিনের কাগজগুলিও লিখল "তার পবিত্রতা, নিষ্ঠা এবং দিব্য ভাবের কথা"। এই যে অসংক্ষুব্ধ এবং অলঙ্ঘ্য নিষ্কলঙ্ক স্বভাবটি, এই যে একটি রহস্যময় শিশুসুলভ স্বভাব, যা 'মহিলাদের সঙ্গে কথা বলার সময় অথবা তাঁর সংযত ভাবের" কারণে তাঁর পরিচিত মহিলাদের মধ্যে মাতৃভাবের জাগরণ ঘটাত—যেমন শ্রীমতী লায়ন, শিকাগোর শ্রীমতী হেল, শ্রীমতী রাইট, শ্রীমতী ব্যাগলি, শ্রীমতী বুল এবং নিঃসন্দেহে শ্রীমতী গার্নসির মধ্যে ঘটেছিল, এটি হলো হিন্দু

* বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ১৯৭, পৃঃ ১১৯

পাঠকেরা জানেন একজন পরমহংসের অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে চিরদিনের জন্য যুক্ত হয়েছেন—তাঁরই বৈশিষ্ট্য।

যে-কথা বলা হয়েছে, স্বামীজীর বক্তৃতাগুলির ওপর প্রতিবেদনে সংবাদপত্রগুলিতে যে-সকল শিরোনামা দেওয়া হয়েছিল তা আমাদের ভাল করে নির্দেশ দেয় তিনি তাঁর সফরের সময়ে আমেরিকার অধিবাসীদের মনে কি ধরনের ধারণার বীজ বপন করে চলেছিলেন। পূর্বোক্ত কাহিনীগুলি বর্ণনাকালে আমি তাঁর ৬৫টি বক্তৃতা, ৭টি ঘরোয়া কথাবার্তা এবং ৬টি সাক্ষাৎকার যা ১৮৯৩-এর ২৭ আগস্ট থেকে ১৮৯৫-এর ২৮ জানুয়ারির মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ যে তারিখে তিনি নিউ ইয়র্কে পাঠচক্রের আসর উদ্‌ঘাটন করলেন সেই তারিখ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল, তা উপস্থাপিত করেছি। এগুলি ছাড়া ব্রুকলিনে ১৮৯৫-এর ফেব্রুয়ারি ৩ ও ২৫ এবং এপ্রিলের ৮ তারিখে দেওয়া তিনটি বক্তৃতাকে এই বক্তৃতা সফরের সময়ের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, যদিও সেগুলি নিউ ইয়র্কের পাঠক্রমের আসর চলাকালীন সময়ের মধ্যে দেওয়া। তার কারণ এ-বক্তৃতাগুলির বেশির ভাগেরই বিষয় ছিল ভারতের রীতিনীতি—বেদান্ত নয়। এইভাবে আমরা এইরূপ ৬৮টি বক্তৃতা পাচ্ছি—যেগুলি "প্রাক্-বৈদান্তিক" ভাষণাবলী বলে শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে।

বক্তৃতাগুলির শিরোনামাকে ভিত্তি করে এগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায় : ভারত-বিষয়ক, ধর্ম-সমন্বয়-বিষয়ক এবং বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম-বিষয়ক। যেগুলি প্রথম শ্রেণীভুক্ত তার মধ্যে "ভারতে মুসলমান শাসন"-বিষয়ক এবং "ভারতে রৌপ্যের ব্যবহার" শিরোনামায় যে-দুটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন সে-দুটি দেওয়া হয়েছিল সারাটোগা স্প্রিংসে। তেরটি ছিল হিন্দুদের জীবনযাত্রার সাধারণ চিত্র এবং তার ভাষ্য সংক্রান্ত, ছটি ছিল হিন্দু নারীজীবনের ব্যাখ্যা, দুটি ছিল সোজাসুজিভাবে ভারতে খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারকদের স্থান নিয়ে, তেইশটি দেওয়া হয়েছিল ভারতের ধর্মসমূহের ব্যাখ্যাস্বরূপ, এর মধ্যে পাঁচটি ছিল পুনর্জন্মবাদ প্রসঙ্গে। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত বক্তৃতাগুলি যার প্রসঙ্গ ছিল ধর্ম-সমন্বয়, তার মধ্যে নয়টি দেওয়া হয়েছিল সরাসরি ঐ বিষয়েই এবং আটটি ছিল সাধারণ অর্থে ধর্মবিষয়ে। তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত বক্তৃতাগুলিতে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে মোট পাঁচটি বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল।

যদিও এ-কথা সত্য যে, স্বামীজীর বক্তৃতাগুলিকে শিরোনামা দিয়ে ঠিক ঠিক শ্রেণীবিভাগ করা যায় না—কারণ তাঁর মনোজগতে কোন বিভাগ

ছিল না। তাঁর মনোজগতে ছিল একটি জৈবিক ঐক্য যার মধ্যে প্রত্যেকটি চিন্তা খুব গভীরভাবে অন্যান্য প্রতিটি চিন্তার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল, তা হলেও ওপরের বিশ্লেষণ থেকে এ-কথা সুস্পষ্ট যে, আমেরিকায় প্রথম দিকে দেওয়া তাঁর বক্তৃতাগুলি প্রধানত ছিল ভারতের ব্যাখ্যাস্বরূপ, তার সঙ্গে অনুস্যূত হয়ে থাকত সহনশীলতার প্রসঙ্গ এবং ভগবান বুদ্ধের ওপর গুরুত্ব দিয়ে মানুষকে করুণা করতে শিক্ষা দেওয়া।

স্বামীজীর ভারত সম্বন্ধে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে এটি লক্ষ্য করার মতো যে, এর মধ্যে যেগুলি ধর্মমহাসভার পূর্বেই দেওয়া হয়েছিল তার সঙ্গে যেগুলি পরে দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে একটা বিষয়গত এবং সুরের পার্থক্য আছে। ১৮৯৩-এ সালেমে যে বক্তৃতাগুলি দেওয়া হয়েছিল সেগুলির প্রতিবেদনে দেখা যায় তাঁর উপস্থাপনায় একটা দোষদৃষ্টিহীনতা রয়েছে—এমন একটা বিশ্বাস রয়েছে যেন বেশির ভাগ মানুষ অন্য মানুষদের কল্যাণের কথাই তাদের হৃদয়ে সর্বদা জাগ্রত রেখেছে। আমেরিকার সম্পদের, আমেরিকার উদারতার কথা আগেভাগেই বলেছেন এবং যেন ভারতের যা সত্যই প্রয়োজন তার একটি সরল ব্যাখাই বিশাল-হৃদয় আমেরিকার জনসাধারণের নিকট থেকে সহায়তা পাবার পক্ষে যথেষ্ট হবে। অবশ্য স্বামীজী তখনো যে খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদের গোঁড়ামির কথা জানতেন না তা নয়, কারণ ভারতেই এদের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি, কিন্তু হিন্দুদের আত্মা নয়, তাদের দেহটাকেই রক্ষা করার প্রয়োজন বেশি—এ-কথায় যে তীব্র বিরোধিতা লাভ করেছিলেন তাতে তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

তার অল্প পরেই তাঁর প্রতিবাদের সুর পালটে গেল। ধর্মমহাসভায় তিনি খ্রীস্টানদের কপটতার জন্য তিরস্কার করেন। তিনি প্রশ্ন করেন "তোমরা খ্রীস্টানেরা পৌত্তলিকদের আত্মাকে উদ্ধার করবার জন্য তাদের কাছে ধর্মপ্রচারক পাঠাতে খুব উদ্‌গ্রীব, কিন্তু বলো দেখি, অনাহার দুর্ভিক্ষের কবল থেকে তাদের দেহগুলি বাঁচাবার জন্য কোন চেষ্টা কর না কেন? ভারতবর্ষে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের সময় হাজার হাজার মানুষ ক্ষুধায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কিন্তু তোমরা খ্রীস্টানেরা কিছুই করনি। ... আমি আমার দরিদ্র দেশবাসীর জন্য তোমাদের নিকট সাহায্য চাইতে এসেছিলাম, খ্রীস্টান দেশে খ্রীস্টানদের কাছ থেকে। অখ্রীস্টানদের জন্য সাহায্য পাওয়া যে কি দুরূহ ব্যাপার, বিশেষ করে তা উপলব্ধি করছি।"*

* বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ২৯

সত্য সত্যই এ-বিষয়টি স্বামীজীর পুরোপুরি উপলব্ধি করতে অধিক সময় লাগেনি।

ধর্ম-মহাসভার পর তিনি খোলাখুলিভাবে আমেরিকার জনসাধারণকে "হিন্দুদের মধ্যে নতুন ধরণের শিল্প গড়ে তোলার কাজে" আগ্রহশীল করে তোলার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করলেন, স্থির করলেন যে, বরঞ্চ তিনি নিজে উপার্জন করে অর্থ সংগ্রহ করবেন, যা দিয়ে তিনি দেশবাসীর কল্যাণের জন্য একটি শিক্ষাপ্রকল্প শুরু করবেন। যদিও তিনি তাঁর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বন্ধুবর্গের নিকট ভারতের জন্য তাঁর কর্মপ্রকল্পের ব্যাখ্যা দেওয়া অব্যাহত রাখলেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ ডেট্রয়েটে একটি ভোজ-সভায় তিনি সন্ন্যাসীদের জন্য একটি শিল্প শিক্ষার মহাবিদ্যালয় স্থাপন করার কথা বললেন, কিন্তু জনসাধারণের নিকট বক্তব্য রাখার সময় তা রাখতেন অধিক পরিমাণে তাদেরই শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে। ভারতের ত্রুটিগুলি তার খ্রীস্টধর্মের অভাবের দরুন—এরকম ধরে নেওয়া হবে এবং তার ফলে সহানুভূতি নয়, আরও বেশি সমালোচনাই করা হবে এ-সম্পর্কে সচেতন হয়ে তিনি আর তাদের সামনে ভারতের জনগণের দারিদ্র্য, অজ্ঞানতা বা দুঃখকষ্টের কথা বলতেন না। তিনি এ-বিষয়েও সচেতন ছিলেন যে, কোন দেশের রীতিনীতি, যখন কোন বিদেশী বিশ্ববীক্ষার নিরিখে দেখা হয় তখন তার অকল্পনীয় অপব্যাখ্যা ঘটে। সুতরাং এখন থেকে তাঁর মুখ্য লক্ষ্য হলো জীবনের প্রতি হিন্দুদের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করা—তার ধর্ম, তার নৈতিক আদর্শ এবং এই পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু-সংস্কৃতির একটি যথার্থ চিত্র দেওয়া। এ ছাড়াও তিনি আমেরিকাবাসীদের মনে ভারত সম্বন্ধে যে-সকল মিথ্যা ধারণা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে সেগুলি অপনোদন করাও তাঁর একটি দায় বলে মনে করেছিলেন। যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই অনেকসময়ই অলীক কাহিনী—বিধবাদের পুড়িয়ে মারা বা নির্যাতন করা, জগন্নাথের রথের চাকার নিচে পিষ্ট করে আত্মহনন করা, শিশুগণকে কুমিরের মুখে নিক্ষেপ করা —প্রভৃতি প্রসঙ্গে তাঁকে ভ্রান্তি নিরসন করতে হয়েছে।

স্বামীজী সেইসকল হিন্দুর একজন কখনই হতে চান নি যারা বিজয়ী জাতির সঙ্গে নিজেদের অভিন্ন ভেবে থাকে, যারা নিজের দেশের জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা নিয়ে উপহাস করে আর তাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে। পরবর্তিকালে তিনি লিখেছেন—"আমার জীবনব্রত একটি বেতনভোগী কুৎসাপ্রচারক হয়ে ওঠা নয়,"[৪] এবং ভগিনী নিবেদিতার ভাষায়—"ভারতের কোন কিছু সম্পর্কে দুঃখপ্রকাশ করার মনোভাবকে অপূর্ব ভঙ্গিতে ঘৃণা করতেন তিনি,"[৫] আর

এই মনোভাব নিয়েই তিনি তাঁর দেশবাসী ও তাঁর দেশেব সম্বন্ধে সর্বদা গর্ব প্রকাশ করেই কথা বলেছেন। সত্যসত্যই স্বামীজী হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি ভারতকে পাশ্চাত্যের নিকট সত্যের আলোকে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি নিজেই যে-কথা আলাসিঙ্গাকে লিখেছিলেন—"আমিই একা সাহস করে নিজের দেশকে সমর্থন করেছি; হিন্দুদের কাছ থেকে এরা যা আশা করে নি, তাই আমি এদের দিয়েছি...।"[৬*] তাঁর অসামান্য আলোকোজ্জ্বল এবং বিশ্বাস-উৎপাদক বর্ণনা ও ভাষ্যসমূহ শুনে আমেরিকাবাসীদের মধ্যে যাঁরা উদারমনা তাদের মনে হয়েছে, ভারতের রীতিনীতি ও ধর্ম সম্বন্ধে সত্যের উদ্ঘাটন ঘটেছে। এবং তাঁরা তাঁর দৃষ্টি দিয়ে যথার্থ ভারতের দর্শনলাভ করে আর কোনদিনও ধর্মপ্রচারক এবং অপর নিন্দুকদের প্রচারিত অপবাদমূলক কাহিনীগুলি গ্রহণ করতে পারেন নি। এমন কি যারা একেবারে কট্টর ধর্মান্ধ তারা এমনই এক নিদারুণ মর্যাদাহানিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছিল যে, তারাও তাদের মতামত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিল। স্বামীজীর উপস্থিতিই তাদের বিরুদ্ধে সকলের চলে যাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। "তাঁর উচ্চ সংস্কৃতিবান মন, তাঁর বাগ্মিতা, তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব হিন্দু সভ্যতা সম্বন্ধে একটি নতুন ধারণা এনে দিয়েছিল"—এ-কথা ক্রিটিক পত্রিকায় লিখেছেন লুসী মনরো ধর্মমহাসভার অল্প পরেই এবং যত সময় অতিবাহিত হতে লাগল, তাঁর দেওয়া এই নতুন ধারণা ক্রমে প্রতিষ্ঠিত সত্যে পরিণত হলো।

আমি বিশ্বাস করি এ-কথা বললে যথার্থ হবে যে, এক বছরের চেয়ে কিছুটা বেশি সময়ের মধ্যে স্বামীজী তাঁর মাতৃভূমির সম্বন্ধে কয়েক দশক ধরে এদেশে যে প্রবল বিরুদ্ধ মনোভাবের স্রোত বয়ে চলেছিল, তার গতি চিরতরে পরিবর্তিত করে দিয়েছেন। তিনি এটা করেছেন প্রচারের পন্থা অবলম্বন না করেই, কতকগুলি বর্ণনামূলক ভাষণ এবং ভারতের জীবনধারা সম্বন্ধে নতুন অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে ভাষ্য দিয়ে তিনি পুরো হিন্দু-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য উদ্ঘাটিত করেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শ্রীমতী রাইট বর্ণিত, র‍্যাডক্লিফ কলেজে যে তুলনাটি তিনি করেছিলেন ভারত এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে সেটি উল্লেখ করা যেতে পারে, তিনি তাতে বলেন—"আমরা যখন ধর্মোন্মাদ হই তখন আমরা নিজেদের পীড়ন করি, আমরা বৃহৎ বৃহৎ শকটের সম্মুখে নিজেকে নিক্ষেপ করি, আমরা নিজেদের গলাকাটি, আমরা লৌহশলাকার

---

* বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ১৭৭, পৃঃ ১১২

শয্যায় নিজেরা শয়ন করি; কিন্তু তোমরা যখন ধর্মান্ধ হও, তখন তোমরা অন্যদের গলা কাটো, অগ্নিদগ্ধ কর এবং তাদের লৌহশলাকায় বিদ্ধ কর!- তোমরা তোমাদের নিজেদের চামড়া খুব বাঁচিয়ে চল!" পুনরায় হিন্দু নারীগণের পুণ্যময় এবং মহান জীবনযাপন সম্বন্ধে তাঁর চিত্ত আলোড়নকারী-বর্ণনাগুলি রয়েছে ঃ "পাশ্চাত্যে নারী হলো স্ত্রী, প্রাচ্যে মা। হিন্দুগণ মাতৃভাবের পূজা করে। এমন কি সন্ন্যাসীরাও মায়ের চরণধূলি তাদের কপালে স্পর্শ করে।" অথবা তিনি বলেছেন হিন্দুর সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপরতা এবং অতুলনীয় অতিথিপরায়ণতার কথা। ডেট্রয়েটের শ্রোতাদের এ-প্রসঙ্গে বলেছিলেন ঃ "যতক্ষণ পর্যন্ত গৃহে অতিথি-আপ্যায়নের মতো কোন সম্বল আছে, ততক্ষণ তারা কোনক্রমেই অতিথিকে ফেরাবে না। অতিথি আহার গ্রহণ করে তৃপ্ত হলে তখন শিশু সন্তানেরা, তারপর পিতা, তারপর মাতা আহার করবে। তারা বিশ্বের দরিদ্রতম দেশের লোক, কিন্তু একমাত্র দুর্ভিক্ষের সময় ছাড়া কেউ কখনো সেখানে অনাহারে মরে না।" তিনি জাতিবিভাগের গুণগুলি ব্যাখ্যা করেছেন। একবার তিনি বলেন ঃ "সত্য কথা ভারতে জাতিভেদ আছে। কিন্তু সেখানে একজন খুনী কখনো সমাজের শীর্ষে আরোহণ করতে পারে না। এখানে, সে যদি কোটিপতি হয়, তাহলেই সে অন্যদের মতো ভাল। ভারতে যদি কেউ একবার অপরাধী হয়, সে চিরদিন অপাঙ্‌ক্তেয় বলে বিবেচিত হয়"। পুনরায় এ-সম্পর্কে বলেছেন—"জাতিবিভাগে দরিদ্র এবং সর্বাপেক্ষা ধনীর স্থান একইপ্রকার, এটাই এর সবচেয়ে সুন্দর দিক।...জাতিভুক্ত মানুষের আত্মার বিষয় চিন্তা করার সময় আছে এবং ভারতীয় সমাজে আমরা সেটাই চাই।" স্বামীজীর শ্রোতৃবৃন্দ কখনো ভুলবে না তাঁর দেওয়া হিমালয় প্রদেশের এক বিশুদ্ধ হিন্দু গোষ্ঠীর বর্ণনা—"যাদের কথা মুসলমান বা খ্রীস্টানরা জানতে পারে নি।" এ-ভাষণটি তিনি দিয়েছিলেন ডেট্রয়েটের একটি সভায়, সে বর্ণনাটি তাঁর আর কোন বক্তৃতা বা লেখায় দেখা যায় না। সে-ভাষণের বিবরণীতে বলা হয়েছে, "তারা এত সৎ যে সর্বজনসমক্ষে এক থলি স্বর্ণমুদ্রা ফেলে রাখলে বিশ বৎসর পরেও দেখা যাবে সেটি সেরকমই অক্ষত আছে। কানন্দের ভাষায় 'তারা দেখতে এত সুন্দর যে ধানক্ষেতের মধ্যে একটি মেয়েকে দেখলে থেমে পড়ে অবাক হয়ে ভাবতে হবে যে ঈশ্বর এত সুন্দর করে তাকে কি করে সৃষ্টি করলেন।' তাদের আকৃতি সুগঠিত, চোখ এবং চুল কৃষ্ণবর্ণ এবং তাদের গায়ের রঙ দুধে আলতার (আঙুলে পিন ফুটিয়ে একবিন্দু রক্ত এক গেলাস দুধে মেশালে

যেমন দেখায় সেরকম) মতো। তারা হলো বিশুদ্ধ হিন্দু, সর্বদোষমুক্ত নির্মল, কখনো কারো অধীনতা স্বীকার করেনি তারা।"

যারা মনে করত হিন্দু-সংস্কৃতি হলো বর্বরদের চেয়ে মাত্র এক ধাপ এগিয়ে, স্বামীজীর—"জগতের প্রতি ভারতের দান" শীর্ষক ব্রুকলিনে প্রদত্ত একটি ভাষণ তাদের ওপর এসেছিল একটি বজ্রাঘাতের মতো। সত্যসত্যই এ-বক্তৃতাটি এমনকি যারা অপেক্ষাকৃত উদারচিত্ত তাদের কাছেও আঘাত-স্বরূপ বেজেছিল, কারণ এ-বক্তৃতাটি ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতায় ভারতের বহুমুখী এবং অমূল্য অবদানের বিষয়ে—জনসমক্ষে এ-বিষয়ে দেওয়া এটিই প্রথম বর্ণনা। এ-বক্তৃতাটি শোনবার পর, যারা আধ্যাত্মিক অবদানের চেয়ে ঐহিক অবদানকে বেশি মূল্য দিত সেই ব্যক্তিদেরও যে-দেশ তাদের সভ্যতার পিতৃস্বরূপ তার নিকট মাথা নত করতে হয়েছিল।

এই ধরনের উদ্ঘাটন সহায়ে স্বামীজী যেন একটি নতুন পৃথিবীর দরজা খুলে দিলেন। আমেরিকাবাসীদের বলা হয়েছিল এবং তারা বিশ্বাস করেছিল যে উক্ত দরজার অভ্যন্তরে আছে ভূতপ্রেত, শয়তান, শয়তানের উপাসকগণ এবং এমন একটি দানব-জাতি যারা প্রায় নিজেদের সন্তানদের ভক্ষণ ছাড়া আর সব কিছু করে। অকস্মাৎ উদ্ঘাটিত হলো এক দেশ যা অতি প্রাচীন এক সংস্কৃতির, এক মহোচ্চ জীবনাদর্শের, পবিত্রতা এবং আত্মত্যাগের, যেখানে অপরকে নির্যাতন করার কোন ব্যাপার নেই, যেখানে নৈতিক জীবনের মান বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ, যার ভিত্তি হলো এই বিশ্বাস যে, "সর্বপ্রকার নিঃস্বার্থপরতাই হলো ভাল এবং সর্বপ্রকার স্বার্থপরতাই হলো মন্দ।" অন্য যে-কোন বক্তার মুখ হতে এরূপ কথা বহির্গত হলে তা হতো অবিশ্বাস্য ব্যাপার, কিন্তু স্বামীজী ছিলেন ভারতের সর্বোচ্চ আদর্শসমূহের মূর্ত বিগ্রহ, তিনি ছিলেন তাঁর বলা কথাগুলির প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ। ব্রুকলিনের একজন সংবাদদাতা এ ব্যাপারে লিখেছেন—"হিমালয়নিবাসী খ্যাতনামা ঋষিদেরই এক অপূর্ব নিদর্শন তিনি"—তাঁর ভাষণ শোনা একটা অভিজ্ঞতা যা ভোলা যায় না, এ হলো এমন একটি উদ্ঘাটন যা পুরান বিশ্বাসকে চুরমার করল এবং স্থায়িভাবে ভারতকে পাশ্চাত্যের চোখে উচ্চস্থানে উন্নীত করল।

আমেরিকার সামনে নিজ দেশকে উপস্থাপিত করতে গিয়ে স্বামীজী কোথাও সত্যকে গোপন করবার প্রয়াস করেন নি। তিনি কখনো তাঁর শ্রোতাদের তার দোষত্রুটি দেখাতে ত্রুটি করেন নি, কিন্তু তিনি কখনো কাল্পনিক কোন কথা বলেননি, কিংবা এরকম কোন ভাবও রেখে যান নি যে এই ত্রুটিগুলিই

ভারতের বৈশিষ্ট্য। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকাবাসীদের ভারতের নাড়ির গতি অনুভব করানো, সেজন্য তাঁর বর্ণনায় তিনি তার স্বাস্থ্যকর এবং স্বাভাবিক অবস্থারই বর্ণনা করেছেন। ব্রুকলিনে প্রদত্ত তাঁর "নারীর আদর্শসমূহ" শীর্ষক ভাষণে তিনি তাই বলেছিলেন—"কোন জাতির বস্তিতে উৎপন্ন জিনিস ঐ জাতিকে বিচার করার পরিমাপক নয়। পৃথিবীর সব আপেল গাছের তলা থেকে কেউ পোকায় খাওয়া সমস্ত পচা আপেল সংগ্রহ করে তার প্রত্যেকটিকে নিয়ে এক একখানি বই লিখতে পারে, তবুও আপেল গাছের সৌন্দর্য এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে তার কিছু জানা নেই, এমনও সম্ভব। জাতির মহত্তম ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের দিয়েই জাতিকে যথার্থ বিচার করা চলে। যারা পতিত, তারা তো নিজেরাই একটি শ্রেণীবিশেষ। অতএব কোন একটি রীতিকে বিচার কববার সময় তার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি এবং আদর্শ দিয়েই বিচার করা শুধু সমীচিন নয়, ন্যায্য ও নীতিসঙ্গত।"*

খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারকগণ এবং কতিপয় ভারতীয় সংস্কারক এ-মত গ্রহণ করেন নি, তাঁরা একে বোঝেনও নি। তাঁদের কাছে পচনগ্রস্ত, কীটদষ্ট আপেলগুলিই হলো বৃক্ষটির ফলগুলির প্রতিনিধিস্বরূপ। এঁরা উভয়েই আদর্শচ্যুত, যে ফলগুলি শ্রেষ্ঠ নয় তার ওপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন : সংস্কারকগণ এমন সব আমূল পরিবর্তনের কথা বলেছেন যা হিন্দু সংস্কৃতির ভিত্তিকেই উৎপাটিত করে ফেলে আর খ্রীস্টধর্মপ্রচারকগণ হিন্দুধর্মকে অধঃপাতে দেন গোঁড়ামিপ্রসূত অত্যুৎসাহ সহযোগে, বেশিরভাগ সময়েই ভুল উপস্থাপনা করে ও ধর্মকে মূলোচ্ছেদ করে তার পরিবর্তে খ্রীস্টধর্ম প্রবর্তন করা হোক এ নিয়ে জোরাজুরি করে। একমাত্র হিন্দুধর্মকে এইভাবে পুরোপুরি অধঃপাতে দেওয়ার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেই যে স্বামীজী আপত্তি তুলেছেন তা নয়, তথাকথিত সংস্কারকদের ক্রমাগত হিন্দুর জীবনকে বৈদেশিক ছাঁচে ঢালাই করবার একগুঁয়ে প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেও আপত্তি জানিয়েছেন।

পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে আমি প্রয়াস করেছি ভারতে খ্রীস্টধর্ম প্রচারকদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে স্বামীজীর যে মতামত সেটি উপস্থাপিত করতে, এখানে তার আর পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু যদি এ-বিষয়ে কোন কিছু আরও বলার থাকে তাহলে সে-বিষয়ে বলার পক্ষে অতি উত্তম স্থান এটি। পাঠকেরা হয়ত লক্ষ্য করেছেন যে, স্বামীজীর মূল বক্তব্য এবং "শয়ে

* বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ১০০

শয়ে হাজারে হাজারে যীশুর প্রচারকদের" আমন্ত্রণ জানানোর মধ্যে একটি আপাতবিরোধিতা রয়ে গিয়েছে। ডেট্রয়েটে তিনি বলেছিলেন—"ভারতে খ্রীস্টের প্রচারকদের চাই—শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে। যীশুর জীবনকে আমাদের নিকট নিয়ে আসুন, আমাদের সমাজের প্রতি কোণে তা অনুস্যূত হোক। তাঁকে ভারতের প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি কোণে প্রচার করা হোক।" যদিও এই বক্তৃতাটিতেই তিনি বলেছেন—"ভারতকে খ্রীস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার প্রসঙ্গে বলা যায়—এ বিষয়ে কোন আশাই নেই। যদিও বা এটা সম্ভব হতো, তবুও এটা করা উচিত হবে না।" এক্ষেত্রে তিনি যে আমন্ত্রণ জানালেন তার অর্থ করা যেতে পারে যে, তিনি খ্রীস্টধর্মে ধর্মান্তরকরণের বিরোধী ছিলেন না, কেবলমাত্র তদানীন্তন ধর্মপ্রচারকদের অত্যন্ত নিম্নস্তরের যোগ্যতার ব্যাপারে বিরোধী ছিলেন।

সত্য কথা যে স্বামীজী খ্রীস্টধর্ম প্রচারক এবং "খ্রীস্টের প্রচারকদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন, এ-বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় মেমফিসে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায়, যাব মধ্যে তিনি এ-কথা বলেছেন বলে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে—"পাশ্চাত্যবাসী যখন এইভাবে (জলমগ্ন ব্যক্তি, যেমন করে বাতাস চায়) ভগবানকে চাইতে পারবে, তখনই তারা ভারতে স্বাগত হবে, কেননা প্রচারকেরা তখন আসবেন যথার্থ সদ্ভাব নিয়ে। ভারত ভগবানকে জানে না—এই ধারণা নিয়ে নয়। তাঁরা আসবেন যথার্থ প্রেমের ভাব বহন করে—কতকগুলি মতবাদের বোঝা নিয়ে নয়।"* তাই যখন তিনি "খ্রীস্টকে ভারতের গ্রামে গ্রামে কোণে কোণে প্রচার করা হোক", বলেছেন তখন মতবাদের খ্রীস্ট অর্থাৎ যিনি একমাত্র এবং একক মুক্তিদাতা তাকে নয়, ববঞ্চ যিনি পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক গুণসমূহের বিগ্রহ, যাঁর জীবনসম্বন্ধে জ্ঞান যে-কোন সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করবে—তাঁকে আহ্বান জানিয়েছেন।

"শত শত হাজার হাজার" খ্রীস্টের ধর্মপ্রচারকদের আমন্ত্রণ জানানোর সময়ে মনে রেখেছেন সেই সকল নরনারীদের কথাই যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে কল্যাণ সাধন এবং আধ্যাত্মিকতার বীজ জনমানসে বপন করা, দরিদ্র, পতিত এবং দুর্দশাগ্রস্তদের সেবা করা এবং যাঁরা ধর্মের মূল ভাবের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করবেন, তার বাহ্য রূপের ওপর নয়, তাঁরা আদৌ খেয়াল করবেন না হিন্দুরা খ্রীস্টকে, না শিবকে, শ্রীকৃষ্ণকে না বুদ্ধকে—

* বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৫২

কাকে পূজা করছে। ডেট্রয়েটে তিনি বলেছিলেন, "ঈশ্বরকে যে সত্যিই ভালবাসে তার সময় হবে না অন্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোকদের এ-কথা বলবার যে তারা ভুলপথে চলেছে... এবং নিজের মতে তাদের টেনে আনবার।"

যদি এরূপ ঈশ্বর-প্রেমিকেরা ভারতের প্রতি কোণে ভিড় করে আসেন, স্বামীজী জানতেন তাঁরা কেউ হিন্দুধর্মকে আক্রমণ কববেন না—বরঞ্চ হিন্দুধর্ম তাঁদের দ্বারা আরও ঐশ্বর্যময় হয়ে উঠবে, আরও ৬াকৃত হবে। সেজন্য তাঁর আহ্বানের অর্থ এ নয় যে তাঁর দেশ ধর্মান্তরকরণের জন্য একটি উন্মুক্ত ক্ষেত্র। সত্যই, যারা তার কাছে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি নিয়ে এসেছে তাদের সকলে ভারত স্বাগত জানিয়েছে, কিন্তু তার দরজা বন্ধ থেকেছে তাদের কাছে যারা এসেছে তাকে বাধা দিতে বা ধ্বংস করতে। ডেট্রয়েটে একটি ঘরোয়া আলোচনায় তিনি বিদেশীদের প্রতি হিন্দুদের মনোভাবের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। সেই আলোচনার সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণী অনুসারে তিনি বলেনঃ "যখন বিদ্যার্থী হয়ে গ্রীকগণ হিন্দুস্থানে শিক্ষা গ্রহণ করতে এসেছে ভারত তার সকল দরজা তাদের কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছে, কিন্তু যখন মুসলমানগণ তরবারি হাতে এবং ইংরেজরা বন্দুকের গুলি নিয়ে এ দেশে এল, তখন ভারত তার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, তাদের বাঞ্ছিত মনে করে স্বাগত করে নি। কথাগুলি কানন্দ অতি স্পষ্ট অর্থব্যঞ্জক শব্দে প্রকাশ করেছেন—'যখন বাঘ আসে, তখন সে চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা দরজা বন্ধ করে রাখি'।"

অবশ্য স্বামীজীর ভারত সম্বন্ধে দেওয়া বক্তৃতা এবং কথাবার্তা সম্বন্ধে সংবাদপত্রে প্রকাশিত আরও অনেক প্রতিবেদন থেকে অনেক কিছু ..ার আছে এবং আমার লোভ হচ্ছে ক্রমাগত সে-বিষয়ে বলে যেতে। যদিও এ-কথা সত্য যে ভারতে তাঁর দেওয়া ভাষণ, তাঁর লিপিবদ্ধ কথাবার্তা, তাঁর গুরুভাই ও শিষ্যদের নিকট লেখা চিঠিপত্র এবং তাঁর বাংলাভাষায় লেখা 'বর্তমান ভারত'-এর মতো নিবন্ধগুলি এমন সব অনুচ্ছেদে পূর্ণ যার মধ্যে তিনি তাঁর দেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা বলেছেন, তথাপি আমি বিশ্বাস করি না যে ১৮৯৩, ১৮৯৪ ও ১৮৯৫-এ ভারতকে তি ি উপস্থাপিত করেছেন যে-সকল ভাষণে সেগুলির স্থান অন্য কোন ভাষণ বা লেখা নিতে পারে। অবশ্য আমাকে এ-বিষয়ে আরও বলার লোভ সংযত করতে হচ্ছে, এখন আমাকে এ-অধ্যায়ের মূল প্রসঙ্গের বর্ণনায় নিযুক্ত হতে হবে—সেটি হলো পাশ্চাত্যের প্রতি তাঁর দেওয়া বাণীর এবং পাশ্চাত্যে তাঁর যে-ব্রতসাধনের জন্য তিনি এসেছিলেন তার বিকাশ কিভাবে

ঘটেছিল সেটি আবিষ্কার করা। এজন্য আমাদের সেই প্রথম দুই শ্রেণীর বক্তৃতাবলীর মধ্যে প্রবেশ করতে হবে যার কথা আমি ধর্ম-সমন্বয় এবং বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক বলে পূর্বে উল্লেখ করেছি, কারণ এগুলির মধ্যেই আমরা তাঁর বিশ্ববাণীর সুনির্দিষ্ট ও পূর্ণায়ত রূপায়ণ দেখতে পাই।

॥ ২ ॥

এটা অবধারিত ছিল যে স্বামীজী প্রথম থেকেই পাশ্চাত্যে ধর্ম-সমন্বয়ের ওপরই বলবেন, তার কারণ তিনি ছিলেন একজন হিন্দু যিনি জন্মেছেন সকল ধর্মের সমস্ত সত্যদ্রষ্টা ও ধর্মপ্রবক্তাদের প্রতি একটি সহজাত শ্রদ্ধা নিয়ে। তাছাড়া, আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো যে, ধর্ম-সমন্বয়ের বাণীই ছিল তাঁর গুরুর উপদেশের সারমর্ম এবং তিনি তাঁর গুরুর জীবনে এ-বাণীর বাস্তব প্রয়োগ সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করেছেন। সেজন্য এ কোনরূপ বিস্ময়ের কথা নয় যে, এক ব্যক্তির স্মৃতি অনুসারে অ্যানিস্কোয়ামে স্বামীজী জনসভায় প্রদত্ত প্রথম ভাষণ শুরুই করলেন এই বলে যে, "হিন্দুদের অন্য মানুষদের ধর্মকে বিপুল শ্রদ্ধাভরে দেখতে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে।" কিন্তু যদিও এটা স্বাভাবিক ছিল যে, ধর্ম-সমন্বয় তত্ত্বকে তিনি সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করবেন, কিন্তু এও অবধারিত ছিল যে, তিনি এতেই সন্তুষ্ট হয়ে থাকবেন না।

এই তত্ত্বের অর্থ সাধারণত এই বোঝায় যে, যেহেতু সব ধর্মই এক লক্ষ্যে—অর্থাৎ ঈশ্বরে পৌঁছয়, সেই হেতু প্রত্যেক মানুষ যে-ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে সে জন্ম নিয়েছে অথবা যে-ধর্ম তার সহজ মনে হয় সেই ধর্মকে সে আন্তরিক বিশ্বাসের সঙ্গে অনুসরণ করবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য ধর্মের প্রতি একটি শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব পোষণ করবে। অন্যের বিশ্বাসকে কখনও সমালোচনা করবে না, কিংবা তাদের ধর্মাচরণে কখনও বাধা প্রদান করবে না। স্বামীজী এই শিক্ষাটিকেই তাঁর ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত প্রথম ভাষণে ব্যাখ্যা করেছিলেন, যখন তিনি তাঁর দেশ কর্তৃক সকল ধর্মকে সত্য বলে গ্রহণ করবার কথা বলেছিলেন এবং গীতা হতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছিলেন ঃ

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।"[৭]*

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪/১১

কিন্তু যদিও আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, এ-শিক্ষা সব ধর্মকেই পরস্পরের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বাস করাকে সম্ভব করে তুলবে, কিন্তু ধর্মগুলিকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন রেখে দেওয়া হয়েছে এই শিক্ষাতেও। বাস্তবে এ-শিক্ষার কথা হলো "আমি নিজেও বাঁচি, অপরেও বাঁচুক।" কিন্তু যদি না বিভিন্ন ধর্মগুলির মধ্যে একটি অন্তর্লীন ঐক্যের সন্ধান মেলে, তাহলে এই শিক্ষা হতে কখনই স্থায়ী ধর্ম-সমন্বয়ের উদ্ভব হতে পারে না। সুতরাং এই ঐক্যের ওপরেই পরে স্বামীজী জোর দিলেন তাঁর "হিন্দুধর্ম" শীর্ষক পঠিত প্রবন্ধে যাতে বলা হলো যে, সত্য হলো সেই বস্তু "যা বিভিন্ন রঙের কাঁচের ভিতর দিয়ে একই আলোর বিচ্ছুরণ ঘটায়।"[৮] 'এখানে ভবিষ্যতের বিশ্বজনীন ধর্মকে এই বলে বর্ণনা করা হলো যে, "তা (সর্বজনীন ধর্ম) কখনো কোন দেশ বা কালে সীমাবদ্ধ হবে না; যে অসীম ভগবানের বিষয় ঐ ধর্মে প্রচারিত হবে, ঐ ধর্মকে তারই মতো অসীম হতে হবে। ...স্বীয় উদারতা বশত সেই ধর্ম অসংখ্য প্রসারিত হস্তে পৃথিবীর সকল নরনারীকে সাদরে আলিঙ্গন করবে। পশুতুল্য অতি হীন বর্বর মানুষ থেকে শুরু করে ...শ্রেষ্ঠ মানব পর্যন্ত সকলকেই স্বীয় অঙ্কে স্থান দেবে। ...তার সমগ্র শক্তি মনুষ্যজাতিকে দেব-স্বভাব উপলব্ধি করতে সহায়তা করার জন্যই সতত নিযুক্ত থাকবে।"[৯]*

যদিও স্বামীজী এ-সময় এ-ধর্ম বাস্তবে কী রূপ নেবে সে-বিষয়ে কোন ইঙ্গিত দেন নি, কিন্তু ধর্মমহাসভায় তাঁর সমাপ্তি ভাষণে আমরা দেখি কি-ভাবে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে অন্ততপক্ষে আংশিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে সে-বিষয়ে পন্থা নির্দেশ করতে। তাঁর প্রথম বক্তৃতার সীমানা অতিক্রম করে তিনি এতে ঘোষণা করলেন যে, একজন খ্রীস্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হতে হবে না; অথবা হিন্দু বা বৌদ্ধকে খ্রীস্টান হতে হবে না; কিন্তু "প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগগুলি গ্রহণ করে পুষ্টিলাভ করবে এবং স্বীয় বিশেষত্ব বজায় রেখে নিজ প্রকৃতি অনুসারে বর্ধিত হবে।"[১০]** এখানে তিনি অন্য ধর্মকে কেলবমাত্র শ্রদ্ধার চক্ষে দেখার কথাই বলছেন না, তিনি এখানে পৃথিবীর সকল অধ্যাত্ম-চিন্তাকে একত্রে গ্রহণ করবার দৃষ্টিভঙ্গি আনবার কথা বলছেন এবং প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে যে-বিভেদের প্রাচীর বিদ্যমান, তাকে ভেঙে দেবার কথা বলেছেন। ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার যে অর্থহীনতা সে-সম্বন্ধে

* বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ২৭
** ঐ, পৃঃ ৩৪

তিনি প্রথমাবধিই সচেতন ছিলেন এবং এ-কথা জেনে যে-রূপক কাহিনী কখনও কখনও একটি বিবৃতির চেয়ে সত্যকে বুঝতে বেশি সহায়ক হয়, ধর্মমহাসভায় ও পরে অন্যত্র বহু জায়গায় সেই অহঙ্কারী ভেকের কাহিনীটি বলেন—যে নিজের ক্ষুদ্র কূপটিকেই সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বলে মনে করত আর যাকে এর বিপরীত কোন কথাতে কোনমতেই বিশ্বাস করানো যায় নি।

স্বামীজী যখন তাঁর বক্তৃতা সফর শুরু করেন, আমরা তখন তাকে দেখি ক্রমাগত ধর্মগুলির ঐক্যের ওপর জোর দিতে এবং কিভাবে এই ঐক্যে উপনীত হওয়া যাবে সে-সম্পর্কে নানা পন্থার কথা বলতে। যাই হোক যদিও তাঁর বক্তৃতাগুলি হতে দেখা যায় তাঁর চিন্তাধারার একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী বিকাশ ঘটছে, তথাপি তিনি তাঁর পূর্ববর্তী ধারণাগুলিকে একেবারে পরিত্যাগ করেন নি, তিনি সেগুলি অটুট রেখেছিলেন এবং মাঝে মাঝে সেগুলির পুনরাবৃত্তি করতেন তাদের জন্য যারা এরূপ শিক্ষা থেকে উপকৃত হবে যে, সব ধর্মই মানুষকে একই লক্ষ্যে নিয়ে যায় সুতরাং সব ধর্মকেই সত্য এবং মঙ্গলের জন্য উদ্ভূত বলে স্বীকৃতি দিতে হবে। সংবাদ পাওয়া যায় যে, মেমফিসে তিনি বলেছিলেন— "হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, সবধর্মের মধ্যেই সত্যবস্তু আছে, সব ধর্মই মানুষের মধ্যে পবিত্রতার জন্য যে অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষা আছে তার মূর্তবিগ্রহ এবং সেজন্য সব ধর্মকেই শ্রদ্ধা করা উচিত।" স্বামীজী অনুভব করেছিলেন যে, কেবলমাত্র পারস্পরিক শ্রদ্ধা সব ধর্মের মধ্যে ঐক্য আনতে পারবে না, তিনি এও জানতেন যে, ঐক্য আনবার জন্য এই শ্রদ্ধাটি হলো আবশ্যিক, কারণ একবার যদি নিজ ধর্ম সম্বন্ধে ধর্মান্ধতা কোন মানুষের হৃদয় অধিকার করে বসে তাহলে আর কোন আশা থাকে না। সেই একই শহরে তিনি কোন ভারতীয় সন্ন্যাসীর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছিলেন—"যদি তুমি এ-কথা বল যে কুমিরের কামড় না খেয়ে তুমি তার একটি দাঁত তুলে আনবে, আমি তোমাকে বিশ্বাস করব, কিন্তু তুমি যদি এ-কথা বল যে কোন সঙ্কীর্ণচিত্ত ধর্মান্ধ ব্যক্তির হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাতে পারবে, তাহলে কিন্তু আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারব না।" এ-কথা কি তিনি মেমফিসে কোন খ্রীস্টধর্মযাজককে বলেছিলেন, যাঁর কথা স্বামীজী পরে তাঁর মাদ্রাজ অভিনন্দনের উত্তরে লিখেছিলেন, যিনি প্রচার করতেন যে, "ভারতে প্রত্যেক গ্রামে এমন একটি করে পুকুর আছে যা, শিশুদের হাড়গোড়ে ভরতি ?"

আমেরিকাতে এরূপ হাজার হাজার ধর্মান্ধের সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি, সেজন্য সহনশীলতার মূল শিক্ষা তাঁকে দিতেই হয়েছিল। বার বার তিনি এ-সত্যের ওপর জোর দিয়েছেন যে সব ধর্মই ভাল, এবং ধর্মে বৈচিত্র্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। "এই বিশ্বের মানসলোকে যে-বিচিত্র সুরের ঐকতান সঙ্গীতের ঝঙ্কার বাজছে, তা থেকে কেন মাত্র একটা সুরকে বেছে নিচ্ছ?"—এ প্রশ্নটি তিনি করেছিলেন ডেট্রয়েটে। "অপূর্ব ঐকতান সঙ্গীতের সুরের সংহতি, তাকে সেভাবেই বাজতে দাও।...প্রত্যেকটি ধর্মই সেই অপূর্ব সুর-সংহতির সংগঠনে একটি করে সুর দান করেছে।" এই যুক্তিটির আরও বিস্তার করে তিনি অনেক সময়ই বলেছেন সেই পাঁচটি অন্ধ মানুষের কাহিনীটি, যাতে আছে যে, প্রত্যেকে একটি হস্তীর বিভিন্ন অঙ্গে হস্তস্পর্শের দ্বারা অনুসন্ধান করে জোরের সঙ্গে হস্তী কিরকম জীব সে-বিষয়ে নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রত্যেকেই ভুল করেছিল, কিন্তু তাদের প্রত্যেকের মতগুলি একত্রিত করলে পূর্ণসত্যটি পাওয়া যায়। ডেট্রয়েটে তিনি বলেন—"কোন একটি বিশেষ ধর্ম কোন নির্দিষ্ট জনসমষ্টির পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয় তাদের জীবন-চর্যার অভ্যাস, রীতি, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া গুণাবলী এবং পরিবেশের প্রভাবসমূহের জন্য। অপর ধর্ম অন্য এক জনগোষ্ঠীর উপযোগী হয় অনুরূপ কারণসমূহের দরুন।...এই যে প্রাণময় স্রোতস্বতী ধারা তা যেভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেছে সেভাবেই প্রবাহিত হোক, যে এর এই গতিপথ রুদ্ধ করবে সে একটি মূর্খ, প্রকৃতিই সমস্যার সমাধানকর্তা।" কিংবা পুনরায় বলেছেন—"সব মানুষ এক নয়, পৃথক ধরনের মানুষ আছে। যদি এ-বৈচিত্র্য না থাকে, পৃথিবীর মানসিক অধঃপতন ঘটবে। যদি বিভিন্ন ধর্ম না থাকে, তাহলে কোন ধর্মই থাকবে না।" এইভাবে স্বামীজী বিভিন্ন প্রকৃতির শ্রোতাদের নিকট, যার নিকট যেটি মূল্যবান তার নিকট সেটি রক্ষা করেছেন। কিন্তু সহনশীলতার মূল কথাগুলি শিক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও, সেই সঙ্গে তিনি প্রয়াস চালিয়েছেন সেই-সব নীতিগুলি প্রণয়ন করতে যা সকল ধর্মকে আলিঙ্গন করে নিয়ে একটি ঐক্য গঠন করবে।

১৮৯৩-এর নভেম্বরের ২৭ তারিখে আইওয়ার অন্তর্গত ডেসমইনসে যে বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন সে-সম্পর্কে সংবাদদাতার বিবরণটি এইরূপ : "তিনি মনে করেন খাঁটি খ্রীস্টান হতে গেলে সব ধর্মকেই গ্রহণ করতে হবে। যে-জিনিস একটি ধর্মে নেই, তা অন্য ধর্মে আছে। সে-ধর্মগুলিও ঠিক এবং খ্রীস্টানদের সেগুলিতে প্রয়োজন আছে। তোমরা যখন আমাদের দেশে

কোন প্রচারক পাঠাও, তখন সে হয়ে যায় [বা তার হওয়া উচিত] একজন হিন্দু-খ্রীস্টান আমাকে হতে হয় খ্রীস্টান-হিন্দু।" এখানে স্বামীজী দেখাতে চেষ্টা করেছেন কি করে বাস্তবে কেউ অন্যান্য ধর্মের মূলভাবকে যে শুধু আত্মস্থ করছে তাই নয়, নিজেকে তার সঙ্গে একাত্মও করছে, অথচ তার নিজের যে-ধর্ম তার প্রতি বিশ্বাসে সে অটুট থাকছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একজন খ্রীস্টান ভারতে গেলে নির্দ্বিধায় এবং কোন ভয় না করে মন্দিরে অথবা মসজিদে গিয়ে উপাসনা করতে পারে। তার কাছে কোন একটি নির্দিষ্ট ধর্মের ছাপ হলো সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক এবং সঙ্কীর্ণতা হলো বিভেদের উৎস। ১৮৯৫-এ তিনি শ্রীমতী বুলকে লিখেছিলেন ঃ "আমার গুরুদেব বলতেন, হিন্দু, খ্রীস্টান প্রভৃতি বিভিন্ন নাম মানুষে মানুষে পরস্পর ভ্রাতৃভাবের বিশেষ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।"* খুব সম্ভব তিনি অনুভব করেছিলেন, নিজের ধর্মের নামের সঙ্গে অন্য ধর্মগুলির নাম যোগ করার কৌশলটিই কেবলমাত্র তাঁর প্রার্থিত ঐক্য আনার পক্ষে যথেষ্ট নয়, যদিও তিনি এ-ধারণাটি একেবারে পরিত্যাগ করেননি।[১১] তথাপি আমেরিকায় অন্য কোন বক্তৃতায় এ-প্রসঙ্গটি আর উল্লেখ করতে দেখি না।

এই একই স্থান ডেসমইনস-এ দেওয়া অপর একটি বক্তৃতায় আমরা স্বামীজীকে আরও একটি অগ্রণী ধারণা উপস্থাপিত করতে দেখি। তিনি বলেন যে, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য খুঁজে বার করার প্রয়াসের দ্বারা ধর্ম-জীবনে বিস্তার ঘটে ঃ কারণ প্রত্যেক ধর্মমত এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কতকগুলি সাধারণ মৌল এবং চিরন্তন তত্ত্ব আছে যেগুলি হলো তাঁর মতে প্রকৃত ধর্ম। তিনি বলেন—"আমাদের দেশে দুটি শব্দ আছে যা সম্পূর্ণ পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়, এ দেশে তা নয়। এই শব্দ দুটি হলো 'ধর্ম' এবং 'সম্প্রদায়'। 'ধর্ম' কথাটির দ্বারা আমরা সব ধর্মকে একসঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করি।...তারপর আছে 'সম্প্রদায়' কথাটি। এ-শব্দটি যে-সকল মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করে তারা তাদের বদান্যতার আবরণে নিজেদের আবরিত করে বলে, 'আমরা ঠিক, তোমরা ভুল'।" স্বামীজী এখানে খ্রীস্টানগণকে কোন একটি ধর্মমতের সঙ্গে বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিজেদের অভেদ বলে বিবেচনা করতে বিরত থাকতে বলেছেন এবং আহ্বান জানাচ্ছেন সব ধর্মকে সমন্বিত করে যে-কালাকালবিহীন বিশ্বজনীন ধর্মের অবস্থান তাকেই বরণ করতে।

* বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ১৭০, পৃঃ ৮৫

যত সময় অতিবাহিত হতে লাগল, তিনি ধর্মের সঙ্গে 'ধর্মমত'-এর পার্থক্যের ওপর ততই অধিকতর জোর দিতে লাগলেন এবং তিনি সেই-সকল ঐক্য-বিধায়ক নীতিগুলি প্রণয়ন করবার প্রয়াস করতে লাগলেন যেগুলির মধ্য দিয়ে যে-কেউ দেখতে পাবে সব ধর্মমতগুলি পূর্ণ সত্য-ধর্মের অন্তর্গত, তার অংশস্বরূপ। ধর্মমতকে যদি সত্য-ধর্মের অন্তর্গত একটি অংশ হিসাবে দেখা যায়, তাহলে তা কিছু ভুল নয়, কিন্তু সেটিকেই যদি পূর্ণ ধর্ম বলে ধরা হয় তাহলে তা মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। ডেট্রয়েটে একটি সাক্ষাৎকারে প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন—"ধর্ম সব বর্তমান ধর্মমতকে একত্রে বোঝায়, কারণ এগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে একই লক্ষ্যে পৌঁছবার প্রয়াস লক্ষিত হয়। 'ধর্মমত' কথাটি পরস্পরবিরোধী ও দ্বন্দ্বসূচক। বিভিন্ন ধর্মমত আছে, কারণ বিভিন্ন ধরনের মানুষ আছে। বিভিন্ন ধর্মমতগুলি জনমানসে স্থান পেয়েছে কারণ বিভিন্ন মানুষ যা চায় তা সেগুলি দিচ্ছে।... 'ধর্ম' এই প্রয়োজনকে স্বীকৃতি দেয় এবং এই যে বিভিন্ন ধরনের ধর্মমত আছে তাতে ধর্ম আনন্দিত, কারণ এর অন্তর্নিহিত ভাবটি খুব সুন্দর।... এই যে বিভিন্ন ধর্মমত বিভিন্ন মানুষ গ্রহণ করেছে, এর মধ্য দিয়ে সকল মানুষের আত্মার অসীমত্ব উপলব্ধির প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়।"

স্বামীজীর মতে, খ্রীস্টধর্মের মধ্যে অপর ধর্মমতের প্রতি "বিরোধিতামূলক লক্ষণগুলির জন্য" এটি একটি ধর্মমত মাত্র, পূর্ণ ধর্ম নয়। অপরপক্ষে হিন্দুধর্ম হলো একটি পূর্ণ ধর্ম কারণ "হিন্দুধর্মের মূলগত বৈশিষ্ট্য হলো অন্য ধর্ম ও বিশ্বাসসমূহের প্রতি সহিষ্ণুতার মনোভাব।" অবশ্য কেবলমাত্র সহিষ্ণুতা থাকলেই 'ধর্ম' হয়ে ওঠে না, কিন্তু তিনি যেকথা বলেছিলেন, সব ধর্মমতের মধ্যে ঐক্য-বিধায়ক যে-তত্ত্বটি আছে তাকেও গ্রহণ করা চাই। এই গ্রহণশীলতা থেকেই আসে সত্যিকারের এবং স্থায়ী সহনশীলতা। "আমি ধর্ম-শিক্ষকদের বলি প্রথমে তোমরা জাতীয়তার মনোভাব পরিত্যাগ কর, দ্বিতীয় কথা বলি সম্প্রদায়গত মনোভাব পরিত্যাগ কর"। "ঈশ্বরের পুত্রদের কোন সম্প্রদায় নেই"—একথা বলেন ডেট্রয়েটে।

স্বামীজী নানাভাবে 'ধর্ম' ও 'ধর্মমত' এ-উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করেন। এর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর একটি ব্যাখ্যা—যা তাঁর অন্য কোন বক্তৃতা বা লেখায় পাওয়া যায় না, তা দেন ডেট্রয়েটে ১১ মার্চ তারিখে তাঁর চিত্তাকর্ষক বক্তৃতাটিতে, যার শিরোনামা ছিল "ভারতে খ্রীস্টধর্মপ্রচার সংস্থাসমূহ"। বক্তৃতাটির সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—

"তিনি তাদের বলেন কিভাবে অসভ্য বর্বর জাতির মানুষ কয়েকটি মণিমুক্তো হাতে পেলে একটি মোটা চামড়ার ফালির সঙ্গে সেগুলি ঝুলিয়ে গলায় পরে। যেই সে একটু অপেক্ষাকৃত সভ্য হয়ে ওঠে তখন সে চামড়ার ফালির বদলে একটি মোটা সূতোর সঙ্গে ওগুলি গাঁথবে। যখন সে আরো বেশি আলোকপ্রাপ্ত হবে তখন তার মণিমুক্তোগুলি সিল্কের সূতোর সঙ্গে গাঁথবে এবং যখন সে সর্বোচ্চস্তরের সভ্যতায় পৌঁছবে তখন সে সেগুলিকে একটি স্বর্ণনির্মিত মণিমুক্তোর কণ্ঠহারে পরিণত করবে। কিন্তু মণিমুক্তোগুলি যাতেই গাঁথা হোক না কেন, আগাগোড়া এগুলি একই বস্তু থাকবে।"

এই বিশ্বজনীন-ধর্মের মূলনীতিগুলিও নির্ধারণ করতে তিনি প্রয়াস করেছেন। ডেট্রয়েটের একজন সংবাদদাতার প্রতিবেদন অনুসারে তিনি সেখানে বলেন, "ধর্ম হলো আত্মস্বরূপের প্রকাশ" কিংবা এ-সময়েই তিনি তাঁর মাদ্রাজী শিষ্য কিডিকে যে-কথা লিখেছিলেন—"ধর্ম হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ।"* মেমফিসে প্রদত্ত তাঁর একটি ভাষণে তিনি একটি অনন্যদৃষ্টান্ত সহকারে নিজ অন্তর্নিহিত পূর্ণতা উপলব্ধির জন্য আত্মার যে-সংগ্রাম তা বোঝাবার প্রয়াস পেয়েছেন। সেটি এখানে পুনরুল্লেখ করা অসঙ্গত হবে না—"যদি একটি গেলাসের তলদেশে তুমি এক কণা বাতাস প্রবেশ করিয়ে দাও তাহলে সেটা তৎক্ষণাৎ ঊর্ধ্বে যে-অনন্ত বায়ুমণ্ডল তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য সংগ্রাম শুরু করে দেবে। আত্মার ক্ষেত্রেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটে। এ-সংগ্রাম সে করছে পুনর্বার তার শুদ্ধ স্বরূপে পৌঁছবার জন্য আর এই জড়দেহের বন্ধন হতে মুক্তিলাভের জন্য। সে তার স্বরূপের অসীম ব্যাপ্তিব সঙ্গে একীভূত হয়ে যেতে আকাঙ্ক্ষা করে। সর্বত্র এই একই কথা প্রযোজ্য।" পুনরায় তিনি ডেট্রয়েটে বলেন, "এক গেলাস জলের মধ্যে একবিন্দু বায়ু প্রবেশ করলে বুদ্বুদ কেটে প্রয়াস করে গেলাস থেকে বেরিয়ে বাইরের বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে মিশে যেতে; তেল, ভিনিগার এবং অন্যান্য বিভিন্ন পরিমাণ ঘনত্বের পদার্থগুলির ক্ষেত্রে এ-প্রয়াস কমবেশি ব্যাহত হয় তার তরলত্ব অনুসারে। এইভাবে বিভিন্ন মাধ্যমের অভ্যন্তর হতে আত্মা তার ব্যক্তিত্বের অসীমতা লাভ করবার জন্য সংগ্রাম করে চলে।" কিন্তু কেবলমাত্র স্বামীজী আমেরিকায় এসে প্রথম বৎসর অখণ্ড ধর্মের যে-সংজ্ঞা দেবার প্রয়াস করেছিলেন—অন্তর্নিহিত দেবত্বের উপলব্ধি

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ৭৯, পৃঃ ৩১৪

—তাই কিন্তু অখণ্ড ধর্মের সবটা নয়, তাঁর বাণীর পূর্ণায়ত রূপ দেখে বোঝা যায় যে, তাঁর অখণ্ড ধর্মের ধারণা জীবনের আরো অনেক দিককে অন্তর্ভুক্ত করে অবস্থিত। (দুর্ভাগ্যক্রমে এ-সম্বন্ধে তাঁর বিকাশশীল চিন্তার প্রত্যেকটি ধাপ ঠিক-ঠিকভাবে বোঝা সম্ভব নয়, কারণ যেসব তথ্য এ-পর্যন্ত জানা গিয়েছে তা থেকে তাঁর বাণীর নানা বিভিন্ন দিক কিভাবে একটি একক চিন্তাধারায় সংগ্রথিত হয়েছে তা জানবার পক্ষে বেশি সূত্র পাওয়া যায় না। এটা অবশ্য সুস্পষ্ট যে, যতই সময় অতিবাহিত হয়েছে, ততই বেশি করে বিভিন্ন ধারা তাঁর চিন্তাস্রোতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে—প্রত্যেকটিই তাঁর শেষ বাণীর মধ্যে পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে।)

ধর্মীয়-ঐক্যের ভিত্তিভূমি অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে একটি গৌণ প্রয়াসে স্বামীজী অনেক সময় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধর্মচিন্তার মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করতেন। যথা, তিনি উল্লেখ কবতেন প্রচলিত মতে গোঁড়া বিশ্বাসীদের ক্রোধ উৎপাদন করে যে, বৌদ্ধধর্ম হলো খ্রীস্টধর্মের ভিত্তিস্বরূপ, বিশেষ করে রোমান ক্যাথলিক-খ্রীস্টধর্ম সম্প্রদায়ের। তিনি ইন্দো-ইউরোপীয় মানুষদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকারত্বের কথাও প্রায়শই উল্লেখ করতেন। তাঁর ১৮৯৩-এর ৮ অক্টোবর তারিখে দেওয়া একটি বক্তৃতার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—"ভাষাতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা করে তিনি নতুন পৃথিবীতে আর্যজাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এবং তাদের বংশধরদের মধ্যে বহুকাল ধরে স্বীকৃত যে-সম্পর্ক রয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন।" তাঁর বক্তৃতা-সফরকালে সবসময়ই তিনি এই একই সুরে কথা বলতে চেয়েছেন। ডেট্রয়েটের একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনের একটি অংশ-বিশেষ এইরূপ : "প্রাচীনকালে তারা সংস্কৃতভাষায় কথা বলত। পিতা, মাতা, ভগিনী, ভ্রাতা প্রভৃতি শব্দের অনুরূপ ছিল সংস্কৃত ভাষায় ঐগুলির উচ্চারণ। এই তথ্য এবং অন্যান্য আরো তথ্য হতে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, আমরা সকলেই একই মনুষ্যগোষ্ঠী হতে উদ্ভূত হয়েছি, সে গোষ্ঠীটি হলো আর্যজাতি। এই জাতির প্রায় প্রতিটি বিভিন্ন শাখাই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে।"

ইউরোপীয় ও হিন্দুদের একই বংশোদ্ভূত হওয়ার মধ্যে স্বামীজী এই উভয় সভ্যতার মধ্যে একটি ঐক্য গড়ে তোলবার সমর্থন খুঁজে পেয়েছেন। ডেট্রয়েটে একটি ভোজসভায় তিনি এই ধারণাটি অভিব্যক্ত করেন। ভোজসভায় আমন্ত্রিত এক অতিথি এখানে স্বামীজীর কথোপকথনের বিবরণে বলেছেন—

"কানন্দের জীবন-ব্রত... এমনই যা প্রত্যেক মানব-প্রেমিকের মনে আবেদন উপস্থিত করবে। তিনি হিন্দু সভ্যতার মধ্যে আমাদের বস্তুতান্ত্রিক দর্শন এবং উন্নতির অনুপ্রবেশ ঘটাতে চান এবং এও চান যে, আমরা যেন তাদের নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ করি। এ-আদানপ্রদান চলতেই থাকবে যতদিন না আমরা একই অখণ্ড সভ্যতার—নিঃস্বার্থতায় সমুন্নত একটিই দর্শনের—যার মধ্যে সম্প্রদায় বা মতবাদের বিরোধ নেই, যা একই ঈশ্বরের অখণ্ডতায় পরিসমাপ্ত—অধিকারি হয়ে বিভিন্ন আর্যগোষ্ঠী অতীতের মতো একই ভ্রাতৃমণ্ডলীতে পরিণত হই।" পুনরায় পূর্বতটাঞ্চলে স্বামীজী তাঁর শ্রোতাদের মনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জনগণের সাংস্কৃতিক এবং বংশগত আত্মীয়তা সম্পর্কে গভীর ছাপ রাখতে চাইলেন। নর্দাম্পটনে দেওয়া তাঁর একটি বক্তৃতার বিবরণীর শিরোনামা দেওয়া হয়েছিল—"আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণের সঙ্গে একটি সন্ধ্যা" এবং তাতে আরো বলা হয় "স্বামী বিবেকানন্দ সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করলেন যে, সমুদ্রের পরপারে আমাদের সকল প্রতিবেশিবৃন্দ এমন কি যারা আরো বহুদূরের অঞ্চল-নিবাসী তারাও আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ রক্তের সম্বন্ধে সম্পর্কিত, কেবলমাত্র কিঞ্চিৎ তুচ্ছ পার্থক্য রয়েছে গাত্রবর্ণ, ভাষা, প্রথাসমূহ এবং ধর্মের ব্যাপারে।"

"সব ধর্মের মধ্য থেকে অধ্যাপকমণ্ডলী গ্রহণ করে" একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে স্বামীজীর যে-সক্রিয় আগ্রহ দেখা যায় তা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি সব ধর্মের মধ্যে একটি ঐক্যের অনুসন্ধান করছিলেন। বাল্টিমোরে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে মনশ্চক্ষে দর্শন করেছিলেন, কথা হয়েছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়টি বোস্টনের নিকটেই স্থাপিত হবে এবং "এখানে বিশ্বের সকল ধর্মই শিক্ষা দেওয়া হবে।" যে-শিক্ষা "ভারতে উন্নত ধরনের ধর্ম-প্রচার কার্যের জন্য প্রয়োজনীয়।"

যদিও আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়টি—যাকে রেভারেন্ড হিরম ক্রম্যান "বিবেকানন্দের একটি প্রিয় স্বপ্ন" বলে উল্লেখ করেছেন—তা বাস্তবায়িত হয়নি, তবে তার কাছাকাছি ব্যাপার ছিল তুলনামূলক ধর্মশিক্ষার জন্য মনস্যালভ্যাট বিদ্যালয় স্থাপন যেটি গ্রীনএকারে ১৮৯৬-এ স্বামীজীর বন্ধুবর্গ কুমারী সারা ফার্মার এবং ডঃ লুইস জি. জেন্‌সের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। কুমারী ফার্মার বলেন—এই বিদ্যালয়টির উদ্দেশ্য "বিদেশে ধর্মপ্রচারের জন্য ধর্মশিক্ষকদের শিক্ষা দেওয়া—যাতে যেখানে তারা যাবেন সেখানে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে-ঐক্যভূমি আছে তার ওপর তাঁরা দাঁড়াতে পারেন, তাঁরা

সেখানে যেন ঝগড়া করতে না যান।”[১২] এই বিবৃতিটি থেকে মনে হয় যেন স্বামীজী ও কুমারী ফার্মার এ-বিষয়ে আলোচনা করে নিয়েছেন।

এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে স্বামীজী হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি সব ধর্মের মধ্যে ঐক্যের ধারণার সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন এবং এই ধারণার প্রথম প্রবক্তা ও শিক্ষাদাতাও তিনি। তাঁর বক্তৃতাদি, চিঠিপত্র এবং তাঁর অন্যান্য রচনাদি হতে এ-বিষয়ে সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, এই ঐক্যের সন্ধান-প্রয়াস তাঁর মনোজগতে বিরামহীনভাবে নিরন্তর চলেছিল—এ-যেন এমন একটা গতিবেগসম্পন্ন চালিকাশক্তি যা তাঁকে কোন বিরামের অবসর দিচ্ছিল না। কেন এরূপ হয়েছিল—এ-কথা ভেবে কেউ কেউ আশ্চর্যবোধ করতে পারেন। এটা কি এই কারণে যে তিনি ছিলেন একই সঙ্গে একজন দার্শনিক এবং একজন ধর্মপ্রবক্তা, সেজন্যই স্বভাবত নাছোড়বান্দা হয়ে ধর্মজগতে এ-বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট ধারণা প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস করেছিলেন? কিংবা মূলত তিনি একজন ধর্মপ্রবর্তক হওয়ায় তিনি জানতেন যে, বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিকে দ্রুত একটি দৃঢ়বদ্ধ ঐক্য পূর্ণায়ত রূপ পরিগ্রহ করতে চলেছে এবং এ ঐক্য স্থায়ী হতে পারে যদি ধর্মের ক্ষেত্রেও একটি ঐক্য সম্ভব হয়—কারণ এই যে ঐক্য তা একটি মতবাদের মতো কারও ওপর চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপার হবে না, কারণ এ ঐক্য হলো সকল ধর্মের মধ্যে অন্তর্নিহিত সত্যবস্তু—আর সেজন্যই কি তাঁর এই বিরামহীন অনুসন্ধান-প্রয়াস? পুনরায় এটা কি এজন্য যে, তাঁর উপলব্ধি অনুসারে এই ঐক্যবদ্ধ ধর্মের বাণীই হলো শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী? সম্ভবত স্বামীজী এই তিনটি উদ্দেশ্যের দ্বারাই প্রণোদিত হয়েছিলেন। তবে এর মধ্যে দৃঢ়তম প্রেরণা ছিল তাঁর গুরুর জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। সত্য বটে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা সম্বন্ধে যা পাওয়া যায় তার মধ্যে এটা সুস্পষ্ট নয় যে তিনি সব ধর্মের মধ্যে অন্তর্নিহিত এক অখণ্ড ধর্ম আবিষ্কার করে তাকেই উপস্থাপনা করেছিলেন কিনা। বরঞ্চ আমরা দেখি যে, সব ধর্ম তাদের বিভিন্নতাসহই যে উত্তম ও সত্য এবং কোনটাকেই যে স্থানচ্যুত করা উচিত নয়—মনে হয় তিনি যেন এ-কথাই বলেছেন। যদিও স্বামীজী কোনমতেই গুরুপ্রদত্ত এই শিক্ষাকে পরিত্যাগ করেননি, তথাপি মনে হয় তিনি সাধারণের চেয়ে এর গভীরতর একটি অর্থ উপলব্ধি করেছিলেন এবং আমরা যা দেখেছি—তাতে মনে হয় ধর্মমহাসভার প্রথম দিনগুলিতেই সকল

ধর্ম ও মতকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি বিশ্বজনীন ধর্মমত প্রণয়নের প্রচেষ্টা করেছিলেন।

আমরা তাঁর প্রথম দিকের বক্তৃতা বা ভাষণ বা সাক্ষাৎকারের মধ্যে অবশ্য এই একক বিশ্বজনীন ধর্মের বিশদ রূপ কিরকম হবে কিংবা তদানীন্তন ধর্ম বা মতবাদগুলি কিভাবে এর সঙ্গে সামঞ্জস্য-সাধন করবে কিংবা এর রূপায়ণ কিভাবে করা হবে যাতে এটি সকল প্রকার ধর্মীয় আকাঙ্ক্ষা, প্রয়াস এবং অভিজ্ঞতাকে অন্তর্ভুক্ত করে কিভাবে প্রতিভাত হবে—সে-বিষয়ে কোন ইঙ্গিতই পাই না। কিন্তু নিঃসন্দেহে এই সমস্যাগুলি তাঁর বক্তৃতা-সফরের শেষের দিকে তাঁর মনকে অধিকার করেছিল এবং পরিশেষে সেগুলির সমাধান মিলল তাঁর বেদান্তকে সুদৃঢ় সত্যরূপে স্থাপনের মধ্য দিয়ে।

স্বামীজীর আমেরিকাবাসীদের নিকট ধর্মের সারতত্ত্ব ব্যাখ্যা করার এবং ভারতকে তার যথাযথ রূপে উপস্থাপিত করার প্রয়াসের কালে তিনি ভারতের ধর্মীয় ব্যাপারে পূর্ণ পরিণতিলাভের কথা জোর দিয়ে বলেছেন—তার উচ্চতম আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ এবং সেই জ্ঞানকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখার ওপরও জোর দিয়ে কথা বলেছেন। কিন্তু বাস্তব-সচেতন মানসিকতাসম্পন্ন আমেরিকানদের মনে এ-প্রশ্ন অনিবার্যভাবেই এসেছে যে, কেন ভারতের ধর্ম পাশ্চাত্যের ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে, যখন ঐহিক ক্ষেত্রে সে একটি এত পিছিয়ে পড়া দেশ? এ-প্রশ্নটা যে সবসময় তাকে ত্যক্ত করবার উদ্দেশ্যে করা হতো তা নয়, কিংবা চিন্তা না করে যে করা হতো তাও নয় এবং এ-সকল প্রশ্ন যে স্বামীজী অপ্রাসঙ্গিক বলে এড়িয়ে গিয়েছেন তাও নয়। যদিও তিনি প্রায়ই আমেরিকানদের "অর্থ-উপাসনাকে তিরস্কার করেছেন, কিন্তু আমেরিকানদের আবিষ্কার কবার এবং সংগঠনী প্রতিভার এবং সর্বোপরি তাদের সাধারণ মানুষের উন্নতি করার বিষয়ে দক্ষতার তিনি প্রচণ্ড অনুরাগী ছিলেন। যাঁর হৃদয়ে সার্বিক মানব-কল্যাণের কথাটিই স্থান পেয়েছে—তা সে কল্যাণ দৈহিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক যেটিই হোক না কেন—তিনি ঐহিক কল্যাণকে কখনো উপেক্ষা করতে পারেন না। সত্যসত্যই স্বামীজীর একটি অতি প্রিয় ইচ্ছা ছিল ভারতের ঐহিক উন্নতি আনয়ন করা। কিন্তু সমস্যা হলো এটি কিভাবে ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনকে অটুট রেখে করা যাবে?

বহু হিন্দুর নিকট এবং অনেক আমেরিকানের নিকটেও আধ্যাত্মিকতা এবং ঐহিক উন্নতিবিধান করা কোন বিশেষ সমস্যার ব্যাপার বলে মনে হতো না। এ-কথা ধরেই নেওয়া হয় যে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক পুনর্জাগরণ

হাত ধরাধরি করে আসে এবং শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা সাধিত ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তির পুনর্বার প্রবল জাগরণের ফলস্বরূপ স্বতঃসিদ্ধরূপেই ঐহিক উন্নতি আসবে। কিন্তু স্বামীজী এরূপ কোন সিদ্ধান্ত অনুমান করে নেননি। তিনি পুরোপুরি ইতিহাসের ছাত্র হওয়ায় এবং মানব-প্রকৃতি অত্যন্ত ভালভাবে জানায় তিনি সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে, ইতিহাসে ধর্মীয় বিকাশ এবং জাগতিক উন্নতি সবসময়েই বিপরীতমুখী দেখা গিয়েছে। একটি থাকলে আর একটি থাকেনি, এভাবেই চলে এসেছে, সুতরাং তাদের মধ্যে যে বাঞ্ছিত সমন্বয় তাকে প্রকৃতি বা দৈবের ওপর ছেড়ে দিলে হবে না। যদিও তিনি এ-কথা বারে বারে ঘোষণা করেছেন যে, একটি আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণই ভারতের একমাত্র আশা, তিনি অবাস্তবভাবে এ কখনো কল্পনা করেননি যে, আধ্যাত্মিক জাগরণকে অনুসরণ করে ঐহিক উন্নতির একটি স্বর্ণযুগ আপনা থেকেই এসে পড়বে।

মেমফিসে একটি আলোচনায় কালে তাঁকে এ-প্রশ্ন করা হয় যে, কেন ভারতের ধর্ম তাকে জগতের অন্যান্য উন্নত জাতিগুলির মধ্যে স্থান করে দেয়নি। উত্তরে তিনি বলেন, "*কারণ ঐহিক উন্নতি ধর্মের কোন ক্ষেত্র নয়। আমাদের জাতি জগতের সকল জাতির মধ্যে নীতিপরাযণ, কিংবা অন্য যে-কোন দেশের মতোই নীতিপরায়ণ। তারা তার আশেপাশের মানুষদের অধিকার সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি বিবেচক, এমন কি মূক প্রাণীদেব অধিকার সম্বন্ধেও কিন্তু তারা ইহবাদী নয়। কোন ধর্মই কোন রাষ্ট্র বা জনগোষ্ঠীর চিন্তা বা প্রেরণার অগ্রগতি ঘটায় নি। বস্তুত ধর্ম পিছিয়ে দেয়নি এমন কোন (ঐহিক) উন্নতি মানুষের ইতিহাসে ঘটেনি। যে খ্রীস্টধর্ম নিয়ে তোমরা এত বড়াই কর, সে ধর্মও এ-ব্যাপারে কোন ব্যতিক্রম বলে নিজেকে প্রমাণিত করেনি। তোমাদেব ডারউইন, মিল, হিউম, কখনো তোমাদের উচ্চপদস্থ ধর্মযাজকদের সমর্থন পায়নি।*" এ-সম্পর্কে স্মরণে আসছে এক বছর পরে ব্রুকলিনে "নারীত্বের আদর্শ"-প্রসঙ্গে তাঁর একটি উক্তি "*যখনই সন্ন্যাসের আদর্শ সমাজ জীবনে উচ্চস্থান লাভ করেছে, তখনই নারীর অবনতি ঘটেছে।*" আরো বলেছেন, "*আমার জানু নত করব সব ধর্মের ও দেশের সকল ধর্মপ্রবক্তাদের নিকট কিন্তু অকপটতা আমাকে এ-কথা বলতে বাধ্য করছে যে, এখানে এই পাশ্চাত্যে নারীদের উন্নতি জন স্টুয়ার্ট মিল এবং ফরাসী বিপ্লবের দার্শনিকেরাই ঘটিয়েছেন। নিঃসন্দেহে ধর্ম কিছুটা করেছে, কিন্তু সব নয়।*"

ডেট্রয়েটে একটি সাক্ষাৎকারে স্বামীজী পুনরায় তাঁর এ-বিশ্বাস ব্যক্ত করেন যে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতি আনুগত্যের জন্যই ভারতের ঐহিক উন্নতি ব্যাহত হয়েছে। তিনি এ-কথা বলেছেন বলে বলা হয়, *"যেখানে পাশব শক্তি এবং রক্তপাত অন্য সব দেশকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে সেখানে ভারত এই পাশবিক শক্তির অভ্যুদয়কে প্রার্থনার দ্বারা নিবারণের প্রয়াস করেছে এবং উপযুক্তের টিঁকে থাকবার নিয়ম অনুসারে—ভারত জাগতিক অর্থে বিশ্বে একটি শক্তি হিসাবে পিছিয়ে পড়েছে কারণ এ-নিয়ম ব্যক্তি ও জাতি—উভয়ের জীবনেই সমান প্রযোজ্য।"* অপরপক্ষে, তিনি তীব্রভাবে সচেতন ছিলেন এ-ব্যাপারে যে, যে-সমস্ত দেশ জাগতিক উন্নতির ক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়েছে তীব্র গতিতে, তারা তা পেরেছে নিজেদের আধ্যাত্মিক বিকাশকে বিসর্জন দিয়ে।

স্বামীজী এ-সত্যের মুখোমুখি হয়েছিলেন যে, যখন একটি জনগোষ্ঠীর সর্বোত্তম শক্তি আধ্যাত্মিকতার বিকাশে নিয়োজিত হয়েছে, তখন তাদের ঐহিক জীবনের উন্নতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং যখন সেই শক্তি ঐহিক জীবনের উন্নয়নে নিয়োজিত হয়েছে তখন আধ্যাত্মিকতা হারিয়ে গিয়েছে। অতীতে এরূপ সর্বদাই ঘটেছে এবং ভবিষ্যতেও তাই হবে যদি না এর কোন প্রতিকার আবিষ্কৃত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীবাহক হিসাবে এবং স্বয়ং জগতের কল্যাণের জন্য আবির্ভূত হওয়ায়, তাঁকে সেই প্রতিকার আবিষ্কার করার প্রয়াস করতে হয়েছে এবং এ অনিবার্য ছিল যে, তাঁর ভারত ও আমেরিকা পরিক্রমা করার কালে তিনি কি করে আধ্যাত্মিকতা আর জাগতিক উন্নতিকে উভয় দেশের উন্নতির জন্য সমন্বিত করা যায় সে-সম্বন্ধে যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা করেছেন।

মেমফিসে তিনি বলেন, *"আমি বিশ্বাস করি যে, হিন্দু-ধর্মবিশ্বাস তার অনুগামীদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ঘটিয়েছে জাগতিক উন্নতিকে বলি দিয়ে এবং আমি মনে করি যে, পাশ্চাত্যে এর উলটো ঘটেছে। প্রতীচ্যের ঐহিকতা এবং প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় ঘটিয়ে অনেক কিছু করা যেতে পারে।"* পুনরায় ডেট্রয়েটে তিনি এই বিশ্বাস ব্যক্ত করেন যে, ঐহিক উন্নতি এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ চিরকালের জন্য পরস্পরবিরোধী হয়ে থাকবে—এর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই এবং এরকম হওয়াটা উচিতও নয়। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, *"সিংহের শক্তির সঙ্গে মেষের যে নম্রতা তার কি সমন্বয় হতে পারে না?"* এবং এই সাক্ষাৎকারের প্রতিবেদনটিতে

বলা হয়েছে যে, তিনি আরো বলেন, "হয়তো ভবিষ্যৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংযুক্তির সম্ভাবনা ধারণ করে রেখেছে—যদি এ-সংযুক্তি ঘটে তাহলে তা সুফলপ্রসূ হবে।"

আমরা জানি যে, তাঁর বেদান্তের মধ্যে বিশেষ করে তাঁর কর্মযোগের শিক্ষার মধ্যে ও তাঁর মানুষের দেবত্বের ওপর জোর দেওয়ার মধ্যে স্বামীজী পরবর্তী সময়ে এই সংযুক্তির রূপায়ণ ঘটাবার পন্থাটি বার করেছেন এবং এজন্য এই আশ্বাস দিয়েছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব বিশ্বহিতের ক্ষেত্রে এক সত্যযুগের সূচনা করছে। তিনি আমেরিকা থেকে গুরুভাইদের লিখেছিলেন, *"যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মেছেন, সেইদিন থেকেই Modern India (বর্তমান ভারত)—সত্যযুগের আবির্ভাব! আর তোমরা এই সত্যযুগের উদ্বোধন কর—এই বিশ্বাসে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।"*[১৩*] কোন্ পন্থায় এ-কাজ করতে হবে তার রূপরেখা স্বামীজীই প্রণয়ন করেন এবং এ-বিষযে কোন সন্দেহ নেই যে মানুষের এই যে সমস্যা যে, সে কিভাবে তার শক্তিকে আধ্যাত্মিক অনুভূতিলাভের জন্য নিয়োগ করবে অথচ এই জগতের ঐহিক প্রয়োজনগুলি অবহেলা করবে না—সে-বিষয়ে তিনি যে-সমাধান দিয়েছেন সেটিই হলো আধুনিক যুগে ধর্মীয় ও বস্তুবাদী চিন্তা এ উভয়ের ক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠ অবদান।

অবশ্য স্বামীজীই যে প্রথম ভারতীয় ধর্মাচার্য যিনি ঐহিক উন্নতি ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস করেছেন তা নয়। স্বামীজী যে-সকল সমস্যার সঙ্গে জড়িত ছিলেন, কয়েকজন উপনিষদের ঋষির কথা যদি নাও ধরা হয়, তাহলে শ্রীকৃষ্ণই যাঁর রচিত ভগবদ্গীতায় একই সমস্যা সমাধানের প্রয়াস করা হয়েছে, এ-বিষয়ে সর্বপ্রথম প্রচারক। কিন্তু ঠিক যেমন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, "দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ায় এ-যোগ পৃথিবীতে হারিয়ে গিয়েছে", ঠিক সেইভাবে স্বামীজীও বলতে পারতেন যে, শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষাও ক্রমে বিস্মৃতির গর্ভে চলে গিয়েছে এবং স্বামীজী সেগুলিকে পুনর্জাগ্রত করছেন, উপস্থাপনা করছেন পুনর্বার, তার সঙ্গে করুণার্দ্রচিত্তে সেবার মনোভাবকে যুক্ত করে। এ-ক্ষেত্রটিতেই তিনি ঘোষণা করতে পারতেন, যেমন তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দের নিকট করেছিলেন : "আমি একটি নতুন পথ নির্মাণ করেছি আর তা সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছি।"[১৪]

অবশ্য সব সময়ই স্বামীজী যা শিক্ষা দিয়েছেন, তার পক্ষে যুক্তি থেকেছে

---

* বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ১৫৯, পৃঃ ৭২

এ-ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হতে পারি। যদিও আমি দেখিয়েছি যে, তাঁর বক্তৃতা-সফরের অন্যতম প্রকাশ্য কারণ ছিল আমেরিকাবাসীদের নিকট হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করা কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে তিনি প্রথম থেকেই অনুভব করেছিলেন যে, বৌদ্ধধর্মেরও ব্যাখ্যাপ্রদান সেই ব্যাখ্যার একটি অপরিহার্য অংশ হবে। ভ্রুম্যান ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁদের 'গতিশীল ধর্ম'-এর সম্বন্ধে বক্তৃতামালায় অংশগ্রহণ করে বক্তৃতা করার সময় তিনি বুদ্ধের শিক্ষাকে সমস্ত সামাজিক সমস্যার সমাধানরূপে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "এ-সমাধানটি কৌশলের বিরুদ্ধে কৌশলের প্রয়োগ নয়, শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ নয়। একমাত্র সমাধান হলো নিঃস্বার্থ পুরুষ, নিঃস্বার্থ নারী সৃষ্টি করতে হবে। তুমি বর্তমান ত্রুটিগুলি সংশোধনের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পার, কিন্তু তাতে কোন ফল হবে না।... [বুদ্ধ] সর্বদা এই মৌল সত্যের ওপর জোর দিতেন যে আমাদের শুদ্ধচিত্ত এবং পবিত্র হতে হবে আর আমাদের অন্যদেরকেও পবিত্র হতে সহায়তা করতে হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মানুষকে কাজ করতে হবে, অন্যদের সাহায্য করতে হবে, অন্যের মধ্যে নিজের আত্মাকে দর্শন করতে হবে এবং অন্যের জীবনকে নিজের জীবনের মতো করে দেখতে হবে।" ব্রুকলিনে স্বামীজী বুদ্ধ সম্বন্ধে বলেন—"তিনি সেই সুমহান ব্যক্তি যিনি কখনো অন্যের হিতের জন্য ছাড়া কোন চিন্তা বা কর্ম করেন নি। যাঁর মেধা ও হৃদয় ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ, যা সমস্ত মানবকুলকে, সমস্ত জীবকুলকে আলিঙ্গন করেছিল, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতাদের জন্য যেমন, তেমনি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটের জন্যও প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন।" এ-কথাগুলি স্বামীজীর নিজের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য, কারণ তাঁরও হৃদয় সমগ্র মানবজাতির ক্রন্দনে সাড়া দিত এবং তিনি একসময় বলেছিলেন, *"আমি যদি একটিও মানুষকে সাহায্য করতে পারি, তাহলে তা করবার জন্য অনন্ত নরকে যেতে প্রস্তুত আছি।"*[১৫] (স্বামীজীর আকৃতিতে বুদ্ধের প্রশান্ত সৌম্যভাব ও করুণা প্রতিফলিত হতো। রেভারেন্ড এইচ. আর. হয়েস একদা তাঁর "বুদ্ধের অপরূপ মুখমণ্ডলের সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য" সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন,[১৬] এবং ১৯০১ সালে ভগিনী নিবেদিতা লিখেছিলেন, *"শ্রীযুক্ত টাটা আমাকে বলেছেন যে, স্বামীজী যখন জাপানে গিয়েছিলেন তখন তাঁকে যাঁরা দেখেছিলেন তাঁরা সকলেই তৎক্ষণাৎ বুদ্ধের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন।")*[১৭]

যে-পৃথিবীতে জটিলতা ক্রমবর্ধমান, যেখানে ধর্মীয় মতবাদগুলি আর

নৈতিক কার্যকলাপের ব্যাপারে তাড়না করা বা সমর্থন করার কাজ করে না, যেখানে অন্ধ বিশ্বাস হতাশার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার শক্তি যোগায় না এবং যেখানে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি যুক্তি-বিরোধী বলে মনে করা হয়, স্বামীজী জানতেন যে সেই বিশ্বে আত্মনির্ভরতা, যুক্তি ও করুণা এগুলির প্রত্যেকটিই জগতের যে-কোন ধর্ম যা এ-যুগের প্রয়োজন মেটাবে—তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। প্রচলিত মতবাদ, দার্শনিক-তত্ত্ব এবং ভারতের ঐতিহ্য হতে মুক্ত হয়ে বুদ্ধ যুক্তির পথকে প্রজ্বলিত করেছেন। বস্তুত আধুনিক মানুষও এটাই করতে চেষ্টা করেছিল। বুদ্ধের মতোই সে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী এবং প্রচলিত ধর্মমতসমূহের তীব্র সমালোচক ; বুদ্ধের অজ্ঞেয়বাদ, তাঁর উদ্যমশীলতা তাঁর আগাগোড়া যুক্তিশীলতা আধুনিক মানুষের নিকট বিশেষ আবেদন উপস্থিত করে। কিন্তু সে কি বুদ্ধের মতো যুক্তিকে তার শেষ সীমায় নিয়ে যেতে প্রস্তুত আর আত্মার মহাকাশে সেই মহা অভিযান করতে, ঝাঁপিয়ে পড়তে সাহসী হবে, যা নৈতিক, আধ্যাত্মিক পূর্ণতা এনে দেয়? সুস্পষ্টরূপে সে এ-বিষয়ে প্রস্তুত নয়। নিঃসন্দেহে পাশ্চাত্য-জগৎকে সর্বোচ্চ যুক্তির শেষ সীমায় পৌঁছবার যে-পথ যে-শেষ-সীমা সমস্ত আত্মবুদ্ধির বিলোপ ঘটায় এবং জড় ও আত্মার মধ্যে সমস্ত বিভেদ লুপ্ত করে—সেই পথটি প্রদর্শনের জন্যই স্বামীজী প্রায়শই বুদ্ধের জীবন ও বাণীর কথা বলতেন। তিনি এ-সত্যের দ্বারাও চালিত হয়েছিলেন যে, এই যুগের মানুষদের যে-বস্তু পাবার জন্য আয়াস তা যদি সত্যই লাভ করতে হয় তাহলে সকল মানুষের প্রতি সহানুভূতিকেই তাদের উদ্দেশ্য-সাধনের সহায় করতে হবে। বুদ্ধ ব্যতীত আর কোন্ সম্পূর্ণ স্বার্থান্ধহীন করুণার দৃষ্টান্ত আছে? এবং যেহেতু স্ব-নির্ভরতা, যুক্তি ও করুণা স্বামীজীর বিশ্ববাণীব একটি বিরাট অংশ সেইহেতু তিনি এই সবচেয়ে স্বাধীন চিত্ত, সর্বশ্রেষ্ঠ যুক্তি-পরায়ণ এবং সকল মানবের মধ্যে সবচেয়ে করুণার মনোভাবসম্পন্ন মানুষটিকে প্রাধান্য না দিয়ে পারেন নি। এ-কথা সুনিশ্চিত যে তিনি আকস্মিকভাবে বুদ্ধকে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মযোগী বলে তাঁর কর্মযোগ গ্রন্থে অভিহিত করেন নি।

বুদ্ধেব সম্বন্ধে স্বামীজীর সুস্পষ্ট আগ্রহের অন্যান্য কারণও বর্তমান ছিল। যদিও এগুলি তাঁর আমেরিকায় দেওয়া বক্তৃতাসমূহ-প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক নয়, তবুও সেগুলি উল্লেখ করা একেবারে অসমীচীন হবে না। সত্য এই যে, সাম্প্রতিককালের পূর্বে ভারতে বৌদ্ধধর্মকে অ-হিন্দু বলে মনে করা হতো এবং সে-কথা বলে হিন্দুর চেতনায় বুদ্ধের উত্তরাধিকার স্থান পায় নি,

বাদ পড়েছিল। যদি আমরা এ-কথা বিবেচনা করি যে, বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি, বিকাশ ও বিস্তার ভারতের ইতিহাসের সহস্র বৎসরের অধিক কাল অধিকার করে আছে তাহলে এ-কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বৌদ্ধধর্মকে বাদ দিলে হিন্দুর উত্তরাধিকারের মধ্যে একটি হাজার বছর পরিমাণের শূন্যতা থেকে যায়। অতীতের শঙ্করাচার্যের মতো যাঁরা বৌদ্ধধর্মকে অস্বীকার করতে চান, সেরকম হিন্দুধর্মাচার্যদের পথে যান নি স্বামীজী। তিনি বৌদ্ধ যুগের ভারত ও ভারতেতর দেশে গৌরবময় কীর্তি আমাদের ঐতিহ্য থেকে বাদ দেবার পক্ষে কোন যুক্তি খুঁজে পান নি। তাছাড়া তিনি হিন্দুধর্মের মধ্যে করুণা উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছিলেন। এটি সর্বজনবিদিত যে, স্বামীজী নিজেকে মহাযান বৌদ্ধমতের সঙ্গে অভিন্নভাবে দেখেছেন, যা শুধুমাত্র হীনযান মতের শূন্যবাদেরই বিরোধী ছিল না, শূন্যবাদের মধ্যে যে-আত্মকেন্দ্রিকতা বিদ্যমান তারও বিরোধী ছিল। তাঁর নিকট মহাযান বৌদ্ধধর্ম, যাকে তিনি দুটি মতের মধ্যে অধিকতর প্রাচীন বলে মনে করতেন, হীনযানের চেয়ে বুদ্ধের মানবতাকে আরও অধিক সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করেছে বলে মনে করতেন এবং এই মানবতা ও বুদ্ধের হৃদয়ের যে বিশালতা, তাঁর যে সর্বব্যাপী সহানুভূতি, হিন্দুধর্মে তার অভাব অনুভব করতেন তিনি। কথাটা এ নয় যে, হিন্দুধর্মে করুণা বা দানপরায়ণতা বা শুভেচ্ছার কোন অভাব ছিল, কিন্তু অনেকসময় গড়পড়তা হিন্দু ঈশ্বরে মগ্ন হয়ে থাকার কৃত্রিম ইচ্ছাব দ্বারা প্রণোদিত হয়ে কার্যকর সেবার যে-শিক্ষা তাকে সরিয়ে দেবার প্রবণতা দেখিয়েছে। ফলে 'করুণা' বস্তুটি হিন্দুজাতির ঠিক মূল চালিকাশক্তিরূপে কাজ করে নি এবং এই অর্থে হিন্দুধর্মের মধ্যে তিনি একটা অভাব দেখেছিলেন। পরে সে-কথা তিনি লিখেছেন—"সত্ত্ব [আলোকলাভ] গুণের দোহাই দিয়ে এ-দেশ তমোগুণের সমুদ্রে ডুবে গিয়েছে, ঘোর অজ্ঞানতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে।"

১৮৯৩-এর আগস্টেই তিনি আলাসিঙ্গাকে লিখেছিলেন—"*সমাজের এই অবস্থাকে দূর করিতে হইবে ধর্মকে বিনষ্ট করিয়া নহে, পরন্তু হিন্দুধর্মের মহান্ উপদেশসমূহ অনুসবণ এবং তাহার সহিত হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতিস্বরূপ বৌদ্ধধর্মেব অদ্ভুত হৃদয়বত্তা লইয়া।*"[১৮]* একমাস পরে ধর্মমহাসভায় তিনি বলেন : "*বৌদ্ধধর্ম ছাড়া হিন্দুধর্ম বাঁচতে পারে না; হিন্দুধর্ম ছেড়ে বৌদ্ধধর্মও বাঁচতে পারে না। অতএব উপলব্ধি করুন—*

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ৬৮, পৃঃ ২৬৮

আমাদের এই বিযুক্ত বিচ্ছিন্নভাব স্পষ্টই দেখিয়ে দিচ্ছে যে. ব্রাহ্মণের ধীশক্তি ও দর্শনশাস্ত্রের সাহায্য না নিয়ে বৌদ্ধেরা দাঁড়াতে পারে না এবং ব্রাহ্মণও বৌদ্ধের হৃদয় না পেলে দাঁড়াতে পারে না। ... অতএব এস, আমরা ব্রাহ্মণের অপূর্ব ধীশক্তির সঙ্গে লোকগুরু বুদ্ধের হৃদয়, মহান আত্মা আর অসাধারণ লোককল্যাণশক্তি যুক্ত করে দি।" [১৯*]

কতবার স্বামীজী আমেরিকা থেকে তাঁর গুরুভাই এবং শিষ্যদের মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করবার জন্য উৎসাহিত করে চিঠি লিখেছেন। ১৮৯৪-এর গ্রীষ্মের প্রথমদিকে গুরুভাইদের তিনি লেখেন—"যদি কিছু ভাল চাও তো ঘণ্টা ফণ্টাগুলিকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নর-নারায়ণের—মানবদেহধারী হরেক মানুষের পুজো করগে—বিরাট আর স্বরাট। বিরাট রূপ এই জগৎ, তার পুজো মানে তার সেবা—এর নাম কর্ম... থাক, তোদের মধ্যে যারা একটু মাথাওয়ালা আছে, তাঁদের চরণে আমার দণ্ডবৎ ও তাঁদের কাছে আমার এই প্রার্থনা যে, তাঁরা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ুন—এই বিরাটের উপাসনা করুন, যা আমাদের দেশে কখনও হয় নাই।" [২০**] অপর একটি চিঠিতে, যেটি সর্বাপেক্ষা বেশি উদ্দীপ্ত-প্রেরণাবশে লিখিত এবং যাতে তিনি নিজেই বলছেন—"আমার হাত ধরে কে লেখাচ্ছে। Onward, হরে হরে। সব ভেসে যাবে—হুঁশিয়ার—তিনি আসছেন। যে যে তাঁর সেবার জন্য—তাঁর সেবা নয়—তাঁর ছেলেদের—গরিব গুরবো, পাপী-তাপী, কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত, তাদের সেবার জন্য যে যে তৈরি হবে, তাদের ভিতরে তিনি আসবেন।" [২১§] পুনরায় তিনি লিখলেন : *"তোমার ভাল করলেই আমার ভাল হয়, দোসরা আর উপায় নেই, একেবারেই নেই।... নিজের মধ্যে সেই দিব্য-স্বরূপের উপলব্ধি তখনই ঘটবে, যখন অন্যদেরও তোমরা তা করতে সহায়তা করবে।"* [২২§§]

এ ধারণা যে ক্ষণিকের তা নয়, তার প্রমাণ তাঁর ১৮৯৭-এর মে মাসের ৩০ তারিখে প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা চিঠিটি, যাতে তিনি লিখেছিলেন, *"আর এক কথা বুঝেছি যে, পরোপকারই ধর্ম, বাকি যাগ-যজ্ঞ সব পাগলামো— নিজের মুক্তি-ইচ্ছাও অন্যায়। যে পরের জন্য সব দিয়েছে,*

---

* বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৩২

** ঐ, ৭ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ১৫০, পৃঃ ৫২-৫৩

§ ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ১০২, পৃঃ ৩৫৮

§§ ঐ, ৭ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ১৫৬, পৃঃ ৭৪ ও ৭৬

সেই মুক্ত হয় আর যারা 'আমার মুক্তি, আমার মুক্তি' করে দিনরাত মাথা ভাবায়, তারা 'ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ' হয়ে বেড়ায়, তাহাও অনেকবার প্রত্যক্ষ করেছি।"[২৩*]

স্বামীজীর নিকট বুদ্ধ ছিলেন উপনিষদের শিক্ষাসমূহের ফলশ্রুতি, প্রাচীন বেদান্তের বিস্তার বা প্রয়োগ। তথাপি এ বিষয়টি হিন্দুদের দ্বারা পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বীকৃতিলাভ করেনি। বুদ্ধের বিশাল হৃদয়কে বরণ করে এবং তাকে তাঁর বিশ্ববাণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে স্বামীজী তাঁর দেশের যে-ধর্মীয় উত্তরাধিকারটি হারিয়ে গিয়েছিল তাকে পুনরুদ্ধার করলেন, হৃদয়ের স্পর্শ হারিয়ে, সেবা করার প্রেরণা হারিয়ে ফেলে যে দর্শন একটি শীতল দর্শনে পরিণত হয়েছিল, তিনি তাঁর মধ্যে অগ্নিস্পর্শের সঞ্চার করলেন। তিনি জানতেন বৌদ্ধধর্মকে নিজের অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করে হিন্দুধর্ম অশেষ ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠবে, অপরিমেয় আত্মবিশ্বাস লাভ করবে এবং সর্বব্যাপী করুণায় পূর্ণ হয়ে উঠবে। হিন্দুধর্ম কেবল এইভাবেই জগতের অধ্যাত্মক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে সমর্থ হবে, হিন্দুধর্ম যে এ-নেতৃত্ব গ্রহণ করবে সে-কথা স্বামীজী নিশ্চিতরূপে জানতেন।

কিন্তু স্বামীজীর বিশ্বের সকল ধর্মকে একসঙ্গে যুক্ত করে অখণ্ড একটি ধর্ম গঠন করবার যে প্রচেষ্টা, ঐহিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি—এ উভয়ের মধ্যে যে-বিরোধ তা দূর করবার জন্য তাঁর যে-প্রয়াস এবং প্রত্যেক মানুষের জীবন ও কর্মের মধ্যে করুণার অনুপ্রবেশ ঘটানোর জন্য তাঁর যে-নির্বন্ধ—কেবলমাত্র এই উপাদানগুলিই তাঁর যে-বিশ্ববাণী যাকে তিনি বেদান্ত বলে অভিহিত করেছেন তার বিকাশ ঘটানোয় কাজ করে নি। ১৮৯৫ সালের এই বিশ্ববাণী এমন সর্বব্যাপী এবং বিচিত্র হয়ে দাঁড়ায় যে এ-বিষয়ে কোন সন্দেহে থাকে না যে, এ-বাণী গঠনের সময় তিনি আধুনিককালের জীবনের আরও অনেক সমস্যার কথাই চিন্তা করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আধুনিক যে দ্বন্দ্ব ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে, যুক্তি ও বিশ্বাসের মধ্যে, উপযোগিতাবাদ এবং অতীন্দ্রিয়-সাধনার মধ্যে, আত্মনির্ভরতা এবং শরণাগতির মধ্যে দেখা যায়—সে-সবই তিনি চিন্তা করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মানসের এই যে সকল দ্বন্দ্ব এগুলি হয়তো তাঁর ভারতে পরিব্রাজক জীবনের সময় হতেই তাঁর মধ্যে জাগরূক ছিল কিন্তু তাঁর আমেরিকা পরিক্রমা এগুলিকে অধিকতর প্রাধান্য এনে দেয় এবং এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা

বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ৩২৯, পৃঃ ৩৪৪

যায় যে তাঁর বিশেষ করে আমেরিকার পূর্ব তটভূমিখণ্ডে বুদ্ধিজীবী এবং মননশীল মানুষদের সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটায় তাঁকে এগুলি আগের চেয়ে অধিকতর গভীরভাবে ভাবতে প্রণোদিত করে। আমরা জানি যে, মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত যে-কোন সমস্যাই তাঁর নিকট নিজের সমস্যার তুল্য ছিল এবং মানবজীবন সম্পর্কে তাঁর যে সুগভীর জ্ঞান ছিল তা দেখে আমরা এ-বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারি যে, তিনি আধুনিক সভ্যতাকে তার প্রতিটি দিকসহ বিশেষভাবে জেনেছেন ও বুঝেছেন একজন সমাজতত্ত্ববিদ, একজন মনোবিজ্ঞানী, একজন ঐতিহাসিক, একজন দার্শনিক এবং একজন সত্যজ্ঞানীর সম্মিলিত প্রজ্ঞা সহায়ে। তাঁর সম্পর্কে যে-কথা বলা হয়েছিল—তিনি "এ-দেশের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সুগভীর পরিচয়" স্থাপন করেছিলেন, এ-পরিচয়-স্থাপন কেবলমাত্র যে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে যোগস্থাপন করে করা হয়েছিল তা নয়, বরঞ্চ যে-কথা তিনি বলেছেন, তিনি মধ্য পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণের সময় শ্রমিক এবং কৃষকদের সঙ্গেও কথা বলেছিলেন, তাঁর আঙ্গুল যেন জাতির নাড়ির ওপর তার স্পন্দন অনুভব করার জন্য স্থাপিত হয়েছিল। একজন জগদ্‌গুরু হিসাবে জন্ম নিয়েছিলেন বলে আজকের বিপদগ্রস্ত মানবজাতির যে-সকল বহুমুখীন জটিল সমস্যাদি বর্তমান সে-সকলেরই একটি সর্বাত্মক সমাধান খুঁজে বার করতে তিনি একটি স্বতঃউৎসারিত প্রেরণা অনুভব করেছিলেন। সত্যসত্যই এ-কথা না ভেবে পারা যায় না যে, ১৮৯৪-এর শেষাংশ ছিল তাঁর একটি বিপুল মানসিক কর্মব্যস্ততার সময়। নতুন নতুন ধারণা, নতুন নতুন উত্তর তাঁর মনে জেগেছে, কিছু ধারণা ত্যাগ করেছেন, কিছু উত্তরও ত্যাগ করেছেন, অন্য ধারণা, অন্য উত্তর গ্রহণ করেছেন সে-সকলের স্থানে। এ-প্রক্রিয়া চলেইছে যতদিন না ১৮৯৫-এর প্রারম্ভে তিনি শেষ উত্তরটি পেলেন—প্রাচীন বেদান্ত তার নবতর ব্যাখ্যা এবং নতুন শক্তিমণ্ডিত হয়ে সুস্পষ্টরেখায় তাঁর সম্মুখে প্রতিভাত হলো।

যে-কথা একাদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, স্বামীজীর চিন্তাধারায় ১৮৯৪-এর গ্রীষ্মকাল থেকে একটা পরিবর্তন আসে এবং আমেরিকায় তাঁর প্রচারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন ধারণার সূচনা হয়। কিন্তু জুলাই-আগস্টেও গ্রীন-একার সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আগে পর্যন্ত তাঁর মনে আমেরিকানদের গভীরভাবে আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও অনুশীলনে সহায়তা করার কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। গ্রীনএকারের মানুষগুলি সম্বন্ধে যাই বলা হয়ে থাকুক না কেন, স্বামীজী

হেল ভগিনীদের যে-কথা লিখেছিলেন তারা ছিল "স্বাস্থ্যবান, তরুণ, নিষ্ঠাবান এবং পবিত্র-হৃদয় নরনারী।" তিনি বেশ সুস্পষ্টভাবে উল্লাস প্রকাশ করে লিখলেন— *"আমি তাদের সকলকে 'শিবোঽহং' করতে শেখাই, আর তারা তাই আবৃত্তি করতে থাকে—সকলেই কি সরল ও শুদ্ধ এবং অসীম সাহসী।"* [২৪*] আমরা জানি, তিনি লাইসেক্‌লস্টার পাইনবৃক্ষের তলায় বসে অদ্বৈতবেদান্ত শিক্ষা দিতেন এবং শঙ্করের 'নির্বাণষট্‌কম্'টিকে পাঠ্য করে তিনি তাঁর আগ্রহী এবং ধারণশক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের আধ্যাত্মিকতার সার শিক্ষা দেন। একাদশ অধ্যায়ে স্বামীজীর আমেরিকার জীবনে গ্রীনএকারের তাৎপর্যের কথা আলোচনা করেছি, এখানে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যদি কেউ এ-কথা বিশ্বাস করে যে, এখানে তাঁর অবস্থানের কাল হলো তাঁর আমেরিকার কাজকর্ম সম্পর্কে একটা পরিবর্তনের কাল তাহলে খুব একটা ভুল হবে না এবং এ-পরিবর্তনকে তিনি নিজের দিক থেকে ও ভারতের দিক থেকে খুব মূল্যবান বলে মনে করেছিলেন। তাঁর চিঠিগুলি পাঠ করলেই তার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

আগস্টের শেষে তিনি আলাসিঙ্গাকে লেখেন— *"সমগ্র জগৎ জ্ঞানালোক চাইছে—উন্মুখ নয়নে তার জন্য আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কেবল ভারতেই সে জ্ঞানালোক আছে—ইন্দ্রজাল, মূক অভিনয় বা বুজরুকিতে নয়, আছে প্রকৃত ধর্মের মর্মকথায়, উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্যের মহিমায় ও উপদেশে। জগৎকে সেই শিক্ষার ভাগী করবার জন্যই প্রভু এই জাতটাকে নানা দুঃখ বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েও আজ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছেন। এখন সময় হয়েছে।"* [২৫**] এ-কথা অবশ্য সত্য যা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক সত্যই হলো স্বামীজীর চিন্তার মূলবৈশিষ্ট্য এবং তাই-ই প্রথমাবধি আমেরিকায় স্বামীজীর বক্তৃতার মধ্যে অপরিহার্যভাবে অনুস্যূত হয়েছিল। সত্যই তাঁর মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণের সময় তাঁর একটি বক্তৃতার শিরোনামাই ছিল—"মানুষের দেবত্ব।" বেদান্তের মহান ধারণাসকলই ছিল তাঁর দেওয়া শিক্ষার বিষয়বস্তু। অন্যদের প্রতি যাঁর হৃদয়-দুয়ার সতত উন্মুক্ত সেই তিনি কি করে এই সকল তাদের নিকট না বলে থাকতে পারেন? ১৮৯৪-এর জুন মাসের ২৩ তারিখে তিনি মহীশূরের মহারাজাকে লেখেন—

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ১০৭, পৃঃ ৩৬৭

** ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ১১১, পৃঃ ৩৩৪

"মহারাজ, আপনি না দেখিলে বুঝিতে পারিবেন না, ইহারা পবিত্র বেদের গভীর চিন্তারাশির অতি সামান্য অংশও কত আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে, কারণ আধুনিক বিজ্ঞান ধর্মের উপর যে পুনঃপুনঃ তীব্র আক্রমণ করিতেছে, বেদই কেবল উহাকে বাধা দিতে পারে এবং ধর্মের সহিত বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে। ...আমার সিদ্ধান্ত এই— পাশ্চাত্যগণের আরও ধর্মশিক্ষার প্রয়োজন, আর আমাদের আরও ঐহিক উন্নতির প্রয়োজন।" [২৬*] হ্যাঁ, স্বামীজী সতত উপলব্ধি করেছেন যে, পাশ্চাত্যের প্রয়োজন আধ্যাত্মিকতার এবং যত সময় অতিবাহিত হয়েছে তিনি এ-বিষয়ে ক্রমে ততই বেশি দৃঢ়বিশ্বাসী হয়েছেন। তাছাড়া এ-কথা বলার প্রয়োজন নেই যে, তাঁর প্রকৃতি যেরূপ তাতে তিনি ভারতকে অর্থ সাহায্য করবার জন্য আমেরিকাকে আহ্বান করতে পারতেন না, যদি না বিনিময়ে তাকে অধ্যাত্ম-সম্পদ দেবার কথা তিনি ভাবতেন। "যখন আমাদের দেশে Social virtue-র (সমাজ হিতকর গুণের) অভাব, তেমনি এ দেশে Sprituality (আধ্যাত্মিকতা) নাই, এদের Sprituality দিচ্ছি, এরা আমায় পয়সা দিচ্ছে"— ১৮৯৪-এর জানুয়ারি মাসে এ-কথা তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখেন। [২৭**] কিন্তু এ-কথা বলা আর বলা যে স্বামীজী প্রথম থেকেই জানতেন যে, পাশ্চাত্যে বেদান্ত শিক্ষা দেওয়াই হবে তাঁর ব্রতস্বরূপ কিংবা এ-কথা বলা যে প্রথম থেকেই তিনি বেদান্তের শিক্ষাগুলিকে এমনভাবে রূপায়িত করেছিলেন যে সেগুলি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সত্তার অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে এবং তাকে উদ্ধার করার মতো একটি ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং আধুনিককালের সবকিছুকে ধ্বংস করে ফেলার যে প্রবণতা তাকে বাধা দিতে পারে—এ এক কথা নয়। একটি জড়বাদী সভ্যতার নিকট চিত্তাকর্ষক অধ্যাত্ম-দর্শন শিক্ষা দেওয়া সহজ নয়, এতে দরকার একজন স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তার সম্পূর্ণ আলো ও শক্তি এবং মনে হয় না যে এ-কাজে তিনি ১৮৯৪-এর শেষ দিকের পূর্বে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

সে-বছর পড়তেই তিনি মানুষের বহু বিচিত্র সমস্যা-সকল দৃঢ়ভাবে আয়ত্তে আনতে প্রায় পূর্ণ সফল হয়েছিলেন, তার মধ্যে পাশ্চাত্যের মানুষের সমস্যাদিও ছিল এবং সে-সকলের সমাধানও যে খুঁজে বার করতে চাইছিলেন

---

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ৯৮, পৃঃ ৩৪৫-৪৬

** ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ৮৪, পৃঃ ৩২৪

তা বোঝা যায় এই লক্ষণ হতে যে তিনি বসে লিখবার যে তাগিদ জুলাই মাস থেকে অনুভব করছিলেন তা তাঁকে সেপ্টেম্বরে তাড়া করে ফিরতে আরম্ভ করে। সেপ্টেম্বরের ১৩ তারিখে তিনি মেরী হেলকে লেখেন যে, *আজ এই ভবঘুরে লামার আঁকিজুঁকি করার ইচ্ছা তাকে গ্রাস করেছিল।* [২৮*] আর সেপ্টেম্বরের ১৯ তারিখে শ্রীমতী ওলি বুলকে (?) লেখেন, *এখন চাই এমন একটা জায়গা, যেখানে বসে আমার ভাবরাশি লিপিবদ্ধ করতে পারি।* [২৯**] অবশ্য আলাসিঙ্গাকে সেপ্টেম্বরের ২১ তারিখে দুঃখ করে লিখছেন, *আমার প্রস্তাবিত গ্রন্থের একটি লাইনও এ-পর্যন্ত আমি লিখে উঠতে পারিনি, হয়তো ভবিষ্যতে এ-কাজটি হাতে নিতে পারব।* [৩০] আমরা যা জানি তা হলো এই যে, শ্রীমতী বুল তাঁকে কেম্ব্রিজে নিজ গৃহে এই লেখার জন্য সুযোগ করে দেবার প্রস্তাব দেন—এ-আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করতেন না যদি না তার মধ্যে তাঁর লিখবার জন্য এমন একটি নিরিবিলি স্থান পাবার সম্ভাবনা থাকত যেখানে বসে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করবার সুযোগ পাবেন। কিন্তু শ্রীমতী বুলের গৃহেও স্বামীজী তাঁর গ্রন্থ রচনা করবার কাজটি ধরতে পারলেন না। অক্টোবরের ২৭ তারিখে আলাসিঙ্গাকে তিনি লিখলেন—§ *আরও একটি বিষয় স্মরণ রাখিও, আমাকে অবিশ্রান্ত কার্য করিতে হয়, সুতরাং আমার চিন্তারাশি একত্র কবিয়া পুস্তাকাকারে গ্রথিত করিবার অবসর নাই।* [৩১ §]

অবশ্য এ-সময় তাঁর চিন্তার গতি কোন্ দিকে চলেছিল সে-সম্বন্ধে একটি সূত্র আমরা পাই মাদ্রাজ অভিনন্দনের সুদীর্ঘ উত্তরের মধ্যে, যেটি 'লিখতে' সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে তিনি 'ব্যস্ত' ছিলেন, যার মধ্যে তিনি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছেন যে বেদের জ্ঞানকাণ্ড—উপনিষদ্ অর্থাৎ বেদান্ত হিন্দুধর্মের অন্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ও মতবাদের মূল-ভিত্তিস্বরূপ। তিনি লিখলেন— *প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় চিন্তাধারাগুলি যেখানে গিয়ে মিলিত হয়েছে এরূপ কোন কেন্দ্রবিন্দুস্বরূপ কোন মতের অনুসন্ধান করতে যদি কেউ প্রয়াস করে, যদি কেউ হিন্দুধর্মের বিভিন্ন প্রকার অভিব্যক্তির মধ্যে মেরুদণ্ডটি দেখতে আকাঙ্ক্ষা করে, তাহলে ব্যাস-সূত্রকে [বেদান্ত সূত্র] প্রশ্নাতীতরূপে দেখা যাবে সেই কেন্দ্রবিন্দুটিরূপে।... দেখা যাবে যে,*

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ১১২, পৃঃ ৪৭৮

** ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ১১৩, পৃঃ ৪৭৯

§ ঐ, ৭ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ১২৭, পৃঃ ৫০৩

বিভিন্ন আচার্য ও মতবাদ তাদের ভিত্তিস্বরূপ রেখেছে সেই চিন্তাধারাটি যার মূল হলো শ্রুতি [উপনিষদসমূহ] আর গীতা হলো তার ভগবৎ-মুখ-নিঃসৃত দিব্য ভাষ্য, শারীরক সূত্রসমূহ-এর সংগঠন এবং ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়সমূহ, পরমহংস পরিব্রাজকাচার্যগণ হতে লালগুরুর দরিদ্র মেথর শিষ্যগণ পর্যন্ত এরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি।[৩২] অন্যভাবে বলতে গেলে স্বামীজী বেদান্তের মধ্যেই হিন্দুধর্মের সকল শাখা-প্রশাখার মূল ভিত্তি এবং অন্তর্নিহিত শক্তির সন্ধান খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর এই মাদ্রাজ অভিনন্দনের উত্তরটি তাঁর দেশবাসীদের উদ্দেশে দেওয়া এই মর্মে একটি আহ্বান যে "বেদান্তসিংহ গর্জন করে উঠুক।" তিনি আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন— "*এস, আমরা আমাদের ধর্মের মূল সত্যের ওপরে দাঁড়াই যে-সত্য সকল হিন্দুরই উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সাধারণ সম্পদ—বৌদ্ধ ও জৈনদেরও সমানভাবে সে-সম্পদের উত্তরাধিকারত্বে অধিকার রয়েছে, সে-সত্যটি হলো এই আত্মতত্ত্ব—যে মৃত্যুহীন, জন্মহীন, সর্বব্যাপী পরমাত্মা আছেন প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই।*"[৩৩]

মাদ্রাজ অভিনন্দনের এই উত্তরটি পাঠ করলে সকলেই দেখতে পাবেন যে এখনো পর্যন্ত স্বামীজীর মনোযোগ অধিক পরিমাণে কেন্দ্রীভুত রয়েছে ভারতবর্ষকে ঘিরে, তথাপি এটাও স্বীকার করতে হবে যে, এই সময়ে তিনি তীব্রভাবে পাশ্চাত্যের প্রয়োজন সম্বন্ধেও সচেতন হয়ে উঠেছেন। তিনি ঐ উত্তরেই লিখেছেন— *আজ পাশ্চাত্য তার নিজের প্রয়োজন সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠেছে, উন্নত পাশ্চাত্যধর্মবিদ্‌দের লক্ষ্যও 'আজ মানুষের আসল স্বরূপ' এবং 'আত্মা'। ... এ কি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক নয় যে, যেখানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রচণ্ড সূচনার দরুন পাশ্চাত্যের ধর্মের প্রাচীন দুর্গ-প্রাকার ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে ;... যেখানে পাশ্চাত্যের চিন্তাশীল জনসাধারণের অধিকাংশ গির্জার সঙ্গে তাদের সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করেছে এবং একটি অস্থিরতার স্রোতে ভেসে চলেছে, সেখানে যে-সমস্ত ধর্মমত আলোর উৎসমূল বেদ হতে জীবন লাভ করেছে—যেমন হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম কেবলমাত্র সেগুলিই পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছে? অস্থিরতার স্রোতে উদ্দেশ্যহীনভাবে ভাসমান পাশ্চাত্য নাস্তিক মতের বা অজ্ঞেয়বাদের সমর্থকগণ গীতা কিংবা ধম্মপদের মধ্যেই একমাত্র সেই স্থানটি খুঁজে পায় যেখানে তাদের আত্মা নোঙর করতে পারে।*[৩৪] এটাও স্বীকার করতে হবে যে, স্বামীজী বেদান্তের মধ্যে এ-সময় খুঁজে পেয়েছেন কেবল হিন্দুধর্মের সকল সম্প্রদায়েরই নয় প্রত্যেক ভারতীয় বা পাশ্চাত্যদেশীয় প্রত্যেক ধর্মমতের মিলনক্ষেত্রটি : *যেহেতু একমাত্র বেদই*

হচ্ছে সেই শাস্ত্র যা সত্য ও পূর্ণস্বরূপ ঈশ্বরের কথা বলে, যার মধ্যে ঈশ্বরের অন্যান্য ধারণাসমূহ সংক্ষেপিত এবং সীমিত দর্শনভিত্তিক; শ্রুতি যেখানে অনুগামীকে ধীরে ধীরে হাত ধরে একের পর এক ধাপ অতিক্রম করিয়ে নিয়ে চলে, পূর্ণকে পাবার জন্য যে-সকল বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে তার এগিয়ে চলা প্রয়োজন, তাকে সে-সকলের মধ্য দিয়েই এগিয়ে নিয়ে চলে, সেখানে অন্য ধর্মগুলি যেন এই সকল বিভিন্ন স্তরের একটি বা অন্যটির প্রতিনিধিত্ব করে, তাদের মধ্যে কোন অগ্রগতি নেই এবং সে যেন একটি শিলীভূত অবস্থা, সেজন্য জগতের অন্যান্য সব ধর্মই নামহীন, সীমাহীন, কালহীন, বৈদিক ধর্মের অন্তর্ভুক্ত।[৩৫] এর মধ্যে সুস্পষ্ট যে, এখান থেকে পাশ্চাত্যের জন্য বেদান্তকেই তাঁর বাণী বলে ধারণায় পৌঁছানো, মাত্র আর একটি ধাপ দূরে।

ভারতের ধর্মে আমেরিকার প্রযোজন এ-বিষয়ে তাঁর সচেতনতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হচ্ছিল এই বিশ্বাস যে ভারতের টিঁকে থাকবার আশা নিহিত রয়েছে কেবলমাত্র উপনিষদোক্ত বিশুদ্ধ ধর্মের পুনরুজ্জীবনের মধ্যেই নয়, তাকে সর্বত্র প্রচার ও ঘোষণা করার মধ্যেও। এই যে স্থিরবিশ্বাস, এটি পরবর্তী কালে একটি সংগ্রামে লিপ্ত হবার জন্য আহ্বানরূপে ধ্বনিত হয়েছে তাঁর দেশবাসীর নিকট প্রদত্ত ভাষণসমূহের মধ্যে। (*ওঠ ভারত, তোমার আধ্যাত্মিকতা দ্বারা জয় কর।*)[৩৬*] এ-সংগ্রামের আহ্বানের প্রথম সুস্পষ্ট প্রকাশ আমরা দেখলাম তাঁর কলকাতা অভিনন্দনের উত্তরের মধ্যে, যেটি তিনি ভারতের উদ্দেশ্যে ডাকে দিয়েছিলেন ১৮৯৪-এর নভেম্বরের ১৮ তারিখে। যদিও এ-চিঠিটার একটি অংশ অষ্টম অধ্যায়ে উদ্ধৃত হয়েছে, এখানে তার পুনরুক্তি প্রাসঙ্গিকতার জন্যই করতে হচ্ছে। স্বামীজী তাতে লিখছেন—*দেওয়া এবং নেওয়া—এই হলো জগতের নিয়ম এবং যদি ভারত আর একবার নিজের অভ্যুত্থান চায়, তাহলে এ একেবারে সুনিশ্চিতরূপে প্রয়োজন যে, সে তার নিজস্ব সম্পদগুলি বের করে এনে জগতের সকল জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দেবে এবং সর্বত্র ঘোষণা করবে সে-কথা এবং বিনিময়ে অন্যদেরও তাকে যা দেওয়ার আছে তা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হবে। বিস্তারই জীবন, সঙ্কোচনই মৃত্যু। প্রেমই জীবন, ঘৃণাই মৃত্যু। আমরা যেদিন থেকে অন্য জাতিদের ঘৃণা করতে শুরু করেছি সেদিন থেকেই আমাদের*

* বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ৭ম সংস্করণ, পৃঃ ১৩২

মৃত্যু ঘটতে শুরু করেছে এবং যদি না আজ সম্প্রসারণ নীতিকে গ্রহণ করি, আর কোন কিছুই আমাদের মৃত্যুকে ঠেকাতে পারবে না।[৩৭]*

সুনির্দিষ্ট প্রমাণ আছে যে, ডিসেম্বর মাসে স্বামীজীর পাশ্চাত্যের প্রতি বাণী সচেতন আকার ধারণ করতে শুরু করে, কারণ ডিসেম্বরের ৫ তারিখ থেকে ২৮ তারিখ অবধি আমরা তাঁকে দেখি কেম্ব্রিজে তিনি একটি দর্শন সম্বন্ধে শিক্ষা দিচ্ছেন, যার নাম তিনি দিয়েছেন 'বেদান্ত'। এই কেম্ব্রিজের আসরগুলিতে তিনি যা বলেছেন বলে আমরা জানি তার থেকে আমরা এ-বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারি যে, সেগুলি তাঁর নিউ ইয়র্কের কাজের প্রস্তুতিপর্ব-স্বরূপ এবং এই আসরগুলিতে শিক্ষা দেবার সময় তিনি পাশ্চাত্য মানসের কাছে কোন্ শিক্ষাপদ্ধতিটি উপযোগী হবে তা নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন ও তাঁর বাণীকে একটি সুসম্বদ্ধ-ঐক্য রূপ দিয়েছেন। পরবর্তী কালে ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা মুদ্রিত একটি প্রচারপত্র হতে আমরা জানতে পারি যে কেম্ব্রিজে শিক্ষা দেবার সময় তিনি যে শুধু [হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের] ছাত্রদের পাঠক্রমের মধ্যস্থ যে-সকল দার্শনিক সমস্যাসমূহ তাদের বিভ্রান্ত করছিল,[৩৮] বেদান্তের মাধ্যমে সেগুলির সমাধান করতে সহায়তা করেন তাই-ই নয়, অন্যদের ও যারা তাঁর শিক্ষার আসরে যোগ দিয়েছিল তাদের নিজ নিজ দার্শনিক সমস্যাদি সমাধানে সহায়তা করেছিলেন।

যে-কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে—১৮৯৪-এর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন চিন্তা স্বামীজীর মনে প্রবলবেগে জেগে উঠছিল এবং লেখার মধ্যে প্রকাশ চাইছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও লেখার সময় তিনি পান নি। বৎসরের শেষের দিকে তিনি আলাসিঙ্গাকে লেখেন, '*...এখন আমি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কোন বই লিখছি না—এখন কেবল নিজের ভাবগুলো টুকে যাচ্ছি মাত্র...।*[৩৯]** এই চিন্তাগুলি যে বেদান্ত সম্বন্ধীয় তা প্রমাণিত হয় এই তথ্যের দ্বারা যে সেই একই চিঠিতে তিনি আলাসিঙ্গা এবং অন্যান্য মাদ্রাজী শিষ্যদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন তারা যেন বেদান্ত অনুশীলনে মন দেয়। *যদি তোমরা বৈদান্তিক ধারায় একটি পত্রিকা বার করতে পার, তাহলে আমাদের উদ্দেশ্যকে সফল করবার পক্ষে তা সহায় হবে।... তোমাদের বুকের ছাতিটা বেড়ে যাক্। সংস্কৃত ভাষা বিশেষত বেদান্তের তিনটি*

---

* বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ১৩০, পৃঃ ৭

** ঐ, পত্রসংখ্যা ১৪৪, পৃঃ ৩৫

ভাষা অধ্যয়ন কর। প্রস্তুত হয়ে থাকো। আমার অনেক রকম কাজ করবার মতলব আছে।[৪০]* বেদান্ত পাঠের গুরুত্ব স্বামীজীর কাছে একটি সাময়িক চিন্তা মাত্র ছিল না, কারণ জানুয়ারি মাসেও চিঠিতে স্বামীজী এ-বিষয়ে নির্বন্ধ প্রকাশ করেছেন।

যদিও এটা ভাবা সম্পূর্ণ যৌক্তিক যে, স্বামীজী তখন তাঁর যে 'চিন্তাধারার সার মর্ম' লিখে রাখতে চাইছিলেন, তা ছিল জগতের সমস্যাসমূহের উত্তর-স্বরূপ যে বেদান্ত সেই প্রসঙ্গে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেগুলি ছিল অনাবিষ্কৃত। ইংরাজীতে স্বামীজীর সম্পূর্ণ রচনাবলীর চতুর্থ এবং পঞ্চম খণ্ডে আমরা দেখতে পাই যে, যে-দুটি গ্রন্থ তিনি লিখতে চাইছিলেন—তারই সংক্ষিপ্তসার তাতে সন্নিবেশিত হযেছে, কিন্তু আমরা যে-সময়ের কথা বলছি এ-লেখার সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ আছে বলে মনে হয় না। অবশ্য 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা ১৯৫৫ সালের মে মাসের সংখ্যায় তাঁর রচিত একটি অসম্পূর্ণ এবং তারিখবিহীন প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে, যাব বিষয়বস্তু মনে হয় ১৮৯৪-এর শেষ এবং ১৮৯৫-এর প্রথমদিকে তাঁর যে চিন্তাধারা ছিল তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং হতে পারে, যে সংক্ষিপ্ত টীকা তিনি লিখে রাখবার কথা বলেছিলেন এ হলো সেই জিনিস। এই প্রবন্ধের একটি অংশ, যা সম্পূর্ণ রচনাবলীতে দেখা যায় "ধর্মের মূলতত্ত্বসমূহ" শিরনামায়, নিম্নোক্তরূপ :

> *ঠিক ঠিক দেখতে গেলে কোন পুরোপুরি জাতিগত ধর্ম নেই, তথাপি বলা যেতে পারে যে... বৈদিক, মোজাইক এবং আবেস্তার ধর্ম আদিতে যে-জাতির মধ্যে উদ্ভূত হয়েছিল, তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে ছিল। অথচ বৌদ্ধ, খ্রীস্টান এবং মুসলমানধর্ম প্রথমাবধি "সম্প্রসারণশীল" ধর্ম ছিল।*
>
> *সংগ্রামটা হবে বৌদ্ধ, খ্রীস্টানের, মুসলমানধর্মের সঙ্গে পৃথিবীজয়েব জন্য, নিজ জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ ধর্মগুলিকেও এ-সঙ্ঘর্ষে যোগদান করতে হবে—এ অনিবার্য। প্রত্যেকটি ধর্মই—তা জাতিগতভাবে সীমাবদ্ধ বা 'সম্প্রসারণশীল'—যেটিই হোক না কেন, ইতোমধ্যে বহু শাখায় বিভক্ত হয়েছে এবং বিপুলভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, সচেতনভাবে বা অসচেতনভাবে, পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধনের প্রয়োজনে। এই তথ্যটি দেখাচ্ছে যে, এদের মধ্যে কোনটিই এককভাবে সমগ্র মানব জাতির ধর্ম হতে পারে না। প্রত্যেক ধর্মই যে-জাতির মধ্যে উদ্ভূত হয়েছে তার বৈশিষ্ট্য*

* বাণী ও বচনা, ৭ম খণ্ড, ১ম সং, পত্রসংখ্যা ১৪৪, পৃঃ ৩৬

হতেই জন্মেছে এবং যেগুলি ঐ বৈশিষ্ট্যগুলিকে আরও গভীরতর করে তোলার এবং রক্ষা করার কারণস্বরূপ; তার কোনটাই সেজন্য সর্বজনীন মানব প্রকৃতির উপযোগী হতে পারে না। তাই শুধু নয়, প্রত্যেকটির মধ্যেই একটি নেতিবাচক দিকও আছে। প্রত্যেকটিই মানব-প্রকৃতির কোন একটি বিশেষ দিকের বিকাশ সাধন করে কিন্তু যে-জাতির মধ্যে এটি উদ্ভূত তার সে গুণ নেই তাকে দমন করে। সেজনা এর মধ্যে কোন একটি বিশেষ ধর্ম সকলের উপর চাপানো হলে তা মানব-জাতির পক্ষে বিপজ্জনক এবং অধঃপতনমূলক হবে।

পৃথিবীব ইতিহাস এ পর্যন্ত বিশ্বজনীনতা বিষয়ে দুটি স্বপ্ন দেখিয়েছে... একটি হলো বিশ্বব্যাপী একটিই রাষ্ট্রের সাম্রাজ্য বিস্তারের, অপরটি বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় সাম্রাজ্যের। এ-দুটি স্বপ্নই বহুকাল ধরেই মানবজাতির দৃষ্টির সম্মুখে রয়েছে, কিন্তু বারে বারেই শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিজয়ীদের সমগ্র বিশ্বকে একটিই রাষ্ট্রাধীন করবার প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। পৃথিবীব যথেষ্ট পরিমাণ ভূখণ্ড জয় করবার পূর্বেই বিজয়ীদের নিজ দেশেব ভূখণ্ডের বিচ্ছিন্নতা ঘটে যাওয়ায়, ঠিক অনুরূপভাবে ধর্মীয় ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে ধর্মটি প্রসূত হবার পবে শৈশব কাটতে না কাটতেই বিভিন্ন নতুন সম্প্রদায় গড়ে উঠে বিচ্ছিন্নতা ঘটিয়েছে।

তথাপি এ-কথা সত্য বলে মনে হয় যে, মানব জাতির ঐক্য—সামাজিক এবং ধর্মীয়—অনন্ত বৈচিত্র্যের সম্ভাবনাসহ গড়ে ওঠাই প্রকৃতির উদ্দেশ্য এবং যদি এতে তিলমাত্র বাধা সৃষ্টি না করাই আসল কাজ হয় তাহলে আমার মনে হয় প্রতিটি ধর্মের এই যে বিভক্ত হয়ে পড়া—সেটিই হলো ধর্মের রক্ষা পাবার উপায়, কঠিন একত্বে সব একাকার হবার যে প্রবণতা তাতে তা প্রতিহত হয় এবং এ থেকে আমরা কোন্ পন্থা গ্রহণ করব তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সেজন্য সম্প্রদায়গুলিকে ধ্বংস করা নয়, সম্প্রদায় বৃদ্ধি করাই আমাদের লক্ষ্য যতক্ষণ না প্রত্যেকটি মানুষ নিজেই এক একটি সম্প্রদায় হয়ে দাঁড়ায়। পুনরায়, সমস্ত বর্তমান ধর্মগুলি একটি মহান দর্শনে পরিণত হয়ে ঐক্যের পটভূমি রচনা করবে। পুরাণ কাহিনী বা আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতির ঐক্য কখনোও হবে না, কারণ স্থূল ব্যাপারে সূক্ষ্মের চেয়ে মতভেদ অধিক হয়ে থাকে। একরকমের নীতিসমূহ যদি গৃহীত হয়ও, তাহলেও মানুষ আদর্শ আচার্যগণের মহত্ত্ব সম্বন্ধে মতভেদ ঘটাবে এবং বিভিন্ন মত প্রকাশ করবে।

সুতরাং দর্শনের ঐক্যই ধর্মীয় ঐক্যের ভিত্তিভূমি হবে। প্রত্যেক ধর্মই তাদের নিজ নিজ আচার্য বেছে নেবে কিংবা ঐক্যের প্রতীক বেছে নেবে নিজ পছন্দমত। দার্শনিক মতের এই মিলন-মিশ্রণ সহস্র সহস্র বৎসর ধরে ঘটে চলেছে, কেবল পরস্পর বিরোধিতা করার জন্য এর গতি অতি দুঃখজনকভাবে রুদ্ধ হয়ে আছে।

সুতরাং পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ না করে আমরা বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পরের চিন্তা ও আদর্শের মধ্যে আদান প্রদান করতে সহায়তা করতে পারি পরস্পরের মধ্যে ধর্মশিক্ষকদের বিনিময় করে, যাতে সমগ্র মানবজাতি ও পৃথিবীর যাবতীয় বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধেই শিক্ষালাভ করতে পারি। তবে একটি বিষয়ে নির্বন্ধ প্রকাশ করতে পারি যা ভারতীয় বৌদ্ধ সম্রাট অশোক খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় দশকে করেছিলেন, সেটি হলো এই যে কেউ যেন অপরের নিন্দা না করি, অন্যের দোষ ত্রুটি যেন আমাদের কারও উপজীব্য না হয়ে ওঠে; বরঞ্চ যেন সকলকে সহায়তা করতে পারি, সহানুভূতি প্রদর্শন করতে পারি এবং সকলকে আলোক দান করতে পারি। [৪১]

স্বামীজী উপর্যুক্ত কথাগুলি যে-তারিখেই লিখে থাকুন না কেন, এটি নিশ্চিত যে, ১৮৯৪-এর ডিসেম্বরের শেষের দিকে তিনি বেদান্তের মধ্যে দেখছিলেন সেই "এক মহান দর্শন"কে এবং তিনি তাঁর নিজের বাণীর প্রকৃতি এবং বিশালতা সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন হয়েছিলেন। কারণ সেই বছরের শেষ দিনটিতে তিনি একজন প্রকৃত ঈশ্বরের অবতারের মতো বিশ্ব-আলোড়নকারী সুনিশ্চিত ঘোষণা করেছিলেন—"*বুদ্ধের যেমন প্রাচ্যের জন্য একটি দিব্য-বাণী ছিল, আমারও তেমনি প্রতীচ্যের জন্য একটি দিব্য-বাণী আছে।*" এই বিবৃতিটির বিষয়ে কারও মনে আর লেশমাত্র সংশয়ের অবকাশ রাখে না যে, তিনি তাঁর জীবনব্রত সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে এসেছেন। এর কয়েক সপ্তাহ পরে তিনি নিউ ইয়র্কে স্থির হয়ে বসলেন তাঁর বেদান্ত শিক্ষাদানের আসব শুরু করবার জন্য। (এখানে লক্ষণীয় যে, তিনি কিছুদিনের জন্য 'যোগ' কথাটি 'বেদান্তে'র সঙ্গে যোগ করেছিলেন তাঁর বিশ্ববাণীর নামকরণ করতে গিয়ে। পরবর্তী কালে অবশ্য তিনি শুধুমাত্র 'বেদান্ত' কথাটিই এজন্য ব্যবহার করে সন্তুষ্ট হয়েছেন, সন্দেহ নেই, যোগ কথাটি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সেটি স্বীকার করে নিয়ে।)

১৮৯৫-এর সূচনার মুহূর্ত হতে স্বামীজী পূর্ণ শক্তিতে এবং পূর্ণ নিশ্চয়তার

সঙ্গে তাঁর বিশ্ববাণী প্রচারকল্পে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, তৎপর হলেন বেদান্তকে তিনি যে-ভাবে ধারণা করেছেন সেটি শিক্ষা দিতে। তাঁব এই বেদান্ত হলো এমন একটি ধর্ম ও দর্শন যা সকল বিভিন্ন মতের বিভিন্ন স্তরের ধর্মীয় বিকাশের উপযোগী হবে অথচ একই সঙ্গে মানুষের সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক প্রয়োজনও মেটাবার উপযোগী হবে, এমন একটি ধর্ম ও দর্শন হবে এটি যা আবার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনুসরণযোগ্য হবে, যা মানবের অস্তিত্বের প্রতিটি দিকেই তাকে উপকৃত করবে ও তার সব সমস্যার সমাধান করবে, যথা—বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে বিরোধের অবসান করবে, ব্যবহারিক উপযোগিতা এবং অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মধ্যেও বিরোধ ঘুচিয়ে দেবে। আবার একই সময়ে আমরা দেখি যে, তাঁর গুরুভাই এবং শিষ্যদের নিকট চিঠিতে বেদান্তের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন তা ভারতের জনগণের ও জাতীয় জীবনের পুনরুজ্জীবনে সহায় হবে বলে এবং তিনি তাদের বেদান্ত অনুশীলন করবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছেন। জানুয়ারির ৩ তারিখে তিনি স্যার এস. সুব্রহ্মণ্য আইয়ারকে লিখলেন— "*কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে নানাবিধ চিন্তা করে এখন তাকে নিম্নলিখিত ধারায় সীমাবদ্ধ করেছি : প্রথমে মাদ্রাজে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে, ক্রমশ তাতে অন্যান্য অবয়ব সংযোজন করতে হবে; আমাদের যুবকগণ যাতে বেদসমূহ, বিভিন্ন দর্শন ও ভাষ্যগুলি সম্পূর্ণরূপে শিখতে পায় তা করতে হবে; তার সঙ্গে অন্যানা ধর্মসমূহের তত্ত্বও তাদেরকে শেখাতে হবে।*"[৪২*] জানুয়ারি মাসের ১২ তারিখে তিনি আলাসিঙ্গাকে লিখলেন : "*বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা, সংস্কৃত ও কয়েকটি পাশ্চাত্য ভাষা এবং বেদান্তের বিভিন্ন মতবাদ শিক্ষা দেবার জন্য মাদ্রাজে একটা কলেজ করতেই হবে।*"[৪৩**] *স্বামীজী যে বেদান্ত-দর্শনের তিনটি ধারারই শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন তার প্রমাণ এই যে, এ-বিষয়ে তিনি ক্রমাগত শিষ্য ও অনুরাগীদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন। এপ্রিলের ৪ তারিখে আলাসিঙ্গাকে লিখেছেন*—"*আমার ভাব হচ্ছে—তোমরা এমন একটা শিক্ষালয় স্থাপন কর, যেখানে ছাত্রগণকে ভাষ্যসমেত বেদবেদান্ত সব পড়ানো যেতে পারে। উপস্থিত এইভাবে কাজ করে যাও।*"[৪৪§]

অবশ্য এ সত্য যে, স্বামীজী বেদান্তের অন্য দুটি ধারার চেয়ে অদ্বৈতবাদের

* বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ১৫৫, পৃঃ ৬১

** ঐ, ৭ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ১৫৮, পৃঃ ৬৮

§ ঐ, ৭ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ১৭২, পৃঃ ৮৮

ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন জগতের সকল সমস্যার সমাধান হিসাবে। এপ্রিলের ২৪ তারিখে তিনি শ্রীযুক্ত ই.টি. স্টার্ডিকে লিখলেন—"*প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্য—সর্বত্র একমাত্র অদ্বৈতদর্শনই যে মানবজাতিকে 'ভূতপূজা' এবং ঐ জাতীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত করতে পারে এবং কেবল তা-ই যে মানবকে তার স্ব স্ব ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে শক্তিমান্ করে তুলতে সমর্থ, সে বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত।*"[৪৫]* কিন্তু তা বলে তিনি বেদান্তের অন্য দুটি চিন্তাধারাকে খারিজ করে দেননি মোটেই। প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি ধারার মধ্যেই তিনি বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে নিহিত ঐক্যকে খুঁজে পেয়েছিলেন। এই ঐক্যকেই তো তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন এতদিন ধরে।

১৮৯৫-এর মে মাসের ৬ তারিখে তিনি আলাসিঙ্গাকে লিখলেন—*এখন তোমাদের কাছে আমার নতুন আবিষ্কারের কথা বলছি। ধর্মের যা কিছু সব বেদান্তের মধ্যেই আছে, অর্থাৎ বেদান্তদর্শনে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত—এই তিনটি স্তর আছে, একটির পর একটি এসে থাকে। এই তিনটি আধ্যাত্মিক উন্নতির তিনটি ভূমিস্তর। এদের প্রত্যেকটিরই প্রয়োজন আছে। এই হলো ধর্মের সার কথা। ভারতের বিভিন্ন জাতির আচারব্যবহার, মত ও বিশ্বাসের প্রয়োগের ফলে বেদান্ত যে রূপ নিয়েছে, সেইটি হচ্ছে হিন্দুধর্ম; এর প্রথমস্তর অর্থাৎ দ্বৈতবাদ—ইউরোপীয় জাতিগুলির ভাবের ভেতর দিয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে খ্রীস্টধর্ম। আর সেমিটিক জাতিদের ভেতর হয়ে দাঁড়িয়েছে মুসলমান ধর্ম; অদ্বৈতবাদ তার যোগানুভূতির আকার হয়ে দাঁড়িয়েছে বৌদ্ধধর্ম প্রভৃতি। এখন ধর্ম বলতে বোঝায় বেদান্ত। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রয়োজন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং অন্যান্য অবস্থা অনুসারে তার প্রয়োগ অবশ্যই বিভিন্ন হবে।*

তোমরা দেখতে পাবে যে মূল দার্শনিক তত্ত্ব যদিও এক, তবু শাক্ত শৈব প্রভৃতি প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিশেষ ধর্মমত ও অনুষ্ঠান পদ্ধতির ভেতর তাকে রূপায়িত করে নিয়েছে। এখন তোমাদের কাগজে এই তিন 'বাদ' সম্বন্ধে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে ওদের মধ্যে একটি অপরটির পর আসে, এইভাবে সামঞ্জস্য দেখাও—আর আনুষ্ঠানিক ভাবটা একেবারে বাদ দাও। অর্থাৎ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক দিকটাই বিচার কর; লোকে সেগুলি তাদের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপাদ্দিতে লাগিয়ে নিক। আমি এ-বিষয়ে

---

* বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ১৭৬, পৃঃ ৯২

একখানি বই লিখতে চাই—সেজন্য সব ভাষ্যগুলি চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার কাছে এ পর্যন্ত কেবল রামানুজ-ভাষ্যের একখণ্ড মাত্র এসেছে।[৪৬*]

এই গ্রন্থটি লিখবার ইচ্ছা স্বামীজীকে তাড়া করে ফিরছিল। ১৮৯৫-এর জুনে তিনি মেরী হেলকে লিখলেন—*ভারত থেকে বেদান্তের ওপর দ্বৈত, অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত-এই তিন প্রধান সম্প্রদায়ের ভাষ্য পাঠিয়েছে। ....চর্চা করে খুব আনন্দ হবে। এই গ্রীষ্মে বেদান্ত-দর্শন-বিষয়ক এক পুস্তক রচনার সংকল্প।*[৪৭**] পুনরায় ১৮৯৬ সালে তিনি লণ্ডন থেকে আলাসিঙ্গাকে লিখলেন—"বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে বড় রকমের একটা কিছু লিখতে ব্যস্ত আছি। বেদান্তের ত্রিবিধ ভাব নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বেদে যে-সকল বচন আছে, সেগুলি সংগ্রহ করছি।... বেদান্ত দর্শনের কিয়দংশ অন্তত পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করে না রেখে পাশ্চাত্যদেশ থেকে চলে যাওয়া ভাল বোধ হচ্ছে না।"[৪৮§] কিন্তু যদিও স্বামীজী এই বইটি লেখেননি, লিখলে অবশ্য গ্রন্থটি বেদান্তের একটি পাঠ্যপুস্তক হয়ে দাঁড়াত—তিনি "এই দর্শনকে কিছুটা গ্রন্থাকারে রূপ" না দিয়ে পাশ্চাত্য ছেড়ে যাননি। ১৮৯৫ ও ১৮৯৬-এ তাঁর বক্তৃতার অনুলিপিগুলি, তাঁর কর্মযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগ—এ-বিষয়ে বিরাট কাজ এবং পরবর্তী বক্তৃতা ও রচনাগুলিসহ সেগুলির মধ্যে যে-বাণী অনুস্যূত হয়ে আছে, তার সম্বন্ধে তিনি নিজেই জীবনের শেষ প্রান্তে এসে বলেছেন যে, তা বিশ্বের পরবর্তী পনের-শ বৎসরের জন্য প্রাণধারণের পক্ষে যথেষ্ট।[৪৯]

১৮৯৪-এর আগমনের সঙ্গে স্বামীজীর বাণীর পূর্ণ বিকাশ ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরালভাবে তাঁর কর্ম-পরিকল্পনারও একটি রূপান্তর ঘটে। আমরা জানি ১৮৯৩-এর পুরো বছরটিতে এবং ১৮৯৪-এর অনেকাংশ সময়ে তিনি আমেরিকায় দীর্ঘদিন থেকে যেতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁর মনের বড় একটি অংশ তখনো অধিকার করে ছিল ভারত এবং যদিও এ-কথা সত্য যে, তাঁর সমগ্র বক্তৃতাসফরকালে তিনি একজন অবতারপুরুষের আশীর্বাদ আমেরিকাবাসীদের মস্তকে বর্ষণ করে চলেছিলেন এবং ধর্ম সম্বন্ধেও প্রচুর শিক্ষা দিয়েছিলেন তাদের, তাঁর সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় জনগণের

* বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ১৭৭, পৃঃ ১১৩-৪

** ঐ, ঐ ঐ ঐ ১৮৭, পৃঃ ১২৭

§ বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ৩০৬, পৃঃ ২২৮

ঐহিক উ[illegible]ত সাধনের জন্য সহায়তা সংগ্রহ। ১৮৯৪-এর মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময় হতে তাঁর মনে হয়েছে পাশ্চাত্যে যথেষ্ট হয়েছে, আর নয় এবং বড় বড় জনসভায় ভাষণ দেওয়া সম্পর্কে বিরক্ত হয়ে তিনি ডেট্রয়েট থেকে মেরী হেলকে লিখলেন—*"এ-দেশ থেকে চলে যাবার আগে আমি অবশ্য দু-একদিনের জন্য শিকাগোতে আসব।"*[৫০*] এবং এই সময়েই আলাসিঙ্গাকে লিখেছিলেন—*"এ-দেশে দু-তিন বছর ধরে বক্তৃতা দিলে টাকা তোলা যেতে পারে। আমি কতকটা চেষ্টা করেছি, আর যদিও সাধারণে খুব আদরের সঙ্গে আমার কথা নিচ্ছে। কিন্তু আমার প্রকৃতিতে এটা একেবারে খাপ খাচ্ছে না, বরং ওতে আমার মনটাকে বেজায় নামিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং আমি এই গ্রীষ্মকালেই ইউরোপ হয়ে ভারত ফিরে যাব স্থির করেছি।"*[৫১**] যদিও এ-কথা সত্য যে ১৮৯৪-এর গ্রীষ্মকালে স্বামীজী কখনো কখনো আমেরিকায় ১৮৯৪-৯৫-এর সারা শীতকাল থেকে যাবার কথা ভেবেছেন কিন্তু তাঁর চিঠিপত্রে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর এ-দেশ ত্যাগ করে যাবার, ভারতে ফিরে যাবার জন্য এক প্রবল ইচ্ছা। ১৮৯৪-এর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি গুরুভাইদের লিখলেন—*"আমি একটা পুঁথি লিখছি—এটা শেষ হলেই এক দৌড়ে ঘর আর কি!"*[৫২§] কয়েকদিন পরেই আলাসিঙ্গাকে লিখলেন, "আশা করি, শীঘ্রই ভারতে ফিরব। এ দেশ তো যথেষ্ট ঘাঁটা হলো,...আমি এই সদাব্যস্ত, অর্থহীন, টাকা-কামানোর জীবন আদৌ চাই না। বুঝছ আমি শীঘ্রই ফিরছি।"[৫৩§§] সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত স্বামীজী আমেরিকায় থেকে যাওয়া এবং শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। তথাপি তিনি থেকে গেলেন।

কেউ যদি কথাটা ভাবতে চেষ্টা করে তাহলে অবাক হয়ে যাবে যে, কোন্ বস্তু তাঁকে আমেরিকায় ধরে রেখেছিল। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে, তাঁর ভারতের কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, সমস্ত বাধার মুখোমুখি হয়েও, তিনি থেকে গেলেন। কিন্তু তা নয়, খুব সম্ভবপর কারণ এই যে তিনি জানতেন যে, তিনি কাজ করছেন ঈশ্বরেচ্ছায়। যদিও তিনি কদাচিৎ

* ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ৮১, পৃঃ ৩১৮
** ঐ, ৭ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ১৫৩, পৃঃ ৫৭
§ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ১১৭, পৃঃ ৬
§§ ঐ, ৭ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ১১৫, পৃঃ ১

বিশদভাবে জানিয়েছেন কিভাবে তিনি জগন্মাতা বা শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ পেয়েছেন, এ-ব্যাপারে অনেক সময় তিনি ইঙ্গিতমাত্র দিয়েছেন, কখনো কখনো তার চেয়ে একটু বেশি বলেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৮৯৪-এর জুলাই মাসে শ্রীমতী হেলকে তিনি লেখেন— "*সম্ভবত আমি শীঘ্রই ইংল্যাণ্ড যাব। কিন্তু এ-কথা কেবল আপনার আমার মধ্যে যে আমি একজন অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে বিশ্বাসী লোক এবং ঈশ্বরের নির্দেশ ছাড়া নড়তে চড়তে পারি না, সেটা এখনো পাইনি।*"[৫৪] আমি রামকৃষ্ণ মঠের একজন প্রাচীন সাধুর মুখে শুনেছি যে, স্বামীজী একবার তাঁর গুরুভ্রাতা স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে গোপনে বলেছিলেন যে, তাঁর আমেরিকা ভ্রমণকালে তিনি কোথায় যাবেন আর কোথায় যাবেন না সে-বিষয়ে কখনো কখনো শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হতে প্রত্যক্ষ নির্দেশ পেয়েছেন। এ-কথা জেনে আমরা নিশ্চিতরূপে বলতে পারি যে, যখন তিনি আলাসিঙ্গাকে লিখেছেন— "*জানি না, কবে ভারতে যাব। সমুদয় ভার তাঁর ওপর ফেলে দেওয়া ভাল, তিনি আমার পশ্চাতে থেকে আমাকে চালাচ্ছেন*"[৫৫*]—তখন তিনি অক্ষরে অক্ষরে সত্য কথাই লিখেছেন। পরে তিনি তাকে লেখেন— "*আমি তাঁরই হাতে... আমি যখন তাঁর নিকট থেকে নির্দেশ পাব, তখনই [ভারতে] ফিরে যাব।*"[৫৬] সুতরাং যখন স্বামীজী অনুভব করছেন যে, এখানে সেখানে জনসভায় বক্তৃতা করে কোন স্থায়ী ফল হচ্ছে না এবং আর্থিক দিক থেকে "এ-বিষয়ে আশা করা নিরর্থক"[৫৭] বলে মনে করছেন, তবুও তখনো তিনি থেকে গিয়েছেন এবং যা করছিলেন তাই করে যাচ্ছিলেন। তাঁর সত্তার গভীরে তিনি নিশ্চয়ই জেনেছিলেন যে, তিনি হলেন আমেরিকায় প্রেরিত ঈশ্বরের দূত এবং তাঁর পাশ্চাত্যকে দেবার মতো একটি বাণী আছে, তথাপি সেপ্টেম্বর ১৮৯৪-এর মতো দেরিতেও তিনি লিখছেন "*এখন প্রাণের ভেতর আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে—হিমালয়ের সেই শান্তিময় ক্রোড়ে ফিরে যাই।*"[৫৮**] এবং পুনরায় লিখলেন "*কবে ভারতবর্ষে ফিরতে পারব, বলতে পারি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এদেশের যথেষ্ট আমি দেখেছি, সুতরাং শীঘ্র ইউরোপ রওনা হচ্ছি—তারপর ভারতবর্ষ।*"[৫৯§]

* ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ৯৫, পৃঃ ৩৩৬
** বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ১২০, পৃঃ ১৮
§ ঐ, ৭ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ১২২, পৃঃ ১২

স্বামীজী যে পরিশেষে এ-বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠছিলেন যে তাঁর জীবনব্রতের মধ্যে পাশ্চাত্যও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে অক্টোবরের শেষে তাঁর চিঠিপত্রের সুরে একটি সুনিশ্চিত পরিবর্তনের মধ্যে। ভারতে প্রত্যাবর্তনের যে ইচ্ছা বারেবারে প্রকাশ পেয়েছে তা যেন অকস্মাৎ বিলুপ্ত হলো এবং তার পরিবর্তে বার বার উচ্চারিত হলো এই ঘোষণা যে আমেরিকা হলো তাঁর উচ্চভাবসমূহ প্রচারের একটি বিরাট ক্ষেত্র। অক্টোবরের ২২ তারিখে তিনি বাল্টিমোর থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখলেন— "*এদেশে কাজের বিরাম নেই—সমস্ত দেশ দাবড়ে বেড়াচ্ছি। যেখানে তাঁর তেজের বীজ পড়বে, সেখানেই ফল ফলবে—অদ্য বাব্দশতান্তে বা।*"[৬০*] পরের দিনই বিহিমিয়া চাঁদকে লিখলেন—"*এতদিনে আমি এদের নিজেদের ধর্মাচার্যগণের মধ্যে একজন হয়ে দাঁড়িয়েছি।*"[৬১**]

হয়ত পরিকল্পনা পরিবর্তনের সুস্পষ্ট প্রমাণ তাঁর ২৭ অক্টোবরে আলাসিঙ্গাকে লেখা চিঠিতে পাওয়া যায় যাতে তিনি লিখেছেন "আমি মনে হয়, যথেষ্ট কাজ করেছি, এখন একটু বিশ্রাম করতে চাই আর আমার গুরুদেবের [শ্রীরামকৃষ্ণ] নিকট থেকে যা পেয়েছি, তাই লোককে একটু শিক্ষা দেব।"[৬২§] এখানে আমরা দেখি স্বামীজীর আমেরিকার কাজ পরবর্তী কালে যে-রূপ নেবে সে-বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত—গ্রীনএকারে যে ইচ্ছার জন্ম, যা ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে, এখন তার পূর্ণ পরিণতি। শুধু যে এখন স্বামীজী আমেরিকাবাসী শিষ্যদের শিক্ষা দিতে চাইছিলেন তাই নয়, তিনি সুনিশ্চিতভাবে অনুভব করছিলেন যে তাঁর যে দিব্য জীবনব্রত এ তারই একটি বিশেষ অংশ। এই চিঠিতেই তিনি লিখছেন— "*আমার ওপর নির্ভর করো না।...এস্থান প্রচারের উপযুক্ত, ক্ষেত্র। বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে কি করব? আমি ভগবানের দাস। উচ্চ উচ্চ তত্ত্ব প্রচার করবার উপযুক্ত ক্ষেত্র এদেশ অপেক্ষা আব কোথায় পাব? এখানে যদি একজন আমার বিরুদ্ধে থাকে তো শত শত জন আমায় সাহায্য করতে প্রস্তুত। এখানে মানুষ মানুষের জন্য ভাবে, নিজের ভাইদেব জন্য কাঁদে আর এখানকার মেয়েরা দেবীর মতো।*[৬৩§§]

* বাণী ও বচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ১২১, পৃঃ ৪৯৮
** ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ১২২, পৃঃ ৪৯৯
§ ঐ, পত্রসংখ্যা ১২৭, পৃঃ ৫০৩
§§ ঐ, পৃঃ ৫০৪-০৫

এ-কথা অবশ্য সত্য যে স্বামীজী সব সময়ই "আগাগোড়া এই জড়বাদী দেশে" "লক্ষণীয় ব্যতিক্রমসকল" দেখেছেন, তিনি হাজার হাজার এমন নরনারী দেখেছেন যাদের নিকট ভাবধারার আবেদন পৌঁছেছে এবং প্রথমাবধি আমেরিকার মেয়েদের মধ্যে তিনি দেখেছেন "দেবী"দের। কিন্তু প্রথমদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার কোন কোন দিক তাঁর খুব ভাল লাগলেও এবং আমেরিকাবাসীদের প্রতি তাঁর যে বিশেষ প্রীতি দেখা যায় তৎসত্ত্বেও, তিনি ইতঃপূর্বে এ-দেশকে ধর্মপ্রচারের পক্ষে "একটি উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র" বলে কখনো মনে করেন নি। ১৮৯৪ এর ২১ সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি লেখেন, "*ধর্মের উচ্চ আদর্শ বুঝতে পাশ্চাত্য দেশে লোকের বহু বছর লাগবে। টাকাই হলো এদের সর্বস্ব। যদি কোন ধর্মে টাকা হয়, রোগ সেরে যায়, রূপ হয়, দীর্ঘ জীবন লাভের আশা হয়, তবেই সকলে সেই ধর্মের দিকে ঝুঁকবে, নতুবা নয়।*"[৬৪]* এবং চারদিন পরে আমেরিকাবাসীদের চরিত্রের সার মর্ম তুলে ধরে তিনি বলেন—"*এদের সব ভাল কিন্তু ঐ যে 'ভোগ'; ঐ ওদের ভগবান,....।*"[৬৫]** সেপ্টেম্বরের শেষে তিনি আলাসিঙ্গাকে লেখেন— "*ভারতই আমাদের কর্মক্ষেত্র, আর বিদেশে আমাদের কার্য সমাদৃত হওয়ার এইটুকু মূল্য যে তাতে ভারত জাগবে, এই পর্যন্ত।*"[৬৬]§ কিন্তু বৎসরের শেষের দিকে তিনি লিখলেন—"*যে মহাপুরুষ হুজুগ সাঙ্গ করে দেশে ফিরে যেতে লিখেছেন, তাঁকে বলো... এ-দেশ আমার অনেক বেশি আপন...ঘরে ফিরে এস? ঘর কোথা?... আমি মুক্তি চাই না, ভক্তি চাই না; আমি লাখ নরকে যাব, 'বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ' (বসন্ত বায়ুর মতো লোকের কল্যাণ আচরণ করে)—এই আমার ধর্ম।*"[৬৭]§§ এর অল্প পরে তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখলেন—"*আমার দেশে যাওয়া অনিশ্চিত। সেখানেও ঘোরা, এখানেও ঘোরা; তবে এখানে পণ্ডিতের সঙ্গ, সেখানে মূর্খের সঙ্গ— এই স্বর্গ নরকের ভেদ।*"[৬৮]§§§ ১৮৯৪-এর শেষের দিকে তিনি লিখলেন—"*আমাকে এখানে স্থায়ী একটা কিছু করে যেতে হবে—*

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, পত্রসংখ্যা ১১৪, পৃঃ ৪৮১
** ঐ, পত্রসংখ্যা ১১৬, পৃঃ ৪৮৫
§ ঐ, পত্রসংখ্যা ১১৯, পৃঃ ৪৯৪
§§ ঐ, ৭ম খণ্ড, পত্রসংখ্যা ১৪৯, পৃঃ ৫২
§§§ ঐ, পত্রসংখ্যা ১৫৬, পৃঃ ৭২

সেইটে আমি এখন ধীরে ধীরে করছি। দিন দিন আমার প্রতি এখানকার লোকের বিশ্বাস বাড়ছে।"[৬৯*]

যতই সময় অতিবাহিত হতে লাগল ততই স্বামীজী তাঁর জীবনব্রত সম্বন্ধে সচেতন হতে লাগলেন এবং এ-বিষয়ে তাঁর দায়িত্ববোধও ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এই সময় স্বামী অভেদানন্দকে একটি পত্র লিখলেন, যাতে কেবল ১৮৯৪ কথাটি তারিখ হিসাবে লেখা আছে, কিন্তু পত্রটির অভ্যন্তরে যা লেখা হয়েছে তা যা প্রমাণ করে তাতে এটি ডিসেম্বরে লেখা হয়েছে বলে ধরা যেতে পারে। এই পত্রে তিনি একজন অবতারসদৃশ আধিকারিক পুরুষ এরকম একটি চেতনা প্রকাশ পেয়েছে। চিঠিটা বাংলায় লেখা, তার আক্ষরিক অনুবাদ করলে ইংরেজী 'সমগ্ররচনাবলী'তে যে অনুবাদ হয়েছে তার থেকে পৃথক হয়ে দাঁড়ায়। এতে তিনি লিখেছেন— *"তোমরা যতদিন কোমর বেঁধে এক কাট্টা হয়ে আমার পিছনে দাঁড়াবে, ততদিন পৃথিবী একত্রে হলেও ভয় নেই। ফলে এই পর্যন্ত বুঝলাম যে আমাকে অতি উচ্চ আসন গ্রহণ করতে হবে।"*[৭০**]

১৮৯৫-এর জানুয়ারি ৩ তারিখে তিনি লিখেছেন— *"আমি দেখছি যে এ-দেশেও আমার বিশেষ কাজ রয়েছে।"*[৭১§] এবং জানুয়ারির ১১ তারিখে লিখলেন— *"জেনো রাখো যে আমার ভাব বিস্তার করবার এটি বিশেষ উপযুক্ত জায়গা; আমি যাদের শিক্ষা দেব, তারা হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক, আর খ্রীস্টানই হোক, আমি তা গ্রাহ্য করি না। যারা প্রভুকে ভালবাসে, তাদের সেবা করতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত।"*[৭২§§] ফেব্রুয়ারির ১ তারিখে তিনি শ্রীমতী হেলকে লিখলেন— *"আমার কিছু বলবার আছে, আমি তা নিজের ভাবে বলব, আর তাকে আমি হিন্দু ভাবেও না, খ্রীস্টানভাবেও না বা অন্য ভাবেও না, আমি সেগুলিকে নিজের ভাবে রূপ দিব, এই মাত্র।"*[৭৩§§§] এ ধরনের বিবৃতি থেকে এ সিদ্ধান্তে না এসে উপায় নেই যে স্বামীজীর আমেরিকার কাজের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি আমূল পরিবর্তন এসময় ঘটেছিল এবং এ পরিবর্তন এত বড় যে তিনি ফেব্রুয়ারি ১৪ তারিখে শ্রীমতী বুলকে লিখলেন— *"সন্ন্যাসীর পক্ষে একটা সৎকাজের জন্যও অর্থসংগ্রহ করা ভাল নয়... এটা যে*

* বাণী ও রচনা, পত্রসংখ্যা ১৪৪, পৃঃ ৩৬

** ঐ, পত্রসংখ্যা ১৪৬, পৃঃ ৪১

§ ঐ, পত্রসংখ্যা ১৫২, পৃঃ ৬২

§§ ঐ পত্রসংখ্যা ১৫৪, পৃঃ ৬৭

ঐ, পত্রসংখ্যা ১৫৯, পৃঃ ৮৪-৫

আমার 'এ করব ও করব, এরকম—এ-সকল ছেলেমানুষী ভাব আমার ছিল, এখন সেগুলিকে সম্পূর্ণ ভ্রম বলে বোধ হচ্ছে। আমার এখন ঐ সকল বাসনা ত্যাগ হয়ে আসছে হয়ত এই দেশে আমাকে টেনে নিয়ে আসার জন্য ঐ সব ভাবোন্মত্ত বাসনার প্রয়োজন ছিল। এই অভিজ্ঞতা লাভ করবার জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।" [৭৪*]

এ-ধরনের বিবৃতিকে কখনো কখনো তাঁর মন মেজাজের তাৎক্ষণিক তারতম্যের জন্য ঘটেছে বলে ধরে নিয়ে সরাসরি খারিজ করে দেবার জন্য আমাদের প্রলোভন হতে পারে, কিন্তু যত্ন করে সময়ানুক্রমিকভাবে স্বামীজীর চিঠিপত্র পাঠ করলে দেখা যাবে যে ১৮৯৪-এর শেষের দিকে এবং ১৮৯৫ এর প্রথম দিকে সুনিশ্চিতভাবে দেখা যায় যে বিশ্বহিতের জন্য তাঁর যে-জীবনব্রত সে-সম্বন্ধে তিনি তীব্রভাবে সচেতন হয়ে উঠছেন। অধিকন্তু দেখা যায় যে, তাঁর চিন্তাধারায় যে-পরিবর্তন এসেছিল তা স্থায়ী। এখন থেকে যখনই সুযোগ এসেছে তখনই তিনি যারা ভুলে যেতে পারে যে তাঁর জীবনব্রত কেবলমাত্র ভারতের জন্য নয়, সমগ্র জগতের জন্য—তাদের সে-কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ১৮৯৫-এর আগস্ট মাসে তিনি আলাসিঙ্গাকে লেখেন— *"সত্যই আমার ঈশ্বর—সমগ্র জগৎ—আমার দেশ।... আমি ভগবানের সন্তান, আমার কাছে একটা সত্য আছে—জগৎকে শেখাবার জন্য।"* [৭৫**] এবং সেপ্টেম্বরের ৯ তারিখে তিনি লিখলেন— *"আমার জীবনের ব্রত কি তা আমি জানি আর কোন জাতিবিশেষের ওপর আমার কোন বিদ্বেষ নেই, আমি যেমন ভারতের তেমনি সমগ্র জগতের। এবিষয় নিয়ে বাজে যা-তা বকলে চলবে না।"* [৭৬§] এবং পুনরায় লিখলেন— *"একথা ভুলে যেও না যে, সব দেশের লোকের প্রতিই আমার টান রয়েছে, শুধু ভারতের প্রতি নয়।"* [৭৭§§] তাঁর 'সম্পূর্ণ রচনাবলী'র পাঠক এ-ধরনের আরও বহু উক্তি পাবেন—যেগুলির কোনটিই ১৮৯৪-এর শেষাংশের পূর্বে করা হয়নি।

যেভাবে স্বামীজী 'বেদান্ত' কথাটিকে ব্যবহার করেছেন তা তাঁর নিজস্ব। আমি যতটুকু জানতে পেরেছি, এই কথাটি উত্তর ভারতে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মসূত্রের অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা সম্বন্ধে। এ-অর্থেই

* বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ১৬৩, পৃঃ ৯০-৯১
** ঐ, পত্রসংখ্যা ২০৩, পৃঃ ১৫১
§ ঐ, পত্রসংখ্যা ২০৬, পৃঃ ১৫৩;
§§ ঐ, পত্রসংখ্যা ৩০৫, পৃঃ ৩০৬

শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সময়ে কথাটিকে ব্যবহার করেছেন, দ্বৈতবাদী মতবাদ থেকে এর পার্থক্য প্রদর্শন করেছেন, যদিও তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকেও বেদান্তের একটি ধারা বলে কখনো কখনো অভিহিত করেছেন। নিজেকে দেখিয়ে তিনি একবার বলেছেন— *"এখানে সব সম্প্রদায়ের লোকই আসে—বৈষ্ণব, শাক্ত, কর্তাভজা, বেদান্তবাদী এবং আধুনিক ব্রাহ্মসমাজীরা"।* [৭৮] অথবা পুনরায় বলেছেন— *"আমি শাক্তদের, বৈষ্ণবদের এবং বেদান্তবাদী সকলকেই মানি।"* [৭৯] দক্ষিণ ভারতে সাধারণত বেদান্তের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদও, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কেবলমাত্র যে-সকল মতের দার্শনিক ভিত্তিতে রয়েছে উপনিষদ্ বা ব্রহ্মসূত্র—সেগুলিকেই বেদান্ত বলে অভিহিত করা হয়। স্বামীজীর পূর্বে কখনো শব্দটিকে তিনি যেরূপ বিশ্বজনীন তাৎপর্য দান করেছেন তা করা হয় নি। ইতঃপূর্বে একে বিস্তারিত করে এমন একটি দর্শনতত্ত্ব ও ধর্মে পরিণত করা হয়নি যার মধ্যে বিশ্বের সকল ধর্ম, মানুষের সকল প্রচেষ্টা—আধ্যাত্মিকতা এবং ঐহিক উন্নতি, বিশ্বাস ও যুক্তি, বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি, কর্ম ও ধ্যান, মানব-সেবা এবং ঈশ্বর-মগ্নতার মধ্যে সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। ইতঃপূর্বে কখনো একে এমন একটি বিশ্বজনীনধর্ম রূপে ধারণা করা হয়নি, যার মূল নীতিগুলি নিজ ধর্মবিশ্বাস-সহ কিংবা কোন ধর্মমতে বিশ্বাস না থাকলেও অনুসরণ করা যায় এবং তা করেও প্রত্যেকটি ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মের প্রত্যেকটি দিকের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখা যায়।

সাল তারিখ অনুসারে ১৮৯৫ সাল অবধি স্বামীজীর দ্বারা বেদান্ত শব্দটির প্রয়োগ অনুসরণ করলে এ-বিষয়ে নতুন আলোকপাত ঘটে। প্রথমেই বলা দরকার যে, তাঁর দেওয়া বক্তৃতা এবং সাক্ষাৎকারসমূহ যা এ-গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে তার মধ্যে 'বেদান্ত' শব্দটি একবারও চোখে পড়ে না। সুতরাং এ-ব্যাপারটি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের নির্ভর করতে হবে তাঁর চিঠিপত্র এবং অন্যান্য রচনাদির মধ্যে যথা তাঁর মাদ্রাজ এবং কলকাতা অভিনন্দনের উত্তরের মধ্যে। এগুলি ছাড়া ১৮৯৫-এর পূর্বে এ-বিষয়ে স্বামীজীর বলা ঠিক ঠিক কথাগুলি জানতে হলে তাঁর ইংরেজী জীবনীতে (প্রথম সংস্করণ) উদ্ধৃত তাঁর হায়দ্রাবাদে ১৮৯৩-এ দেওয়া ভাষণটি দেখতে হবে, যে বক্তৃতাটির কথা আমি পূর্বে একটি অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি এবং ১৮৯২-৯৩-এ মাদ্রাজে দেওয়া তাঁর কথাবার্তার যে অনুলিপি তাঁর (ইংরেজী) সম্পূর্ণ রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডের সন্নিবেশিত হয়েছে সেটিও দেখতে হবে।

এই সমস্ত সূত্রগুলি দেখলে জানা যায় যে স্বামীজী 'বেদান্ত' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ১৮৮৯-এর ১৭ আগস্টে প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা একটি চিঠিতে যার মধ্যে তিনি ব্রহ্মসূত্র নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।[৮০] এখানে তাঁর শব্দটির ব্যবহার পুস্তকানুগ এবং তাঁর ভবিষ্যৎ বাণীর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। শ্রীযুক্ত মিত্রকে লেখা দ্বিতীয় একটি চিঠিতে—যেটি ১৮৯০-এর মার্চের ৩ তারিখে লেখা হয়, তিনি বলছেন— "*কঠোর বৈদান্তিক মত সত্ত্বেও আমি অত্যন্ত নরম প্রকৃতির লোক।*" এই যে 'কঠোর বেদান্তমত'[৮১*] এটি হলো অদ্বৈত বেদান্তমত, আপসহীন অদ্বৈতদর্শন, যা তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট শিক্ষালাভ করেছিলেন, সেটি ছিল তখন তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাসের দর্শন—তা তাঁর জগতের জন্য প্রদত্ত বাণী নয়। এই চিঠিতেই স্বামীজী 'বেদান্ত' কথাটি ব্যবহার করেছেন কেবলমাত্র অদ্বৈতবাদের অর্থে যখন তিনি তাঁর গুরু সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন যে, তিনি অবতার "*অথবা বেদান্তদর্শনে যাকে নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ 'লোকহিতায় মুক্তোঽপি শরীরগ্রহণকারী' বলা হয়েছে*"।[৮২**] "মাদ্রাজে লিপিবদ্ধ করা তাঁর ১৮৯২-৯৩-এর কথোপকথন" মধ্যে 'বেদ' কথাটির বেদান্ত অর্থে প্রয়োগ প্রায়শই দেখা যায়, তখনো এমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না যে, বেদান্তকেই তিনি তাঁর বিশ্ববাণী-রূপে দেখছেন। সত্য কথা বলতে গেলে বেদান্ত কথাটি ওখানে আদৌ ব্যবহৃতই হয় নি। তাঁর জীবনীতে প্রকারান্তরে বলা হয়েছে যে, ১৮৯৩-এর ফেব্রুয়ারির ১৩ তারিখে হায়দ্রাবাদে প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি বলেছেন যে "*তিনি বেদ বেদান্তের অতুলনীয় গৌরবের কথা বিশ্বের কাছে প্রকাশিত করাকে একটি অবশ্য-করণীয় কর্তব্য বলে মনে করছেন।*"[৮৩] বর্তমানে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি যে-তিনি এ-কথা সত্যিই বলেছিলেন।[৮৪] কিন্তু যদি তিনি এ-কথা বলেও থাকেন তথাপি তিনি সুস্পষ্টভাবে এখানে (এবং আগের দিন হায়দ্রাবাদের-নবাবকে) 'বেদান্ত' বলতে হিন্দুদের "সনাতন ধর্মের" কথাই বলতে চেয়েছেন। এটি তিনি সত্যিই ধর্মমহাসভার দিনগুলি হতে আরম্ভ করে পাশ্চাত্যে অবস্থানকালে সবসময়ই বলেছেন। স্বামীজীর স্বমুখনিঃসৃত বাণী যদি ধরতে হয় (এবং এটা ধরাই হলো সবচেয়ে নিশ্চিত প্রমাণকে ধরা) ১৮৯৪-এর মে মাসের আগে আমরা তাঁকে পুনর্বার 'বেদান্ত' কথাটি ব্যবহার করতে দেখি না,

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ৩৭, পৃঃ ৩১১

** ঐ, পৃঃ ৩২০-২১

ঐ সময়ে তিনি অধ্যাপক রাইটকে লেখা একটিপত্রে (দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) মন্তব্য করেছেন *"নির্বোধ ধর্ম [ব্রাহ্মসমাজীদের] প্রাচীন বেদান্তের কাছে দাঁড়াতে পারে না"*[৮৫]—এখানে 'বেদান্ত' অর্থে তিনি অদ্বৈত-বেদান্তের কথা বলতে চেয়েছেন, ব্রাহ্মগণ এর বিরোধী ছিলেন।

এ-কথা সুস্পষ্ট যে উপযুক্তভাবে বেদান্তের প্রয়োগসমূহের মধ্যে স্বামীজীর বেদান্তের সঙ্গে তাঁর নিজের দেয় বাণীকে একীভূত করার কোন চিন্তা ছিল না। কিন্তু সেপ্টেম্বরের ২৫ তারিখে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি খ্রীস্টীয় বিজ্ঞানীদের সম্বন্ধে লেখেন *"আমি বলতে চাই যে এরা হচ্ছে বেদান্তী অর্থাৎ গোটাকতক অদ্বৈতবাদের মত জোগাড় করে তাকে বাইবেলের মধ্যে ঢুকিয়েছে।"*[৮৬]* যদিও যা তিনি বলেছেন এখানে তার চেয়ে বেশি কিছু এর দ্বারা বোঝায় না, কিন্তু এ-চিঠিটির অধিকাংশ হলো অদ্বৈত-বেদান্তের বজ্রনিনাদী সমর্থন এবং এ তাঁর এ-ইচ্ছার প্রমাণ যে, অদ্বৈতকে তিনি ভারতের উদ্দেশ্যে তাঁর বাণীর মূল কথা হিসাবে দেখাতে চাইছেন। এ-সময় তিনি তাঁর মাদ্রাজ অভিনন্দনের উত্তর লিখেছেন, যার মধ্যে এ-বিষয়ে প্রচুর সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে যে, ভারতের উদ্দেশ্যে তাঁর দেওয়া বাণীকে তিনি বেদান্তের সঙ্গে যুক্ত করছেন এবং তিনি এ-বিষয়েও সচেতন যে, বিশুদ্ধ আকারে ভারতের ধর্ম পাশ্চাত্যের পক্ষে অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয়।

এর পর থেকে অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের পর থেকে স্বামীজী 'বেদান্ত' শব্দটিকে তাঁর বাণীর সঙ্গে কমবেশি সমার্থক করে প্রয়োগ করতে লাগলেন—যদিও আরও কয়েকমাস অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত এ-দুটি সম্পূর্ণ এক হয়ে যায়নি। অক্টোবরের ২৭ তারিখে তিনি আলাসিঙ্গাকে লেখেন, *"বেদান্তের কথা ফস্ ফস্ করে মুখে আওড়ানো খুব ভাল বটে, কিন্তু তার একটা ক্ষুদ্র উপদেশ কাজে পরিণত করা কি কঠিন।"*[৮৭]** যদি স্বামীজী তাঁর নিজের দেয় শিক্ষাকে বেদান্তের পরিভাষায় রূপ দেওয়ার কথা চিন্তা না করতেন তাহলে এখানে তাঁর যে শিষ্যটিকে তিনি অসংখ্য চিঠিপত্রের মধ্যে নানা নির্দেশ ও প্রেরণা দিচ্ছেন, তাকে তিনি বেদান্তের অনুসরণকারী বলতে পারতেন না। এক পলক দেখাতেই এই চিঠিটা থেকে স্পষ্ট হয় যে, তিনি

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ১১৬, পৃঃ ৪৮৪

** ঐ, পত্রসংখ্যা ১২৭, পৃঃ ৫০৫

আগাগোড়া অদ্বৈত-বেদান্তের ভাবে অনুস্যূত হয়ে কথা বলছেন, সেজন্য তিনি সেখানে 'বেদান্ত' কথাটির দ্বারা এ-তথ্য বোঝাতে চান নি যে, আলাসিঙ্গা রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত ভাবধারা অনুসরণকারী একটি বৈষ্ণব পরিবারে জন্মেছেন।

আমি একথা ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে, ১৮৯৪-এর শেষভাগে স্বামীজী আলাসিঙ্গা এবং তাঁর অন্যান্য মাদ্রাজী শিষ্যদের বেদান্তের তিনটি ভাষ্যই শিক্ষা করতে জরুরী নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আমার এখানে সে কথার পুনরুদ্ধৃতি দেবার প্রয়োজন নেই, কিন্তু এটি একটি অকাট্য প্রমাণ যে, তিনি এখন বেদান্তকেই তাঁর বিশ্বের প্রতি প্রদেয় বাণী বলে স্বীকৃত দিচ্ছেন। বেদান্ত কথাটি এর পরে তিনি ব্যবহার করেছেন ১৮৯৪-এর শেষে স্বামী শিবানন্দকে লেখা একটি চিঠিতে যার মধ্যে তিনি রামকৃষ্ণের বাণীকে ধর্মের সারসত্যের সঙ্গে সমীকরণ করছেন। তিনি লেখেন, *"বেদ-বেদান্ত পুরাণ ভাগবতে যে কি আছে, তা রামকৃষ্ণ পরমহংসকে না পড়লে কিছুতেই বোঝা যাবে না।... তিনি বেদ ও বেদান্তের জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ ছিলেন। ...তাঁর একটা কথা বেদ-বেদান্ত অপেক্ষা অনেক বড়।"* [৮৮*] এর দ্বারা স্বামীজী এ-কথা কিন্তু বোঝাতে চাইছেন না যে, শ্রীরামকৃষ্ণ এমন কিছু শিক্ষা দিয়েছেন 'যা বেদ-বেদান্তে নেই, কিন্তু তাঁর উক্তিগুলি হলো প্রত্যক্ষ এবং প্রাণময় সত্যের উদ্ভাসন এবং সেজন্য পুঁথির চেয়ে অনেক মূল্যবান। (পরবর্তী "হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ" শীর্ষক একটি বঙ্গভাষায় রচিত লেখায় আমরা দেখি যে, তিনি তাঁর গুরুদেবকে 'বেদমূর্তি' বলে অভিহিত করছেন অর্থাৎ "বেদের জীবন্ত-বিগ্রহ" বলছেন।)[৮৯**] ডিসেম্বর মাসে আমরা দেখেছি যে, তিনি মেরী হেলকে তাঁর বেদান্ত শিক্ষার আসরের কথা লিখছেন—এ থেকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে যে, তিনি তাঁর শিক্ষাকে এই নামেই অভিহিত করছেন।

এইভাবে আমরা দেখি যে ১৮৯৪-এর গ্রীষ্মকাল হতে একই সঙ্গে স্বামীজীর চিন্তাধারার পর পর কতকগুলি বিকাশ যা একের সঙ্গে অপরের তাল রেখে ঘটছে। প্রকৃতপক্ষে সেগুলির তিনটি ধারা : তাঁর বাণীর পূর্ণ রূপায়ণ, তাঁর কর্মসূচীতে পরিবর্তন এবং তাঁর বাণীকে বেদান্তের সঙ্গে এক

---

* বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ১৪৭, পৃঃ ৪৪-৮৫

** ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৫

করে ফেলার ব্যাপারে গতি বৃদ্ধি। এই তিনটি ধারা একই মূল ঘটনার অভিব্যক্তি—বিশ্বকল্যাণ-কল্পে তাঁর জীবনব্রত সম্বন্ধে উপলব্ধির উদয়, এই তিনটি ধারাই এ-সময় তাঁর কথাবার্তা এবং লেখার মধ্যে অনস্বীকার্যরূপে স্বাক্ষর রেখেছে। অবশ্য আমি মনে করি না যে, এ-কথা বললেই সব বলা হবে যে, ১৮৯৫-এর গোড়ার দিকে তিনি তাঁর বিশ্ববাণীকে পূর্ণ রূপ দিয়েছেন, কারণ পরবর্তী বৎসরসমূহ ধরে এর বিভিন্ন অংশের গুরুত্ব বদল হয়েছে এবং ক্রমশ এটি আরও পূর্ণ আরও বিশদ হয়ে উঠেছে। বেদান্তের গ্রন্থসমূহ সম্বন্ধে আমার যেটুকু ধারণা আছে তাতে আমার মনে হয় না যে তিনি সনাতন বেদান্তকেই সর্বাংশে শিক্ষা দিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, তিনি এর সঙ্গে অনেকখানি সাংখ্যদর্শনের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন, আজকের আধুনিক জ্ঞানের প্রগতি হতে উত্থিত কতকগুলি প্রশ্নের সঠিক উত্তর লাভের জন্য। অবশ্য স্বামীজী যেভাবে বেদান্ত শিক্ষা দিয়েছেন তা ব্যাখ্যা করা অথবা বেদান্তের যে বিকাশ তাঁর চিন্তায় ঘটেছে তা আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। শুধু দেখাতে চাই যে তাঁর ব্যাখ্যায় বেদান্তের ধারণায় পরিবর্তন ঘটেছে এবং তিনি যেভাবে বেদান্তশিক্ষা দিয়েছেন তা হলো আধুনিক যুগকে দেওয়া তাঁর অবদান।

এ-প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, স্বামীজী কেন তাঁর প্রচারিত ধর্মতত্ত্বকে বেদান্ত নামে অভিহিত করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এর কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ যে-কথা তিনি নিজেই অনেকসময় বলেছেন—যে-তত্ত্ব তিনি দিয়েছেন তা কম বেশি সব ধর্মেই আছে। তিনি কি এ-কথা লেখেন নি যে—*"সত্য কথা হলো শ্রীরামকৃষ্ণ যে-ধর্ম শিক্ষা দিয়েছেন তাই আসল ধর্ম— হিন্দুরা তাকে হিন্দুধর্ম বলুক, অন্যরা তাকে নিজ নিজ পছন্দের নাম দিন"?*[৮০] তাহলে যেগুলি প্রতিষ্ঠিত ধর্ম সেগুলির মধ্যেই যদি ধর্মের সার সত্য নিহিত থেকে থাকে তাহলে আবার কেন তাকে একটি বিশেষ নাম দেওয়া? একটি সুস্পষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হলো যে, এই নামটি পূর্ব হতেই ছিল। এক অখণ্ড ধর্ম তার সকল দিক সহ বিকশিত হয়েছিল এবং সহস্র সহস্র বৎসর ধরে তাকে 'বেদান্ত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। স্বামীজী এ-সত্যকে অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। আমি অবশ্য আরও দুটি কারণের কথা ভাবতে পেরেছি।

প্রথম, আমরা দেখে এসেছি, তিনি তাঁর সমগ্র বক্তৃতা-সফরের কালে ধর্ম-সমন্বয়কে তার সত্য অর্থে রূপ দেবার প্রয়াস করেছেন এবং অবশেষে

এ-সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে সব ধর্মের মধ্যে ঐক্য-স্বীকৃতির মধ্যেই তা পাওয়া যাবে অথবা সত্যধর্মকে সব ধর্মের মূলে অবস্থিত এটি ভাবতে হবে—কারণ ধর্ম নানা নয়, ধর্ম এক এবং অখণ্ড। যদি তিনি এই ধর্মকে কোন নাম না দিতেন, এর ধারণা অস্বচ্ছ থেকে যেত এবং এরূপ অস্বচ্ছতার যে বিপদ তা সুস্পষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, যদি সব ধর্মমতকে নিজ পছন্দমত ব্যাখ্যা করতে দেওয়া হয় তাহলে যে এই এক অখণ্ড বস্তু ধর্মের যা সার তা যে সুস্পষ্ট সংজ্ঞায় ব্যক্ত হবে এবং অবিকৃত থাকবে—এমন সম্ভাবনা কম এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল হবে যে, আপসের মনোভাব প্রবল হবে এবং এই অখণ্ড ধর্মের যে মূলনীতিগুলি সেগুলি পুনরায় হারিয়ে যাবে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় মতবাদের মধ্যে। আর একটি কথা, প্রত্যেক ধর্মমত বা পথ যে ধর্মের সার তত্ত্বগুলির সবগুলিকে আয়ত্ত করতে পেরেছে বা আয়ত্ত করতে চায় তা ঠিক নয়; সত্য বলতে গেলে, একমাত্র হিন্দুধর্ম ব্যতীত সব ধর্মমতের পক্ষেই সে-সবগুলিকে তাদের ধর্মীয় তত্ত্বের মধ্যে স্থান করে দিতে পারাটা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে।

স্বামীজী তাঁর অখণ্ড একক এই ধর্মের একটি নাম দিতে চেয়েছেন আমার মতে দ্বিতীয় যে কারণে তা হলো এই যে, এই নামকরণ করে তিনি যে ধর্ম-নীতিগুলির বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে পেরেছেন তাই শুধু নয়, এর দ্বারা যে-কোন ব্যক্তির পক্ষে প্রথমেই কোন বিশেষ ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত না করে কিংবা নিজেকে কোনরূপ বিশেষ আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত না করে নীতিগুলি অনুসরণ করতে পারা সম্ভব করে তুলেছেন। সংক্ষেপে কোন ব্যক্তি একজন "বেদান্তী" হয়ে সোজা সত্য ধর্মের মর্মস্থলে গিয়ে পৌঁছতে পারবেন। *"পাশ্চাত্যের কর্মৈষণা ও তেজস্বিতার কিছু উপাদান হিন্দুদের শান্ত গুণাবলীর সঙ্গে মিলিত করলে—এযাবৎ পৃথিবীতে যত প্রকার মানুষ দেখা গেছে তার চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট ধরনের মানুষ আবির্ভূত হবে।"* [৯১*] —১৮৯৪-এর মে মাসে তিনি হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে এ-কথা লিখেছিলেন। এরপর ১৮৯৫-এর মে মাসে তিনি দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে আলাসিঙ্গাকে লিখলেন— *"আমাকে এখানে একদল নতুন মানুষ সৃষ্টি করতে হবে।"* [৯২**] কিন্তু এই নতুন ধরনের মানুষ আসতে পারে না যদি না

---

* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ১২০, পৃঃ ৪৯৭

** ঐ, ৭ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ১৭৭, পৃঃ ১১৪

তারা ধর্মের বিশুদ্ধ তত্ত্ব ও আচার-আচরণ সম্বন্ধে পুরোপুরি শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়; এবং সেই মতবাদ এবং আচার-আচরণসমূহকে সংজ্ঞা দেবার এবং নাম দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এটা প্রয়োজন শুধু সেগুলিকে অবিমিশ্র বিশুদ্ধ রাখবার জন্যই নয়, কিন্তু অনুগামীদের মনে স্পষ্টতা এবং সংহতি দেবার জন্যও বটে...।

৩

স্বামীজী কিভাবে তাঁর বাণী ও জীবনব্রত সম্বন্ধে শেষ উপলব্ধিতে পৌঁছলেন তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমি হয়ত দেখিয়েছি যে, এ-বিষয়ে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল প্রধানত বৌদ্ধিক— অতএব অনুমান স্তরে। আমি অবশ্য এ বোঝাতে চাইনি যে, তাঁর ধারণাগুলি অপ্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণাত্মক যুক্তি-তর্ক হতে প্রাপ্ত অনিবার্য সিদ্ধান্তরূপে প্রসূত অথবা যুক্তির ওপরই তার প্রমাণসিদ্ধতা নির্ভর করছে। এ-কথা সত্য যে, তাঁর বক্তৃতা-সফরের সময় তিনি তাঁর বাণীর একটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দেবার প্রয়াস করছেন বলে মনে হয়েছে যেন জিনিসটা ভেবেচিন্তে স্থির করছেন। এও অবশ্য সত্য যে, ভগিনী ক্রিস্টিনের বর্ণনানুসারে তিনি অনেক সময় সিদ্ধান্তে আসবার পূর্বে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে উচ্চৈঃস্বরে তর্কবিতর্ক করতেন স্বপক্ষে বিপক্ষে সকলপ্রকার যুক্তিতর্কের অবতারণা করে। কিন্তু প্রশ্ন হলো যুক্তি-তর্ক মানে কি যে তার মধ্যে কোন দৈব অনুপ্রেরণা অথবা ঐশ্বরিক অনুমোদন থাকতে পারে না?

এ-কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, স্বামীজী ছিলেন একজন দিব্যজ্ঞানে প্রদীপ্ত মানুষ এবং তাঁর চিন্তাভাবনা সাধারণ মানুষদের মতো ছিল না, ছিল অনুভূতি-প্রসূত এবং তার মধ্যে যুক্তি-তর্কের শ্রমসাধ্য পদ্ধতি ছিল না। সত্যই তাঁর চিন্তা এবং দিব্য প্রেরণার মধ্যে প্রভেদের রেখাটি ছিল অতি সূক্ষ্ম কিংবা বলা যায় যে, এরূপ কোন বিভেদের রেখা টানা প্রায় অসম্ভব ছিল। তিনি অনেকসময় বলতেন এমন সব সত্য আছে যা যুক্তির দ্বারা ধারণা করা যায় না, কিন্তু তা যদিও যুক্তির ধরা-ছোঁয়ার বাইরে তবুও কখনো যুক্তি-বিরোধী নয়। অসংখ্যবার সত্যের অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে তিনি যুক্তি-তর্কের সীমাকে অতিক্রম করে গিয়েছেন এবং এমন সব সত্য উদ্ঘাটিত করেছেন যা যুক্তির দ্বারা লভ্য নয়, কিন্তু তবুও সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসম্মত। তিনি ছিলেন বিনা আয়াসে এক বিশাল অসীম জ্ঞানময় চৈতন্যসত্তার

সঙ্গে যুক্ত, সেজন্য তাঁর নিকট যুক্তির সীমা একটি বাধাস্বরূপ ছিল না। বরঞ্চ, তাঁর কাছে যুক্তি-প্রয়াস এবং যুক্তির অতীত যে বোধি এ-উভয়ের কাজকর্ম একসঙ্গে একক একটি পন্থায় পরিণত হয়ে চলত।

যেভাবে স্বামীজীর মন যুক্তির রাজ্যে এবং যুক্তির অতীত রাজ্যে বিচরণ করত তা চিন্তা করতে গেলে ভগিনী নিবেদিতার 'দি মাস্টার অ্যাজ আই-স-হিম' (স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি) গ্রন্থের দুটি অনুচ্ছেদের কথা স্মরণ হয়। *"তাঁর বক্তৃতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার কাহিনী যা তিনি বলেছিলেন,"* বর্ণনা করতে গিয়ে নিবেদিতা লিখছেন—*"তিনি-বলেছেন যে, রাত্রিকালে তাঁর ঘরে একটি কণ্ঠস্বর তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে পরের দিন যে-সকল কথা বলতে হবে তা বলে দিত, পরের দিন তিনি দেখতেন যে তিনি সেগুলি মঞ্চ হতে পুনরাবৃত্তি করছেন। এক এক সময় বিতর্করত দুটি কণ্ঠস্বর শোনা যেত। পুনরায় মনে হতো কণ্ঠস্বরটি যেন দূরাগত, যেন একটি বিশাল পথের মাঝখান হতে তাঁর সঙ্গে কথা বলছে। তারপর তা যেন ক্রমে এগিয়ে এগিয়ে আসত, যতক্ষণ না তা অত্যন্ত উচ্চ-কণ্ঠস্বরে পরিণত হতো। তিনি বলতেন—'অতীতে যাকে দৈববাণী বলা হতো, তা এরকমই কিছু ছিল—এ জেনে রেখো'!"* [১৩] ঐ বইতেই নিবেদিতা আরও লিখছেন—*"পুনরায়, সেই স্বপ্নটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যা তিনি যাত্রার সময় জাহাজে দেখেছিলেন এবং বলেছিলেন—'আমি দুটি স্বর শুনেছিলাম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিবাহের আদর্শ নিয়ে আলোচনা করছিল এবং মোট সিদ্ধান্ত হয় যে প্রত্যেকটির মধ্যেই এমন কিছু আছে যা বিশ্ব পরিত্যাগ করতে পারে না'।"* [১৪]

এখন স্বামীজীর দ্বারা শ্রুত এই সকল কণ্ঠস্বর তাঁর নিজের মধ্য হতে উৎসারিত হতো কি না কিংবা অন্য কোন উৎস হতে আসত—সে-কথা অপ্রয়োজনীয়। সত্য এই যে, তাঁর চিন্তার জন্ম এমন একটি রাজ্যে যা মনের সাধারণ স্তরের অতীত। তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে তাঁর আমেরিকার কাজ সম্পর্কে লিখেছিলেন—*"আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। তিনি এই যন্ত্র দ্বারা সহস্র সহস্র হৃদয়ে এই দূর দেশে ধর্মভাব উদ্দীপিত করছেন।"* [১৫*] আমরা জানি আমেরিকায় থাকাকালে গুরুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ যোগ ছিল। এই গ্রন্থের মধ্যস্থ বিষয়সকল বর্ণনাকালে আমি এ-বিষয়ে বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি এবং এ-বিষয়ে তাঁর নিজ স্বীকৃতি উদ্ধৃত করেছি।

---

* বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ১৪১, পৃঃ ২৪

তাঁর চিঠিপত্রে এ-বিষয়ে প্রচুর ইঙ্গিত আছে এবং স্বীকৃতি আছে যে, তাঁর কর্ম এবং চিন্তা ছিল ঈশ্বর-প্রেরণায় নির্দেশিত এবং তাঁর অনুভূতিসকল ছিল সাধারণের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এবং অনেক সময় এমন দিব্যবস্তু যে তা কাউকে বলা উচিত নয় এবং লোকের নিকট বললে লোকে চমকে যাবে তাই সেগুলি প্রকাশ করা হয়নি। ১৮৯৪-এ তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখেন—*"দাদা, আজ ছ' মাস থেকে বলছি যে পর্দা উঠছে, সূর্যোদয় হচ্ছে, পর্দা উঠছে—উঠছে ধীরে ধীরে ধীর গতিতে কিন্তু নিশ্চিতরূপে, কালে প্রকাশ, তিনি জানেন।"* তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের গাওয়া একটি গানের প্রথম কলিটি এখানে উদ্ধৃত করেছেন—*'মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা'* এবং তারপর বলছেন, *"দাদা, এসব লেখবার নয়। বলবার নয়।"*[৯৬*] এবং আলাসিঙ্গাকে ১৮৯৫-এর আগস্টে লেখেন—*"আমি তোমাদের অনেক কথা বলতে পারতাম, যাতে তোমাদের হৃদয় আনন্দে লাফিয়ে ওঠে, কিন্তু তা আমি বলব না। আমি লৌহবৎ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও হৃদয় চাই, যা কিছুতেই কম্পিত হয় না।"*[৯৭**]

কিন্তু যদিও স্বামীজী চিঠিপত্রে তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেন নি, কিন্তু তিনি এ-বিষয়ে কোন সংশয় রাখেন নি যে, তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে ঈশ্বরের নির্দেশ লাভ করছেন। *"আমি যতদিন পৃথিবীতে আছি, তিনি আমার মধ্যে কাজ করছেন"*, এ-কথা তিনি ১৮৯৫-এ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখেন। আরও লিখলেন—"এতে যতদিন তোমাদের বিশ্বাস থাকবে, ততদিন কোন অমঙ্গলের সম্ভাবনা নেই।"[৯৮§] এবং আলাসিঙ্গাকে তাঁর দেওয়া আশ্বাসের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে : *"আমার পিছনে এমন একটা শক্তি দেখছি যা মানুষ, দেবতা বা শয়তানের শক্তির চেয়েও অনেকগুণ বড়।"*[৯৯§§]

তাঁর সিদ্ধান্তগুলি যে, কেবলমাত্র যুক্তি বা বাস্তব বিবেচনাপ্রসূত নয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই ঘটনার মধ্যে যে ১৮৯৬-এ যখন তিনি লণ্ডনে তাঁর সাফল্যের শীর্ষদেশে অবস্থান করছিলেন, তিনি স্থির করলেন তিনি ভারতে ফিরে যাবেন, এই বিদায় গ্রহণকে সাধারণ বুদ্ধির দৃষ্টিতে দেখলে বলতে হয় যে, অসময়ে বিদায় গ্রহণ। কিন্তু কুমারী ম্যাকলাউডকে তিনি

* বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পত্র সংখ্যা ১৪১, পৃঃ ২৫
** ঐ, পত্রসংখ্যা ২০৩, পৃঃ ১৫১ § ঐ, পত্রসংখ্যা ২৪১, পৃঃ ২০০
§§ ঐ, পত্রসংখ্যা ২০৬, পৃঃ ১৫৪

লিখলেন—"অবশ্য এখানকার সকলেই ভাবছেন, এই সাফল্যের মুখে কাজটা [লণ্ডনের কাজটি] ছেড়ে যাওয়া বোকামি কিন্তু আমার প্রিয় প্রভু বলছেন, 'প্রাচীন ভারতের অভিমুখে যাত্রা কর।' আমি তাঁর আদেশ পালন করব।" [১০০*] যিনি ভয় পাচ্ছিলেন, যে স্পষ্টবাদিতার দ্বারা স্বামীজী হয়ত লোকজনদের বিরূপ করে তুলে থাকবেন, সেই মেরী হেলকে তিনি পরবর্তী কোন তারিখে লেখেন— *"আমার সময় অল্প। এখন আমার যা কিছু বলবার আছে, কিছু না চেপে বলে যেতে হবে। ওতে কারও হৃদয়ে আঘাত লাগবে বা কেউ বিরক্ত হবে—এ বিষয়ে কিছু লক্ষ্য করলে চলবে না। অতএব প্রিয় মেরী, আমার মুখ থেকে যাই বের হোক না কেন, কিছুতেই ভয় পেয়ো না, কারণ যে শক্তি আমার পশ্চাতে থেকে কাজ করছে তা বিবেকানন্দর নয়—তা স্বয়ং প্রভু; কিসে ভাল হয়, তিনিই বেশি বোঝেন।"* [১০১**] খুব কম লোক স্বামীজীকে পুরোপুরি বুঝেছে অবশ্য যদি কেউই তাঁকে আদৌ পুরো বুঝে থাকে। তাঁর শিষ্য আলাসিঙ্গাকে তিনি লেখেন ঃ *"বৎস আমি অসাধারণ প্রকৃতির লোক, তোমরা পর্যন্ত এখনও আমায় বুঝতে পারবে না।"* [১০২§] এবং আর একজন শিষ্য নরসিমাচার্যকে লেখেন ঃ *"আমার ভেতর যে কি আগুন জ্বলছে, তার সংস্পর্শে এখনও তোমাদের হৃদয়* অগ্নিময় হয়ে ওঠেনি। তোমরা এখনও পর্যন্ত আমাকে বুঝতে পার নি।"[১০৩§§] সত্যিই শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছিলেন—*"নরেনকে (স্বামী বিবেকানন্দকে) কেউই পুরোপুরি বুঝতে পারবে না।"* [১০৪] এবং তাই হয়েছিল। তিনি যা বলেছেন বা যা করেছেন তা অনেক সময় তাঁর গুরুভাইদের দ্বারাও বোঝা সম্ভব হয়নি। তাঁর কাজ এবং কথা তাঁদেরও অনেক সময় মনে হয়েছে আবেগতাড়িত এবং তাঁর জীবনব্রতের পক্ষে ক্ষতিকর। তিনি অবশ্য কাজ করতেন তাঁর অন্তর্নিহিত জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হয়ে। ১৮৯৭-এ তিনি একজন গুরুভাইকে লেখেন— *"তোমার ভয় পাবার কারণ নেই, আমি নিঃসঙ্গ নই—প্রভু সর্বদাই আমার সঙ্গে আছেন।"* [১০৫§§§]

এ-প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি যখন তাঁর জনৈক গুরুভাই তিনি তাঁর গুরুদেবের শিক্ষা থেকে সরে যাচ্ছেন মনে করে এ-সম্পর্কে কিছু বলেছিলেন তখন তিনি কিভাবে বজ্রনির্ঘোষ করে বলেছিলেন— *"তুমি কি*

---

* বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ ** ঐ, পত্রসংখ্যা ৩৪১, পৃঃ ৩৬৫

§ ঐ, পত্রসংখ্যা ২০৬, পৃঃ ১৫৪ §§ ঐ, পত্রসংখ্যা ১৫৪, পৃঃ ৬৮

§§§ ঐ পত্রসংখ্যা ৩১৬, পৃঃ ৩১৭

করে জানলে যে আমি তাঁর শিক্ষানুসারে কাজ করছি না? তোমরা কি শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘরে বন্দি করে রাখতে চাও? তিনি ছিলেন অনন্ত ভাবময়, তিনি তোমাদের সীমাবদ্ধ ধারণার অনেক ঊর্ধ্বে; আমি এই সকল সীমাবদ্ধতাকে ভেঙ্গে চুরমার করে তাঁর ভাবগুলিকে বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে চাই।... তিনি নিজে আমার পেছনে আছেন এবং তিনিই আমাকে এভাবে কাজ করাচ্ছেন।"[১০৬] আবার লিখলেন—*"আমি রামকৃষ্ণের দাস, তিনি তাঁর কাজের ভার আমার ওপর দিয়েছেন এবং আমি যতক্ষণ এ-কাজ শেষ না করছি তিনি আমাকে বিশ্রাম দেবেন না।"*[১০৭]

এইসকল তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে এ-কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, স্বামীজীর বিশ্ববাণীতে যে-সিদ্ধান্তসমূহ রয়েছে, সেগুলির উৎস শ্রীরামকৃষ্ণ, কিংবা বলা যেতে পারে শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক অনুমোদিত, সুতরাং এ-কথা কেউ বলতে পারবে না যে, বেদান্তরূপে তাঁর বিশ্ববাণীর বিকাশ কেবলমাত্র যুক্তি-তর্কের ফল; বরঞ্চ যদি কেউ ভাবে যে এ হলো সত্যের উদ্ভাসন তাহলে সে সঠিক ভাবছে। তথাপি সব সত্যদ্রষ্টা ধর্মপ্রবক্তাকে তাঁদের উপলব্ধি-প্রসূত সত্যসমূহকে মানবমনের ধরাছোঁয়ার মতো করে দিয়ে যেতে হয় এবং এমন পরিভাষায় দিতে হয় যা মননের দ্বারা আয়ত্ত করা যায় এবং যা যুক্তিতর্কের নিয়মে ধাপে ধাপে বোঝা যায়। দিব্য-দর্শনকে এরূপ দার্শনিক এবং বাস্তব আকারে রূপ দেওয়াই একজন জগদ্গুরুর মূলকাজ এবং এ-কাজটি স্বামীজীর ক্ষেত্রে ছিল বিপুল পরিমাণে জটিল। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, তিনি পরিচালিত হয়েছেন দিব্য প্রেরণা এবং নিজ বিপুল মনীষার দ্বারা। কিন্তু যখন আমরা এ-কথা বলছি তখন যেন মনে রাখি যে তাঁর মনীষা চৈতন্যের-রাজ্যের দরজা খুলে সেখানে ঢুকে পড়েছিল। তাঁর চিন্তা এত গভীরতায় পৌঁছেছিল, এত অসীম তার ব্যাপ্তি যে সে-চিন্তাকে সত্যের উদ্ভাসন থেকে পৃথক করা যায় না।

স্বামীজীর জীবনব্রত ছিল এক অর্থে দ্বিমুখী। প্রথমত, আধুনিক জীবনের যে বহুমুখী সমস্যাদি তার একটি বাস্তব একক উত্তর খুঁজবার কাজে তিনি নিজেকে নিবিড়ভাবে নিযুক্ত করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক নিযুক্ত বার্তাবহ হওয়ায় তিনি সমভাবে তাঁর গুরুর শিক্ষাসমূহ অবিকৃতভাবে এবং পূর্ণরূপে প্রচার করার ব্যাপারেও গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। যেকথা আমি ওপরে বলে এসেছি এবং যে-কথা তিনি প্রায়ই বলতেন, তিনি এমন কিছু শিক্ষা দেন নি যা শ্রীরামকৃষ্ণের দেওয়া নয়। এই দুটি উদ্দেশ্যের

সংযুক্তি-সহায়ে তাঁর জীবনব্রত গঠিত হওয়ায় একদিকে প্রয়োজন হয়েছিল এমন একটি যুগের বিপুল জটিল এবং পরস্পর-সম্পর্কিত সংগ্রামগুলি সম্বন্ধে একটি পরিপূর্ণ এবং আগাম জ্ঞান—যে-যুগের ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক সবেমাত্র শুরু হয়েছিল এবং অপরদিকে প্রয়োজন হয়েছিল একটি অসীম ব্যাপ্তির দিব্যচরিত্রের সমস্ত দিককে পুরোপুরিভাবে বোঝা। শ্রীরামকৃষ্ণ বাস্তবে যা ছিলেন তা হলো একটি পূর্ণায়ত বিশ্ব-মানবসত্তা, এমন এক ব্যক্তি যিনি নিজের মধ্যে ঈশ্বরের সকল ঐশ্বর্য এবং মানব-আদর্শের সকল দিককে ধারণ করে রেখেছিলেন—তা থেকে তিনি যদি কিছু কম হতেন তাহলে বেদান্তকে তাঁর সঙ্গে অভেদ করে দেখা স্বামীজীর পক্ষে আরও কঠিন কাজ হতো, একেবারে যদি দুঃসাধ্য নাও হতো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি যা ছিলেন, তাতে স্বামীজী দুটিকে এক ও অভেদ করে দেখতে পেরেছেন। যদিও এটি আপাতদৃষ্টিতে সুস্পষ্ট নয় যে, স্বামীজীর বেদান্তের প্রত্যেকটি দিক শ্রীরামকৃষ্ণের লিপিবদ্ধ শিক্ষা হতে গ্রহণ করা হয়েছে কিনা, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন তাঁর উপলব্ধিতে বেদান্তের জীবন্ত বিগ্রহ। স্বামীজীর কাছে বেদান্ত প্রতিভাত হয়েছিল সেই জীবনেরই বিধিবদ্ধ প্রতিরূপ বা ভাষ্যরূপে অর্থাৎ যা ছিল সূত্ররূপে বেদান্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন তারই জীবন্ত রূপ। স্বামীজী লিখেছেন—*"তিনি বেদ ও বেদান্তের জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ ছিলেন"।*[১০৮]* বেদান্তকে মানুষের সব আকাঙ্ক্ষার, সকল প্রয়াসের, সকল প্রাপ্তির আধাররূপে উপস্থাপিত করা, তাঁর গুরুর অসীম বিশ্বব্যাপী জীবন এবং শিক্ষার তাৎপর্য ধারণা করা এবং উভয়কে এক করে তোলাই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বের প্রতি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদানসমূহের মধ্যে অন্যতম মহান দান, তাঁর মধ্যে এ-বিষয়ে আধিকারিক পুরুষের যে-প্রতিভা ছিল তা রামকৃষ্ণের সকল ভক্ত প্রথমটায় বুঝে উঠতে পারেন নি, সন্দেহ হয় এখনো তা অনেকেই বুঝে উঠতে পারেন না।

---

* বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ১৪৭, পৃঃ ৪৪

পরিশিষ্ট-ক

গ্রীনএকারে ১৮৯৪-এর গ্রীষ্মকালীন বক্তৃতাসমূহের কার্যসূচী

(একাদশ অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

মেইনের অন্তর্গত গ্রীনএকারে মলাটসহ পাঁচপাতার প্রচারপত্র হিসাবে মুদ্রিত একটি কার্যসূচী বিতরণ করা হয়েছিল। এটি আমাদের হাতে তুলে দেবার জন্য আমরা ম্যাসাচুসেট্স বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী সর্বগতানন্দ এবং কুমারী এলভা নেলসনের নিকট কৃতজ্ঞ। কুমারী নেলসন এটি গ্রীনএকারের একজন প্রবীণ অধিবাসীর নিকট হতে সংগ্রহ করে বেদান্ত সোসাইটিকে দান করেন। প্রচারপত্রটির প্রচ্ছদে লেখা ছিল—এলিয়ট, মেইন-এর গ্রীনএকারের গ্রীষ্মকালীন কর্মসূচী—১৮৯৪-এর ৩ জুলাই থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত।

পাঁচপৃষ্ঠাব্যাপী প্রচারপত্রটির অভ্যন্তরে কার্যসূচীর একটি রূপরেখা দেওয়া হয়েছে।

গ্রীষ্মকালীন বক্তৃতাসমূহ

এলিয়ট, মেইন-এ অবস্থিত গ্রীনএকারের পান্থশালা এ অঞ্চলের গ্রাম-জীবনের আকর্ষণ ও আরামের সুযোগের সঙ্গে যাতে অতিথিবর্গের আধ্যাত্মিক মানসিক এবং নৈতিক জীবনকে সঞ্জীবিত ও শক্তিশালী করতে পারে এবং সবচেয়ে সুনিশ্চিত এবং শান্তিপূর্ণ শারীরিক বিশ্রামও দিতে পারে এরূপ বক্তৃতাবলী ও শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা করেছে।

১৮৯৩ সালে অনুষ্ঠিত সম্মেলনগুলির উদার ভাব প্রকাশের ভাষায় এই সংস্থার উদ্দেশ্য হলো এ পৃথিবীতে এ-যাবৎ যে সকল উন্নতি ঘটেছে তার সমীক্ষা করা, যে-সকল বাস্তব সমস্যার সমাধান প্রয়োজন সেগুলি নির্দেশিত করা এবং আরও উন্নতি লাভ করবার উপায় সম্বন্ধে সুপারিশ করা। এ কাজকে সম্ভব করে তোলার জন্য এবং বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সারা পৃথিবীতে যেখানে কাজকর্ম হয় সে অঞ্চলেই একে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। সুতরাং কয়েক বৎসর ধরে যা কেবলমাত্র কয়েকজন প্রগতিশীল চিন্তকদের হৃদয় আলোড়িত করছিল, তা তাদের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের কারণ হয়ে এবং তাদের ইচ্ছার পরিণতিস্বরূপ গ্রীনএকার পান্থশালায় সুনির্দিষ্টভাবে একে কার্যকর করার জন্য এবং তার জন্য যে পরিবেশ সৃষ্টি আশু প্রয়োজন

তার জন্য স্থির করা কার্যক্রমের মধ্যে রূপ নিল। ১৮৯৪-এর সারা জুলাই ও আগস্ট মাসব্যাপী নির্ধারিত কার্যক্রমটি নিম্নলিখিতরূপ :

মঙ্গলবার, জুলাই ৩, শ্রীমতী ওলি বুল, কেম্ব্রিজ—স্বাগত ভাষণ, শ্রীমতী এলিজাবেথ বইন্‌টন হার্বার্ট, শিকাগো—"পাশ্চাত্যের অভিনন্দন বাণী", শ্রী উইলিয়ম অর্ডওয়ে পারট্রিজ—উদ্বোধনী ভাষণ।

বুধবার, জুলাই ৪, শান্তিদিবস, রেভারেণ্ড ডঃ ফ্লবিয়াস জে. প্রবস্ট, শিকাগো—"আগামী দিনের আমেরিকান"।

বৃহস্পতিবার, জুলাই ৫, শ্রীযুক্ত ফ্রেডরিক রীড, রক্সবেরী ল্যাটিন বিদ্যালয়—"আগামীকালের উপযোগী শিক্ষা", শ্রীমতী এইচ. এইচ. ফার্ণস্‌ওয়ার্থ, শিকাগো—"জীবনের বিজ্ঞান"।

সোমবার, জুলাই ৯, শ্রীমতী অ্যাবিমর্টন ডিয়াজ, বোস্টন—"মানব জাতির জন্য মানবসমাজের আসল কাজ", অধ্যাপক টমাস ই. উইল, বোস্টন—"বাস্তব উন্নতির জন্য ঐক্য"।

মঙ্গলবার, জুলাই ১০, শ্রীযুক্ত হেনরী উড, বোস্টন—"মানসিক এবং প্রাকৃতিক রসায়ন", শ্রীমতী হেলেন ভ্যান অ্যাণ্ডারসন—"খ্রীস্টের-অনুরূপ জীবন কিরূপে বাস্তব করে তোলা যাবে"।

বুধবার, জুলাই ১১, কুমারী সোফিয়া বেক, ম্যালণ্ডেন—"আত্মবিকাশের সহায়ক উপায়সমূহ", শ্রীযুক্ত র‍্যালফ ওয়াল্ডো ট্রাইন, পি এইচ. ডি., মাউন্ট মরিস, ইলিয়নিরস— "গ্রন্থকারত্ব এবং বাগ্মীতার প্রকৃত কৌশল"।

বৃহস্পতিবার, জুলাই ১২, রেভারেণ্ড এইচ. সি. ব্রুম্যান, ইস্ট মিল্টন—"আধ্যাত্মিক যুগের বস্তুগত অভিব্যক্তি", শ্রীমতী হেলেন উইলম্যান, বোস্টন—"মানসিক স্বাধীনতা"।

সোমবার, জুলাই ১৬, শ্রীমতী এলেন. এইচ. রিচার্ডস্‌, ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি—"গৃহ-জীবনের উন্নয়ন", কুমারী মারিয়া ড্যানিয়েল, উল্যাস্টন—"বৈজ্ঞানিক উপায়ে এবং স্বল্প ব্যয়ে খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী", শ্রীযুক্ত ফ্রাঙ্ক বি. স্যানবর্ন, কনকর্ড ম্যাস,—"মানসিক এবং আধ্যাত্মিক বিপথগামিতার মানবিক সমাধান।"

মঙ্গলবার, জুলাই ১৭, ডঃ হেনরী বি. ব্ল্যাকওয়েল, বোস্টন—"নারীর সম্ভাবনাসমূহ", কুমারী লিডা হুড ট্যালবট, শিকাগো—"আত্মিক বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত শরীর চর্চা।"

বুধবার, জুলাই ১৮, শ্রীমতী বি.ও. ফ্লাওয়ার, বোস্টন—"জাতির

উপর পোষাকের স্বাধীনতার প্রভাব”, ডঃ এলিস বি. স্টকহ্যাম, শিকাগো—“মাতৃত্ব”।

বৃহস্পতিবার, জুলাই ১৯, শ্রী বি. ও. ফ্লাওয়ার, এরিনা—“আদিযুগের পরিবেশ”, শ্রীযুক্ত পার্কার পিলসবেরি, কনকর্ড, এন. এইচ.—বিষয় ঘোষণা সাপেক্ষ।

সোমবার, জুলাই ২৩, শিশু দিবস ঃ পরিচালনায় ওলাস্টনের কুমারী মার্গারেট সল্টোনস্টল, ডঃ জি. পি. উইকসেল—“সালামের শিশু”, রেভারেণ্ড ডব্লু. ডব্লু. লক, নিউইয়র্ক—“আমাদের ছেলেরা”।

মঙ্গলবার, জুলাই ২৪, শ্রী হেনরী উড, বোস্টন—“অর্থনীতির প্রাকৃতিক নিয়মসমূহ”, কর্ণেল পোস্ট, জর্জিয়া—“রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি”।

বুধবার, জুলাই ২৫, রাব্বি সলোমন শিণ্ডলার, বোস্টন—“ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদ”।

বৃহস্পতিবার, জুলাই ২৬, শ্রী ডব্লু. জে. কলভিলে— “সভ্যতার উদয়”।

সোমবার, জুলাই ৩০, ডঃ সি. ডি. শ্যেরম্যান—“মানুষের ক্রমবিকাশের সঙ্গে গ্রহতারকার শক্তির সম্পর্ক।”

মঙ্গলবার, জুলাই ৩১, অধ্যাপক এ. সি. ডলবিয়ার, টাফ্‌ট্‌স্ মহাবিদ্যালয়—“শরীর ও মনের জ্ঞাত সম্পর্কগুলি”।

বুধবার, আগস্ট ১, কুমারী এম. জি. বার্নেট, বোস্টন—“থিয়োজফি”, শ্রী জর্জ ডি. আয়ার্স, বোস্টন— “থিয়োসফি আন্দোলন”। শ্রীবারচার্ড হার্ডিঞ্জ, লণ্ডন—‘কর্ম ও অবতারবাদ’।

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ২, রেভারেণ্ড এডওয়ার্ড এভারেট হেল, ডি. ডি.—“সমাজতত্ত্ব”।

সোমবার আগস্ট ৬, শ্রীমতী বার্নাড হুইটম্যান, বোস্টন—“হাত বাড়িয়ে কাজ করুন”, কুমারী এমিলি ম্যরগ্যান, হার্টফোর্ড—“ছুটি কাটানোর আবাসগুলি”।

মঙ্গলবার, আগস্ট ৭, শ্রীমতী ইভলিন ম্যাসন, ব্রুকলাইন—“উচ্চতর বিকাশের মাধ্যমে বিশ্রাম”, রেভারেণ্ড অগাস্টাইন কল্ডওয়েল, ইপসউইচ্—“নাম ও সংখ্যার আধ্যাত্মিক তাৎপর্যসমূহ”।

বুধবার, আগস্ট ৮—রেভারেণ্ড শ্রীযুক্ত হিলিস ইভানস্টন, ইলিয়নিস—“রাস্কিন”, রেভারেণ্ড টি. আর্নেস্ট অ্যালেন, গ্রাফটন—“বিশ্বজনীন ধর্ম”।

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ৯, ডঃ লিউইস জি. জেন্স, ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের অধ্যক্ষ—"ক্রমবিকাশ তত্ত্ব এবং প্রাণ"।

সোমবার, আগস্ট ১৩, মাদক দ্রব্য পরিহার দিবস ঃ মেইন ডব্লু. সি. টি. ইউয়ের অধ্যক্ষা শ্রীমতী এল. এম. এন. স্টিভেনস্, প্যোর্টল্যাণ্ড-এর পরিচালনায়, মাদাম ল্যায়া বরকত, সিরিয়া—"সিরিয়ায় মাদক দ্রব্য পরিহার আন্দোলন", শ্রীযুক্ত জোসেফ্ জি. থর্প, জুনিয়ব, কেম্ব্রিজ—'নরওয়ের আইন', জেনারেল নীল ডাউ, পোর্টল্যান্ড—"মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধকরণ।"

মঙ্গলবার, আগস্ট ১৪, রেভারেণ্ড ই.পি. পাওয়েল, ক্লিন্টন, নিউ ইয়র্ক—"স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণের সম্ভাবনা"।

বুধবার, আগস্ট ১৫, শ্রীমতী মার্গারেট বি. পিকে, স্যান্ডাস্কি, ওহিয়ো—"ঈশ্বরের সন্ধানে আত্মা", রেভারেণ্ড উইলিয়াম আর. অ্যালগার, বোস্টন—"বিশ্বজনীন ধর্ম"।

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ১৬, শ্রী এস. ফ্রাঙ্ক ডেভিডসন, লা গ্রাঞ্জি, ইলিয়নিস—"ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গী", শ্রীমতী উরসুলা এন. জেস্টফেল্ড, নিউ ইয়র্ক—"বাইবেলের অন্তর্নিহিত অর্থ"।

সোমবার, আগস্ট ২০, অধ্যাপক আর্নেস্ট এফ. ফেনোলোসা, বোস্টন আর্ট মিউজিয়াম—"শিল্পের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক"।

মঙ্গলবার, আগস্ট ২১, শ্রীমতী মার্থা হোয়ে ডেভিডসন, লা গ্রাঞ্জি, ইলিয়নিস—"ধর্মীয় শিল্প", শ্রী ফ্রাঙ্ক এইচ. টম্প-কিন্স্, বোস্টন—"শিল্পের বাস্তব দিক সম্বন্ধে কথাবার্তা।" শ্রী আর্থার ডব্লু. ডাউ, ইপ্সউইচ্—"শিল্পের গঠন"।

বুধবার, আগস্ট ২২, শ্রীমতী মেরী ডব্লু চ্যাপিন, বোস্টন—"আধ্যাত্মিক নিরাময়", শ্রী ই. এম. বিশপ, বোস্টন—"জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত ঐক্যের নিয়ম"।

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ২৩, শ্রীমতী ফ্যানি এম. হার্লি, "বিশ্ব-সত্য". -সংস্থা, শিকাগো—"প্রতিপাদন", শ্রীমতী আন্না ডব্লু. মিল্স, শিকাগো—"সত্যের অনুসন্ধান", সারা এ. কিং, বাল্টিমোর—"দৈব-নিরাময়"।

সোমবার আগস্ট ২৭, রেভারেণ্ড জর্জ লিউইস, দক্ষিণ বেরউইক—"ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ ও তাঁদের ভবিষ্যৎ বাণী", রেভারেণ্ড টি. আর্নেস্ট অ্যালেন, গ্রাফ্টন—"আধ্যাত্মিকতা যদি সত্য হয়, তার কি কোন মূল্য আছে?"

মঙ্গলবার, আগস্ট ২৮, শ্রী এস. পি. ওয়েট, দর্শন বিদ্যালয়, পোর্ট এডওয়ার্ডস্, নিউ ইয়র্ক—"আত্মা এবং তার সম্ভাবনাসমূহ"।

বুধবার, আগস্ট ২৯, শ্রীযুক্ত এডউইন ডি. মীড, নিউ ইংল্যাণ্ড ম্যাগাজিন—"ইমান্যুয়েল কাণ্ট"।

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ৩০, কুমারী জোসেফাইন সি. লক, শিকাগো—"প্রতীকী নারী"।

বক্তৃতাগুলি অপরাহ্ন ৩টায় দেওয়া হবে এবং সব কটি বক্তৃতাই দর্শনীমুক্ত।

উপরোক্ত বক্তৃতাগুলি ছাড়াও, স্বামী বিবেকানন্দ "ভারতের ধর্মসমূহ", ডঃ জেন্‌স "ক্রমবিকাশ", ডঃ প্রোবস্ট, "ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বোচ্চ শিখর" এবং "হাস্য-কৌতুকের দর্শন", শ্রীযুক্ত বি.ও. ফ্লাওয়ার "হুইটিয়ার", শ্রীযুক্ত কোলভিলে "রোমাঞ্চকর অনুভূতি" এবং "সুমহান সৃষ্টি পিরামিড হতে নূতন আলো", কুমারী জোসেফাইন সি. লক "পুরাণ কথা এবং শিল্পে নারী", কুমারী শিদা মোরি, ইয়ানাগাওয়া, জাপান—"জাপানীদের পোশাক ও গৃহ জীবন" বিষয়ে ভাষণ দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ইংল্যাণ্ডের ডঃ এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল "জীব বিজ্ঞানে খ্রীস্টীয় বিজ্ঞানের পদ্ধতি" বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠাবেন বলেছেন।

আশা করা যাচ্ছে মিশরের ডঃ ইব্রাহিম জি. খেরাল্লা উপস্থিত থাকবেন এবং তিনি "সত্য এবং গূঢ় বিদ্যা বিষয়ক প্রাচ্য দর্শন" এবং কুমারী ভার্জিনিয়া ভাউগান "প্রাচ্য দেশীয় কবিতা" বিষয়ে বলবেন।

এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে উপরোক্ত বিষয়সমূহ শিক্ষার জন্য দক্ষ শিক্ষকদের পরিচালনায় শিক্ষামূলক আসর বসবে, এ বিষয়ে সংবাদের জন্য সংস্থা-সচিব কুমারী ফার্মারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

সঙ্গীত পরিচালনার ভার গ্রহণ করবেন শ্রীমতী ওলি বুল, শ্রীমতী এলিজাবেথ এম. অ্যালেন ভিয়েনাস্থ লেৎসিৎঝিস্‌কির ছাত্রী, শ্রীযুক্ত এডওয়ার্ড টি. বার্কার, শ্রীযুক্ত হ্যারী ডব্লু. ইলিয়ট এবং বোস্টনের শ্রীযুক্ত স্টীফেন এস্. টাউনসেণ্ড। অর্থাৎ, এই গ্রীষ্মে সঙ্গীত-শিক্ষার্থীদের সঙ্গীত শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার একটি দুর্লভ সুযোগ মিলবে।

পরিশিষ্ট-খ

ওয়াশিংটন ডি. সি. টাইম্‌স

(দ্বাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

রে এবং ওয়াণ্ডা এলিসের গবেষণার ফলে আমরা ওয়াশিংটন টাইমসের দুটি প্রতিবেদন পেয়েছি, এজন্য আমরা তাঁদের কাছে ঋণী। প্রথমটির তারিখ ১৮৯৪-এর অক্টোবর ২৯—এটিতে ওয়াশিংটন ডি. সি.-তে রবিবার অক্টোবর ২৮ তারিখে সকালে প্রদত্ত স্বামীজীর ভাষণটি যথেষ্ট পরিমাণে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় এবং তুলনায় স্বল্প পরিসরের প্রবন্ধটি ২ নভেম্বর, ১৮৯৪ তারিখে প্রকাশিত হয়। এটি ১ নভেম্বর তারিখে ওয়াশিংটন মেৎঝেরট সভাগৃহে প্রদত্ত ভাষণের প্রতিবেদন। টাইমস্ পত্রিকার ঘোষণানুযায়ী দ্বিতীয় বক্তৃতার বিষয় ছিল "কান অ্যাক্স" (পুনর্জন্ম)। উভয়ই স্বামীজীর অন্যান্য বক্তৃতার মতো সংবাদপত্রের প্রতিবেদন পর্যাপ্ত না হওয়া সত্ত্বেও বেশির ভাগ প্রতিবেদনের চেয়ে কম গোলমেলে। নিচে পুরো প্রতিবেদন দুটি দেওয়া হলো ঃ

প্রেম—ধর্মের সার
ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী বিবে কানন্দ
পীপলস চার্চে ভাষণ দিলেন

বক্তাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন রেভারেণ্ড ডঃ কেন্ট

জীবনকে চাওয়ার মতো করেই যারা ঈশ্বরকেও
চায় তারা তাঁকে পাবে। বহু মানুষ গীর্জায় যায়,
কারণ সেখানে যাওয়া তাদের সামাজিক মর্যাদা
অনুসারে একটি প্রচলিত রীতি। সত্যিকারের
ভক্তি কোন প্রতিদান চায় না।

ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী বিবে কানন্দ ৪২৩ জি, নর্থওয়েস্ট স্ট্রীটে অবস্থিত চার্চে গতকাল সকাল ১১টায় সমবেত শ্রোতাদের সম্মুখে বক্তৃতা দেন।

তিনি একটি উজ্জ্বল লালরঙের পরিচ্ছদ পরেছিলেন যা তাঁর গলা থেকে পা পর্যন্ত পুরো শরীরটাকে বড় বড় সোজা সোজা ভাঁজে ঢেকে রেখেছিল। তাঁর মাথায় ছিল সোনালী রঙের প্রচুর সিল্কের কাপড়ে জড়ানো পাগড়ি, যার একটি অংশ তাঁর কোমর পর্যন্ত লুটিয়ে ছিল। তাঁর মসৃণ মুখমণ্ডল, সুগঠিত মুখাবয়ব, বিশাল চক্ষুদ্বয়, বেশির ভাগ সময় অংশত বোজা থাকায়

চোখের জ্যোতি কিছুটা স্তিমিত। তাঁর বাদামী রঙের মুখ এবং যেখান থেকে পরিচ্ছদটি শুরু হয়েছে তার মধ্যবর্তী অংশে কড়া ইস্ত্রি করা কলারের সরু সাদা ভাগ দেখা যাচ্ছিল আর তাঁর মাথার উপরে পাগড়ির প্রান্তভাগে কালো চুলের অনেকটা অংশও বেরিয়েছিল। দীর্ঘ উন্নত সুগঠিত আকৃতি সাদাসিধে পরিচ্ছদে তাঁকে একেবারে মহিমময় দেখাচ্ছিল।

ডঃ কেন্ট সন্ন্যাসীকে পরিচিত করালেন। তিনি বললেন, আমরা মিশনারিদের মুখে বিবরণ শোনার সময় ব্যক্তিগত সমীকরণের কথাটি যথেষ্ট বিবেচনা করি না—এই মর্মে ডঃ লিওনার্ড বীকন ধর্মমহাসভায় যে বিবৃতি দিয়েছিলেন সে বিষয়ে আমাদের চিন্তা করা প্রয়োজন। এই বিবৃতিগুলি সৎ কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ ভ্রান্তপথে পরিচালনা করে। যেসব জনগোষ্ঠীকে সাধারণত ভুলভাবে উপস্থাপিত করা হয়, তাদের নিজেদের সম্পর্কে সত্য তুলে ধরবার সুযোগ দিয়েছিল বিশ্বধর্মমহাসভা কিন্তু এ থেকে আমাদের অতিরিক্ত আশা করা উচিত নয়। কচ্ছপের মতো বহু ধর্মসম্প্রদায় নিজেদের খোলার মধ্যে নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে সে-সকল সত্য শুনতে চায়নি।

ইংলণ্ডের ডঃ মামেরী [ডঃ আলফ্রেড ডব্লু. মোমেরী], বলেছেন—"যে-কোন ধর্মের যা কিছু মূলকথা তা অনেকাংশে সত্য এবং যা হচ্ছে বাহ্য তার অনেকখানিই মিথ্যা।" ধর্মমহাসভা হতে আমাদের দেশের সর্বত্র অন্য ধর্মসমূহের গ্রন্থাদি বহুল প্রচার লাভ করেছে, তার ফলে এই ধারণাই আমাদের দেশের মানুষদের মনে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হচ্ছে।

বিবে কানন্দ, এগিয়ে এসে বলেন, তিনি বাল্যকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ধর্মশিক্ষা করেছেন। ভারতে বহু ধর্ম বর্তমান। জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ হলো মুসলমান, ১০ লক্ষ খ্রীস্টান। তিনি সব ধর্ম সম্বন্ধেই পড়াশুনা করেছেন। একজন মহান হিন্দু ধর্মাচার্যের কথা শোনবার পর তিনি তাঁকে বলেন—

"ভাই, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?" আচার্য আশ্চর্য হয়ে তাকালেন, বললেন—"না"।

"তাহলে আপনি কি করে জানলেন যে ঈশ্বর সত্য?"

"আমাকে আমার পিতা বলেছেন।"

"তাঁকে কে বলেছিল?"

"তাঁর পিতা" এবং এইভাবে পরম্পরায় পূর্বপুরুষগণ যাঁরা মেঘের রাজ্যে লীন হয়ে গিয়েছে তাঁদের মাধ্যমে এই কথাগুলি উত্তরপুরুষের কাছে পৌঁছেছে।

তিনি একজন বাগ্মী খ্রীস্টান ধর্মোপদেষ্টার মুখে ধর্ম-কথা শুনেছেন।

তিনি সত্যানুসন্ধানীকে বলেন, খ্রীস্টধর্ম অনুসরণ না করলে যদি তিনি তৎক্ষণাৎ জলে না নিমজ্জিত হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি জীবন্ত ভাজা হয়ে যাবেন—এ আশঙ্কা থেকেই যায়। এই প্রসঙ্গে আরো প্রশ্ন করা হলে এই খ্রীস্টানটিও তাঁর গ্রন্থে যা লিপিবদ্ধ আছে তদনুসারে এবং পূর্বপুরুষদের বক্তব্যের প্রমাণ দিতে দিতে একেবারে মেঘের রাজ্যে চলে গেলেন।

শিক্ষার্থীটি এতে সন্তুষ্ট হলেন না

এ-কথা সত্যানুসন্ধীটিকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। তিনি প্রার্থনা করতে লাগলেন। তিনি উপবাসী থেকে তিনদিন তিনরাত ধরে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করলেন। অবশেষে তিনি এমন একজন মানুষের দেখা পেলেন, যিনি কোন গ্রন্থ পাঠ করেননি। তিনি নিজের নামটুকুও লিখতে পারতেন না। তিনি তাঁর ধর্ম প্রচার করছিলেন। পুরান প্রশ্নটি শুনে তিনি বললেন—"হ্যাঁ, আমি ঈশ্বরকে দেখে থাকি এবং তোমাকেও শিখিয়ে দেব কিভাবে তুমি তাঁকে দেখবে।"

এ-মানুষটির অবয়বে ঈশ্বরের ছাঁচ মুদ্রিত ছিল। এ হলো সেই একই প্রমাণপত্র যা নাজারেথের মানুষটির নিকট এসেছিল যখন শান্তির দূত হিসাবে ঘুঘু পাখিটি তাঁর নিকট জর্ডানে নেমে এসেছিল। তাঁর কথা যারা শুনল তিনি তাদের বিশ্বাস করিয়ে ছাড়লেন যে, ঈশ্বর আছেন এবং ধর্ম একটা ব্যঙ্গ কৌতুকের ব্যাপার নয়।

বারো (প্রকৃতপক্ষে ছয়) বৎসর কানন্দ এই লোকটির পাদমূলে বসেছেন। তিনি ছিলেন গুরু। একদিন তিনি বললেন—"এ বইটি নাও"। কানন্দ বইটি নিলেন এবং পড়লেন। এটি ছিল একটি পঞ্জিকা। যেখানটায় বৃষ্টিপাতের কথা লেখা আছে তিনি সে জায়গাটিও পড়লেন। তাতে বলা হয়েছে কোন একটি জেলায় একটি সময় সীমার মধ্যে এত পরিমাণ বৃষ্টি হবে। গুরু বললেন—"বইটা বন্ধ কর এবং চেপে ধর", উনি তাই করলেন। তিনি বললেন—"এবার নিঙড়োও"। উনি তাই করলেন। জল বের হলো কি? না, এক ফোঁটাও না, সব বইগুলি ঠিক একই রকম। প্রকৃত ধর্ম হলো এই এখানে—হৃদয়মধ্যে।

সত্য কথা হলো মানুষ ঈশ্বরকে চায় না। এ চাওয়া থেকে অনেক দূরে থাকে মানুষ। ধর্ম আজ একটা ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার প্রিয় মহিলাটির সুন্দর একটি বৈঠকখানা আছে, সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্র আছে। একটি পিয়ানো আছে, সুন্দর গহনা আছে এবং দামী পোশাক আছে,

একটি টুপি আছে যা একেবারে হালফ্যাসানের। এতসব উপকরণ থাকলে তার ধর্মের আড়ম্বর না থাকলে কি চলে? এ হালফ্যাসানের ধর্ম প্রচুর আছে। কিন্তু এ হলো কপটতা এবং কপটতা হলো যত মন্দের উৎস। এরূপ ধর্ম ঈশ্বরের ধর্ম নয়। এ হলো ধর্মের ছায়ামাত্র। এরূপ ধর্মের মানুষেরা অনেকে কখনো কখনো খুব আন্তরিকতাসহ বড় হয়ে ওঠে এবং এমনভাবে ধর্মের বিষয়ে কথাবার্তা বলে যেন এর মধ্যে কিছু সত্য আছে। ধর্ম লাভ না করে যারা ধর্মের কথা বলে তারা বিবাদ-বিসম্বাদ এবং হানাহানিতে জড়িয়ে পড়ে। "আমার", "আমার"—বলে তারা চিৎকার করে, "তোমার", "তোমার"—কখনো বলে না। "আমার ধর্ম সবচেয়ে ভাল", "না, না, আমার"—এইভাবে পরস্পরে হানাহানি করে। ঠিক যেমন আদিম উপজাতিগুলি প্রতিদ্বন্দ্বী দেবতাদের নিয়ে করত। মাম্বো আর জাম্বো। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যেমন, ধর্মের ক্ষেত্রেও তেমন প্রতিযোগিতা চরম অভিশাপের মতো।

ভালবাসাই স্থায়ী হয়

তোমাদের নিজ ধর্মপ্রবক্তা পল বলেন—"সব কিছু ধ্বংস হবে, একমাত্র ভালবাসা থাকবে।" এই হলো মহান সত্য। আমার জাতির ক্ষমতা বৃদ্ধি হোক অন্য জাতির মূল্যে—এ মিথ্যা মতবাদ কখনো ঈশ্বরের নয়।

একজন যুবক তার গুরুর কাছে গিয়ে বলে—"আমি ঈশ্বরকে জানতে চাই।" তার গুরু তার কথা কানে নিলেন না। কিন্তু যুবক ক্রমাগত বলে যেতে থাকল একই কথা। সে নিরস্ত হতে চাইল না। অবশেষে একদিন গুরু তাঁকে বললেন, "চল, নদীতে স্নান করে আসি।" দুজনেই গিয়ে নদীতে নামলেন। গুরু তার উপব পড়ে জলের নিচে তাকে চেপে রাখলেন। যুবক উঠবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু গুরু তাকে উঠতে দেবেন না। অবশেষে যখন সে মৃতপ্রায়, তখন গুরু তাকে ছেড়ে দিলেন এবং জলের উপর তাকে তুলে এনে পুনর্জীবিত করলেন।

"যখন জলের মধ্যে ডুবে ছিলে তখন কি চাইছিলে?"—গুরু জানতে চাইলেন।

"নিঃশ্বাস"—উত্তর এল।

"তাহলে তুমি ঈশ্বরকে চাও না"।

সাধারণত সব মানুষের ক্ষেত্রেই তাই। তোমরা কি চাও? নিঃশ্বাস নিতে চাও, নিঃশ্বাস না নিয়ে তুমি বাঁচতে পার না। তোমার খাদ্য চাই, খাদ্য ছাড়া তুমি বাঁচতে পার না; তোমার বাড়ি চাই, বাড়ি ছাড়া তুমি

বাঁচতে পার না। যখন যেভাবে এই জিনিসগুলি চাইছ, ঠিক সেইভাবে ঈশ্বরকে চাইবে, তখন তিনি তোমার সামনে প্রকটিত হবেন। ঈশ্বরকে চাওয়া একটি মস্তবড় কথা।

বেশীরভাগ নরনারী ইন্দ্রিয়সমূহের উপভোগ চায়। তাদের বলা হয়েছে যে, কোথাও দূরে আকাশে একজন ঈশ্বর আছেন এবং তাঁর কাছে আন্তরিক প্রার্থনা করা হলে তিনি ইন্দ্রিয়ভোগ্য জাগতিক বস্তুসমূহ পেতে সাহায্য করে থাকেন। সকল দেশেই ঈশ্বরকে চায়—এরকম মানুষের সংখ্যা খুব কম। তাঁরা 'সত্য' এবং 'ভাল'র সঙ্গে এক হয়ে যান। ধর্ম দোকানদারী নয়। ভালবাসা কোন প্রতিদান চায় না। কোন কিছু ভিক্ষা চায় না, ভালবাসা দিতে চায়।

ধর্ম ভীতি-সঞ্জাত নয়, ধর্ম আনন্দের ব্যাপার। এ হলো স্বতঃস্ফূর্ত পাখির গান এবং প্রভাতকালের মনোরম দৃশ্যের মতো। এ হলো আত্মার অভিব্যক্তি। এ হলো মুক্ত এবং মহৎ আত্মার অন্তর থেকে উৎসারিত বস্তু।

ধর্ম যদি দুঃখ-দুর্দশা হয়, তাহলে নরক কি ? কোন মানুষের দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত হবার অধিকার নেই। তা হওয়া ভুল, সেটাই পাপ। প্রতিটি হাসিই ঈশ্বরেব নিকট প্রেরিত প্রার্থনা।

যা বলছিলাম, আমি যা শিখেছি তা হলো—ধর্ম গ্রন্থ মধ্যে নেই। কোন বিশেষ রূপের মধ্যে নেই, বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে নেই, কোন বিশেষ জাতিতে নেই, ধর্ম রয়েছে মানুষের হৃদয়ে। তা এখানে হৃদয়ে প্রোথিত। এর প্রমাণ আমাদের মধ্যেই আছে।

আমি দুটি কথা বলব। সম্প্রদায় আছে। সেগুলি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাক, যতক্ষণ না প্রতিটি ব্যক্তি এক একটি সম্প্রদায় হয়ে দাঁড়ায়। অন্যে যেভাবে দেখে থাকে, কেউ হুবহু সেইভাবে ঈশ্বরকে দেখে না, প্রত্যেকেরই তাঁতে বিশ্বাস থাকা দরকার এবং যে যে-ভাবে ঈশ্বরকে দেখে থাকে, সে সেইভাবে তাঁকে সেবা করবে। তখন আমি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় চাইব। প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য বিশ্বজনীনতার বিরোধী নয়।

আসুন, প্রত্যেকে নিজের জন্য এবং সকলে একত্রে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি। আপনার যদি আটটি শক্তি থাকে, আমার চারটি। আপনি যদি এসে আমাকে ধ্বংস করেন, আপনি অন্ততপক্ষে চারটিকে হারাবেন। আপনার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য বাকি রইল মাত্র চার। একমাত্র ভালবাসার দ্বারাই ঘৃণাকে জয় করা যায়, যদি ঘৃণার কোন শক্তি থাকে, তাহলে ভালবাসার শক্তি নিশ্চয়ই আরো অনেক বেশি।

হিন্দু আশাবাদী

বিবে কানন্দ ধর্মে ধর্মে তুলনা করলেন এবং পুনর্জন্মবাদের কথা বললেন।

যিনি মেৎঝেরট সভাগৃহে একটি ভালমতো দর্শক সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন, সেই ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী বিবে কানন্দের মতে আর্য বা হিন্দুদের ধর্মমতের বৈশিষ্ট্য হলো আশাবাদ, পাশ্চাত্য ধর্মীয় বিশ্বাস হতে যা তাদের পৃথক করেছে। তাঁর বিষয়বস্তু ছিল—পুনর্জন্ম। বক্তৃতায় অনেকখানি হিন্দু ও খ্রীস্টীয় মতবাদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

পুনর্জন্মের দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি মানব শরীরকে নদীর সঙ্গে তুলনা করেন। প্রত্যেকটি জলবিন্দু প্রবাহিত হয়ে চলে যায় এবং তার স্থান অন্য জলবিন্দু গ্রহণ করে। সমগ্র জলপ্রবাহের অবয়ব, তিনি বলেন, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে যায়, কিন্তু তাকে আমরা একই নদী বলে অভিহিত করি। ঠিক একইভাবে মানবশরীরে প্রতিটি কণিকার স্থান প্রতি মুহূর্তে অন্য কণিকা গ্রহণ করে এবং কোন দু-দিন আমাদের শরীর একই থাকে না, তবুও আমরা আমাদের একত্ব দেখতে পাই। আত্মাই অপরিবর্তিত থাকে—হিন্দুদের এই বিশ্বাস। মৃত্যুর মধ্যে আরো অকস্মাৎ অত্যধিক পরিবর্তন ঘটে। তবুও এ বিশ্বভুবনের অন্যত্র অন্য কোন গ্রহ-তারকার মধ্যে কোথাও যেন তার অস্তিত্ব থেকে যায়, তারপর সে পুনর্বার রক্ত-মাংসের বা অন্য কোন রকমের শরীর গ্রহণ করে।

তিনি বলেন পাপ সম্পর্কে কোন কথা বলা উচিত নয়, অতীতের ভুলভ্রান্তি ভবিষ্যতের নির্দেশিকার মতোই ব্যবহার করা উচিত, তার জন্য শোক করা কখনই উচিত নয়। সেগুলি থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করার তা গ্রহণ করা হয়ে গেলে, সেগুলি ভুলে যাওয়া উচিত।

তিনি বললেন—"অন্ধকারে বসে বসে শুধু খেদ না করে আলো জ্বালাও। সবসময় যা আরো ভাল তা করে সুখী হও।"

তিনি ১৭০৮, নর্থওয়েস্ট স্ট্রীটে মাননীয় এনক টটেন-এর সঙ্গে অবস্থান করছেন এবং অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তাঁর নিকট উপস্থিত হতে দেখা যাচ্ছে। অনেক আগ্রহী শ্রোতাদেরও জড় হতে দেখা যাচ্ছে। শ্রীমতী টটেন যদিও নিষ্ঠাবান প্রেসবিটেরিয়ান, তাঁর মতবাদকে বিশেষ সহায়ক বলে মনে করছেন এবং তাঁর কথা শুনলে অনেক খ্রীস্টান এবং গীর্জা-বহির্ভূত এমন অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিও উপকৃত হবেন বলে মনে করছেন।

পরিশিষ্ট-গ

১৮৯৪ এর ১৭ ডিসেম্বর তারিখে স্বামী বিবেকানন্দ প্রদত্ত বক্তৃতা
(দ্বাদশ অধ্যায়ের ২৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনাদের নিকট আমাদের দেশের নারীগণের সম্বন্ধে বলতে উঠে মনে হচ্ছে আমার মা এবং ভগিনীদের কথা বলছি এমন আর একটি জাতির নারীদের নিকট, যাদের মধ্যে অনেকেই আমার মা ও ভগিনীর স্থান নিয়েছেন। যদিও দুর্ভাগ্যবশত সাম্প্রতিককালে বেশির ভাগ মানুষের মুখেই আমাদের দেশের নারীদের উদ্দেশে অভিশাপ উদ্গীরিত হতে দেখেছি, কিন্তু আমি এও দেখতে পেয়েছি যে, এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা তাদের উদ্দেশে আশীর্বচন উচ্চারণ করে থাকেন। এ-দেশে আমি শ্রীমতী বুল, কুমারী ফার্মার এবং কুমারী উইলার্ডের মতো মহৎপ্রাণাদের দেখেছি এবং বিশ্বের অভিজাত শ্রেণীদের সেই বিস্ময়কর প্রতিনিধি, যার জীবন আমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে ভারতবর্ষের সেই মানুষটির কথা যিনি খ্রীস্ট জন্মের ৬০০ বৎসর পূর্বে জনসাধারণের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য সিংহাসন পরিত্যাগ করেছিলেন। লেডী হেনরী সমারসেট আমার নিকট এক বিস্ময়কর প্রকাশের মতো। যখন এইসকল মহৎপ্রাণ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎলাভ করি তখন আমার সাহস বাড়ে, এঁরা অভিশাপ দেবেন না, এঁদের মুখে আমার জন্য, আমার দেশের জন্য, আমার দেশের মানুষদের জন্য অজস্র আশীর্বচন রয়েছে এবং এঁদের হৃদয় এবং হাত মানব সেবার জন্য সতত প্রস্তুত।

আমি প্রথমে ভারতের অতীত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে চাই। এটা করলে আমরা একটি অনন্য জিনিস দেখতে পাব। আপনারা সকলেই হয়ত জানেন যে, আপনারা আমেরিকানরা এবং আমরা হিন্দুরা এবং আইসল্যাণ্ডের এই মহিলা [জনৈক শ্রীমতী ম্যাগ্নুসন] 'আর্য' নামক একই গোষ্ঠীভুক্ত পূর্ব-পুরুষের সন্তান। সবচেয়ে বড় কথা এই আর্যজাতি যেখানেই গিয়েছে, সেখানেই তিনটি ধারণা দেখতে পাই : গ্রামসমাজ, নারীর অধিকার এবং একটি আনন্দপূর্ণ ধর্ম। প্রথমটি হলো গ্রাম-সমাজ ব্যবস্থা। এইমাত্র আমরা শ্রীমতী বুলের মুখে শুনলাম উত্তরাঞ্চলের মানুষদের প্রসঙ্গে—প্রত্যেক মানুষ স্বাধীন এবং জমির মালিকানা তার নিজস্ব। আজকের পৃথিবীতে আমবা যে-সকল রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহ দেখি সে সবগুলিই

ঐ গ্রামসমাজ থেকেই বিকাশ লাভ করেছে। আর্যরা বিভিন্ন দেশে গিয়ে যেমন যেমন বসতি স্থাপন করেছে, কতকগুলি পরিস্থিতি এক ধরনের সংস্কার বিকাশ ঘটিয়েছে, আবার অন্য পরিস্থিতিতে অন্য ধরনের। আর্যদের অপর ধারণা হলো নারী-স্বাধীনতা সম্পর্কিত। প্রাচীনকালে একমাত্র আর্য সাহিত্যেই দেখা যায় মহিলাগণ পুরুষের সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে সম-অংশ-ভাগিনী, অন্য কোন সাহিত্যে এ জিনিস দেখতে পাওয়া যায় না। বিশ্বের প্রাচীনতম সাহিত্য হলো আমাদের এই বেদ গ্রন্থ, যা আমাদের এবং আপনাদের পূর্বপুরুষ মিলিতভাবে লিখেছেন। (এ গ্রন্থ ভারতে বসে লেখা হয়নি সম্ভবত বাল্টিক হ্রদের তীরে বসে লেখা হয়েছিল বা মধ্য এশিয়ায়—আমরা সঠিক জানি না।) তার দিকে ফিরে তাকালে দেখা যাবে তার মধ্যে প্রাচীনতম রচনাগুলি হলো স্তুতিগাথা—আর্যরা যে দেবতাগণের পূজা করতেন তাঁদের স্তুতিগাথা। 'দেবতাগণ' বলার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন—এর আক্ষরিক অনুবাদ হলো "জ্যোতির্ময় পুরুষ।" এই স্তোত্রগুলি নিবেদিত অগ্নি, সূর্য, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের উদ্দেশ্যে। শিরোনামায় বলা হয়েছে—"অমুক অমুক ঋষি অমুক অমুক দেবতাদের উদ্দেশ্যে এই স্তুতি রচনা করেছেন।" চতুর্থ কি পঞ্চম স্তুতিটির পর আমরা একটি অসামান্য স্তোত্র পাই, কারণ রচয়িতা ঋষি হলেন একজন নারী এবং সেটি এমন এক দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত যিনি এইসকল অন্যদেবতাদের পশ্চাৎপটে আছেন। পূর্ববর্তী স্তোত্রগুলি যেন তৃতীয় পুরুষে দেবতাদের সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, এ স্তোত্রটি এ-পদ্ধতির ব্যতিক্রম ঘটাল। এটি হলো যেন ঈশ্বর নিজেই নিজের কথা বলছেন, যে সর্বনাম (Pronoun) ব্যবহৃত হলো, সেটি হলো "আমি"। "আমি এ জগতের রাষ্ট্রী, সকলের সব প্রার্থনা পূর্ণ করি।"

এই প্রথম আমরা বেদে নারীর রচনার দর্শন পাই। আরো এগিয়ে গিয়ে আমরা দেখি যে, কর্মক্ষেত্রে আরো নানাভাবে নারী অংশ গ্রহণ করছে, এমন কি পুরোহিতের কাজ করছে। সমগ্র বিশাল বেদে এমন একটিও শ্লোক নেই, যার অর্থ পরোক্ষভাবেও এরূপ করা যায়, যার তাৎপর্য হয় যে নারী পৌরোহিত্য করতে পারবে না। অপর দিকে নারী পুরোহিতের কাজ করছে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এরপর বেদের অন্তভাগে উপনীত হলে যা পাওয়া যায় তা হলো ভারতের প্রকৃত ধর্ম, তাতে যে জ্ঞান কেন্দ্রীভূত তা বর্তমান শতাব্দীতেও অতিক্রম করা যায়নি। তার মধ্যেও আমরা নারীর প্রাধান্য প্রত্যক্ষ করি, এর মধ্যে একটি বৃহদংশ

হলো নারীর মুখ হতে উৎসারিত কথা। এর মধ্যেই ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের সেই অনবদ্য কাহিনীটি রয়েছে, যিনি মহান রাজা জনকের রাজ্যে গিয়েছিলেন এবং যেখানে জ্ঞানী ব্যক্তিদের এক সমাবেশে তাঁকে সকলে প্রশ্ন করতে এগিয়ে এলেন। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন—"আমি এই যজ্ঞানুষ্ঠান কিভাবে করব?" তিনি উত্তর দেবার পর একজন নারী উঠে বললেন—"এসব হলো বালসুলভ প্রশ্ন। এবার আপনি তৎপর হোন, আমি এই দুটি তীর হাতে নিলাম, আমার দুটি প্রশ্নের স্বরূপ। যদি পারেন তো তার উত্তর দিন, তাহলে আমরা আপনাকে 'ঋষি' বলে মেনে নেব"। প্রথম প্রশ্ন হলো—"আত্মা কি?" দ্বিতীয়—"ঈশ্বর কি?" এইরূপে ভারতে আত্মা এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে যে বিরাট প্রশ্ন তা বেরিয়ে এল একজন নারীর মুখ থেকে। ঋষিকে একজন নারীর নিকট পরীক্ষা দিতে হলো এবং তিনি তাতে উত্তীর্ণ হলেন।

এর পরবর্তী স্তরের সাহিত্যে, আমাদের মহাকাব্যসমূহে আমরা দেখি তখনো শিক্ষার অবক্ষয় হয়নি, বিশেষ করে রাজন্য গোষ্ঠীর মধ্যে এই আদর্শ আশ্চর্যরূপে ধরে রাখা হয়েছিল। বেদে আমরা বিবাহের যে আদর্শ পাই তা হলো : বালিকারা নিজেরাই তাদের জীবন সঙ্গীকে বেছে নিচ্ছে, বালকেরাও তাই করছে। এর পরবর্তী স্তরে তাদের পিতামাতা তাদের জন্য পাত্র পাত্রী নির্বাচন করছেন, অবশ্য একটি জাতির মধ্যে ছাড়া এ-প্রথা অন্যদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছিল। এ-ক্ষেত্রেও আমি আপনাদের এর অপর দিকটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বলব। হিন্দুদের সম্বন্ধে যাই বলা হোক না কেন, তারা হলো বিশ্বে যে-সমস্ত জাতি জ্ঞানসম্পদ সৃষ্টি করেছে তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। হিন্দু হলো দার্শনিক, যে সবকিছুকে বুদ্ধি দিয়ে দেখে। সব কিছু জ্যোতিষগণনার দ্বারা স্থির করা হতো। এর পশ্চাতের ধারণাটি হলো গ্রহনক্ষত্র প্রত্যেক নর-নারীর ভাগ্য নির্ধারণ করে। আজও পর্যন্ত একটি শিশু জন্মগ্রহণ করলে কুষ্ঠি তৈরি করা হয়। শিশুর চরিত্র তার দ্বারা নির্ণয় করা হয়। দেখা যায় যে, কোন শিশু দেব-প্রকৃতির, কেউ মানব-প্রকৃতির, কেউ বা আরও নিম্নস্তরের প্রকৃতির। প্রশ্ন হলো একটি রাক্ষস চরিত্র শিশুকে দেব চরিত্র একটি শিশুর সঙ্গে যদি মিলিত করা হয়, তাতে একে অপরের অধঃপতন ঘটাবে কিনা? পরবর্তী প্রশ্ন ছিল আমাদের আইনে একই গোষ্ঠীর মধ্যেও বিবাহ অনুমতি দেওয়া হতো না। নিজেদের পরিবারের মধ্যে এমন কি আত্মীয়বর্গের মধ্যে বিবাহ তো

সম্ভবই ছিল না। পিতা বা মাতার গোষ্ঠীর মধ্যেও কেউ বিবাহ করতে পারত না। তৃতীয় অসুবিধা ছিল যদি কুষ্ঠ বা যক্ষারোগ বা এইরূপ কোন দুরারোগ্য ব্যাধি পাত্রপাত্রীর ছয় পুরুষের মধ্যে কারুর থেকে থাকে তাহলেও বিবাহ নিষিদ্ধ। এই তিনটি বাধা ছাড়া ব্রাহ্মণের কথা হলো—"যদি বিবাহের জন্য বালক বালিকাকে স্বাধীনভাবে নির্বাচন করতে দেওয়া হয়, তাহলে তারা কারুর সুন্দর মুখ দেখে আকৃষ্ট হয়ে বিবাহ করে পরিবারে বিপর্যয় টেনে আনতে পারে।" আমাদের বিবাহ-সংক্রান্ত নিয়মকানুন যা আপনারা দেখতে পান তার মূলভাবনা হলো এই এবং তা ঠিক হোক বা ভুল হোক এর পশ্চাতে অবস্থিত মূল দর্শনচিন্তা হলো এই যে রোগে আক্রান্ত হবার পরে নিরাময় করার চেষ্টার থেকে রোগের আক্রমণ না হয় সেটা দেখাই সঙ্গত। জগতে দুঃখ-দুর্দশা থাকার কারণ আমরাই দুঃখ-দুর্দশার জন্ম দিই। পুরো প্রশ্নটা হলো দুর্দশাগ্রস্ত শিশুদের জন্মানোতেই বাধা দেওয়া। অবশ্য ব্যক্তির উপর সমাজের নিয়ন্ত্রণ কতদূর পর্যন্ত হওয়া উচিত, সেটি অবশ্য একটি অমীমাংসিত প্রশ্ন। হিন্দুরা বলে বিবাহ পাত্র-পাত্রীর হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। আমি এ-কথা বলতে চাই না যে, এটিই হলো সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যবস্থা, আবার এও বলতে চাই না যে, পাত্রপাত্রীর হাতে ছেড়ে দেওয়াই সর্বোত্তম সমাধান। আমার মনে এ পর্যন্ত এর কোন সমাধান খুঁজে পাইনি এবং অন্য কোন দেশও পেয়েছে বলে জানি না।

এরপর আমরা আর একটি চিত্রে আসছি। আমি বলেছি আর একটি অনন্য বিবাহ প্রথা ছিল (সাধারণত রাজন্যবর্গের মধ্যেই এ প্রথা দেখা যেত), যে প্রথানুসারে বালিকাটির পিতা বিভিন্ন রাজা এবং সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের আমন্ত্রণ জানাতেন এবং তাদের নিয়ে একটি সভানুষ্ঠান হতো। তরুণীটি একটি দোলায় বাহিত হয়ে প্রতিটি রাজার সম্মুখে যেতেন এবং ঘোষক ঘোষণা করতেন "ইনি অমুক রাজা, এই এই এঁর গুণাবলী।" তরুণীটি হয় থেমে যেতেন কিম্বা আজ্ঞা দিতেন—"এগিয়ে চল।" পরবর্তী রাজার সম্মুখে ঘোষক একই ভাবে ঘোষণা করতেন এবং তরুণীটি বলতে পারতেন "এগিয়ে চল"। (এ সকলই পূর্ব-নির্ধারিত, বালিকাটির হয়ত আগে থেকেই কাউকে পছন্দ হয়ে আছে।) অবশেষে কন্যাটি একজন পরিচারককে নির্বাচিত ব্যক্তিটির গলায় মালাটি ছুঁড়ে দিতে বলেন এবং তার দ্বারা দেখানো হয় যে, এই ব্যক্তিই নির্বাচিত হলেন। (এ ধরনের শেষ বিবাহটিই ভারতে মুসলমান বিজয়ের কারণ হয়ে আছে।) রাজন্যশ্রেণীর মধ্যেই বিশেষ করে এই ধরণের বিবাহ পদ্ধতি সীমাবদ্ধ ছিল।

প্রাচীনতম সংস্কৃত ভাষায় লিখিত কাব্য যা আজও বর্তমান আছে, সেই রামায়ণের সীতা চরিত্রের মধ্যে হিন্দুধর্মে নারীর আদর্শ সম্বন্ধে সর্বোচ্চ ধারণা বিধৃত হয়ে আছে।

আমাদের সময় নেই যে, তাঁর অনন্ত ধৈর্য এবং সতীত্বের কাহিনী বিশদভাবে বিবৃত করব। আমরা তাঁকে ঈশ্বরের অবতার বলে পূজা করি এবং তাঁর স্বামী রামচন্দ্রের আগে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়। আমরা শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী বলি না আমরা শ্রীমতী ও শ্রীযুক্ত বলি, দেবদেবীদের সবার ক্ষেত্রেই তাই করি। দেবীদের নাম আগে উচ্চারণ করি। হিন্দুদের আরো একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধারণা আছে। যাঁরা আমার কাছে এখানে আরো আলোচনা শুনেছেন তারা জানেন যে, হিন্দু-দর্শনের মূল ধারণা নৈর্ব্যক্তিক। বিশ্বের পটভূমিকা এই নৈর্ব্যক্তিক বস্তু। এই যে নৈর্ব্যক্তিক অস্তিত্ব, যাঁর বিষয়ে আমরা কিছুই বলতে পারি না, তাঁর সমস্ত শক্তিকে স্ত্রী-সূচক শব্দের দ্বারা সূচিত করা হয়। ভারতে প্রকৃত ব্যক্তি-ঈশ্বর হলেন স্ত্রী। ব্রহ্মের এই শক্তি সমস্ত সময়েই স্ত্রীলিঙ্গ হিসাবে কথিত। রাম যেন নৈর্ব্যক্তিক পরম ব্রহ্ম। সীতা তাঁর শক্তি। সীতার সমস্ত জীবন ভাল করে যে দেখব সে সময় আমাদের হাতে নেই। কিন্তু তাঁর জীবন থেকে একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করব যা এ-দেশীয় নারীদের বিশেষভাবে ভাল লাগবে। দৃশ্যটির উন্মোচন সেইখানে যেখানে তিনি নির্বাসিত স্বামীর সঙ্গে বনবাস করছেন। একজন নারী-ঋষিকে তাঁরা উভয়ে দর্শন করতে গিয়েছিলেন। উপবাস এবং সাধনায় তাঁর শরীর শীর্ণ হয়েছে। সীতা তাঁর সামনে গিয়ে প্রণত হলেন। নারী-ঋষি সীতার মাথায় হাত রেখে বললেন—"সুন্দর শরীর পাওয়া ঈশ্বরের মস্ত বড় আশীর্বাদ, তোমার তা আছে। একজন মহৎ স্বামী লাভ করা আরো বড় আশীর্বাদ। তোমার তাও লাভ হয়েছে। এরূপ স্বামীর আজ্ঞাবহ হওয়া সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ। তুমি নিশ্চয়ই সুখী।" সীতা উত্তর দিলেন—"মা, আমি আনন্দিত যে ঈশ্বর আমাকে সুন্দর শরীর দিয়েছেন এবং একজন অনুরক্ত স্বামী পেয়েছি। কিন্তু আমি আপনার তৃতীয় আশীর্বাদ সম্পর্কে সঠিক জানি না যে আমি তাঁর আজ্ঞাবহ না তিনি আমার আজ্ঞাবহ। কেবল একটা কথাই আমি স্মরণ করি তিনি যখন আমাকে হাত ধরে যজ্ঞস্থলে নিয়ে গেলেন, অগ্নির প্রতিফলনেই হোক কিম্বা ঈশ্বর স্বয়ং আমাকে দেখালেন যে আমি তাঁর এবং তিনি আমার এবং তদবধি দেখছি আমি তাঁর পরিপূরক আর তিনিও আমার।"

কাব্যের কিয়দংশ ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সীতা ভারতের নারীর আদর্শ এবং ঈশ্বরের অবতাররূপে পূজিত।

এবার প্রখ্যাত আইন প্রণেতা মনুতে আসছি। মনুর এই গ্রন্থে একটি শিশু কিভাবে শিক্ষালাভ করবে সে বিষয়টি বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের স্মরণ করতে হবে যে আর্যদের মধ্যে যে-কোন বর্ণেরই হোক না কেন শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে এ বিধান অবশ্য পালনীয় ছিল। কিভাবে একটি শিশু শিক্ষা করবে এ বিষয়টি বর্ণনা করবার পর মনু আরো বলছেন—"পুত্রদের মতোই কন্যাকে একই ভাবে শিক্ষিত করতে হবে।" আমি এ-কথা প্রায়ই শুনি মনুতে আরোও কিছু শ্লোক আছে যাতে স্ত্রীগণের নিন্দা আছে। আমি স্বীকার করছি আমাদের পবিত্র গ্রন্থসমূহে নারীগণকে পুরুষ প্রলোভিত করার জন্য নিন্দা করা হয়েছে—আপনারা নিজেরাই তা বুঝতে পারবেন। কিন্তু আবার কিছু শ্লোক আছে যাতে বলা হয়েছে যে, যে-গৃহে নারীর একবিন্দু অশ্রুজল পড়ে, সে-গৃহের প্রতি দেবতারা প্রসন্ন হন না এবং সে-গৃহ ও সে-পরিবার ধ্বংস হয়। মদ্যপান করা, নারী হত্যা এবং ব্রহ্ম হত্যা হলো হিন্দুধর্মে সর্বাপেক্ষা নিন্দনীয় অপরাধ। আমি স্বীকার করছি অনেক নিন্দাসূচক বাক্য আছে, কিন্তু এসব ক্ষেত্রে আমি হিন্দু গ্রন্থগুলির শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করব, কারণ অন্য জাতিসমূহের গ্রন্থাদিতে কেবলমাত্র নারীর নিন্দাই আছে, প্রশংসাসূচক একটি শব্দও নেই।

এরপর আমি আসব আমাদের প্রাচীন নাটকসমূহে। শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে যাই বলা হয়ে থাকুক না কেন, নাটকগুলি কিন্তু পুরোপুরি তদানীন্তন সমাজের প্রতিচ্ছবি। এগুলি খ্রীস্ট জন্মের ৪০০ বৎসর পূর্ব থেকে লেখা শুরু হয়। এতে আমরা দেখি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নারী ও পুরুষে পূর্ণ। পরবর্তী কালে নারী যা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, তা আমরা সেখানে দেখি না। তারা এদেশে যেমন দেখা যায়, উদ্যানসমূহে এবং আমোদ-প্রমোদের স্থানসমূহে পায়ে হেঁটে বা গাড়িতে যেত। আর একটি বিষয় আমি আপনাদের সামনে উল্লেখ করব এবং সে-বিষয়ে হিন্দু নারী অন্য সকল দেশের নারী অপেক্ষা এগিয়ে—সে হলো তার অধিকার-সম্বন্ধীয়। সম্পত্তিতে পুরুষের যেমন, ঠিক তেমনই তার পূর্ণ অধিকার। এ ব্যবস্থাটি সহস্র সহস্র বৎসর ধরে বজায় রয়েছে। যদি আপনাদের কোন আইনজ্ঞ বন্ধু থেকে থাকে এবং তার কাছে হিন্দু আইনের ব্যাখ্যা যদি পেয়ে যান, তাহলে এ আপনি নিজেই দেখতে পাবেন। প্রাচীন

এমন কি নতুন গ্রন্থাদিতেও দেখা যাবে একাধিক বালিকার স্বামীগৃহে আসবার সময় ১০ লক্ষ ডলার নিয়েও আসতে পারে, কিন্তু তার প্রতিটিতে তার নিজের অধিকার। অন্য কারো তার মধ্যে একটি ডলারও স্পর্শ করবার অধিকার নেই। যদি কোন সন্তানহীনা নারীর পতিবিয়োগ ঘটে, তাহলে স্বামীর সম্পত্তিতেও তার অধিকার বর্তায়, স্বামীর পিতামাতা জীবিত থাকলেও। সেই আইন অতীত থেকে বর্তমানকাল অবধি চলে এসেছে। এ-ব্যাপারে ভারতীয় নারী অন্য দেশের নারীদের অতিক্রম করেছে। প্রাচীন—এমন কি নবীন গ্রন্থাদিও হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের অধিকার স্বীকার করেনি—এ কথা ভাবা ভুল। তারা এ ব্যাপারে নারীকে সে কি কববে তা বেছে নেবার অধিকার দিয়েছে এবং এ-অধিকার নারী এবং পুরুষ উভয়কেই সমভাবে দেওয়া হয়েছে। আমাদের ধর্মে বিবাহ হলো দুর্বলচিত্তদের জন্য এবং এ-ধারণা বর্তমানে পরিত্যাগ করবার পক্ষে আমি কোন যুক্তি দেখি না। যারা নিজেদের এককভাবেই পূর্ণ মনে করে, তাদের বিবাহের প্রয়োজন কি? এবং যারা বিবাহ করে তাদের একটা সুযোগ দেওয়া হয়। সে সুযোগ চলে গেলে নারী বা পুরুষ যদি পুনর্বিবাহ করে তাহলে তাদের একটু হেয় দৃষ্টিতে দেখা হয়। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে তাদের বাধা দেওয়া হয়। এ-কথা কোথাও বলা হয়নি যে কোন বিধবা বিবাহ করতে পারবে না। যে বিধবা বা বিপত্নীক ব্যক্তি পুনর্বিবাহ করে না, তাদের অধিকতর আধ্যাত্মিক বলে মনে করা হয়। পুরুষেরা অবশ্য এ বিধি লঙ্ঘন করে পুনর্বাব বিবাহ করে থাকে এবং নারী অধিক আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন হওয়াব দরুন বিধি মেনে চলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ যেমন আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থগুলি বলে মাংস খাওয়া খারাপ এবং পাপকাজ, কিন্তু তৎসত্ত্বেও অনেকে মাংস খেতে পারেন। যেমন ধরুন মেষ মাংস। আমি হাজার হাজার পুরুষকে মেষ মাংস খেতে দেখেছি। কিন্তু উচ্চবর্ণের একজন নারীকেও আমার জীবনে আমি কোনপ্রকার মাংস খেতে দেখিনি। বোঝা যাচ্ছে যে তাদের প্রকৃতিই হলো বিধিনিয়ম মেনে চলা। তাদের ধর্মের দিকে প্রবণতা বেশি। সুতরাং হিন্দু পুরুষদের বেশি কঠোর বিচার করবেন না। আপনারা এটাকে আমার অবস্থান থেকে দেখুন, আমি একজন হিন্দু পুরুষ। বিধবাদের বিবাহ না করাটা পরে একটি প্রথায় দাঁড়িয়ে গেল এবং যখনই ভারতে কোন বিধান কঠোর হয়ে যায়, তখন তা ভঙ্গ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক যেমন আপনাদের দেশে, পাঁচদিনের প্রথা প্রচলিত। তা ভঙ্গ করা

খুব শক্ত। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে, দুটি শ্রেণী বাদে বিধবারা পুনর্বিবাহ করে। আমাদের শেষের দিকের আইনের গ্রন্থে লেখা আছে যে কোন নারী বেদপাঠ করবে না। একজন দুর্বল ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রেও সে বিধিনিষেধ আছে। যদি কোন ব্রাহ্মণ বালক দৃঢ়চিত্ত না হয় তাহলে সেও এই বিধিনিষেধের আওতায় পড়বে। কিন্তু তার দ্বারা এ বোঝায় না যে, তাদের শিক্ষা গ্রহণ নিষিদ্ধ। কারণ হিন্দুদের কেবলমাত্র যে বেদই আছে তা নয়। অন্য সমস্ত গ্রন্থ নারী পাঠ করতে পারে। সমুদয় সংস্কৃত সাহিত্য মহাসাগরের মতো বিশাল—বিজ্ঞান, নাটক, কাব্য সবই তাদের জন্য; কেবল শাস্ত্র ছাড়া তারা আর সবই পাঠ করতে পারে। পরবর্তী কালে এ ধারণা জন্মাল যে নারীগণের পুরোহিত হবার কথা নয়, সুতরাং তাদের বেদপাঠ করে কি হবে? এ ব্যাপারে হিন্দুরা যে অন্য জাতিদের চেয়ে অনেকদূর পিছিয়ে তা নয়। মেয়েরা যখন সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন তাদের নারী বা পুরুষ রূপে দেখা হয় না। সন্ন্যাসী ব্রতধারী লিঙ্গভেদের ঊর্ধ্বে এবং উচ্চ বা নীচ জাতি, স্ত্রী বা পুরুষ এসব প্রশ্ন তখন অবান্তর। ধর্ম সম্বন্ধে আমি যা জানি, তা আমি আমার গুরুর নিকট শিক্ষা করেছিলাম এবং তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন একজন নারীর কাছে।

রাজপুত নারীদের ক্ষেত্রে এসে আমি আপনাদের সামনে মুসলমান বিজয়ের সমসাময়িক কালের একটি কাহিনী উপস্থাপিত করব—কি করে একজন নারীই ভারতে মুসলমান বিজয়ের কারণ হয়েছিলেন। সুপ্রাচীন দিল্লী নগরীর এক রাজপুত রাজার একটি কন্যা ছিল। তিনি পৃথ্বীরাজের [চিতোরের রাজা] যুদ্ধে পরাক্রমের গৌববেব কথা শুনে তাঁব প্রতি অনুরক্ত হন। তাঁর বাবা রাজসূয় যজ্ঞ নামে একটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে চাইলেন এবং তাতে যোগদানের জন্য সারা দেশের রাজন্যবর্গকে আমন্ত্রণ জানালেন এবং সেই যজ্ঞে সেই সব রাজন্যবর্গকে কায়িক সেবা দিতে হয়েছিল। যেহেতু তিনি নিজে হলেন সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সেই সভায় তিনি ঘোষণা করলেন যে তাঁর কন্যা স্বয়ম্বরা হবেন। কিন্তু তার কন্যা ইতিঃপূর্বেই পৃথ্বীরাজের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন। পৃথ্বীরাজ অত্যন্ত শক্তিশালী রাজা ছিলেন এবং তিনি তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে সম্মত ছিলেন না। সেজন্য তিনি আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তখন ঐ রাজা পৃথ্বীরাজের একটি স্বর্ণপ্রতিমা নির্মাণ করলেন এবং সেটিকে দ্বারদেশে স্থাপন করে ঘোষণা করলেন যে তাঁকে তিনি মালবাহীর কাজ করবার কাজ দিয়েছেন। এর

মোট পরিণাম যা দাঁড়াল তা হলো পৃথ্বীরাজ একজন প্রকৃত বীরপুরুষের মতো এসে কন্যাটিকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলে নিয়ে পলায়ন করলেন। কন্যার পিতার নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছল তিনি তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন এবং তুমুল যুদ্ধ হলো এবং উভয়পক্ষে বিপুল সংখ্যক সৈন্য হতাহত হলো। এইরূপে রাজপুতগণ এমন দুর্বল হয়ে গেল যে ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়ে গেল।

যখন এদেশে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল, সেই সময়কার চিতোরের রাণী পরমা সুন্দরী ছিলেন এবং তাঁর সৌন্দর্যের সংবাদ সুলতানের কানে পৌঁছে গেল এবং তিনি একটি চিঠি দিয়ে আদেশ জানালেন রাণীকে যেন তাঁর জেনানামহলে পাঠানো হয়। পরিণাম হলো রাজার সঙ্গে সুলতানের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। মুসলমানগণ চিতোর অবরোধ করল এবং রাজপুতগণ যখন দেখলেন যে তাঁরা আর নিজেদের রক্ষা করতে পারবেন না, পুরুষেরা সকলে তরবারী হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসে শত্রু বধ করে নিহত হলেন। যখন সমস্ত পুরুষ ধ্বংস হলো এবং বিজয়ী সুলতান শহরে প্রবেশ করল, তখন রাজপথে একটি প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড শিখা বিস্তার করছিল। তিনি দেখতে পেলেন নারীগণ চক্রকারে অগ্নি প্রদক্ষিণ করছেন। নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্বয়ং রাণী। যখন তিনি নিকটে এসে রাণীকে অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে নিষেধ করলেন, রাণী বললেন—"এই যে এইভাবে রাজপুত নারী তোমাদের সঙ্গে ব্যবহার করে" এবং নিজেকে অগ্নিতে সমর্পণ করলেন। বলা হয় যে ৭৪,৫০০ নারী (৭৫,০০০ নয়) এইভাবে অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়ে মুসলমানদের হাত থেকে নিজেদের সম্মান রক্ষা করেন। এখনো পর্যন্ত আমরা যখন চিঠি লিখি, চিঠি খামে বন্ধ করে তার উপর ৭৪½ কথাটি লিখে দিই। এর অর্থ হলো এই চিঠি অন্য যে খুলবে তাকে ৭৪,৫০০ নারী হত্যা করার পাপ স্পর্শ করবে।

আমি আপনাদের আরো একটি সুন্দরী রাজপুত কন্যার কাহিনী বলব। আমাদের দেশে একটি অতুলনীয় প্রথা আছে যাকে 'রক্ষা' (রাখি) বলে অভিহিত করা হয়। নারীগণ রেশমি সূতো দিয়ে বলয় তৈরি করে পুরুষদের নিকট পাঠাতেন। কোন নারী যদি কোন পুরুষকে এটি পাঠায় তাহলে সেই পুরুষ তার ভাই হবেন। শেষ মোগল সম্রাটের রাজত্বকালে যে নিষ্ঠুর মানুষটি ভারতে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় সাম্রাজ্য ধ্বংস করে ফেলল,

তিনিও একজন রাজপুত সর্দারের কন্যার সৌন্দর্যের কথা জানতে পারলেন। নির্দেশ দেওয়া হয়ে গিয়েছিল যে, তাকে মোগল সম্রাটের জেনানামহলে প্রেরণ করতে হবে। তখন সম্রাটের এক দূত মেয়েটির কাছে এলো সম্রাটের চিত্র তাকে দেখাবার জন্য, কন্যাটি বিদ্রূপ করে সম্রাটের চিত্রটি পদদলিত করে বললেন—"রাজপুত কন্যা এভাবেই মোগল সম্রাটের সঙ্গে আচরণ করে।" পরিণামে সম্রাটের সৈন্য রাজপুতানায় অভিযান করে এল। হতাশ হয়ে সর্দারের কন্যা একটি কৌশলের কথা ভাবলেন। তিনি কিছু রাখি নিয়ে রাজপুত রাজন্যদের পাঠালেন এই সংবাদ দিয়ে—"আমাদের সাহায্য করুন", এবং সমস্ত রাজপুত একত্রিত হলো। ফলে সম্রাটের সৈন্যবর্গকে ফিরে যেতে হলো।

রাজপুতানায় একটি অদ্ভুত প্রবাদ আছে। ভারতে একটি জাতি আছে যাদের দোকানদার বা বণিক শ্রেণী বলে অভিহিত করা হয়। তারা খুব বুদ্ধিমান। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যাদের হিন্দুরা মনে করে অত্যন্ত শাণিত-বুদ্ধিসম্পন্ন। কিন্তু এদের একটা বৈশিষ্ট্য যে এ জাতির নারীগণ তত বুদ্ধিমতী নন। অন্যদিকে রাজপুত পুরুষদের রাজপুত নারীদের তুলনায় অর্ধেক বুদ্ধিও নেই। সেজন্য রাজপুতানার একটি প্রচলিত প্রবাদ হলো—"বুদ্ধিমতী নারী একটি নির্বোধ পুত্রের জন্ম দেয়, আর একটি নির্বোধ নারী শাণিত-বুদ্ধি পুত্রের জন্ম দেয়।" এটা বাস্তব সত্য যে রাজপুতানায় যখন কোন নারী রাজ্য পরিচালনা করেছে, তা আশ্চর্যরকম ভালভাবে পরিচালিত হয়েছে।

আমরা অপর এক শ্রেণী নারীর কথায় আসছি। এই নিরীহ হিন্দুজাতি মাঝে মাঝে কিন্তু যোদ্ধা নারীর জন্ম দিয়েছে। আপনাদের মধ্যে হয়ত কেউ কেউ সেই নারীর কথা শুনেছেন, যিনি ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছেন! আগ্নেয়াস্ত্র সামলেছেন এবং সর্বদা আক্রমণের পুরোভাগে নিজে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই রাজ্ঞীটি ব্রাহ্মণ ছিলেন। আমি এক ব্যক্তিকে জানি যিনি তাঁব তিনটি পুত্রকে এই যুদ্ধে হারিয়েছেন। তিনি যখন তাদের কথা বলেন, শান্তভাবে বলেন, কিন্তু তিনি যখন এই মহিলার কথা বলেন তখন তাঁর কণ্ঠস্বর উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, ইনি একজন দেবী ছিলেন, মানুষ নন। এই প্রধান সৈনিকটি মনে করতেন যে ঐ মহিলার চেয়ে উত্তম সেনাপতিত্ব আর কাউকে করতে দেখেননি। ভারতে আরো কিছু পূর্ববর্তী কালের

চাঁদ সুলতানার কথা সুবিদিত। তিনি ছিলেন গোলকোণ্ডার রাণী। গোলকোণ্ডায় হীরক খনি ছিল। তিনি মাসের পর মাস আত্মরক্ষা করেছেন। অবশেষে দুর্গপ্রাকারের এক জায়গায় ফাটল ধরল। যখন সম্রাটের সৈন্য সেখানে দ্রুত পৌঁছাতে চেষ্টা করছে, তিনি পূর্ণভাবে বর্ম ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বাধা দিয়েছেন এবং তিনি বাধ্য করেছেন সম্রাটের সৈন্যদলকে ফিরে যেতে। এর চেয়ে আরো পরবর্তী সময়ে আপনারা শুনে আশ্চর্য হবেন একজন মস্তবড় ইংরাজ সেনাধ্যক্ষকে ষোড়শবর্ষীয়া একটি বালিকার মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

রাজনীতিজ্ঞের ভূমিকায় রাজ্যভুক্ত অঞ্চলগুলি নিয়ন্ত্রণকার্যে, দেশ-শাসনে, এমন কি যুদ্ধকর্মেও তারা পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ না হয়ে থাকলেও অন্ততপক্ষে যে সমান এ তারা প্রমাণ করেছে। ভারতের ক্ষেত্রে এ-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। যখনই তারা সুযোগ পেয়েছে, তারা প্রমাণ করেছে যে তাদের পুরুষের সমান সামর্থ্য আছে এবং তাদের আরো এই সুবিধা আছে যে তারা কদাচিৎ অসৎ হয়। তাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত নারীজাতিসুলভ যে নৈতিকতাব মানদণ্ড বর্তমান, তাকে তারা অক্ষুণ্ণ রাখে। ফলে অন্ততপক্ষে ভারতের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল বা রাজ্যশাসক হিসাবে তারা পুরুষের তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠ। জন স্টুয়ার্ট মিল একথা উল্লেখ করেছেন এবং আজও পর্যন্ত ভারতের নারী বড় বড় জমিদারী দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করছেন। আমি যেখানে জন্মেছি সেখানে দুজন মহিলা ছিলেন যারা বিরাট বিরাট জমিদারীর মালিক হন এবং শিক্ষা ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হন। তারা নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে জমিদারী পরিচালনা করতেন এবং কাজের প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপার নিজেরা দেখাশোনা করতেন।

মানবসমাজের যে-সকল সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে তাছাড়াও প্রতিটি জাতির নিজস্ব চারিত্রিক কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে ধর্মের ক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে। ঠিক যেমন প্রতিটি মানুষের শরীরে, মানসিক অভ্যাসে, নারী ও পুরুষ ভেদে এরূপ নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। একটি জাতি কোন একটি বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়, অপর জাতি অপর কোন বৈশিষ্ট্যের। বিগত কয়েক বছরে বিশ্ব এ-ব্যাপারটিকে স্বীকার করতে শুরু করেছে। হিন্দু নারীর বৈশিষ্ট্য হলো মাতৃত্ব। তারা বিশেষভাবে এ-ভাবটির বিকাশসাধন করেছে এবং তাদের জীবন সম্বন্ধে ধারণাই হলো এটা। আপনি যদি কোন হিন্দুগৃহে যান তাহলে যা আপনি এখানে দেখতে পান স্ত্রী ও

স্বামীকে সমান সাথীরূপে, সেখানে সেরূপ দেখতে পাবেন না। কিন্তু আপনি যখন মাকে দেখবেন, তখন হিন্দুগৃহের ভিত্তিস্তম্ভটিকে দেখতে পাবেন। স্ত্রীকে 'মা' হয়ে ওঠবার জন্য অপেক্ষা করতে হয়, তারপর সে-ই সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে। যদি কেউ সন্ন্যাসী হয় তবে তার পিতা তাকে প্রথম প্রণাম করবেন, কারণ সে সন্ন্যাসী হয়ে পিতার চেয়ে ঊর্ধ্বে আরোহণ করেছে, কিন্তু মাকে সন্ন্যাসী হোক বা না হোক ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে হবে, তার চরণামৃত খেতে হবে; একজন হিন্দু সন্তান আনন্দের সঙ্গে তা হাজার বার করবে। বেদ নৈতিক শিক্ষা দিতে গিয়ে বলে—"মাতৃ দেবো ভব" এবং সত্যিই মা তাই। নারীর মূল্য মানবজাতির জননী হিসাবে। এ ধারণাটি হিন্দুদের। আমি আমার বয়সে প্রবীণ গুরুকে ছোট ছোট বালিকাদের উচ্চাসনে বসিয়ে সত্যিই পূজা করতে দেখেছি। তাদের পায়ে ফুল দিয়ে প্রণাম করেছেন তিনি। কারণ তারা হলো জগন্মাতার প্রতীক। আমাদের পারিবারিক দেবতা হলেন মা। এর পশ্চাতে অবস্থিত চিন্তাটি হলো জগতে সত্যিকারের ভালবাসা, যা স্বার্থলেশহীন, তা মায়েরই আছে। মা সকল সময় দুঃখ বরণ করছেন, ভালবাসছেন এবং মায়ের মধ্যে যে ভালবাসা আছে তা ছাড়া আর কোন ভালবাসা ঈশ্বরের ভালবাসার প্রতীক হতে পারে? "মা হচ্ছেন হিন্দুর কাছে ঈশ্বরপ্রতিম।" সেই সন্তানই ঈশ্বরকে বুঝতে পারে যে তার প্রথম শিক্ষা মায়ের কাছে লাভ করেছে। আমি আমাদের নারীদের নিরক্ষরতা সম্বন্ধে অনেক হঠকারী কাহিনী শুনেছি। আমি আমার দশবৎসর বয়স পর্যন্ত মার কাছেই লেখাপড়া শিখেছি। আমি আমার পিতামহীকে জীবিত দেখেছি। আমার প্রপিতামহীকেও জীবিত দেখেছি। আমি আপনাদের নিশ্চিত করে বলতে পারি যে তাঁদের কাউকে আঙ্গুলের ছাপ দিতে হয়নি। যদি এরা কেউ নিরক্ষর হতেন, তাহলে আমার জন্ম সম্ভব হতো না। যে বর্ণে আমার জন্ম সেই বর্ণ-নিয়মে এটি বাধ্যতামূলক। সুতরাং এই যেসব কাহিনী শোনা যায় যে মধ্যযুগে ভারতে লেখা বা পড়ার অধিকার হিন্দু নারীদের কাছে থেকে কেড়ে নেওয়া হয়, সেগুলি বানানো কাহিনী। আমি আপনাদের স্যার উইলিয়াম হাণ্টার প্রণীত "ইংরেজ-জাতির ইতিহাস" গ্রন্থের কথা বলতে পারি, তাতে তিনি সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে হিন্দু মহিলাদের গণনা করবার কথা উল্লেখ করেছেন। আমাকে বলা হয়েছে মাকে বেশি বেশি পূজা করলে মাকে স্বার্থপর করে তোলা হয়। আবার মা যদি সন্তানদের বেশি ভালবাসেন, তাহলে তারা স্বার্থপর

হয়। কিন্তু আমি এতে বিশ্বাস করি না। আমার মা আমাকে যে ভালবাসা দিয়েছেন তারই ফলে আমি আজ যা, তা হতে পেরেছি এবং তাঁর কাছে আমার যে ঋণ তা অপরিশোধ্য।

হিন্দু মাকে কেন পূজা করা হয়? আমাদের দার্শনিকরা এর একটা কারণ দর্শাবার চেষ্টা করেছেন। আমরা আমাদের আর্যজাতি বলি, আর্য বলতে কাদের বোঝায়? আর্য হলো এমন একটি মানুষ যে জন্মেছে ধর্মাচরণের মধ্য দিয়ে। এদেশে এটি একটি অদ্ভুত কথা বলে মনে হবে। কিন্তু এর পশ্চাতের ভাবনাটা হলো যে, একটি মানুষের ধর্মের মধ্য দিয়ে, প্রার্থনার মধ্য দিয়ে জন্ম হওয়া উচিত। তোমরা যদি আমাদের শাস্ত্রীয় বিধিনিয়মের গ্রন্থগুলি দেখ তাহলে দেখবে যে অধ্যায়ের পর অধ্যায় লেখা হয়েছে ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বে শিশুর উপর মায়ের প্রভাব-প্রসঙ্গে। আমি জানি যে আমি ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বে আমার মা উপবাস করেছেন, প্রার্থনা করেছেন এবং এরূপ শত শত কৃচ্ছ্রতা ও কঠিন কাজের অনুষ্ঠান করেছেন, যা আমি পাঁচ মিনিটের জন্যও করতে পারব না। তিনি দু বছর ধরে তা করেছেন। আমার বিশ্বাস, যেটুকু ধর্মীয় সংস্কার আমি পেয়েছি, তার জন্য আমি আমার মায়ের কাছে ঋণী। মা সচেতনভাবে আমি যা হব তা হবার জন্য আমাকে পৃথিবীতে এনেছেন। আধ্যাত্মিকতার পরিবেশের মধ্যে যে-শিশু জন্মলাভ করে সেই 'আর্য'। এইসকল কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য এবং তার সন্তান যাতে শুদ্ধ ও পবিত্র চরিত্র নিয়ে জন্ম নেয় সেজন্য তাঁকে নিজেকে এত শুদ্ধ ও পবিত্র করে তুলতে হয়। হিন্দু সন্তানের উপর তাঁর দাবি অনন্য সেজন্যই। আর সব কিছুই অন্যান্য দেশের মতো। মা এত স্বার্থশূন্য, কিন্তু আমাদের পরিবারসমূহে তাঁকে খুব কষ্ট সহ্য করতে হয়। মা সকলের শেষে আহার করবেন। আপনাদের দেশে আমাকে বহুবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, আমাদের দেশে স্বামী কেন স্ত্রীর সঙ্গে খেতে বসেন না। এর পশ্চাতের চিন্তাটা কি এই যে, স্বামী স্ত্রীকে নিজের চেয়ে হীন মনে করেন? এ ব্যাখ্যা একেবারেই ঠিক নয়। আপনারা জানেন যে শূকরের চুল অতি নোংরা বস্তু বলে মনে করা হয়। একজন হিন্দু এই বস্তু দিয়ে তৈরি দাঁতন দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করবে না, সেজন্য সে ব্যবহার করে গাছের তন্তু। একজন বিদেশী পর্যটক বৃক্ষ-তন্তু দিয়ে দাঁত মাজতে দেখে লিখল—"একজন হিন্দু সকালে উঠে একটি ছোট গাছ উপড়ে নিয়ে চিবিয়ে গিলে খায়।" একইভাবে তারা দেখেছে যে স্বামী

স্ত্রী একসঙ্গে আহার গ্রহণ করে না। সেজন্য নিজস্ব ব্যাখ্যা বানিয়ে দিয়েছেন। এ-জগতে ব্যাখ্যাকার অনেক কিন্তু বোদ্ধার সংখ্যা কম। জগৎ যেন তাদের ব্যাখ্যার জন্য মরে যাচ্ছে। সেজন্য আমি মনে করি মুদ্রণ শিল্পের আবিষ্কার একটি অবিমিশ্র আশীর্বাদস্বরূপ হয়নি। আসল সত্য হলো যেমন আপনাদের দেশেও অনেককিছু নারীরা পুরুষের সামনে করবে না। সেইরূপ আমাদের দেশেও নারীদের পুরুষের সামনে চিবিয়ে চিবিয়ে খাওয়া অশোভন বলে মনে করা হয়। একটি মেয়ে যখন খায় সে তার ভাইয়ের সামনে খেতে পারে, কিন্তু স্বামী যদি সেখানে আসে সে তক্ষুণি খাওয়া বন্ধ করবে এবং স্বামীও সেখান থেকে দ্রুত চলে যাবেন। আমাদের খাওয়ার জন্য টেবিল থাকে না। যখনই পুরুষ ক্ষুধার্ত বোধ করে সে এসে খেয়ে চলে যায়। মনে করো না যেন যে হিন্দু স্বামী স্ত্রীকে তার সঙ্গে টেবিলে বসতে দেয় না। টেবিল বলে সেখানে কিছুই থাকে না। আহার প্রস্তুত হবার পর প্রথম খেতে দিতে হয় অতিথিকে এবং দরিদ্রদের তার পরের ভাগ ইতর জন্তুদের। তৃতীয় ভাগ শিশুদের। চতুর্থ ভাগ স্বামীকে এবং শেষ অংশ হলো মায়ের। আমি কতবার দেখেছি আমার মা যখন দিনের মধ্যে প্রথম আহার করতে যাচ্ছেন তখন বেলা দুটো বেজে গেছে—আমরা খেয়েছি দশটায় এবং তিনি খাচ্ছেন দুটোয়। কারণ তাঁকে অনেক কিছু দেখাশোনা করতে হয়। হয়ত কেউ দরজায় এসে বলল যে, সে অতিথি এবং তখন আমার মায়ের জন্য ছাড়া আর কোন খাবার নেই। মা স্বেচ্ছায় তাকে আগে খেতে দেবেন এবং নিজের খাবারের জন্য অপেক্ষা করে থাকবেন। এই ছিল তাঁর জীবন এবং এ জীবনই তাঁর পছন্দ ছিল এবং এজনাই আমরা মাকে দেবীর মতো পুজো করে থাকি। আমি ভাবি যে আপনারাও যদি কেবল আদর ও অনুগ্রহ পাবার পরিবর্তে পূজা পাওয়া বেশি পছন্দ করতেন! মানবজাতির সদস্য হতভাগ্য হিন্দু কিন্তু এসব বোঝে না। কিন্তু যদি আপনারা বলেন যে, "আমরা মা, এ আমাদের আদেশ", সে মাথা নত করবে। এই দিকটিই হিন্দু বিকশিত করেছে।

আমাদের তত্ত্বের দিকে ফেরা যাক। মাত্র শতবর্ষ পূর্বে পাশ্চাত্য এই অবস্থানে পৌঁছেছিল যে, তারা অন্য ধর্মগুলির প্রতি সহনশীলতা দেখাবে। কিন্তু আমরা এখন জেনেছি যে অন্য ধর্মের প্রতি শুধু সহনশীলতাই যথেষ্ট নয়, অন্য ধর্মকেও সত্যরূপে গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং প্রশ্ন বাদ দেবার নয়, যোগ করবার। সত্য হলো এ-সকল ধর্মমতের যোগফল।

প্রত্যেকটি পৃথক ধর্ম মাত্র একটি দিকেব প্রতিনিধিত্ব কবে। পূর্ণতা হলো এ-সকলের যোগফল। প্রত্যেকটি বিজ্ঞানেও তাই, যোগই হলো নিয়ম। হিন্দু এই দিকটির বিকাশ ঘটিয়েছে। এটাই কি যথেষ্ট? হিন্দু নারীরূপে যিনি মা হয়েছেন তিনি যোগ্য স্ত্রীও হোন না, কিন্তু মাকে যেন ধ্বংস করতে চেষ্টা করো না; এবং সেটাই হবে সবচেয়ে ভাল কাজ যা তুমি করতে পার। এর ফলে বিশ্বের একটি অধিকতর উত্তম পরিচয় পাবে। বিশ্বের সর্বত্র সব জাতির নিকট গিয়ে একথা বলা— "জঘন্য হতভাগ্যগণ! অনন্তকালের জন্য তোমরা আগুনে ঝলসাতে থাক"—তাব চেয়ে এ ভাল হবে, আমরা যদি এই অবস্থানের উপর দাঁড়াতে পাবি যে, ঈশ্বরেচ্ছার অধীনে প্রত্যেকটি জাতিই মানব-প্রকৃতির এক একটি দিকেব বিকাশ ঘটাচ্ছে, তাই কোন জাতিই ব্যর্থ নয়। এ পর্যন্ত তারা ভালই কবেছে। এখন তাদের আরো ভাল করতে হবে (হর্ষধ্বনি)। হিন্দুদের "পৌত্তলিক, ঘৃণ্য, দাস" এসব না বলে ভারতে গিয়ে বল না কেন—"এ পর্যন্ত তোমরা খুব ভাল কাজ করেছ, কিন্তু তাই তো সব নয়, তোমাদেব আরো অনেক কিছু করার আছে। তোমরা নারীকে 'মা' হিসাবে বিকশিত কবেছো এজন্য ঈশ্বর তোমাদের আশীর্বাদ করুন। এখন অন্য দিকটি বিকশিত করতে প্রযত্ন কব, পুরুষের যোগ্য স্ত্রী হওয়া।" সেইভাবে আমি মনে করি (একথা আমি অত্যন্ত সদিচ্ছার সঙ্গে বলছি) আপনারা আপনাদের জাতীয় চরিত্রে হিন্দু প্রকৃতির মাতৃভাবটি যোগ করুন না কেন। আমি প্রথম দিন বিদ্যালয়ে গিয়ে যে কবিতাটি শিক্ষা কবেছিলাম সেটি হলো—"সেই ব্যক্তিটি প্রকৃত বিদ্বান যিনি জগতেব সব নারীকে নিজ মাতাব মতো দেখেন। পবেব ধনসম্পত্তিকে ধূলিকণার মতো দেখেন এবং প্রত্যেক প্রাণীকে আত্মবৎ দেখেন।" পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে কর্মে অংশ গ্রহণ করা নারীর সম্বন্ধে এ হলো আর এক ধরনেব চিন্তা ভাবনা। হিন্দুদের মধ্যে এ আদর্শ যে একেবারে নেই তা নয়। কিন্তু তারা এ আদর্শেব পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারেনি। একমাত্র সংস্কৃত ভাষায় আমরা চারটি শব্দ পাই, যার অর্থ যুগ্মভাবে স্বামী এবং স্ত্রী। একমাত্র আমাদের বিবাহে শপথ নেওয়া হয়— "আমার হৃদয় তোমার হউক।" স্বামীও সেই শপথ গ্রহণ করে থাকে এবং বিবাহকালেই দেখি যে স্বামীকে স্ত্রীর হাত ধরে ধ্রুব নক্ষত্র দেখিয়ে বলতে হয়—"ধ্রুব তারা যেমন আকাশে স্থির, সেইরকম আমি আমাব ভালবাসা তোমার উপব অটুট রাখব" এবং স্ত্রীও একই কথা উচ্চারণ করবে। একটি যথেষ্ট

দুষ্টপ্রকৃতির স্ত্রী ... পথেও দাঁড়ায় সেও স্বামীর নিকট ভরণপোষণ দাবি করতে পারে। এসব ভাবনার বীজ আমরা আমাদের জাতির গ্রন্থাদির মধ্যে সর্বত্র দেখি, কিন্তু আমরা চরিত্রের সেই দিকগুলি যথেষ্ট বিকশিত করতে পারিনি।

কোন কিছু বিচার করতে গেলে আবেগকে বাদ দিতে হয় এবং আমবা জানি যে জগতকে একমাত্র আবেগ পরিচালনা করে না। আবেগের পশ্চাতে আর কিছু কাজ করে। অর্থনৈতিক কার্যকারণ, পাবিপার্শ্বিক পরিস্থিতি আরো বিবেচ্য কিছু বিষয় জাতিগুলির বিকাশ সাধনে কাজ করে। (বর্তমানে যে কাবণে নারী স্ত্রী হিসাবে বিকাশ লাভ করে, তাব কার্য-কারণ বিশ্লেষণের মধ্যে প্রবেশ করা আমাব বর্তমান পরিকল্পনার মধ্যে পড়ছে না।) সুতরাং এই বিশ্বে প্রত্যেক জাতিই কতকগুলি বিশেষ পবিস্থিতির অধীনে অবস্থিত এবং একটি বিশিষ্ট ছাঁচ তৈবি করতে বত। সেইদিন আসছে যখন এইসকল বিভিন্ন ছাঁচ মিশ্রিত হযে যাবে এবং সেই নিন্দনীয় প্রকৃতির স্বদেশ প্রেম যা বলে—"অন্য সকলের সম্পদ অপহরণ করে আমাকে দাও"—তা অদৃশ্য হযে যাবে। তখন জগতে একপেশে বিকাশ আব ঘটবে না এবং প্রত্যেকে দেখবে প্রত্যেকে ঠিক কাজই করেছে। আমাদেব এখন কাজে লাগতে হবে, সব জাতিগুলিকে মিশ্রিত কবতে হবে এবং নূতন জাতিকে আসতে দিতে হবে। আপনারা কি আমাকে আমাব বিশ্বাসের কথা বলতে অনুমতি দেবেন" আজ বিশ্বে যতগুলি সভ্যতা আছে তার প্রায় সবগুলিই সেই অনন্য আর্য জাতি থেকেই উদ্ভূত হযেছে। মানব সভ্যতা তিন ধবনেব রূপ নিয়েছে। রোমক ধরনের বৈশিষ্ট্য হলো সংগঠন-প্রতিভা, রাজ্যজয় প্রবণতা ও দৃঢ়তা। কিন্তু তাদেব প্রকৃতিতে আবেগেব সৌন্দর্যপ্রিয়তাব এবং উচ্চভাবের অভাব। গ্রীকরা মূলত সৌন্দর্যেব ব্যাপারে উৎসাহী, কিন্তু চপলস্বভাব এবং নৈতিকতা চ্যুতির প্রবণতাসম্পন্ন। হিন্দু ধবনটি হলো মূলত দার্শনিকতা এবং ধর্মপ্রবণতা, কিন্তু হিন্দু প্রকৃতিতে সংগঠন-প্রতিভা এবং কর্মোদ্যমের অভাব। বর্তমানে রোমক সভ্যতাব প্রতিনিধি হলো অ্যাংলো স্যাক্সন জাতি, গ্রীসীয় সভ্যতার প্রতিনিধিত্বের অন্যদের চেয়ে ফরাসীরা দাবিদার হতে পারেন। প্রাচীন হিন্দু ধবনটি মৃত্যুহীন! এই নূতন দেশে যেখানে অনেক কিছু সম্ভাবনা রয়েছে, প্রত্যেকটি ধরনের সভ্যতার বিকাশের পক্ষে সুবিধা আছে, যেমন রোমকদের সংগঠন প্রতিভা, গ্রীকদেব সুন্দরকে

ভালবাসার আশ্চর্য ক্ষমতা এবং হিন্দুর ধর্মের মেরুদণ্ড ও ঈশ্বরকে ভালবাসার ক্ষমতা—এ সকলেরই বিকাশের সুযোগ রয়েছে। এগুলিকে মিশ্রিত করে নূতন সভ্যতার আগমন ঘটান আপনারা এবং আমি বলতে চাই যে, এ কাজ নারীদেরই করা উচিত। আমাদের কিছু গ্রন্থ আছে তাতে বলা হয়েছে পরবর্তী ঈশ্বরের অবতার এবং শেষতমটি (আমরা দশটি অবতারে বিশ্বাস করি) আসবেন নারীরূপে। আমরা দেখছি জগতে অব্যবহৃত সম্পদ এখনো পড়ে রয়েছে। কারণ জগতে যত শক্তি আছে তার সব এখনো ব্যবহৃত হয়নি। হাত কাজ করেছে কিন্তু শরীরের অন্যান্য অংশ নিশ্চল থেকেছে। শরীরের অন্যান্য অংশের শক্তিগুলিও জেগে উঠুক এবং হয়ত এ-সব-শক্তির সমন্বিত কর্মপ্রচেষ্টার ফলে জগতের দুঃখ দুর্দশা দূর হবে। হয়ত এই নবীন দেশে আপনাদের শিরায় যে নূতন রক্ত প্রবাহিত, তার দ্বারা আপনারা সেই নূতন সভ্যতাকে আনতে পারবেন এবং হয়তো তার আগমন ঘটবে আমেরিকান নারীদের দ্বারা।

সেই চিরপুণ্যভূমি যা আমার এই শরীর দিয়েছে, আমি তার অতীতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকিয়ে আছি এবং সেই করুণাময় পরমপিতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি যিনি আমাকে জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করতে দিয়েছেন। যখন বিশ্বের সর্বত্র পরস্বাপহারী সশস্ত্র দস্যুদের মধ্যে বংশোৎপত্তির গৌরব খুঁজতে ব্যস্ত, একমাত্র তারাই মুনিঋষির বংশধর বলতে নিজেদের গৌরবান্বিত বোধ করে।

সেই আশ্চর্য তরণীটি যা যুগ যুগান্তর ধরে নরনারীকে নিয়ে চলেছে জীবন-সমুদ্রের পরপারে, হয়ত তার মধ্যে কোথাও কোথাও ছিদ্র দেখা দিয়েছে এবং একমাত্র ঈশ্বরই জানেন তা কতটা তাদের নিজেদের দোষে আর কতটা তাদের দোষে যারা হিন্দুদের আজ ঘৃণার চোখে দেখে। কিন্তু যদি সেরূপ কোন ছিদ্র থেকেই থাকে, আমি তার দীনতম সন্তান, আমি মনে করি তাকে ডুবে-যাওয়া থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করব এবং তার ফলে আমাকে যদি প্রাণ দিতে হয়, তাও দেব। যদি আমি দেখি এজন্য আমার সব সংগ্রাম ব্যর্থ হলো, তাহলেও ঈশ্বর সাক্ষী থাকবেন। আমি তাদের আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে আশীর্বাণী উচ্চারণ করে বলব—"আমার ভ্রাতৃমণ্ডলী, তোমরা ভাল কাজেই করেছ। তোমরাই আমার যা কিছু সম্পদ সবই দিয়েছ, আমাকে সুযোগ দাও যেন আমি শেষ পর্যন্ত তোমাদেরই সঙ্গে একই সঙ্গে ডুবে যাই।"

পরিশিষ্ট-ঘ

শ্রীমতী জেমস ম্যাক্‌কিন-এর চিঠির উত্তর ডঃ লুইস জি. জেন্‌সের দেওয়া—
(একাদশ অধ্যায় পৃঃ ৩৩৯ দ্রষ্টব্য)

[ব্রুকলিন রমাবাঈ কেন্দ্রের নেত্রী শ্রীমতী জেমস ম্যাক্‌কিনের চিঠির উত্তরে ডঃ লুইস জেনসের লেখা ব্রুকলিন ডেইলী ঈগল্‌ পত্রিকায় ১৫ এপ্রিল, ১৮৯৫-এ প্রকাশিত চিঠির পূর্ণ বয়ান হলো নিম্নলিখিত রচনাটি ঃ]

ব্রুকলিন ঈগল্‌ পত্রিকা সম্পাদক সমীপেষু,

ভারতে নারীর সামাজিক এবং আইনগত মর্যাদার প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে আমার এবং রমাবাঈ কেন্দ্রের নেত্রীর মধ্যে মত বিনিময়ের ফলে যে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে তা আরো বেশি মনোযোগ আকর্ষণের যোগ্য। প্রকৃত তথ্য আইনজ্ঞ, সমাজতত্ত্ববিদ এবং যারা ধর্মপ্রচারের কাজে নিযুক্ত আছেন তাঁদের জ্ঞাত থাকা উচিত। হিন্দুজাতির পবিত্র শাস্ত্রীয় সাহিত্য এবং আইনের বিধানসমূহ সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার অপেক্ষা অপর কোন ইউরোপীয় অধিক জ্ঞাত নন। তাঁর যে কৌতূহলোদ্দীপক ছোট্ট বইটি—"ভারত আমাদের কি শেখাতে পারে", হলো মূলত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের নিকট একটি পাঠক্রমের উপর দেওয়া বক্তৃতাবলী। তার মধ্যে "হিন্দুদের চরিত্রে সত্যনিষ্ঠা" শীর্ষক একটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় আছে। এতে তিনি হিন্দুদের এত উচ্চ প্রশংসা করেছেন যে, যে-কোন জাতি ঐরূপ সৎ প্রশংসার গৌরব মুকুট পরিধান করতে গৌরব বোধ করবে। ভারতে আগত বহু পর্যটক এবং অনুসন্ধানীদের উদ্ধৃত করে তিনি এ-কথাও যোগ করেছেন যে—"আমি গ্রন্থের পর গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত করে দেখাতে পারি যে সত্যকে ভালবাসা হলো ভারতীয়দের সংক্ষেপে জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। ভারতের সংস্পর্শে যাঁরাই এসেছেন তাঁদেরই এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যটি চমক লাগিয়ে দিয়েছে। তাদের কেউই ভারতীয়দের মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দেয়নি। ম্যাক্সমূলার অধ্যায়ের শেষে যোগ করেছেন এই কথা কয়টি—"অবশ্যই ভারতে নৈতিক অধঃপতন আছে, আর বিশ্বের কোথায়ই বা নৈতিক অধঃপতন নেই? কিন্তু এ-বিষয়ে জাতিভিত্তিক পরিসংখ্যানের মধ্যে প্রবেশ করা, আমার বিশ্বাস, খুবই বিপজ্জনক খেলা হবে।...অপরকে বিচার করবার সময়, তা বাহ্য বা ব্যক্তিগত জীবন

যেটি নিয়েই হোক না কেন, জানবেন যে, একটি দয়ালু হৃদয় কখনো কারও ক্ষতিসাধন করে না।" এই সত্যনিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর এবং তার শ্রদ্ধেয় ধর্মীয় শিক্ষক, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় যাদের সংখ্যা ভারতে লক্ষাধিক, তাদেরই প্রতিনিধি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি আইনজ্ঞ হিসাবে শিক্ষা লাভ করেছেন, অভিনেতা হিসাবে নন এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ সম্মানসহ উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি শুধুমাত্র যে মনু এবং তৎপরবর্তীকালের আইন সম্বন্ধেও বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত তাই নন, তুলনামূলক আইন সম্বন্ধেও শিক্ষাপ্রাপ্ত। যারা বর্তমান বিতর্কে আগ্রহান্বিত, তারা যদি এসকল বিবেচনা করতে চান, তাহলে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হোন যে স্বামী বিবেকানন্দ জানেন যে তিনি কি বলছেন এবং তিনি হিন্দু নারীগণের সম্পত্তির অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্নাতীত তথ্যসমূহ দিয়েছেন। রমাবাঈ কেন্দ্রের শ্রদ্ধেয় পরিচালিকার গত শনিবারে ঈগল পত্রিকায় দেওয়া সাক্ষাৎকারটি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক এবং তার মধ্যে ভারতের হিন্দু বিধবার মর্যাদা সম্বন্ধে তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য, পড়াশুনো করে প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা কবা হয়েছে দেখা যায। আমাব অবশ্য ভয় এই যে, ভদ্রমহিলাটি হয়ত তথ্যাদি মূলগ্রন্থাদি হতে না সংগ্রহ করে কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ হতে সংগ্রহ করে থাকবেন। প্রথমে আমি এক কথায় স্বামী বিবেকানন্দ একজন অভিনেতা ছিলেন এ বানানো কাহিনীব নিষ্পত্তি করব। যদি তিনি তা হযেও থাকেন, তাহলেও তা যে তাঁর অখ্যাতির কোন কারণ, তা নয়। যথেষ্ট সম্মানিত যোগ্য পুরুষ ও নারী এই অভিনয়বৃত্তিতে নিযুক্ত আছেন, যাবা উদারচিত্ত মানুষদেব প্রশংসা ও শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য। এব মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে কথাগুলি যেভাবে বলা হয়েছে তাতে তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন বক্রোক্তি আছে বলে মনে হয। যেন যেহেতু পূর্বে তিনি একজন অভিনেতা ছিলেন সেইহেতু দার্শনিক বা ধর্মাচার্য হবার যোগ্যতা তিনি হারিয়েছেন—এ যুক্তি যুক্তি-বিচাবের চেযে কুসংস্কাব এবং দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতারই ইঙ্গিত বহন করছে। সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সম্মোহন হলো সেটি, যেটি ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার হতে প্রসূত। কিন্তু একথা সত্য নয় যে, স্বামী বিবেকানন্দ "অভিনেতা" কথাটির স্বীকৃত অর্থে একজন অভিনেতা ছিলেন। এ বিষয়ে তথ্যাদি হলো এইরূপ : কয়েক বৎসর পূর্বে ব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধেয় প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র সেন একটি ধর্মীয় নাটক লিখেছিলেন যাতে তিনি ধর্মসম্প্রদায়-সমূহের মধ্যে ঐক্য প্রতিপাদনের জন্য

তাঁর নিজস্ব ধারণাগুলি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, বলতে চেয়েছিলেন যে, সব ধর্মমতের গভীরতম সত্যগুলি মূলত এক। "নব বৃন্দাবন" নামে এই নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়েছিল একটি ধর্মীয়-অনুষ্ঠানরূপে এবং তিনি নিজে, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবর্গ নাটকটিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। নাটকের মধ্যে একটি সন্ধিক্ষণে একটি বৈদিক স্বস্তিবাচক মন্ত্রকে সুরসঙ্গীত মাধ্যমে উপস্থাপিত করবার প্রয়োজন হলে, বিবেকানন্দ, তখন তিনি কমবয়সী সুদর্শন সুকণ্ঠ তরুণ, কেশব সেনের ভক্ত হিসাবে মঞ্চে এসে সেই স্বস্তিবচনটি পরিবেশনের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। একমাত্র এভাবেই তিনি একজন অভিনেতা হয়েছেন, কিম্বা কোন নাটকাভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। একমাত্র এইভাবেই তিনি নব বৃন্দাবন মঞ্চের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। যদি তিনি একজন অভিনেতা হয়ে থাকেন, তাহলে কেশবচন্দ্র সেন এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও আরো অধিক মাত্রায় অভিনেতা ছিলেন। সমস্ত কাহিনীটি গজিয়েছে ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্রে একটি উল্লেখের জন্য, যা স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করার উদ্দেশ্যে করা হয়নি। এদেশে আগমনের পূর্বে তিনি জনসভার বক্তা হিসাবে বিদিত ছিলেন না। সাধারণত সন্ন্যাসীদের কর্মক্ষেত্র বক্তৃতামঞ্চ নয়, সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে এবং শাখাপ্রশাখায় প্রসারিত বৃক্ষতলে বসে গুটিকতক শিষ্যদের সামনে কথাবার্তা বলাই তাদের কাজ।

সেজন্য স্বামীজীর বন্ধুবান্ধবেরা তাঁর বক্তৃতামঞ্চ হতে প্রদত্ত ভাষণাবলী এবং দার্শনিক ব্যাখ্যাসমূহে আমেরিকার আগ্রহের পরিমাণ দেখে অবাক হয়েছিলেন। বেদান্ত দর্শনের উপস্থাপনায় তাঁর যে পাণ্ডিত্য ও সত্যসমৃদ্ধতা প্রকট তা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতবর্গ, মুখ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধ্যাপক-মণ্ডলী, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উচ্চতম ন্যায়ালয়ের বিচারকগণ এবং সনাতন ও নবীন ধর্ম সম্প্রদায়বর্গের প্রতিনিধিবর্গ—এঁদের সকলের নিকট হতে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এইসকল ভদ্রমহোদয়গণের নাম এবং ভারতের সর্বাপেক্ষা জনবহুল নগরীসমূহে স্বামী বিবেকানন্দের কাজের স্বীকৃতি জ্ঞাপন করবার জন্য যে-সকল মহতী জনসভাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়েছে তার প্রতিবেদন আমার হাতে আছে, কিন্তু আমি যদি সে-সব উদ্ধৃত করি তাহলে আপনাদের সংবাদপত্রের অনেকখানি জায়গা নিয়ে নেবে। অবশ্য কিছু ছিদ্রান্বেষী সমালোচকও যে আছে তাও সত্য হতে পারে। কিন্তু শ্রীমতী ম্যাক্‌কিনের

সাক্ষাৎকারে ইউনিটি অ্যাণ্ড মিনিস্টার থেকে যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তা স্পষ্টত এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। নাইনটিস্থ সেঞ্চুরী পত্রিকা (ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পৃঃ ৩০৫-৩ দ্রষ্টব্য) হতে দেবেন্দ্রনাথ দাসের যে উক্তিটি উদ্ধৃত করা হয়েছে আমি মনে করি না চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কাছে তারও কোন গুরুত্ব আছে। কারণ তার বিরুদ্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বৎবর্গ ও ভারততত্ত্বের এবং ভারতীয় সাহিত্যের গবেষকদের সাক্ষ্য আছে আর মনুসংহিতায় তার বিরুদ্ধে যে বিধান আছে, আমি মনু থেকেই সেই উদ্ধৃতি দিতে প্রস্তুত আছি। যদি আমি সঠিক জেনে থাকি তাহলে শ্রীযুক্ত দাস হলেন একজন অতি অল্পবয়স্ক তরুণ ভদ্রলোক, যিনি কয়েক বৎসর পূর্বে পণ্ডিতা রমাবাঈয়ের ইংলণ্ড ভ্রমণের সঙ্গী হয়েছিলেন। তাঁর প্রবন্ধ ইংলণ্ডের পাঠকদের জন্য লেখা হয়েছিল, বস্তুত একটি প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যে। ভারতের প্রকৃত বিধিবিধান এবং প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে এই ধরনের বিকৃত একদেশদর্শী বিবরণ ও অতি কথন সম্পর্কে স্বামীজীর আপত্তি। প্রকৃত তথ্য ও মনুর বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে (শ্রীমতী ম্যাক্‌কিনের) এই নিশ্চিত ঘোষণা যে, "তাদের (বিধবা) সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে প্রতিটি দিকেই যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে, তাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারি হবার কোন অধিকারই নেই"—বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার! মনুসংহিতা গ্রন্থে বারেবারে বিধবাগণসহ হিন্দুনারীদের সম্পত্তিতে পৃথক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। বিধবাদের অধিকার বিশেষভাবে সুস্পষ্ট ধারায় সুরক্ষিত করা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি মূল মনুসংহিতা হতেই ম্যাক্স-মূলারের "সেক্রেড বুক অব দ্য ইস্ট" গ্রন্থে যে স্বীকৃত অনুবাদ দেওয়া হয়েছে তা থেকেই উদ্ধৃতি দেব, কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ বা উৎস হতে নয়। প্রথমে অবশ্য আমাকে আপনারা সারা বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত গ্রন্থ বলে স্বীকৃত এরূপ গ্রন্থ হতে হিন্দু চরিত্র এবং হিন্দু নারীর প্রতি আইনের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিতে অনুমতি দিন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে মনুসংহিতা লিখিত হলো খ্রীস্টপূর্ব পাঁচ শতকে এবং এটি প্রাচ্যচিন্তার সৃষ্টি। আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় বা আমেরিকান নর-নারীদের সম্পর্কে ধারণার দৃষ্টিকোণ থেকে এর উপর দৃষ্টিপাত করলে হবে না। এর মধ্যে বর্তমান হিন্দু আইন ও প্রথারও ঠিক ঠিক বিবরণ পাওয়া যাবে না। পরবর্তীকালে যে-সকল বিধান গঠিত হয়েছে এবং ভাষ্যকারেরা মূল যে সকল ধারা

ছিল সেগুলির পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য করে পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। প্রথমদিকের বিধানগুলিকে হিব্রু ও খ্রীস্টানদের বিধানের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে মনু নারীর অধিকার সুরক্ষার এবং নারীর সম্পত্তিতে অধিকার স্বীকৃতির ব্যাপারে অনেকখানি এগিয়ে। হিন্দুদের সাধারণ চরিত্র সম্বন্ধে স্যার জন ম্যালকম বলেন—"তারা হলো সাহসী, উদার, মানবিক এবং তাদের সাহসের মতোই তাদের সত্যনিষ্ঠা অসাধারণ"।

অধ্যাপক উইলসন বলেন—"ভারতীয় চরিত্রে যে-গুণ সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সর্বত্র দেখা যায় তা হলো স্পষ্টবাদিতা।" কর্ণেল সীম্যান বলছেন—"তোমরা তাদের ভয় দেখিয়ে বা অর্থের লোভ দেখিয়ে একটি সুপরিকল্পিত মিথ্যা বলাতে পারবে না।" বিশপ হেবার বলছেন, "হিন্দুরা সাহসী, ভদ্র, বুদ্ধিমান, জ্ঞানলাভ এবং উন্নতিলাভের জন্য অত্যন্ত আগ্রহশীল, সংযমী, পরিশ্রমী, পিতামাতার প্রতি কর্তব্যপরায়ণ, সন্তান সন্ততিগণের প্রতি স্নেহশীল, আগাগোড়া কোমল প্রকৃতির এবং ধৈর্যশীল।" ভারতের ইতিহাস-প্রণেতা এলফিনস্টোন বলেন—"হিন্দুদের মধ্যে এমন কোন শ্রেণী নেই যারা আমাদের বড় বড় শহরের নিম্নশ্রেণীর ন্যায় নীতিভ্রষ্ট। গ্রাম্য লোকেরা সর্বত্র অমায়িক, পরিবারের প্রতি স্নেহশীল, প্রতিবেশীদের প্রতি দরদী।" স্যার টমাস মুন্‌রো বলেন—"যদি পরস্পরের প্রতি সদিচ্ছা, আতিথেয়তা এবং সর্বোপরি নারীদের প্রতি ব্যবহারে পূর্ণ বিশ্বাস, শ্রদ্ধা এবং শিষ্টতা সভ্য মানুষদের লক্ষণ হয়, তাহলে হিন্দুরা কোন অংশে ইউরোপীয় জাতিগণ অপেক্ষা হীন নয়।" মহাকাব্য মহাভারতে একজন বীরপুরুষ ভীষ্মের মৃত্যুর কারণই হলো কখনো তিনি নারীকে আঘাত করবেন না—এই প্রতিজ্ঞা এবং যাকে তিনি নারী বলে গণ্য করতেন সেই শিখণ্ডির হাতেই তিনি নিহত হন। "প্রাচ্যের ধর্মসমূহ"-গ্রন্থের লেখক স্যার স্যামুয়েল জনসন, যিনি এ-বিষয়ে বিশেষ যত্ন সহকারে অনুসন্ধান করেছেন, তিনি বলেছেন—"কয়েকটি অন্যরূপ বিধান সত্ত্বেও, হিন্দু আইন বস্তুত নারীকে বেশির ভাগ খ্রীস্টীয় জাতির আইন যে অধিকার দিয়েছে তার তুলনায় অধিক অধিকার দিয়েছে এবং নারীগণ ব্যবসায়ে উপযুক্ত বিচক্ষণতা ও কুশলতা প্রদর্শন করেছে।" এ-বিষয়ে অপর একজন প্রামাণিক গ্রন্থকার টেনিয়েন্ট সমান স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন : "যেহেতু সিংহলের আইন নারীকে যে-সম্পত্তি ব্যবহার করতে দেওয়া হয় তার ওপর তার সর্বময়

কর্তৃত্ব স্বীকার করে, সেজন্য বিবাহের সময় সম্পত্তির বড় অংশ দেওয়া প্রথা থাকায়, ভূসম্পত্তিতে বিশাল বৃহদংশ নারীর হাতে ন্যস্ত করেছে এবং সম্পত্তির পরিচালনায় অনুরূপ কর্তৃত্বের অধিকার দিয়েছে।" ভারতে বিধিবিধান সিংহলের চেয়ে খুব বেশি ভিন্নরকম নয়। স্ত্রী নিজের সম্পত্তির উপর পরিপূর্ণ অধিকার পায়, আর যদি তার বৈধব্য ঘটে, সে নিজে উত্তরাধিকার লাভ করে, তার স্বামীর সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি লাভ করে এবং তার ভূসম্পত্তিতে জীবনস্বত্ব লাভ করে। 'ভারতের শাসনব্যবস্থা' গ্রন্থের গ্রন্থকার প্রীচার্ড বলেছেন—"পারিবারিক বৃত্তের মধ্যে এবং দৈনন্দিন পারিবারিক কর্তব্যপরায়ণতার মধ্যে নানাপ্রকার আগ্রহ এবং আনন্দ উপভোগের মধ্যে হিন্দু নারীর স্নেহ ও সহানুভূতি প্রদর্শনের অনেক ক্ষেত্র আছে যা তাকেও তার পাশ্চাত্য ভগিনীদের সঙ্গে সমপর্যায়ে স্থাপিত করেছে।" জনসন লিখেছেন—"খ্রীস্টীয় আইন মনুর বিধান অপেক্ষা অনেক ব্যাপারে নারীর প্রতি অধিক অবিবেচনার পরিচয় রাখে।" তিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন ইংলণ্ডের আইনে মাতা বা পিতার সব অধিকার একমাত্র পিতাতেই বর্তায়, মা সম্পূর্ণ বাদ। মনুর বিধানে গ্রেট ব্রিটেনেব আইনের তুলনায় নারী পুরুষের আশ্রিত এ ধারণাটি অনেকখানি সংস্কৃত। জনসন বলছেন—"আইনের দৃষ্টিতে নারীর অযোগ্যতার যে ধারণা সামন্ততন্ত্র থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তার তুলনায় অখ্রীস্টানদের মধ্যে নারীর চিরন্তন রক্ষণাবেক্ষণের ধারণাটি অনেকখানি মর্যাদাপূর্ণ।"

এইবার মনুর দিকে দৃষ্টিপাত করে আমরা দেখছি যে শ্রীমতী ম্যাক্‌কিনের সাক্ষাৎকারে শেষ যে উদ্ধৃতিটি দেওয়া হয়েছে সেটির স্পষ্টত নারীর সম্পত্তির অধিকারের প্রশ্নের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। এটি হলো কেবলমাত্র সাধারণভাবে নারী কোন না কোন পুরুষের প্রাধান্যতাকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্বীকার করবে—প্রাচ্যের এই ধারণার প্রকাশ। অন্য একটি অংশে আমরা একই ধারণা এভাবে বিবৃত হতে দেখি—"বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্ধক্যে পুত্র, তাকে রক্ষা করে, নারীর কোন অবস্থাতেই স্বাতন্ত্র্য নেই" (মনু ৯।৩)। এই প্রসঙ্গের সঙ্গে সম্পত্তির অধিকারের কোন সম্পর্ক নেই। সেটা বোঝা যায় এই তথ্য হতে যে, মনুসংহিতায় একই অধ্যায়ে বারে বারে সম্পত্তির অধিকার স্পষ্ট ভাষায় স্বীকৃত হয়েছে। এর দ্বারা এমনকি মুসলমান অধ্যুষিত দেশগুলিতেও নারীর উপর ব্যক্তিগতভাবে যে নজরদারি

করা হয় তাও বোঝায় না, কারণ অপর একটি ধারায় বলা হয়েছে কোন পুরুষ একটি নারীকে জোর করে পুরো পাহারা দিতে পারে না। কিন্তু তাদের নিম্নলিখিত উপায়সমূহ দ্বারা সুরক্ষিত করা যেতে পারে। স্বামী স্ত্রীকে তার ধনসম্পত্তি সংগ্রহ এবং ব্যয় বিষয়ে পরিচ্ছন্নভাবে হিসাব রাখা, ধর্মীয় কর্তব্য পালনের কাজ সুসম্পন্ন করা, খাদ্য প্রস্তুত করা এবং গৃহস্থালীর জন্য প্রয়োজনীয় তৈজসপত্রাদি দেখাশোনা করার কাজে নিযুক্ত করবেন। নারীকে গৃহাভ্যন্তরে বিশ্বস্ত পরিচারকদের অধীনে আবদ্ধ করে রাখলেই তাদের সুরক্ষিত করা যায় না। কিন্তু যাঁরা নিজেরা নিজেদের রক্ষা করতে পারে তারাই সুরক্ষিত হন (মনু ৯।১০-১২)। মনুর বিধানে পরিবারে স্বামী ও স্ত্রীর ঐক্য বিষয়েও উপদেশ দেওয়া হয়েছে—সেই ব্যক্তি পূর্ণ মানুষ যে তিনজনকে—স্ত্রীকে, নিজেকে এবং সন্তানদের ঐক্যবদ্ধ রাখে। বেদে বলা হয়েছে, পণ্ডিত ব্রাহ্মণরা এই একই উপদেশের কথা বলেন—"স্ত্রী ও স্বামী অভেদাত্মা বলে ঘোষিত হলো" (মনু ৯।?)। মনু সংহিতার নবম অধ্যায়ে (?) বলা হয়েছে প্রত্যেক পুরুষ যখন কার্যোপলক্ষে বিদেশে যান, তিনি যতদিন দূরে থাকবেন, ততদিনের জন্য স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে যাবেন। সম্পত্তির অধিকার এবং উত্তরাধিকারের ব্যাপারে আমরা নিম্নলিখিত বিধানসমূহ দেখতে পাই—পিতা এবং মাতার মৃত্যুর পর ভ্রাতৃবর্গ পিতা ও মাতার সম্পত্তি ভাগ করে নিতে পারে। কারণ. পিতামাতা জীবিত থাকাকালে তাদের এর উপর কোন অধিকার নেই (৯।১০৪)। এর দ্বারা এটাই প্রতিষ্ঠিত হয় যে কখনো পিতা বা মাতার মধ্যে একজন জীবিত থাকলে সম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়ারা করা যায় না। সুতরাং স্বামীর মৃত্যুর পর সম্পত্তির উত্তরাধিকার যে তার স্ত্রীর উপর বর্তায় তার সাক্ষ্য বহন করছে এ ধারাটি। প্রকৃতপক্ষে স্বামীর ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর বিধবার অধিকার সর্বময় এবং তার ভূসম্পদের উপর তার জীবনস্বত্বের অধিকার। মনুর বিধানে আরো বলা হয়েছে—"অবিবাহিত বোন ও ভাইদের পৃথকভাবে প্রত্যেককে নিজের অংশের এক চতুর্থাংশ দিতে হবে, যে তা দিতে অসম্মত হবে সে জাতিচ্যুত হবে।" আরো বলা হয়েছে—"মায়ের পৃথক সম্পত্তি যতটুকুই হোক না কেন তাতে একমাত্র অধিকার অবিবাহিতা কন্যার। কিন্তু একজন দত্তক কন্যার পুত্র তার মাতামহের কোন পুত্রসন্তান না থাকলে তার পুরো সম্পত্তি পাবে"

(মনু ৯।১৩৭)। "কিন্তু যখন মায়ের মৃত্যু ঘটে তখন সহোদর ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ মায়ের সম্পত্তি সমানভাবে ভাগ করে নেবে" (মনু ৯।১৯২)। "এমনকি ঐসকল কন্যাদের যে কন্যা—সন্তান তাদেরও স্নেহের কারণে এই মাতামহীর সম্পত্তি থেকে কিছু দিতে হবে" (মনু ৯।১৯৩)। "বিবাহের হোমাগ্নির সম্মুখে যা দেওয়া হয়, কন্যাকে পিতৃগৃহ হতে যাবার সময় ও ভালবেসে যে সমস্ত উপহার দেওয়া হয় এবং যা সে তার ভাই, মা ও বাবার নিকট হতে উপহার পায়, তাকে নারীর ষড়বিধ সম্পত্তি বলা হয়।" "নারীর এইরূপ সম্পত্তি এবং পরবর্তী কালে উপহারস্বরূপ পাওয়া সমস্ত সম্পত্তি এবং তাকে যা কিছু তার স্নেহময় স্বামী দিয়েছেন, তা তার সন্তানেরা পাবে, এমন কি তার যদি মৃত্যু হয় স্বামীর জীবৎকালেই সে সকল তার সন্তানেরা পাবে" (মনু ৯।১৯৪-১৯৫)।

এর থেকে বোঝা যায় যে, স্ত্রী যে কেবলমাত্র স্বামীর ব্যক্তিগত সম্পদ পুরোপুরি পাবে তাই নয়, তার ভূসম্পত্তিতেও তার জীবৎকালীন অধিকার পাবে। কিন্তু তার যা স্বতন্ত্র নিজস্ব সম্পত্তি তা যদি তার সন্তানাদি থাকে তারা পাবে, তার স্বামী নয়। যদি সন্তানাদি না থাকে, আর একটি ধারানুসারে, তার স্বামী পাবে। কিন্তু বিবাহ যদি বৈধ না হয়, তার স্বামীর পরিবর্তে তার পিতামাতা সেই সম্পত্তি পাবে। আর একটি ধারায় স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত বিধবাদের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পত্তি এবং অন্যান্য সম্পাত্তি আগ্রাসী ব্যক্তিদের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করবার দায়িত্ব রাজাকে অর্পণ করা হয়েছে। "যে-সকল আত্মীয়-স্বজন নারীদের এই সকল সম্পত্তি তাদের জীবৎকালেই আত্মসাৎ করতে চায়, তাদের চোরের শাস্তি দেবেন একজন ন্যায়পরায়ণ রাজা" (মনু ৮।২৭, ২৮-২৯)। এক নারীর স্ত্রীধনেব, উপর যে-সকল পুরুষ আত্মীয় নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে তাদের উপর অভিশাপ নিক্ষেপ করা হয়েছে—"সেই সকল পুরুষ আত্মীয় যারা তাদের নির্বুদ্ধিতার দরুন নারীর নিজস্ব সম্পত্তির উপর নিজেদের ভরণপোষণের জন্য নির্ভর করে অর্থাৎ তাদের ভারবাহী পশু, গাড়ি এবং নারীর পোশাকপরিচ্ছদও আত্মসাৎ করে, তারা পাপ করে এবং নরকগামী হয়" (মনু ৩।৫২)। সুতরাং কেবলমাত্র আইনের দিক থেকেই নয়, হিন্দু নারীর সম্পত্তি সুরক্ষিত করবার জন্য অত্যন্ত কড়া ধরণের ধর্মীয় বিধিনিষেধও আরোপ করা হয়েছে—তা তারা বিবাহিত বা বিধবা যেই হোক না কেন।

এ এক আশ্চর্য ও সন্তোষজনক সমাপতন যে সম্প্রতি মনুর এ সকল বিধানের প্রমাণস্বরূপ একটি দৃষ্টান্ত আমি হাতে পেয়েছি। জনসন দেখাচ্ছেন যে মনুসংহিতার বিধানগুলিকে পরবর্তী ভাষ্যকার এবং ন্যায়ালয়সমূহের সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছে এবং সেগুলিই এ মুহূর্তে ভারতে চালু আইন হিসাবে বলবৎ রয়েছে। ভারতের মহাকাব্য মহাভারতের প্রকাশক এবং ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের অবৈতনিক সংবাদদাতা বাবু প্রতাপ চন্দ্র রায় সম্প্রতি কলকাতায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। আমি তাঁর বিধবা পত্নীর এবং তাঁর ব্যবসায়ের একজন অংশীদারের নিকট হতে তাঁর মৃত্যু সংবাদসহ একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি পেয়েছি, যার থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি তাঁর কলকাতার বাড়ি এবং প্রকাশনা ব্যবসায়ে নিয়োজিত তাঁর যে সম্পত্তি, তা তাঁর বিধবা পত্নীকেই দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু বিধবা পত্নী বলছেন তাঁর নিজস্ব একটি ছোটখাট সম্পত্তি আছে, যা তিনি তাঁর স্বামীর প্রবর্তিত মহৎ কাজটি সম্পন্ন করবার জন্য দান করতে চান। সুতরাং আমি যে কেবলমাত্র মূল গ্রন্থের স্বীকৃত অনুবাদ হতে উদ্ধৃত করে দেখাতে সমর্থ যে স্বামী বিবেকানন্দ যা বলেছেন তা মোটের উপর সম্পূর্ণ সমর্থিত শুধু নয়, সাক্ষ্যপ্রমাণসহ প্রতিপন্ন যে উক্ত বিধানসমূহ মৃত নয়, এখনো বর্তমান ভারতে ওগুলি চালু আছে। আমি এও নিবেদন করছি যে, সে সাক্ষ্য প্রমাণ পর্যাপ্ত, সিদ্ধান্তজ্ঞাপক এবং ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু। এরপর আর আমাদের অতিথির সত্যবাদিতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না এবং এ-বিষয়ে তিনি যে-সংবাদ দিয়েছেন তারও ভ্রমশূন্যতা সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আমি রমাবাঈ কেন্দ্রের নেত্রীর সাক্ষাৎকারে "বাবু নরেন্দ্রনাথ দত্ত (ওরফে বিবেকানন্দ)" এইরূপ শব্দ প্রয়োগে দুঃখিত হয়েছি, কারণ এ-ধরনের ভাষাপ্রয়োগ পুলিশ-আদালতের নথিতে যারা অন্যদের প্রবঞ্চনা করবার জন্য অন্য নাম নেয় তাদের ক্ষেত্রে তাদের সঠিক পরিচয় বোঝাবার জন্য প্রয়োগ করা হয়। এ-কথা সকলেরই ভাল করে জানা উচিত যে, হিন্দু-সন্ন্যাসীদের প্রথা হলো—যা ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টান্টদের মধ্যেও কিছু কিছু দেখা যায়—সংসার ও পবিজনদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ এবং ধর্মাচার্যদের নিজেদের কাজে পূর্ণ আত্মনিবেদন ব্যাপারটি বোঝাবার জন্য একটি সম্পূর্ণ নূতন নাম গ্রহণ করা।

স্বামী বিবেকানন্দের জননীর স্বহস্তে লিখিত একটি সুন্দর চিঠি—মূল

চিঠিটি আমি নিজে দেখেছি এবং তার একটি অনুবাদ আমাকে পড়তে দেওয়া হয়েছিল, তাতে দেখা যাচ্ছে যে তাঁর ব্রতের দ্বারা যে বিচ্ছেদ সূচিত তৎসত্ত্বেও এবং হাজার হাজার মাইলের দূরত্ব সত্ত্বেও মাতৃহৃদয়ের ভালবাসা এবং সন্তানের জন্য গর্ববোধ নিয়ে তিনি তাঁর পুত্রের সঙ্গে যুক্ত আছেন এবং তাঁর পুত্র যে-সকল মহৎ কাজ করছেন এবং দূরদেশে যে-সকল বন্ধু লাভ করেছেন তার জন্য বিনয়নম্র চিত্তে কৃতজ্ঞ হয়ে আছেন। এর চেয়ে অধিক মহৎ স্নেহপূর্ণ এবং মাতৃমহিমাপূর্ণ চিঠি অদ্যাবধি আমার চোখে আর পড়েনি। রমাবাঈ কেন্দ্রের নেত্রী আমাকে যে-সকল প্রশ্ন ব্যক্তিগতভাবে করেছেন, সে সম্বন্ধে আমি অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে ছেড়ে দেব। বাবু শশীপদ ব্যানার্জীর অবস্থান সম্পর্কে আমি ইতঃপূর্বেই পুরোপুরি সবকিছু জেনেছি। তিনি কিন্তু পণ্ডিতা রমাবাঈয়ের মতো একজন খ্রীস্টধর্মে ধমান্তরিত ব্যক্তি নন, যদিও তিনি যজ্ঞোপবীত এবং জাতিবন্ধন অস্বীকার করেছেন। জনগণ এটা হয়তো সাধারণভাবে নাও জানতে পারে যে, একজন সন্ন্যাসী সংসারত্যাগী ও জাতিধর্মের সীমাবন্ধনেব উর্ধ্বে আরোহণ করেন, হিন্দু ঐতিহ্যে ফাটল ধরিযে সেটা করা হয় না, যাকে বলা যায় ক্রমবিকাশের পথে উচ্চতর ধর্মীয স্তরে উন্নত হওয়ার পরে জাতিব সীমাবদ্ধতা আর প্রযোজ্য হয় না বলেই তা সম্ভব হয়। বাবু শশীপদ ব্যানার্জীর কাজের জন্য এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক অর্থদান করার ব্যাপারে অসঙ্গতি সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে বলি যে, একটি ভাল কাজের জন্য না হয় আমি অসঙ্গতির দায় মেনেই নিলাম। এমার্সন বলেছেন—"সঙ্গতির মূর্খতা হলো ক্ষুদ্র মনের দুষ্ট ভূত।" কিন্তু আমি মনে করি যে, যা অসঙ্গতি বলে মনে হচ্ছে, তা অনেকখানি দূর হবে যখন আমরা চিন্তা করে দেখব, আমাদেব সমিতি সুস্পষ্টভাবে এবং সর্বসম্মতিক্রমে চরিত্রে অ-সাম্প্রদায়িক এবং বাবু শশীপদ ব্যানার্জী স্বয়ং আমাদের একজন সভ্য। যেভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে কষ্ট সহ্য করার বিধান মনুর বিধানে কেবলমাত্র বিধবাদের জন্য নির্দেশিত হয়েছে, তাও ঠিক নয়। একই সংযমবিধি পুরুষদের জন্যও নির্দেশিত হয়েছে এবং একই নির্বাচিত শব্দসমূহ যা বিধবাদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে তা পুরুষদের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়েছে। দ্বিজ জাতির স্নাতকদের জন্য আমরা নিম্নলিখিত নির্দেশটি দেখি : "একাকী বেদপাঠে তাকে পরিশ্রমী হতে হবে। তাকে ধৈর্যের সঙ্গে কষ্ট সহ্য করতে হবে।

অর্থাৎ সে নিত্য ফুল, মূল ও ফল এবং ভিক্ষালব্ধ খাদ্যের নিয়মানুযায়ী যে ফল পক্ক হয়ে বৃক্ষতলে আপনা থেকে পড়েছে তাই খেয়ে জীবন ধারণ করবে। আরাম বিলাসের জন্য কোন দ্রব্য সে সংগ্রহ করবে না, পবিত্র থাকবে, ভূমিশয্যায় শয়ন করবে। কোন আশ্রয়ের জন্য চেষ্টা করবে না, বৃক্ষমূলে বাস করবে। সত্য সত্যই এই কৃচ্ছ্রতাকে আমরা অযৌক্তিক মনে করতে পারি, কিন্তু এ কেবলমাত্র নারীর জন্য বা বিধবার জন্য নির্দেশিত হয়নি, হিন্দু বিধবার সাজপোশাক এবং জীবন ধারণের পদ্ধতি হলো ব্রহ্মচারী ব্রতধারী শিক্ষার্থীদের মতোই অনাড়ম্বর, সাদাসিধে, অলঙ্কারবর্জিত, অমিতাচার এবং স্নায়ু দুর্বলকরা আমোদপ্রমোদ বর্জিত। আমি এ-বিষয়ে কোন প্রশ্ন করছি না যে নারীগণ, বিশেষ করে যারা দেশের প্রথানুসারে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পান না, তদ্দ্বারা ক্লেশ ভোগ করেন কি না এবং একটি একঘেয়ে এবং নানাভাবে অন্যায়রূপে সীমাবদ্ধ এক জীবন যাপন করতে বাধ্য হন কি না। যা তাদের আরো সক্রিয়ভাবে কর্তব্য পালনে সমর্থ করবে সেই শিক্ষার অভাব হচ্ছে মস্ত বড় অভাব, সেজন্য সে ব্যাপারে সকল সুবিবেচিত প্রচেষ্টাই আমার আন্তরিক প্রশংসা এবং অনুমোদন লাভ করবে। বাল্যবিবাহ অনেক সময় এমন সব কুফল আনে, যা অতিশয় ঘৃণাযোগ্য নিন্দনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়—এ আমি জানি। কিন্তু এ পরিণাম সর্বজনীন নয়। এ বিষয়ে চিকিৎসকদের একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে ভারতে পঞ্চান্ন জন চিকিৎসক মাত্র এ-রকম তেরোটি কুফলের ঘটনা নিজেরা প্রত্যক্ষ করেছেন। যদি আমাদের দেশে চিকিৎসকদের এরকম সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয়, তাহলে কি দেখা যাবে? তুলনা কি আমাদের পক্ষে যাবে? বেদে বাল্যবিবাহের সমর্থন নেই। এর অপব্যবহারের সমর্থন মনুস্মৃতিতেও পাওয়া যায় না। এ প্রথাটির উৎস হলো হিন্দুদের তরুণ এবং প্রবীণ সকল বয়সের লোকদের নিকট হতে পবিত্রতার দাবির বিষয়ে প্রবল আবেগ। ভারতে বাল্যবিবাহ প্রথার একজন উদারমনা হিন্দুর দৃষ্টিভঙ্গি হতে পক্ষপাতিত্বহীন বর্ণনার জন্য যারা আগ্রহশীল, তারা ১৮৮৮ সালে নর্থ আমেরিকান রিভিউ পত্রিকায় কেশবচন্দ্র সেনের ভাগিনেয় এবং ব্রুকলীন এথিক্যাল এসোসিয়েসনের অবৈতনিক সংবাদদাতা সদস্য বাবু রাজকুমার রায় লিখিত এ-বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করলে ভাল করবেন...। আমাদের বা ইংরেজদের সভ্যতার

সঙ্গে ভারতের সভ্যতায় স্ত্রীপুরুষ সম্পর্কের পুরোপুরি তুলনা কি চলে? আমাদের পুর-শাসন-সংস্থা হতে সাম্প্রতিক যে-সকল তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তাতে আমাদের বিশ্বের অন্যপ্রান্তে সহজেই-লক্ষ্য-করা-যায় এমন মানুষদের পাথর ছুড়ে মারবার পূর্বে একটু থেমে পড়া উচিত। মনে হয় প্রচারকদের প্রচেষ্টা এবং নৈতিক সংস্কৃতি ফলবতী হতে পারে এমন প্রচুর ক্ষেত্র আমাদের স্বদেশে নিকটেই রয়েছে।

লিউস জি. জেন্‌স

অধ্যক্ষ

ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসন ব্রুকলিন, এপ্রিল ১২, ১৮৯৫

এখানে আমরা ডঃ জেনসের জোরালো এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ চিঠির সঙ্গে এই মন্তব্যটুকু যোগ করতে পারি যে, যদি শ্রীমতী জেম্‌স ম্যাক্‌কিন ভারতের নারীর প্রতি ঐতিহ্য পরম্পরাগত যে দৃষ্টিভঙ্গি সে সম্বন্ধে জানতে প্রকৃত আগ্রহী হতেন, তাহলে একটু অনুসন্ধান করলেই তিনি দেখতে পেতেন যে, মনুর যে সকল শ্লোক ডঃ জেন্‌স উদ্ধৃত করেছেন সেগুলিই শুধু নয়, আরো এইগুলিও আছে—"পিতা, স্বামী, ভাই, দেবর প্রভৃতি যদি নিজেদের মঙ্গল চান, তাহলে নারীকে সম্মান করবেন এবং অলঙ্কারে ভূষিত করবেন", "যেখানে নারী সম্মানিত, সেস্থানের উপর দেবতারা প্রসন্ন হন, কিন্তু যেখানে তারা অসম্মানিত, সেখানে কোন পুণ্যকর্মানুষ্ঠানই ফলপ্রসূ হয় না", "যেখানে নারী পরিজনগণ দুঃখে থাকে, সে পরিবার শীঘ্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু যে পরিবারে তারা অসুখী নয়, সে পরিবার লক্ষ্মী লাভ করে", "বন্ধ্যা, পুত্রহীনা, যার পরিবার ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এমন, পতিব্রতা পত্নী ও বিধবাগণের এবং রোগে পীড়িত নারীর সমান যত্ন নেবে।" এই সকল বিধান হিন্দু ঐতিহ্যের এমনই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে করা হতো যে সেগুলি লঙ্ঘন করা পবিত্র বস্তুকে অপবিত্র করার মতো পাপকর্ম বলে মনে করা হতো।

পাউচ ম্যানসন, ব্রুকলিন

ডাঃ লিউইস জি. জেন্‌স
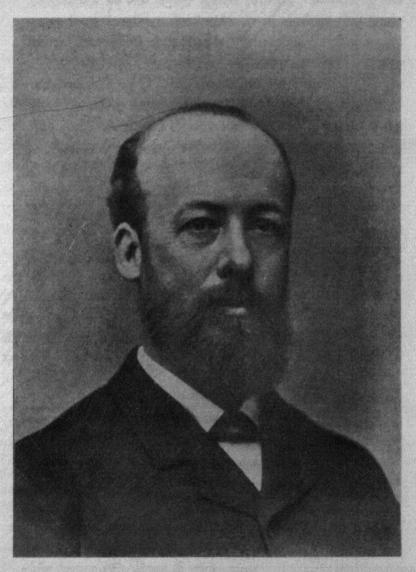
স্বামী বিবেকানন্দ (অক্টোবর, ১৮৯৪ অথবা ১৮৯৫-এর প্রথমভাগ)

হোটেল রেণার্ট, বাল্টিমোর

ভোজন কক্ষ, বসার ঘরের বামদিকের প্রসারিত অংশ

১৬৮, ব্র্যাটল স্ট্রীটের বসার ও সঙ্গীতের ঘর

(ভারতে খোদাই করা সেগুণ কাঠের আসবাবে সুসজ্জিত। দূরে ডানদিকের কোণে রয়েছে ওলি বুলের আবক্ষ মূর্তি)
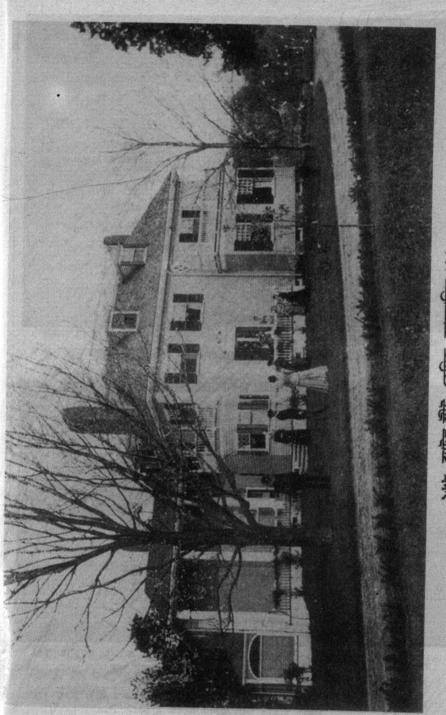
১৬৮, ব্র্যাটল স্ট্রীট, কেম্ব্রিজ, আনুমানিক ১৮৯০

(শ্রীমতী বুল ক্যামেরার বামদিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে আছেন)
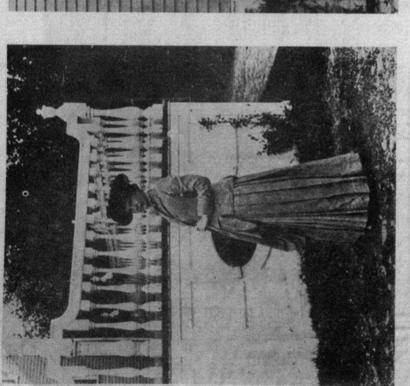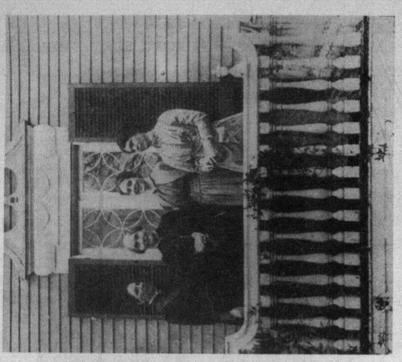
সারা চ্যাপম্যান বুল (আনুমানিক ১৮৯০)

১৬৮, ব্র্যাট্‌ল স্ট্রীট, কেম্ব্রিজে কয়েকজন

(বাম থেকে) অ্যারে. ই. স্যাপলে, অ্যামেলিয়া সি. থর্প, ওলিয়া বুল ভন্‌ ও সারা সি. বুল

সারা চ্যাপম্যান বুল

অ্যানিস্কোয়ামে হায়াৎদের বাড়ি

অ্যানিস্কোয়ামে মেকানিক্স হল
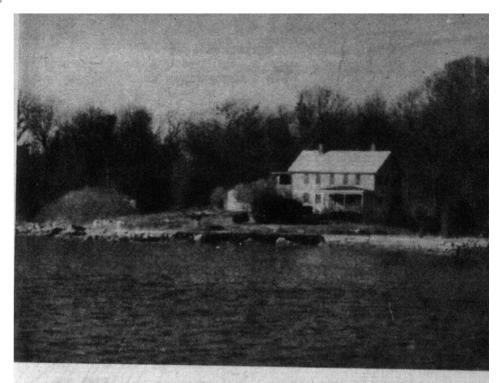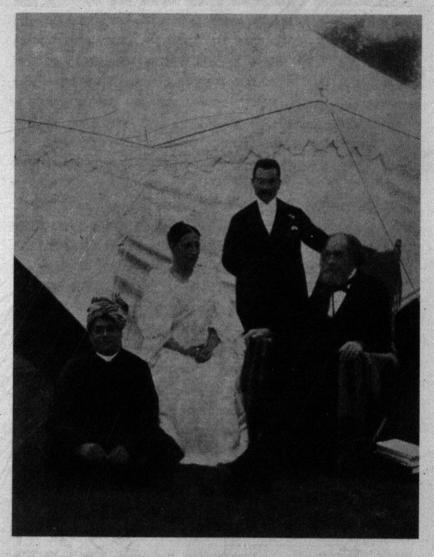
স্বামী বিবেকানন্দ, সারা ফার্মার, এম. এইচ. গুলিসিয়ান,
এডওয়ার্ড এভারেট হেল (গ্রীণ একার)

সারা. জে. ফার্মার, ১৮৯৭
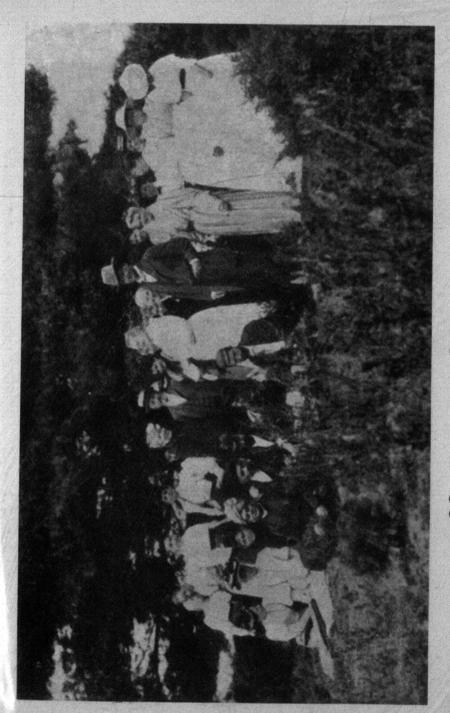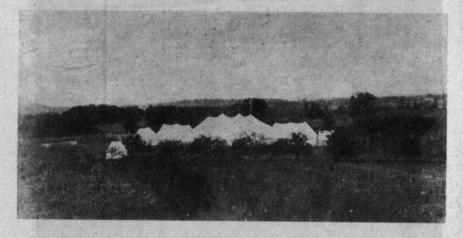
‘‘স্বামীজীর পাইন’’-এর তলায় স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর দলবল

গ্রীণ একারের সার্বিক দৃশ্য

দি আইরেনিয়ন অথবা শান্তি-নিবাস

পান্থশালা এবং সূর্যোদয় শিবির

গ্রীণ একারে স্বামী বিবেকানন্দ
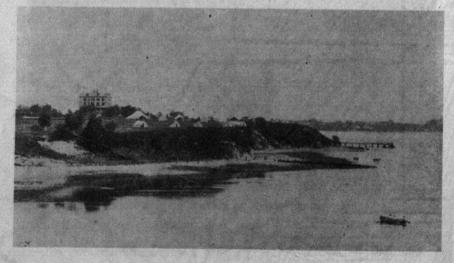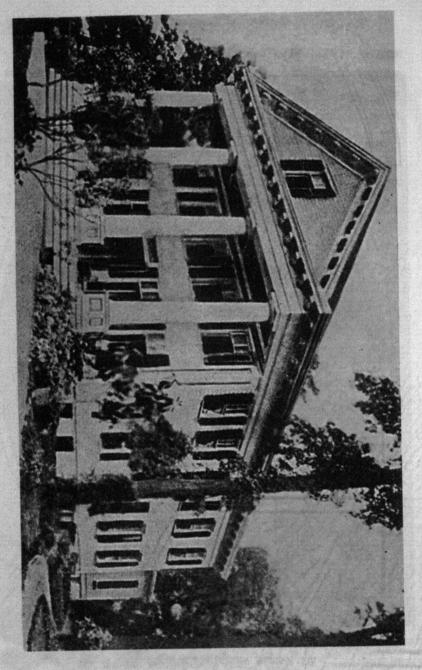
নিউইয়র্কে ফিসকিল ল্যাণ্ডিং-এ গার্নসিদের বাড়ি
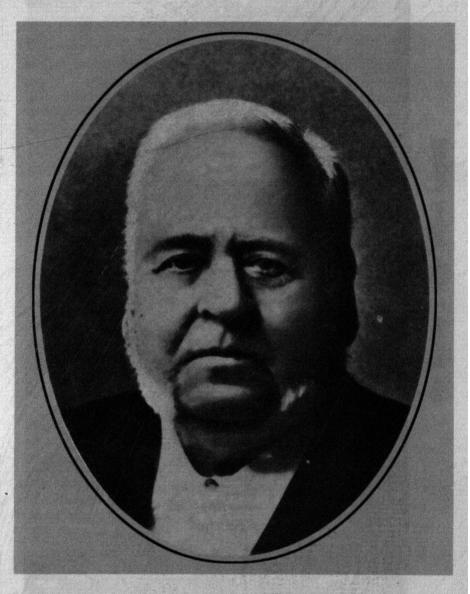
ডঃ এগবার্ট গার্নসি, আনুমানিক ১৮৯৬ খ্রীঃ
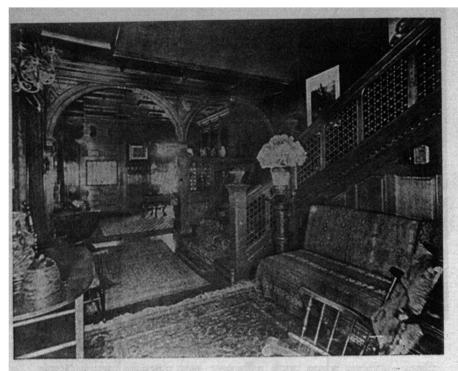
১৮৯০-এ হেল বাড়ির, সামনের হলঘর

হেলবাড়ির বসবার ঘর
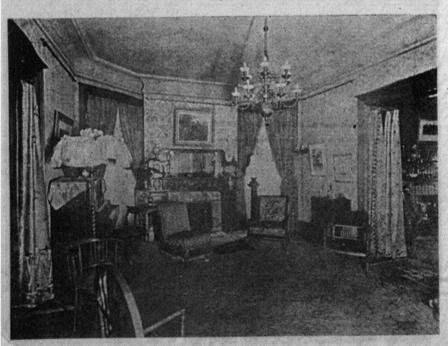
হেলবাড়িতে গ্রন্থাগার

হেল বাড়িতে, ভোজনকক্ষ

হেলবাড়ির অভ্যন্তরভাগের এই ছবিগুলি বেশ কিছুটা অস্পষ্ট, কিন্তু এই চিত্রগুলি যে এখনো আছে, সেটাই আনন্দের কথা। স্বামীজীর খুব পরিচিত এই ঘরগুলি কিন্তু বহুদিন যাবৎ ভেঙে ফেলা হয়েছে।

DECEMBER

1 Thou hast a few names even in Sardis which have not defiled their garments; and they shall walk with Me in white: for they are worthy.—Rev. iii. 4.

2 My tabernacle also shall be with them: yea, I will be their God, and they shall be My people.—Ezek. xxxvii. 27.

3 There shall be a tabernacle for a shadow in the daytime from the heat, and for a place of refuge, and for a covert from storm and from rain.—Isa. iv. 6.

4 In that day shall the Lord of hosts be for a crown of glory, and for a diadem of beauty, unto the residue of His people.—Isa. xxviii. 5.

5 I will make them and the places round about My hill a blessing; and I will cause the shower to come down in his season; there shall be showers of blessing.—Ezek. xxxiv. 26.

"HOW PRECIOUS ALSO ARE THY THOUGHTS UNTO ME, O GOD!"

স্বামীজীর স্বাক্ষর-সম্বলিত 'জন্মদিনের বই'-এর একটি পৃষ্ঠা

ম্যাসাচুসেট্স, নর্দাম্পটনে 'চতুষ্কোণ বাদামী রঙের বাড়ি'